শরৎ-পত্রাবলি

সূচি

মীনাক্ষী রায়-কে

রেঙ্গুনের চিঠি

বিভূতিভূষণ ভট্ট[১]কে লেখা

এস, চ্যাটার্জী
পি, ডব্লিউ, এ, রেঙ্গুন
২২-২-০৮

পরম কল্যাণীয় পুঁটুভায়া,[২]

অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি— প্রার্থনা করিতেছি যেন এখানি তোমার হাতে পড়ে। আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ভুলিয়া সবটুকু স্নেহের চক্ষে পড়িয়ো ভাই, যেন এ লেখা আমার সার্থক হয়। তোমাদের চিঠি লিখিতে লজ্জা করিতেছে— ভয় হইতেছে যে, এই বানান ভুল এলোমেলো লেখা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিবে, আর মনে করিবে ছেলেবেলায় এই লেখা কেমন করিয়াই বা ভালবাসিতে!

সব ভুলিয়া গিয়াছি ভাই,— বাঙ্গলা অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেন কলম দিয়া বাহির হইতে চাহে না, বাধ-বাধ ঠেকে। সমস্তই মাপ করিতে হইবে ভাই, না হইলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।

বলিতেছি কি যে, এমনি অদৃষ্ট আমার যে, এতদিন বোধ হয় মাস চারেক কলিকাতায় থাকিয়াও[৩] তোমাদের দেখিতে পাইলাম না। তুমিও কলিকাতায় আসিলে[৪], অথচ এমনি ভুল করিলে যে দেখা হইল না। এখন মনে হইতেছে যে কোনদিন কোনকালেও দেখা হইবে কিনা। একবার আশুর[৫] সহিত ও একবার একাই তোমাদের বাড়ীতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি রকম লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল— আর গেলাম না।

পুঁটু, বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নিরস দিন, মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন মাথায় বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধি যদি দিয়াছিলেন, একটু সুবুদ্ধি দিলেই ত পারিতেন! যদি না দিলেন ত এত ভালবাসিতে শিখাইয়া দিলেন কেন? ভালবাসিবার একটি মাত্র পাত্র আমাকে দিলেই কি এই বিশ্বরাজ্যে তাঁহার লোকের অভাব ঘটিত! জানি না কেমন বিচার!

বুঝিতে পারি যে, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। জানি, বিশ্বাসের কোন রাস্তা আমি রাখি নাই— চির-প্রবাসী, দুঃখী, কুৎসিৎ-আচারী[৬] আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না, কিন্তু পুঁটু, সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায়

ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই— এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দুহাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে? সাধু সাজিতেছি না ভাই— এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না— কিন্তু তোমরা ত ভাল, তবে তোমরাই বা এত নিষ্ঠুর হইলে কেন?

সুরেন ও গিরীনকে[৭] চিঠি দিয়া জবাব পাইলাম না, তুমিও দিলে না। আমাকে একছত্র লিখিয়া পাঠাইলেই কি তোমরা পতিত হইতে? এত দূরে থাকিয়া তোমাদের কাহারো কোন ক্ষতি করিতে পারিব না। একখানি চিঠি লিখিলেই যদি তোমাদের চরিত্র মলিন হইয়া যায় ত, গেলই বা' এমন জিনিষ নির্মল থাকিলেই বা কি আর মলিন হইলেই বা কি!

একদিন ত তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছিলে— আজ আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, এ চিঠির জবাব দিয়ো ভাই! চিরদিনই মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, জানি না কেন, তুমি ও বুড়ি[৮] কোনদিন আমার প্রতি বিমুখ হইবে না— আমার এ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়ো না। মিথ্যা যদিই বা হয় ক্ষতি কি? যে মিথ্যা কাহারো কোন ক্ষতি করিবে না, অথচ একজনকে আশ্রয় দিবে, নৈতিক অবনতি যে তাহাতে কতখানি মাপিয়া দেখিবার শিক্ষা আমার নাই, কিন্তু দয়ামায়া ও স্নেহের স্বর্ণাঙ্গে একতিল আঁচড়ও লাগিবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

মনে করিয়ো না আমি কাহারো কোন সম্বাদ রাখি না। ছাপার অক্ষরে পাই। হাতের লেখা নাই বা হইল, আমাকে বিশেষ করিয়া নাই বলিল,— সকলেই যাহা পায়, কৃতজ্ঞতার সহিত আমিও তাহা গ্রহণ করি। তুমি লেখ না,— তবুও নিজের মনের ভিতর দিয়া অনুভব করি, তুমি সুস্থ নির্বিঘ্নে আছ। বুড়ির সম্বাদও পাই ; মনে মনে কত যে আশীর্বাদ করি, কত গৌরব অনুভব করি, তাহা আমিই জানি। সে যাহা লেখে, একটুখানি অংশ আমি মনে মনে আদায় করিয়া নদীর ধারে জেটির উপর বসিয়া পরিপাক করি এবং কামনা করি যেন বাঁচিয়া থাকিয়া বিশেষ একটু ভাল জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।

না জানি বুড়ির খাতাখানি[৯] আজকাল কত মোটা হইয়াছে। একবার পড়িতে এমনি ইচ্ছা করে' আচ্ছা, কাটাকুটি করা 'রাফ্ কপি' একটা কিছু নাই কি? চুপিচুপি চুরি করিয়া একটিবার যদি পাঠাইতে পার, আমি তিন চার দিনের মধ্যেই রেজেস্ট্রি করিয়া ফিরাইয়া দিব। যদি নিতান্তই খোঁজখবর করে. বলিয়ো— একজন পড়িতে লইয়াছে। সে বেচারা ভাল মানুষ, অত পীড়াপীড়ি বোধ হয় করিবে না।

খুকুমনি[১০] কি শ্বশুরবাড়ী আছে পুঁটু? যদি এ বাড়ীতে থাকে ত একখানা চিঠি লিখিতে বলিয়ো ত— দেখি কেমন সে লেখে! খুব বড় হইয়াছে বোধ হয়। বগির[১১] মা স্বর্গে গিয়াছেন— ইন্দুর দুর্ভাগ্য যে সে এমন স্ত্রী হারাইয়াছে।

ভাল কথা, বউমা[১২] আমার কথা কোনদিন শুনিয়াছেন কি? আশীর্বাদ করি তোমরা চিরসুখী হও।

আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য-প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমানভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চারতলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা

পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি, চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা সুরু করিয়াছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।[১৩]

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই। একবার ওলাউঠা হইল, কতদিন হাসপাতালে অপারেশন লইয়া পড়িয়া রহিলাম। আর সবচেয়ে জ্বালাতন করিয়াছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল। গায়ের চামড়া খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ত নাই!

আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিবে। ইহার পরেও যদি বাঁচিয়া থাকি, ওদিকে চাহিব— এখন নয়।

মাস ছয়েক মদ খাই নাই[১৪]— শরীরটা যেন একটু সুস্থবোধ করি— আর যদি না খাই ত বোধ হয় বেশ সারিয়া যাইব।

তুমি ও তোমরা সকলে কেমন আছ ও থাক মাঝে মাঝে যদি জানিবার অবকাশ দাও ত বড় সুখী হই।

সময় কি তোমার খুবই অল্প? চিঠি লিখিতে এমনই কি বেশী সময়ের আবশ্যক? এই দেখ ঠিক ৯টার সময় লিখিতে বসিয়াছি— এখনো ১৫ মিনিট বাকি আছে— দশটা বাজিলেই শুইয়া পড়িব।

তোমার পরীক্ষার ফল কবে বাহির হইবে?

নতুন মাকে[১৫] আমার প্রণাম জানাইয়ো। বলিয়ো আমি ভাল আছি। তখন ভাল বুঝি নাই, এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, তিনি তখনও আমাকে স্নেহ করিতেন।

সুরেশ্বরী[১৬] ঐখানেই আছে না?

ইন্দুর নতুন বৌ হইয়াছে— ভাল!

আশীর্বাদ করিতেছি।

শরৎদা

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য[১]কে লেখা

১

ডি.এ.জি'র অফিস, রেঙ্গুন
২২-৩-১২

প্রমথ,

তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি, এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেন না, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত করিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন— আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম! তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা[২] না স্মরণ করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি— এই কথাটা যদি কোনো দিন কাহারো দেখা পাও— বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরু ভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্মান্তিক করিবে না, এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ— তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোটো বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।[৩]

(২) চাকরি করি। ৯০ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা অ্যালাউন্স পাই। একটা ছোটো চায়ের দোকানও[৪] আছে। দিনগত পাঁপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) 'হার্ট ডিজিজ' আছে। কোনো মুহূর্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর।[৫] প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর[৬] 'ফিজিওলজি, বাইওলজি, অ্যাণ্ড সাইকোলজি' এবং কতক 'হিস্ট্রি' পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে[৭] আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের 'ম্যানাস্ক্রিপ্ট'—'নারীর ইতিহাস'[৮] প্রায় ৪০০। ৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসর 'পাবলিশ' করিব। আমার দ্বারা কিছু

হয়, এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল— সবই গেল।

তোমার ক্লাবের[৯] কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল— হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যে রকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য-সভা'র একটি মাত্র সভ্য নিরুপমা দেবীই[১০] সাহিত্যের চর্চা রাখিয়াছেন— আর সকলেই ছাড়িয়াছে— এই না?

আমার আগেকার কোনো লেখা আমার কাছে নাই— কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না— জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন 'হার্ট ডিজিজ'-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া 'অয়েল পেন্টিং' সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি 'অয়েল পেন্টিং[১১] সংগ্রহ হইয়াছিল— তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি।

(১) নভেল, হিস্ট্রি, পেন্টিং

কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত।

তোমার স্নেহের

শরৎ

২

ডি. এ. জি'র অফিস, রেঙ্গুন

২৯-৪-১২

প্রমথ,

আমি মনে ক'রে আছি, তুমি চিঠি লেখ না কেন— এ দিকে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তা' আমার বাস্কেটেই পড়েছিল। মনে জানি নিশ্চয়ই পোস্ট করা হয়ে গেছে।— এ রকম ভুল হওয়ায় বড়ই লজ্জিত হয়ে আছি। যাহোক, এ বারের মত বেশী কিছু মনে কোরো না, এই অনুরোধ করি।

আমার 'হ্যাবিট্' প্রভৃতি তুমি অপরের কাছে সন্ধান লইতে গেলে কেন? জিজ্ঞাসা করলে আমি কি বলতাম না মনে কর? অবশ্য তুমি আমার বর্তমান মনের ও শারীরিক অবস্থা জান না— দেখ্‌লে বুঝতে পারবে— মিথ্যা কথা ব'লে কাজ বাড়াবার মত সময় আমার একেবারে নাই।

এ চিঠিতে বেশী কিছু লিখ্‌ব না, শুধু এইটুকু জানাচ্ছি যে, আমি মে মাসেই যাব।[১] কবে, কি বৃত্তান্ত বল্‌তে চাই নে। আমাকে সশরীরে দেখলেই টের পাবে আমি এসেছি।—

এক রকম শরীরের স্বস্তি নাই, তার ওপরেও ক'দিন থেকে আরো যেন অসুখ করেছে— শীঘ্র জবাব দিও কাজ আছে।—

শরৎ

৩

[৪ এপ্রিল, ১৯১৩]

প্রমথ,

তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম, তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস— আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি। আমি ত যোগ্য নই ভাই! আমার অনেক দোষ। তোমার সরল, স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাকে অনেক সময়ে সুখ দেয়— দুঃখ দিতেও ছাড়ে না। ভাবি, আমার সম্বন্ধে এই লোকটা ইচ্ছা ক'রেই আত্মপ্রবঞ্চনা করছে— না সত্যি এত সরল সুহৃদ্ আজকাল মেলে? তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, এ কথা কেউ যদি না বিশ্বাস করে প্রমথ, তুমি করবেই। আমার অনেক দোষের সময়েও যখন বিশ্বাস ক'রে এসেছ, তখন, এখন ত আমি ভাল ছেলের মধ্যেই। আজকাল প্রায়ই সত্যি কথা বলি।

আমার অনেক কথা আছে। আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলেবেলাকার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমারও ভাল লাগ্‌ত (মনে আছে বোধ হয়— পাথুরেঘাটায়[১]), আমারও ভাল লেগেছিল, লিখেওছিলাম। আজ তুমিও বড় হয়েছ, আমিও। তোমারও ভাল লাগে নি, আমার ত অতি বিশ্রী লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয়।[২] এও প্রকাশ করেছেন।

অনিলা দেবী[৩] ও তার ভাই শরৎ— অর্থাৎ শরৎ এবং অনিলা দেবী— অর্থাৎ অনিলা দেবী এবং শরৎ 'যমুনা'[৪] কাগজে কথা দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধেছেন। আমি অনেক অপরাধ, অনেক গর্হিত কায আমার প্রথম বয়সে করেছি— আর করতে চাই নে ভাই! আমি কথা দিয়েছি— তুমি আমার বন্ধু— এতে প্রফুল্লমনে সম্মতি দাও। লোভের বশে, বা তোমার মত বন্ধুর অনুরোধেও আর অসত্য সৃষ্টি না করি, এই আশীর্বাদ ক'রে আমাকে সর্বান্তঃকরণে ভিক্ষা দাও। আমার মামারাও বিরূপ— তাঁদেরও অনেক অনুনয় করেছি। আমার লেখা, (ছোট গল্পে যদিও তেমন মজবুত নই) ফাল্গুন থেকে 'যমুনায়' বেরোচ্ছে[৫] এবং তোমার অনুমতি পেলে আরও কিছুকাল নিশ্চয়ই বেরোবে। আমার মত্ এবং গল্পের ধারা সম্বন্ধে বিচার করবার জন্য দুই-এক দিনের মধ্যেই 'যমুনা' পাবে। যমুনা দেখে সমুদ্রের ধারণা তোমার না করতেও হয়ত হ'তে পারে। 'যমুনা' দেখে যমুনার ধারণাই কোরো— তোমার স্বাধীন মত লিখে জানাইয়ো। 'বৈশাখও' প্রথম বৈশাখেই পাবে। তাতে 'নারীর মূল্য'[৬] ব'লে ক্রমশঃ একটা প্রবন্ধ অনিলা দেবী লিখছেন। তার সম্বন্ধেও মত দেবে।

'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি[৭] কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা চরিত্রহীনের লেখা 'চরিত্রহীন'— তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে— তা ছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। আমার সম্বন্ধে (অবশ্য আমার 'রিসেন্ট্' লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে) যদি ভাল 'ওপিনিয়ন্' হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো— কিন্তু,

এখন নয়। নিঃশব্দে গোপনে— ঢাক-ঢোল পিটে ফটোগ্রাফ দিয়ে নয়। আমি অত অর্বাচীন নই। আরও একটা কথা এই যে, 'চরিত্রহীন' গল্প হিসাবে— তা' সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্—সাইকোলজিক্যাল— এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি। সেটা পুড়ে যায়, তারপরে দুটো মিশিয়ে একরকম ক'রে লিখেছি।

আজ এই পর্যন্ত। বাড়ীর খবর ভাল ত? আমার কথাটা বাড়ীর মধ্যে একবার জানিয়ে দিয়ো। তোমার পিসীমাকে প্রণাম জানালাম।

তোমার স্নেহের
শরৎ

প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে— সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে নয়— এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না— আমি সত্য চাই। তোমাদের কাগজে[৮] ভাল লেখার অভাব হবে না, কেননা, তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই 'যমুনাকে' ছাড়ি, তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি 'মেরিট'-এর আদর থাকে— তবে যমুনা বড় হবেই। আমি কোনদিন কোন কাজেই এলাম না ভাই, যদি এই একটা কাজ সম্পন্ন ক'রে তুল্‌তে পারি, তবুও একটু সুখে মরব। এর মধ্যে আমাকে জবাব দেবার প্রয়োজন নাই। একেবারে বৈশাখের 'যমুনা' দেখে তোমার স্বাধীন মত দিয়ে চিঠি লিখো। দিদির 'নারীর লেখা'টা[৯] সম্বন্ধে বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু 'ট্রুথ্' চাই-ই। আজকালকার দিনে এইটারই সব চেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক— খাতির ক'রে কথা বল্‌তে জানি না— তাই আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি, ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব, যথা— (১) নারীর মূল্য (২) ধর্মের মূল্য (৩) ঈশ্বরের মূল্য (৪) নেশার মূল্য (৫) মিথ্যার মূল্য (৬) আত্মার মূল্য (৭) পুরুষের মূল্য (৮) সাহিত্যের মূল্য (৯) সমাজের মূল্য (১০) অধর্মের মূল্য (১১) ...., (১২) ..... ।

বোধ করি বছর দুই লাগবে শেষ করতে। মত কি? ভাল হবে? দ্বাদশ মূল্য নাম দেব মনে করছি।[১০] তোমার লেখার কি হ'ল? বলেছিলে পাঠাবে? যদি পাঠাও 'রেজিস্টার্ড' পাঠাবে।

৪

১৭ই এপ্রিল ১৯১৩
রেঙ্গুন

প্রমথ,

তোমার কাল পত্র পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি। সময় নাই, কাযের কথা বলি। বৈশাখের 'যমুনায়' ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে 'চরিত্রহীন' শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে।[১] এ

অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে[২] তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, স্থির করা যথার্থই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে, 'ফল্‌স পজিশন'এ পড়িবে, এইটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলিয়াছে— না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। 'যমুনায়' ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন তোমার সম্মান অসম্মানের কথা— এইটাই আসল কথা। জলধরবাবু[৩] প্রভৃতি নামজাদা লেখক— তাহাদের জোর করিয়া পয়সার লোভে লেখা উপন্যাস অবশ্য ভাল হইতেই পারে না ; কিন্তু, তবু নাম আছে— সেগুলো ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। অথচ, আমারটা যে তোমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে এরই বা স্থির কি? যাই হৌক, তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনে'র যতটা লিখিয়াছিলাম— (আর অনেকদিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনরূপ বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। 'অ্যাপ্রিসিয়েট্' করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন[৪]— কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে। তোমাদের জলধর সেন প্রভৃতির লেখাই বেশ হইবে। আমার এ সব বকাটে লেখা— এর যথার্থ ভাব কে-ই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কে-ই বা ভাল বলিবে ! তবে, তোমার উপর আমার এই শপথ রহিল, যদি বাস্তবিকই আর দ্বিতীয় উপায় না থাকে, তাহলে আর কি বলিব, অন্যথা আমাকে ছাড়িয়া দিয়ো— 'যমুনার' কলেবরই ইহাতে বৃদ্ধি করিব। তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে। তুমি যদি সতাই মনে কর, এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত, তাহলে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য— এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা[৫] মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে, একটা কথা বলি -- শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া 'চরিত্রহীন' মনে করিয়ো না। আমি একজন 'এথিক্‌স'এব স্টুডেন্ট--- সত্য স্টুডেন্ট। 'এথিক্‌স' বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। যাহা হৌক্, পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো, তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে, সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়। রাঁড়ের বাড়ীর গল্পও নয়। যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয়, তাহা হইলে বলিয়ো আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই-— আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি— এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের 'যমুনা' কেমন লাগল? 'পথনির্দেশ'[৬] বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো-—

শরৎ

৫

[মে ১৯১৩]

প্রমথ,

তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস।[১] এই জন্যই 'যমুনা' যাতে তোমার কাছে যায়, সে ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার স্বভাব জানইত। যারা আপনার লোক তারা যে আমাকে ঠিক জানতে পারে, অথচ, পরে আমার কিছুই না জানে, এই যে আমার স্বাভাবিক ব্যাধি— এর অনুরোধেই তোমাকে যমুনা পাঠানো এবং এর জন্যই তোমার কাছে 'চরিত্রহীন' পাঠালাম। আশা করি এতদিনে পেয়েছ। কি জানি আমার মনে একটা ভয় হয়েছে; এই বইটা ভাল লাগবার সাহস তোমার নাই। 'ইন্‌টেলেকচুয়ালি' এ একেবারে নির্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়— কিন্তু 'রুচির' কথা তুল্‌লে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশী। অথচ, সব বুঝেও আমি এর এক ছত্রও বাদ দিই নি— দিবও না। যাক্ এ কথা। তোমাকে পড়তে দিয়েছি, তোমার 'অনেস্ট ওপিনিয়ন্' দিয়ে ফিরিয়ে দেবে আশা করি— অনুরোধ করি। তোমরা 'রিজেক্ট' কর— আমার এই (ঈশ্বরের কাছে) আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ, তোমাকে তাহলে আর 'ফল্‌স পজিশন'এ পড়তে হবে না। সহজেই বলতে পারবে— এ পছন্দ হয় নি।

একবার মনে করেছিলাম, প্রমথ, তোমাদের কাগজের জন্য কিছু ছোট গল্প সাধ্যমত ভাল ক'রে লিখব— কেন না, তুমি এ কাগজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু, হঠাৎ সে আশাও ছাড়লাম। এর সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম (ফণীবাবুর— যমুনা-সম্পাদকের) তা থেকেই সব বুঝবে— এবং হরিদাসবাবুর আপনার লোকে যখন এরি মধ্যে আমার নামে এত মিথ্যা আমারি বন্ধুদের কাছে বলেছে, তখন ভবিষ্যতে (যদি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি) আরো যে কত মিথ্যা কুৎসা রট্‌বে তা ত তুমিই বুঝতে পাচ্ছ। আমার নিন্দায় আমার চেয়ে তুমি নিজে বেশী কষ্ট পাবে তা' আমি বেশ জানি, কিন্তু, পাছে হরিদাসের প্রতি স্নেহ তোমাকে আমার দিকে অন্ধ ক'রে ফেলে তাই এত কথা লিখলাম— না হ'লে শুধু ফণীর চিঠিটা পাঠিয়েই তোমার সৎ বিবেচনার উপর বরাত দিয়েই চুপ ক'রে থাকতাম। যা' আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড়লোকের নির্লজ্জ খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে, যদি তোমাদের সঙ্গে 'সাহিত্যিক' সম্বন্ধ রাখি? তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের 'ইনফ্লুয়েন্স' ছোট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রচুর— কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয় এবং টাকারও কাঙাল নয়। অন্ততঃ আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালবাসা ছাড়া আমাকে কিন্‌তে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, ত' তোমাদের পাড়াটি ত ছোট। কি দুঃখ হয় বল ত? হরিদাসবাবুর ম্যানেজার সু—[২] তাকে আমিও চিনি—আমার সম্বন্ধে এত মিথ্যা রটাতে তার একটু সঙ্কোচ বোধও হ'ল না? তারা মনে করে আমি তাদেরি মত হীন, নীচ, ব্যবসাদার সাহিত্যসেবীর মুখ ভ্যাংচানি— না?

প্রমথ, বেশী গর্ব করা ভাল নয়, আমি কি তা' আমি জানি। আমি যে-কোন কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি— এ যদি তোমার মিথ্যা কথা ব'লে মনে হয়, বেশী দিন নয়— একটা বৎসর দেখো— তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না।

যাক্, এ সব কথা আমাদের আপোষের কথা, এ নিয়ে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—

কিন্তু, যদি তোমার ওদের ওপর এতটুকুও 'ইনফ্লুয়েন্স' থাকে, আর যদি আমি তোমার শত্রু না হই, ত' এ সব মিথ্যা যাতে আর না রটে তা' কোরো ভাই। আমি ঝুড়ি ঝুড়ি লিখ্‌তেও পারি নে— লিখ্‌লেও ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি নে। ফণী আমাকে কিছুতেই একটি কথাও মিথ্যা বলবে না, এ আমি নিশ্চয় জানি। তাছাড়া, আমিও ঐ হতভাগা বা— কে জানি অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে শুনেছি। তাই এত দুঃখ হয়েছে যে, তোমাকেও এ সব রূঢ় কথা লিখতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

প্রমথ, আমি 'যমুনা'কে ভালবাসি সে কথা তোমার অগোচর নাই, তবুও পাছে তোমার অমর্যাদা হয়, এই ভয়েই তোমাকে 'চরিত্রহীন' পাঠিয়েছি। (তুমি ভাল-মন্দ কি বল, না-বল সেটাও আর একটা কথা) যদি একেবারেই না পাঠাই, তোমাদের দলের লোকের মনে হ'তে পারে, আমি তোমাকে ঠিক অত ভালবাসি না। কিন্তু ভাল যে বাসি এইটা সপ্রমাণ করবার জন্যেই তোমাকে পাঠান। তুমি পড়বে এবং 'রিজেক্ট' করবে। ক্ষতি নাই, তবু তোমার মান থাকবে এবং আমার ওপরে যে তোমার জোর আছে সেটাও জানা যাবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ফণী পালকে লিখে দেব। সে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসবে।

আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্বটাই তোমাদের দলের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। টাকা সবাইকে কিন্‌তে পারে না। একটু সৎ, একটু 'অনেস্ট' হওয়া চাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? এখনও কাগজের অনুষ্ঠানপত্র বার হ'ল না, এর মধ্যেই এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা গ্লানি? তোমরা পরে যে কি করবে, আমি তাই ভাবছি। সমাজ যাতে ভাল হয়, লোক যাতে সৎ শিক্ষা পায়, মাসিক কাগজের সে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অথচ, এমনি তোমাদের ম্যানেজার যে— তাঁর কথা আর বেশী তুলতেও রাগ হচ্ছে। টাকা খরচ ক'রে মাইনে দিয়ে কি এই লোক রাখে? এই সব নমুনা যাতে বেশী প্রশ্রয় না পায়, হরিদাসবাবুকে আমার সবিনয় অনুবোধ জানিয়ে বলবে। বলবে— আমার পেশা চাক্‌রি— তাতে দু-মুঠো খেতে পাই। আমি সন্ন্যাসী— আমার নামের ওপর, টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশী লোভ নেই। তাছাড়া, আমি ত' হরিদাসবাবুর কোন অন্যায় করি নি, যে, তাঁর 'ডান-হাত' আমার 'ডান-হাত'টা কাটবার চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর এমন নির্বাসনে এত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতাম না।

যাই হৌক— তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু বললে যা মানে হয় তাই। তার এক তিল কম নয়। যা উচিত তুমি করবে।

'পথনির্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই[৩]— বহুদিনের একটা গোপন কথা? না পড়লেও ক্ষতি নেই— কিন্তু, কেমন লাগল— লিখো। শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত-গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)

আজ ক'দিন যেন একটু জ্বরোভাব টের পাচ্ছি। জ্বর না হ'লে বাঁচি। তোমার ছেলে[৪] কেমন আছে? আশীর্বাদ করি যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রাণধনবাবুকে[৫] আমার নমস্কার জানিয়ে— আমার কথাটা একটু মনে ক'রে দিয়ো। নিতান্ত যেন ভুলে না যান, এইটি মাঝে মাঝে কোরো।

শরৎ

প্রমথ, আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, সু—র অত কথার মধ্যে হয়ত একটু সত্য নিহিত আছে। হয়ত ওঁরা (অর্থাৎ হরিদাসবাবু প্রভৃতি) বলিয়াছেন যে, আমার একখানি বই দয়া করিয়া তাঁর কাগজে প্রকাশ করিয়া দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব। মস্ত ভুল, প্রমথ ' মস্ত ভুল !!

প্রমথ, সু—র সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা কোরো তার 'জাহ্নবী'তে যদি দয়া ক'রে আমার কিছু ছাপায় ত' কিছু টাকাকড়িও না হয় তাকে দিতে পারি। 'ডা-সোয়াইন! সে লোকটা নাকি 'পুণ্যের জয়' না কি একটা লিখেছিল। পুণ্যাত্মা লোকের এই লেখাই ত চাই।

৬

৩-৫-১৩

প্রমথ,

'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ইতিপূর্বে দু-চার দিন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম, কিন্তু এই যে নিজের কায হয়ে গেছে, বস্ চুপ ক'রে আছ। যা হোক্, ওটা পড়্লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার ভাল লেগে উঠ্ছে না— অন্ততঃ ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু, ভালই হৌক আর মন্দই হৌক, অ্যানালিসিস্ ঠিক আছে, না? দার্শনিক গোছের।— [নীরস]? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্যে', না হয় 'যমুনা'য়, না হয় 'ভারতী'তে[১] বেরুতে পারবে, কিন্তু, তোমাদের এটা নূতন কাগজ— একটু 'পুণ্যের জয়'[২], কিম্বা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরছে কিম্বা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকেও খুব তারিফ ক'রে বল্‌বে— হ্যাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিন্দু আইডিয়াল্ বজায় হচ্ছে। তা নইলে এ স.। লেখা একে ত' শক্ত, তার পরে তেমন হিঁদু মাখামাখি নয়। রুচির দিক্ দিয়ে ত অব্‌জেকশন্ নিশ্চয়ই হবে টের পাচ্ছি। এ ব্যবসায় কোন্‌টা ভাল দাঁড়ায়, সেইটা দেখা প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কিন্তু, তোমার স্বাধীন নিরপেক্ষ মতও চাই। আমি জানতে চাই আমার বন্ধু প্রমথনাথ কি বলেন ' যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হ'লে যাতে ভাল হয়, তার চেষ্টা করব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে লিখো, আমি চিঠি লিখে দিলে ফণী গিয়ে নিয়ে আসতে পাববে।

তোমাদের অনুষ্ঠান পত্র কি এখনও বার হয় নি? বার হ'লে আমাকে যদি দয়া ক'রে একটা পাঠাও ত' বড় ভাল হয়। এবং যখন কাগজ বেরোবে তখন এক কপি পাঠিয়ে দিলে দেখ্‌তে পারব।

তোমাকে একটা পরমর্শ দিই। তুমি না কি ভার নিয়েছ[৩] তাই বলা, না হ'লে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর, তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী— তপ— জপ— কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখবে। ওটা বাজারে বড় নাম ক'রে দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় ক'রে ম'রে যাবে—(একটা বিষ খাওয়া চাই !) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক জায়গায় মিলে যাবে। এ হ'লে

লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নূতন কাগজ বার করতে হ'লে এই সব নভেলের বড় আদর। আমাকেও যদি অনুমতি কর, আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখ্‌বে। আমি সেইমত রচনা সুরু করে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভায দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখিবে।[৪] ভাল কথা— তোমাদের পরম বন্ধু সু—র সম্বাদ কি, কেমন আছেন তিনি? কি করলেন? কি কি মন্ত্রণা তিনি আজ পর্যন্ত দিলেন শুনি? মন্ত্রণা যে মূল্যবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।—

তোমার স্নেহের

শরৎ

প্রমথ, তামাসা কর্‌লাম বলে রাগ কোরো না যেন ! নিছক তামাসা কারু ওপরে কোন রকম 'রিফ্লেকশন্‌' নয়, তাহা নিশ্চয় জেনো। তোমাকে একটু তামাসা করলাম শুধু এই জন্যে যে, তুমি না দেখেই 'চরিত্রহীনে'র জন্য মহা হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম এটা 'চরিত্রহীন', ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল 'এথিক্‌স' আর 'সাইকোলজি'! ধর্ম নয় !

যা হোক্‌, তুমি যে তোমার দলের মধ্যে আমার জন্যে অপ্রতিভ হবে সেইটাই আমার বড় দুঃখ। যে কেহ তোমাকে এ সম্বন্ধে বলবে তাকেই এই বলে জবাব দিয়ো, শরৎ লিখতে যে জানে না তা নয়, তবে এটাতে তার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা অসম্পূর্ণ অবস্থায়[৫] চোখে পড়ছে না। আমি যে গল্প বানাতে পারি, তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ। এই বলে জবাবদিহি কোরো। আমি ভবিষ্যতে তোমাদের যাতে ভাল লাগে, এই রকম করে একটা নভেল লিখে দেবো, কিছু মনে কোরো না।

আর এক কথা— অনিলা দেবী আমার দিদি— আমি নয়। কি কোরে তুমি জানলে যে একই ব্যক্তি? কেন এ কথা দ্বিজুবাবুকে বললে? ভাল কর নি, আমি ত তোমাকে কোথাও বলি নি এঁরা এক ব্যক্তি? দু কান চার কান করতে করতে কথাটা (যাহা মিথ্যা) প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তা হলে ভারী লজ্জার বিষয় হবে। কেন না, অনেক তীব্র সমালোচনা দিদি করবেন বলেছেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরুদ্ধে তাঁদের কত স্থানে কত ভুল, সেই সমালোচনা করবেন বলে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। বোধ করি বড় গ্র্যাণ্ড হবে ! শুনছি ঠাকুরবাড়ীর প্রায় সবাই শুধু নামের জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। সম্প্রতি ঋতেন্দ্রবাবুর একটা সমালোচনা (ফাল্গুনের 'সাহিত্যে কাণকাটার ইতিহাস বলে যা লিখেছেন) সমস্ত ভুল সম্বাদ, এমন মাথা উঁচু করে সবজান্তা গোছ হয়ে যে মানুষ লিখতে পাবে, দিদি লিখেছেন, এটা তিনি আর কখন কোন ইংরাজী বাঙলা বইয়ে পড়েন নি।[৬] আমার বিশ্বাস তাঁর অধ্যয়নটা 'এ লিট্‌ল বিট্‌ ওয়াইড্‌'। এ অবস্থায় লোকে যদি মনে করে একজন সামান্য কেরাণী এবং গল্পলেখক এ সমস্ত গম্ভীর সমালোচনা করেছেন, সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ভাল হবে না। তা ছাড়া দিদিও দুঃখ করতে পারেন। কথাটা পার ত উল্টে নিয়ো।[৭]—শ

৭

[জ্যৈষ্ঠ ১৩২০?]

প্রমথনাথ,

তোমার একসঙ্গে দুইখানি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যদিও ফণীর পত্র পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি তোমার বৃদ্ধ— মশায়কে লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। বুড়ো মানুষ শাপ শাপান্ত করিবে ভাল নয়। একটু বিনয় ক'রে বলিও যেন আর কিছু না মনে করেন। তিনি যখন কিছু সত্যই বলেন নাই, তখন এ কথা এই পর্যন্ত।

আমার তোমাদের ইভিনিং ক্লাব-এ যে সুখ্যাতি হইয়াছে, শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলে দ্বিজুবাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আসিতাম। এর বেশী আর কিছুই করিবার আমার বোধকরি ক্ষমতা থাকিত না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই হয় যে, 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথনির্দেশ' ঢের ভাল। দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথাটাই ফাইন্যাল হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে।

'ভারতবর্ষ' যখন তোমার কাগজের মতই তখন এ বিষয়ে আমার কর্তব্য আমি স্থির করব। এ বিষয়ে মনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কথা, আমার বড় সময় কম। রাত্রে লিখিতে পারি না, সকালে ঘণ্টা দুই, তা হয়ত তাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না। তোমাকে আমার একটা নিবেদন, আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা' তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, একটু সে দিকে নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে যে তোমার অসম্মান করে কিম্বা উপেক্ষা করে, তা সে ফণী কেন, কাহারো জন্যই সেটা আমি পারিব না। সেই জন্যই 'চরিত্রহীন' পাঠাই। যদিও এই পাঠানো লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে এবং হইবে, তাহা জানিয়াও আমি পাঠাইয়াছি। যা হোক্, তোমাদের যখন ওটা পছন্দ হয় নাই, তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হইয়াছে, সেই মত 'যমুনা'তেই ছাপা হইবে। তুমি বলিয়াছ, একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে।

তুমি যা লিখিয়াছ তাহা আমিও জানিতাম। আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই! অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ। এ একটা 'সায়েন্টিফিক্ সাইকো : অ্যাণ্ড এথিক্যাল্ নভেল' আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙলায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শন' পড়েছ কি? 'হিজ বেস্ট বুক' একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই, সে কথা সত্য।

যা হৌক, ওটা যখন হইল না তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নতুন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে আমারও আর অন্য উপায় নাই। আমি উল! বলিয়া আর্টকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা 'ইন্ স্ট্রিক্টেস্ট সেন্স মরাল' হয় তাই উপসংহার করব। আমাকে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিও, ফণীকে দিবার আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রথম সংখ্যার[১] জন্য কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব।
হ্যাঁ, আর একটা কথা, এর পূর্বে আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত— ঝি লইয়া সুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়ত আলাদা পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম। তা সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন 'টু লেট্'।

'পাষাণ'টা[২] কি, ভাল মনে নেই। নিজের কাছেও নেই। তা ছাড়া ও-ছেলেবেলার লেখা। না দেখে না সংশোধন করে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। করলে হয়ত 'কাশীনাথে'র মত হয়ে দাঁড়াবে। আমার 'চন্দ্রনাথ' গল্পটা মনে আছে? সেটাকেও এখন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। সেটা যমুনায় বেরুচ্ছে।[৩] এটা শেষ হলে চরিত্রহীন বার করা হবে বলেই সকলে স্থির করেছেন। সমাজপতি মশাইকে দিবার কথা ছিল, এবং এ জন্য তিনি পত্রাদিও লিখেছিলেন কিন্তু ফণীর কাগজ যে আমার কাগজ।

তুমি ফণীর উপরে রাগ কোরো না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে, তুমি আমার কি এবং ২০ বছরের[৪] কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোক মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি করে জানবে? তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না প্রমথ! যদি কোনদিন এ বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কথা হয় বোলো, বাইরের লোককে কি জানাব, শরৎ আমার কি এবং আমি শরতের কি! বরং না জানাই ভাল। তুমি আমাকে যা যা লিখেছ একটু ভেবে চিন্তে পরে জবাব দেব। তুমিও একটু শীঘ্র জবাব দিয়ো। হরিদাসবাবুকে এবং প্রাণধন ভায়াকে আমার কথা একটু মনে ক'রে দিও।

শরৎ

৮

(ডাকমোহর ১২ মে, ১৯১৩)

প্রমথনাথ,

তোমার তৃতীয় পত্র পাইলাম। পূর্ব পত্রের যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চমূল্য দিই। আমার যাহা বলিবার বলি, তাহার পরেও যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছাই থাকে, যথাসাধ্য তোমার অভিরুচি পালন করিতে চেষ্টা করিব। লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া?) হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার 'পথনির্দেশ'[১]কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি, ওটা তোমার ভাল

লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটা 'পেণ্টার' যেমন 'কালার ব্লাইণ্ড' থাকেন, তুমিও তাই। 'রামের সুমতি'তে আর্ট কম, তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর, এ প্রায় সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথনির্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে, অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া 'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি— এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে— সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে।

যাক্। 'চরিত্রহীন' ফিরাইয়া (রেজেস্ট্রি) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি টলস্টয়ের 'রিসারেক্শন' (দি গ্রেটেস্ট বুক) পড়িয়ো। অ্যাবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না।[২] সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কে শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কায আছে। সে কাযটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়— তাই করিতে হইবে। অস্টিন, মারি কোরেলি প্রভৃতি এবং সারা গ্রেণ্ড সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তা ছাড়া 'সেনট্রাল ফিগার' করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে? অবশ্য বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি, কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ করে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তুমি বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাই, কিন্তু এই এক 'চরিত্রহীন' অবলম্বন করিয়া 'যমুনা'র কিরূপ উন্নতি হইবে না-হইবে, দেখাও আবশ্যক। মনে করিও না যাহা ছোট, তাহা কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোটও বড় হয়, বড়ও ছোট হয়।

সেও যাক্। গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম। তোমাদের কাগজের জন্য কিরূপ গল্প খাটিবে— এটা বুঝিতে পারাই আমার পক্ষে শক্ত হইবে। এ যদি সন্দেশ তৈরি হইত, না হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছানা চিনির ভাগ বেশী কম করিয়া করিতাম— কিন্তু এ যে মনের 'সৃষ্টি'। সেই জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, এবং সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগজের জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিকই যদি তোমার কাযে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমার কায যে তোমাদের কাছে অকায বলিয়া ঠেকিবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, রাগ করিও না— তোমাদের 'ভিউ' এত 'ন্যারো' হইয়া গেল কিরূপে, এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি।

তুমি 'নারীর মূল্যে'র সুখ্যাতি করিয়াছ— জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা (যমুনা) পড়িলে তুমি যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার 'অর্থের মূল্য' লেখ। কি রকম লিখিতে ইচ্ছা

করিয়াছ, খুব ভাল। তবে বিদ্বানের সব দেশে পূজা হওয়া (বড়লোকের চেয়ে) উচিত নয়—কথাটা প্রমাণ করিবে কি করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পূজা ত সে পায় না কিন্তু পাওয়া উচিতও নয়, সেইটাই প্রমাণ করা শক্ত হইবে বোধ হয়।

তোমাদের কাগজের চারিদিকেই নাম হইয়াছে। সকলেই বলিতেছেন, দুই এক মাস নমুনা দেখিয়া তবে গ্রাহক হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিব। সুতরাং প্রথম দুই এক সংখ্যা যা-তা হইলে কখনই চলিবে না। কেন না দাম ঢের বেশী[৩]— ঠিক এই পরিমাণেই লোকে আশা করিবে। অন্ততঃ এই ত বর্মার 'ভিউ'। প্রথমেই যেন লোকে 'প্রেজুডিস্‌ড' না হইয়া যায়। আসা করি ফিরৎ ডাকে 'চরিত্রহীন' পাঠাইবে। তোমাকে পূর্ব পত্রেই জানাইয়াছি— ওটা যমুনাতেই বাহির হইবে— অবশ্য কাগজ বড় করিয়া। অবশ্য ফলাফল তার কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার কথা? এত কুরুচিপূর্ণ তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। যা শক্ত জিনিস সেই ভার সইতে পারে।

আর এক কথা। 'চোখের বালি' তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী[৪] ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেমন পাঁচকড়ির 'উমা'[৫]। আমি তো এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই ; পরে কি করিব কি জানি!

তুমি আমার উপর রাগ করিয়ো না প্রমথ। তোমাকেও যদি মন খুলিয়া না বলিতে পারি, তা হইলে আর কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু আর সাহস নাই। 'বিধবা' ছাড়া গল্প জমে না, এই যখন তোমাদের 'নেগেটিভ স্ট্যাণ্ডার্ড'— তখন আমার আর কিছুমাত্র উপায় নাই।

তোমাদিগকেও একটা সামান্য উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়ো, না হয় করিও না। তোমাদের পোষা লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্‌ দিয়া লেখাও, আর প্রতি পদে ওভারসিয়ারের মত 'লেভেল' দড়ি হাতে মাপ জোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে। এ কাগজ 'আলটিমেটলি ফেলিওর্‌' হবে। যারা সুলেখক, এবং যথার্থই যাহাদিগকে 'কবি' বলিয়া মনে কর, তাহাদের সমালোচনা কর, কিন্তু লেখাও প্রকাশ কর। লোককে ভাল মন্দ দুই-ই বলিবার সুযোগ দাও— গাল দাও কিন্তু প্রকাশ হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়ো না। পাদবিদের 'হীম' বা গির্জার 'প্রেয়ার' শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে করে তোল, সে টিকসই হবে কি? আমি অনেক কথা লিখলাম— কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে, পাছে মনে কর আমার এই লেখার মধ্যে একটু রাগ বা জ্বালা আছে। কিচ্ছুটি নেই। তুমি যে আমাকে সরলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। এতে আমি বুঝতে পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিত্র ন'ন তিনি কি বলবেন। অবশ্য বইটাকে 'ইম্‌মরাল্‌' বলায় একটু দুঃখিত যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু উপায় কি? ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। 'পথনির্দেশ' গল্পটাই যখন 'ইম্‌মরাল্‌' ঠেকেছে (কারণ লিখেছ— 'এটা ঠাট্টা' কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা বোঝা ভার) তখন 'চরিত্রহীন' এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিয়ে 'ইম্‌মরাল্‌' করা হয়েছে।

এও যাক। তোমাব খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক কে? কিন্তু জলধর সেন টেনের বিশুদাদা টাদা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও বড় কম বাঙ্গালী নেই এবং যারা আছে তারা একটু বেশ বোঝে সোঝেও, কিন্তু ওসব আর কেউ পড়তে চায় না। এমন

কিছু বার কর্‌বার চেষ্টা কর, যা— উজ্জ্বল! পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোমরা যা বার কর্‌বে আমরা তাতে সেইরূপ আকৃষ্ট হয়েই থাকব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই থোড়—বড়ি—খাড়া আর খাড়া—বড়ি—থোড়ে আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি'[৬] বার হয়, লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকত। আসা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি 'সাক্‌সেস্‌ফুল' হয়। কাবণ তোমাদের 'রিসোর্স' বিস্তর— হাতে বিস্তর লোক আছে। এবং সবচেয়ে বেশী (টাকা) জিনিসটাও আছে।

শুনেছি, তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা কর নি। যাই হৌক, তাতে কি কি ছিল একটু সংক্ষেপে যদি লিখে জানাতে পার ভাল হয়।

আজ এই পর্যন্ত। কি জানি এত বড় দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি, কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশী। আমি কি এতই হীন?

যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশী করেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া একটা 'ফিক্‌টিসাস' নামে (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভাল মন্দ যাই হোক, 'কন্‌সিকোয়েন্স' আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এত দিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না। আমার ভালবাসা জানিয়ো, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো।

শরৎ

৯

(ডাকমোহর ২৪ মে, ১৯১৩)

প্রমথ,

দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ[১] 'রেঙ্গুন গেজেটে' পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে খুব কম জানিতাম তাহা নহে ; অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না। সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না। কে যে কখন যাত্রা করেন, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালী মাত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমাদের পাড়ার যে কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার ছেলে,[২] বাড়ী, ইভ্‌নিং ক্লাব প্রভৃতির আরো একটু বিস্তারিত সম্বাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম— এবার যখন পত্র লিখিবে একটু জানাইয়ো।

তোমাদের 'ভারতবর্ষে'র সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম, হয়ত এ কাগজ আর বাহির হইবে না! বাহির হইলেও খুব সম্ভব টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন?[৩] তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। 'কম্‌পাইলার'ও[৪] বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরাণ ধরণের।

তিনি খুব সম্ভব 'ফেলিওর্' হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের মোড়ল[৫] হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক নন, এটা মনে রাখিয়ো। অবশ্য তোমরা কলিকাতায় থাক, আমরা মফঃস্বলে থাকি ; এ সব মতামত আমরা দিতে পারি না। দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধ করি তেমন গ্রাহ্য হইবে না— যাই হৌক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাই জানাইলাম।

শেষে আমার কথা। তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য তাহা নিশ্চয়ই করিতাম কিন্তু এখন তিনি আর নাই। তিনি সাহিত্যিক এবং বোদ্ধা ছিলেন, তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন— এবং না বুঝিলেও, তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে কবিলে প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না— অভিমানও হইত না, কিন্তু এখন যে-সে আমার দাম কষিবে, হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়— হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা 'ফাইল' কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর।— তুমি আমার কত বড় সুহৃদ্ তাহা আমি জানি— সে কথাটা একদিনের তরেও ভুলিব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্যাদা নষ্ট করিব না। সুরু হইতেই তোমাকে বলিতেছি, তোমাদের লেখকরা সাগরতুল্য। যাঁহাদের রচনা এবার বাহির হইবে বলিয়া লিখিয়াছ, অনুরূপা, বিদ্যাবিনোদ, নগেনবাবু[৬] প্রভৃতি, তাঁহাদের লেখার কাছে আমার লেখা যে গোষ্পদের মত দেখাইবে! আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই— এর বেশী আর কিছু আশা করি না।

আর একটা কথা চরিত্রহীন সম্বন্ধে। আমার সুরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাসবাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন, ওটা এত 'ইম্‌মরাল্' যে কোন কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে— কারণ তোমরা আমার শত্রু নও, যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে— আমিও ভাবিতেছি, ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত 'আর্গুমেণ্ট' ফণীকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম, তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস আমি এমন কিছু লিখিতেই পারি না, যাহা 'ইম্‌মরাল্'। সেই জন্য বাধ্য হইয়া তোমার অনুরোধ ভাই রক্ষা করিতে বোধ হয় পারিলাম না। কারণ 'অ্যাড্‌ভার্টাইজ' করা হইয়াছে, আর ফিরান যায় না। আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও ভাবি না। লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক, কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং 'ইম্‌মরাল্' হোক, 'মরাল্' হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে করুক। তবে, একটা উপায় করিতে হইবে। 'রামের সুমতি'র মত সরল স্পষ্ট গল্প পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া চরিত্রহীনের 'এফেক্ট মাইল্ড' করিয়া আনিতে হইবে। ফণী লিখিয়াছে, লোকে আমার গল্প পড়িবার জন্য উতলা হইয়া আছে। যাক এ কথা। 'কাল' আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দু-ই করিবে, সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।

যাক্। এই সময়টায় যদি আমি কলিকাতায় থাকিতাম, তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য অনেক করিতে পারিতাম। কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটাই 'এডিট্' করিয়া

দু-এক মাস চালাইয়া দিতে পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে। তবে, যখন কলিকাতাতে নাই, এবং শীঘ্র থাকিব এ আশাও নাই— তখন এ সব কথার আলোচনায় লাভ নাই।

এই দূর দেশে কম সময়ে আমি শুধু যমুনার জন্যই একটু আধটু লিখিতে পারি, এর বেশী সময় এবং স্বাস্থ্য দু-ই নাই। তুমি আমার উপর যেন একটুও দুঃখ করিও না এই আমার মিনতি।

দ্বিজুবাবু আর নাই— আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া। তা ছাড়া আমি একবকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব। এ জন্য আমার শিষ্যমণ্ডলীকেও[৭] অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এত শ্রদ্ধা করে যে, আমি অনুরোধ করিলে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবে না— শুধু এই জন্যই এখনো তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। আশা আছে প্রমথ, এদের সাহায্য লইলে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইবে। শুনিতেছি, এরি মধ্যে যমুনার বেশ আদর হইয়াছে। তাই প্রতি মাসে যদি এমনই আদর অর্জন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় হইবে আশা করা যায়। কাগজটা আগামী বৎসর হইতে ডবল সাইজে বাহির হইবার কথা আছে।

তোমার কথা রাখিবার জন্য সমস্ত জানিয়াও এবার চরিত্রহীন পাঠাইয়াছিলাম, আবার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার কথা রাখিবই। কিন্তু পরের জন্য আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই! হরিদাস তোমার বন্ধু, আমি কি তার চেয়ে কম? তোমাকে যত লোকে যত ভালবাসিয়াছে, আমি কারুর চেয়ে কম বাসি নাই, সেই কথাটা যখন আমার উপর রাগ হইবে তখন স্মরণ করিয়ো। আর কি বলিব! আমি ওখানে লেখা দিয়া আর অপ্রতিভ হইতে ইচ্ছা করি না। ওখানে ঢের বড়লোক লেখেন, আমার জন্য এতটুকু এক তিলও ফাঁক পড়িবে না। ফণীও তোমার নাম করিয়াছে। বিস্তর্ সুখ্যাতি করিতেছিল।

তোমার নিজের সম্বাদ লিখিবে। আমার সম্বাদ একই রকম। কখন ভাল, কখন মন্দ। রেঙ্গুন আর সহ্য হইতেছে না, প্রতি পদেই টের পাইতেছি। কিন্তু অন্য কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। কি জানি এইখানের মাটিই কেনা আছে কিনা!

তোমার স্নেহের

শরৎ

১০

৩১-৫-১৩
রেঙ্গুন

প্রমথনাথ,

আজ তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য হইলাম যে, আমার পূর্বেকার পত্র তোমার হাতে যায় নাই। যদি এতদিনে গিয়া থাকে নিশ্চয়ই সমস্ত বুঝিয়াছ। এই ত ভাব। তার পরে আমার যাবার কথা। আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি।

আমাদের বড় সাহেব 'নিউমার্চ'। 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন, "আমি মাধব চাটুয্যে নীলকরের গোমস্তা।"[১] এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই। নিউমার্চ ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে 'রিডিইস' করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি 'ডেস্প্যাচ' করতে ৩দিন দেরি হয়— আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরাণ চিঠি বার হয়, এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল চ্যান্টার সাহেব, ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল শ্রীনিবাস আইয়ার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল সুন্দরম, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ম্যাসেট, ১ মাসের মধ্যে 'মেডিকেল সার্টিফিকেট' দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে, আমাদের 'পি-ডব্লিউ-ডি' লোকেদের নিজের আফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের আফিস আওয়ার, 'স্ট্রিক্টলি উইথ হার্ডেস্ট লেবার ফ্রম্ ১০-৩০ টু ৬-৩০'। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে 'রিমাইণ্ডার' আসে— ৬ মাসের জন্য ১০ হিসাবে (জরিমানা) 'রিডাক্সন্'। এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সেদিন 'লোকাল গভর্ণমেণ্ট'কে এই ব'লে 'মুভ' করেছেন যে আফিসের কেরাণী ঘুষ দিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে পালায়, তাতে আফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সেই জন্য আফিসের চিঠি না গেলে সিভিল সার্জন কাউকে যেন মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেন। আমাদের এখন মেডিকেল সার্টিফিকেট দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিলেও বলে ওর 'সার্ভিস বুকে' নোট ক'রে রাখ মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট। বর্মা ব'লেই এত জুলুম চ'লে যাচ্ছে!

দিন ৩।৪ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা 'রিমাইণ্ডার' আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটি আমার 'সাব অডিটর' ভৌমিকবাবু ও পেরিয়া স্বামীর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। 'এক্সপ্লেনেশন্' দিলাম আমারই 'ওভারসাইট্'। ইত্যবসরে 'রেজিগ্নেশন্' লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না, এ জেনেই লিখে রাখি। যা হোক, কি জানি নিউমার্চ দয়া ক'রে কোন কথাই বল্লেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমার আর 'রেজিগ্নেশন্' দেওয়া হ'ল না। কিন্তু শরীর আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এতদিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখন পড়ি নি। সেদিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তির মশাইকেও[২] চিঠি লিখি যে, যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি 'রিজাইন' দিয়ে চলে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও

বুঝতে পাচ্ছি, এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখি নে— তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য আফিসে 'অ্যাপ্লিকেশন' পর্যন্ত 'ফরওয়ার্ড' করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না! দেখি মিত্তির মশাই কি লেখেন।

আমার 'ভারতবর্ষে' লেখার অনেক গোলমাল। সারদাবাবুকে জানি না— তিনি যে কি করবেন তিনিই জানেন। দ্বিজুবাবুই এ কাজ পারতেন— এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে? ওর চেয়ে তোমার যোগ্যতা এতে বেশী। বিদ্যাপতি 'এডিট্' করা আর ভারতবর্ষ 'এডিট' করা এক জিনিস নয়। তা ছাড়া তাঁর অনেক কায। এ 'সিলেক্শন' একেবারেই ভাল হয় নি। সারদা বাবু সত্যরঞ্জন রায়ের ['অবগুণ্ঠিতা']র যে প্রশংসা করেছিলেন, তাইতেই বোঝা গেছে উনি কি রসগ্রাহী! সত্যরঞ্জন এখানে ছিল, তার অনেক লেখাই পড়েছি। [অবগুণ্ঠিতার] চেয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'অধঃপতন'[৩] ভাল।

'ভেরি ব্যাড্ সিলেক্শন'— ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যে 'ফেলিওর্' হবে!!! এ যদি না হয়, মিথ্যাই এতদিন সাহিত্য সেবা করলাম।

দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ— এত বেশী আয়োজন, এত বেশী 'সাব্স্ক্রিপশন'— আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়াই উচিত। এ কাজ 'সাক্সেস্ফুল' হবার হ'লে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে 'সুপারস্টিশন'ই বল আর যাই বল।

দ্বিজুবাবু আবশ্যক হলে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার[৪] মত সমালোচনায় যেমন ক'রে হোক আবশ্যক হলে চালিয়ে দিতে পারতেনই— এ কি আর কারো কাজ! তা ছাড়া কাগজ যে ছোট নয়—৬ টাকা চাঁদা— সেটাও বড় কম ভাবনার বস্তু নয়। প্রবাসী এতদিনের কাগজ— এতটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে ভরাতে হয়। ওর অর্দ্ধেকের উপর ত অপাঠ্য। তবু ওর চাঁদা কম। তোমাদের সে 'এক্সকিউজ'ও নাই। তা ছাড়া ভাই, অনেকেই বলে লিখবে, কিন্তু শেষকালে যারা নিতান্ত তোমার আমার মত লেখক তারাই লেখে। তা ছাড়া ভাল লেখক প্রায়ই লেখে না। দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ 'ইনফ্লুয়েন্স' পর্যন্ত গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর 'অ্যাপ্রিসিয়েশন'-এর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভালমন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?

শরৎ

১১

প্রমথনাথ,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আজই একটা টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম আমার পূর্বপত্র রদ করিয়া, বোধ হয় পাইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়াছ। তোমার কথাই সত্য। ঠিকানা ছিল এস্, চ্যাটার্জি,

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউন্টেণ্ট, জেনারেলস্ পোস্ট অফিস। আমার বুদ্ধিমান অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নগেন ভৌমিক আমার অবর্তমানে ভি-পি-পি গ্রহণ করিয়াছিল, আমি উপস্থিত থাকিলেও হয়ত লইতাম। সেই জন্য দোষ আমার— তোমাদের নয়। তোমাদের দোষ নাই বলিয়াই টিকিটগুলো লইতে পারিলাম না— না হইলে তোমার মান রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতাম। বুক পোস্ট পাই নাই এবং ভবিষ্যতে দিলেও পাইব না। ওসব আমার বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই পাই, অন্যথা পাই না।

এস্, চ্যাটার্জী, ১৪ লোয়ার পোজনডং স্ট্রীট, রেঙ্গুন। এ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

তোমার পত্রের একটা একটা করিয়া জবাব দিই। দুটি একটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই। তাম্রশাসন[১], আমার মত বেরসিক লোকেই পড়ে। সার অসার কি আছে না আছে আমাদের জানা উচিত। 'কৌতূহল'[২] ভাল।

১। 'ভ্যারাইটি' হিসাবে তোমার কথা হয়ত সত্য ; কিন্তু 'ভ্যারাইটি' মানে যদি ৩২ ০ ভাজা হয়, ত খেতে মন্দ লাগে না। তাতে বড়লোকের পেট ভরে, গরীবের ভরে না। 'সাবস্টেন্সিয়াল্' জিনিস দুটোও ভাল, কিন্তু ৩২ ০ ভাজা ভাল নয়— আমি ওর পক্ষপাতী নই।

২। ছবির সম্বন্ধে— 'নোটেড'।[৩]

৩। নির্ভীক মতামত— ঠিক কথা। যতদিন ঐ রকমের দ্বিজুবাবুর কাছাকাছি— ভাল মানুষ, সরল অথচ গোঁয়ার-গোছের লোক না পাও, ততদিন সমালোচনা বাহির না করাই বুদ্ধির কায। তবে, 'সাহিত্যে'র সমালোচনার মত সমালোচনা ভদ্রলোকের বাহির করা উচিত নয়। কেবল তীব্র ভাষা অথচ কেন তীব্র ভাষা তার কারণ দেখানো নাই। 'তোমারটা ভাল নয়' 'ওতে অনেক কথা বলবার আছে' 'এ রকম সবাই জানে' 'এ রকম না লেখাই উচিত' এ সব সমালোচনা নয়। সমালোচনায় যেন তাহার চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত— গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব এ মৎলব ভাল নয়। হাঁ, কানকাটার সমালোচনার মত সমালোচনাই যথার্থ সমালোচনা। সবাই লিখতে পারে না তাও হয়ত সত্য। কিন্তু আমারও বড় অসংযত ভাষা হয়ে গেছে। ঐ যে তুমি লিখেছিলে সবাই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের লেখক— তাতেই আমার রাগ এবং একটু দ্বেষ হয়েছিল। সবাই যদি এত সহজে লিখতে পারে, তবে, কেন মিছে আমরা খেটে মরছি? এই একটু রাগ— তাইতেই কিছু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে। তবে তাঁরও জ্ঞান হবে যদি দয়া ক'রে পড়ে দেখেন— ভবিষ্যতে আর অমন ওপর-চালাকি করতে ব্যস্ত হবেন না। সতিই এতে একটু 'সলিড' পরিশ্রমের দরকার হয়।

৪। না, যমুনাতে একসঙ্গে অত বার হবে না। চন্দ্রনাথ এখনো শেষ হয় নি। নারীর মূল্য[৪] এবারে অসুস্থতার জন্য শেষ করতে পারি নি। আলোছায়া[৫] কি আমার লেখা? তাইতেই মনে হয়েছিল বটে, কোন অপরিণত কাঁচা লেখক আমার লেখার 'স্টাইল' অনুকরণ করেছে। আমি গত পত্রে ঠিক এই কথা ফণীকে লিখেছি। বড় অন্যায়! বড় অন্যায়!! বিন্দুর ছেলে[৬] পড়ে দেখো। শুনলাম যমুনার ৩২ পাতা হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল তোমাদের ভারতবর্ষে ওটা অশোভন হবে এবং ভালও হয় নি। তোমার ভাল লাগবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা। অনেকটা মেয়েদের জন্য— তারা যেন

একটু শিক্ষা লাভ করে— এই ইচ্ছায় লেখা। ঐ রামের সুমতির ধরণের, তবে বেশী 'ক্যারেক্‌টার' আছে— তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে। যাক্।

দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা[৭] আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয়, তাও আমার ইচ্ছা নয়।

সত্যিই আজকাল কি গল্পই বার হয়! কেবল লোকের চেষ্টা কি ক'রে পাঠকের মনে কষ্ট দেয়! হয়, অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, না হয় খুনজখম করে— আরে বাবু রাস্তায় কুকুর ঠেঙ্গান দেখলেও ত কান্না পায়— সেইটাই কি তবে দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?

গল্প পারতপক্ষে 'ট্রাজেডি' করতে নেই। কুৎসিত ভাবগুলো দেখাতে নেই— ওসব সবাই জানে। দীনেন্দ্রবাবুর সাহিত্যে 'দাদা' [৮] পড়েছ? পড়ে বাস্তবিক অভক্তি হয়ে গেল ! গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ!' তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চল্‌ছি। রামের সুমতি, পথনির্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব এই ছাঁচে ঢালা। শেষ ক'রে একটা আনন্দ হয়— শেষ করে মনের মধ্যে 'গ্লুমি' ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে"। এই সমালোচনাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা! ভাল কথা— 'ক্ষুদ্রের গৌরব' 'ছায়া' 'বিচার'[৯] ওসব কি? আমার ত একটুও মনে নেই।

তোমাদের সমাজপতির সম্বন্ধে ওসব কেচ্ছার ব্যাপারটা কি? তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য আমি অভাজন কি করতে পারি ভাই? অত বড় বড় কৃতবিদ্য লোক রয়েছেন, তার ওপরে আমি কি করব? তবে এক আধটা প্রবন্ধ বা গল্প লিখে দিতে পারি ; তাও সত্যি সত্যি ভয় হয় প্রমথ, হয়ত বা ফেরৎ আসবে। ঐ লজ্জাতেই আমার যেন হাত পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে! আচ্ছা বিন্দুর ছেলে পড়ে যদি এমন সাহস তুমি দাও যে ওটা তোমাদের ভারতবর্ষে পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হোতো, তাহলে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। এই কথা দিলাম। তবে আমি ভাই অশ্রদ্ধা ক'রে, যা-তা লিখে দিতে পারব না। নিজের অন্ততঃ চলনসই মনে না হ'লে পাঠাই নে। তোমরা ফণীকে দেখতে গিয়েছিলে শুনে বড় সুখী হলাম। এই ত বন্ধুর মত কায !

আমার কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পূর্বপত্রে লিখেছি। তবে কিনা জানো ভাই, 'সাহিত্য' অবলম্বন করতে আমার ভারী লজ্জা করে। ওটা যেন উঞ্ছবৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও একটা ৪০। ৫০্ টাকার চাকবি যোগাড় ক'রে দিতে পার ত যাই। আমার গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস বলে একটুও মায়া নাই। এ শালার আফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম।

আমার ইচ্ছে করে, চাকরি ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ক'রে সাহিত্য সেবা ক'রে যদি দু পয়সা পাই ত বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পরে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার বড় প্রবল।

আমার 'চরিত্রহীন' বোধ হয় 'মডিফায়েড্' হয়ে, আশ্বিন কার্তিক থেকে বেরুবে।[১০] ততদিনে চন্দ্রনাথ শেষ হবে।

হাঁ ভাল কথা। আমি কলিকাতা এবং আরো দু-এক যায়গা থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মতামত পেয়েছি। সত্যি কেউ সন্তুষ্ট হয় নি। সকলেই লিখেছে— ওঁদের মধ্যে 'পছন্দ' ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা নমুনা দেখে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা ত ভেতরের কথা জানেন না! দ্বিতীয় 'ইসু' দেখে তাঁদের মত ফিরবে ব'লেই আশা করি। 'ভারতবর্ষ' প্রথমে বিপুল আয়োজন করে,

দ্বিজুবাবুর সম্পাদকতায় বার হবে শুনে আমাকে অনেক সম্পাদকই লিখেছিলেন যে, 'আমাদের সংহার করবার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে'। তাদের শাপ সম্পাতেই দ্বিজু দাদা মারা গেলেন— অত দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সেই সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কি করবে কপাল ! দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও ভারতবর্ষ অক্ষয় হয়ে যেত তা নিশ্চয় ! এখন এর 'স্ট্যাবিলিটি' সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়। পাছে লোকে ক্রমশঃ মনে করতে থাকে 'নট্ ওয়ার্থপেয়িং রুপিজ সিক্স', এই ভয়।

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখব ব'লে ঠিক করেছি।[১১] যদি ভালো হয় (হবেই!) কোনো থিয়েটারে প্লে করিয়ে দিতে পার? আজ এই পর্যন্ত।

তোমার
শরৎ

১২

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
১৭-৭-১৩

প্রমথ,

তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশী হইলাম। আগেকার পত্রে তোমার যেন একটা রাগের ভাবই আমার চোখে পাড়ত, এবার দেখিতেছি সেটা গিয়াছে। তুমি শান্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছ। আমি মনে কবিয়াছিলাম, ভায়া আমার এবার ক্ষেপিয়া না গেলে বাঁচি। যা হোক ভালয় ভালয় সামলাইয়া গিয়াছ, তাহা বড় সুখের কথা। আজ সুরেনকে দেবদাস পাঠাইবার জন্য[১] চিঠি লিখিয়া দিলাম। কিন্তু কোন কাজে আসিবে না ভাই ! ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা। লেখাগুলো পর্যন্ত আঁকাবাঁকা। যা মনে আসিয়াছিল, তাই লিখিয়াছি।

আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব,[২] নিশ্চিন্ত থাক। তবে, হয়ত একটু বড় হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। পূজার সংখ্যায় আমার জন্য ২০ ২৫ পাতা খালি রাখিয়ো। তবে, 'ট্র্যাজেডি' লিখিব না। 'ট্র্যাজেডি' ঢের লিখিয়াছি আর না। তা ছাড়া, ছেলে-ছোকরারা ট্র্যাজেডি লিখুক, আমাদের এ বয়সে ট্র্যাজেডি লেখা কালি কলমের অপব্যয়। আর ইংরিজির তর্জমা করা লিলি-টিলি আমার আসে না। খাঁটি দিশি জিনিস, একেবারে 'ইণ্ডিজেনাস্ গুডস্'! চাই ত ব'লো। আর ইংরিজির ছাঁচে ঢালা তাও চাও ত লিখো। এ রকম ইংরিজি ধরণের গল্প লিখতে পারি নে যে তা নয়, তবে লজ্জা করে।

যাক। সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক তাই। সমাজপতির মত স্পষ্টবাদিতার ভাণ ক'রে গালিগালাজ করা সত্যই ভাল নয়। তবে, তুমি যা বলছ গুণের কথাই বল্‌ব, দোষ দেখাব না, এটাও ঠিক নয়। দোষ দেখাব, কিন্তু বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত। যেন সে নিজের দোষটা দেখ্‌তে পায়। তা না ক'রে ঐ রকমের সমালোচনা—'অত্যন্ত কদর্য !' 'কিছুই হয় নি' 'পণ্ডশ্রম'

'কালি কলমের অপব্যবহার' ইত্যাদিকে সমালোচনা বলে না। কোথায় দোষ করিয়াছি, কোথায় ভুল হইয়াছে, যদি যথার্থ বলিয়া দিয়া লেখকের উপকার করিতে পার ত কর, না হইলে ও-রকম ওপর চালাকিতে কায হয় না, শুধু শত্রু বাড়ে। পুস্তকের সমালোচনা এমন করিয়া করা উচিত, যেন সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়। যেন সেইটাই একটা পড়বার জিনিস হয়।

তোমার চিঠিতে ফণির অসুখের অবস্থা শুনে ভয় পেয়ে গেছি। সুরেনও ঠিক ঐ কথাই লিখেছে। বাস্তবিক ফণির অসুখে যদি 'যমুনা' বন্ধ হয়ে যায় ত বড় দুর্ঘটনা। আমি ঐ কাগজ-খানিকে বড় করিবার জন্য যে কত আশা করিয়া আছি, তাহা আর কি বলিব। যদি তাহার চেঞ্জে যাওয়াই উচিত হয় ত তাই পরামর্শ দাও না কেন? দুই এক মাস ভাগলপুর কি মোজাফ্ফরপুরের মত যায়গায় গিয়ে থাকলে বোধ হয় দেহটা শুধরে যেতে পারে, কিন্তু তাব মধ্যে কাগজটা চালাবে কে? তবে তুমি যদি একটা কিছু উপায় ক'রে দাও ত হতে পারে বোধ হয়। বেচারী একা, অথচ এটুকু কাগজের জন্য লোক রাখাও যায় না, সমস্তই একা করতে হয়, বড় মুস্কিল।

আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চা ক'রে পেট ভরে না ভাই। তাছাড়া, ধর যদি একমাস কিছু নাই লিখ্‌তে পারি, তা হ'লেই ত বিপদ! অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না। যাহোক মনে কচ্চি পূজোর পর দু-এক মাসের ছুটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব।[৩] সেই সময়ে মিত্তির মহাশয়েব সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু সেখানে চাকরি করতে আমি নারাজ। শুনি হাড়ভাঙা খাটুনি— মাইনে কম। কে ঐ কম মাইনের জন্য হাড়ভাঙা খাট্‌বে আর তাতে সাহিত্যচর্চাও বন্ধ হবে। সে আমি পারব না।

ভাল কথা। এবার 'সাহিত্যে' 'দাদা'[৪] ব'লে একটা গল্প পড়েছ? কি ভীষণ লেখা। সবাই জানে অকৃতজ্ঞতা বাজারে আছে, তাই ব'লে কি ঐ রকম ক'রে লেখে? ওতে কার কি উপকার হবে? সমস্তটা পড়ে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আসে. মন উঁচু হয় না। ওকে সাহিত্য বলা যায় না— ঐ গল্পই আবার সাহিত্যে বার হ'ল। ওর চেয়ে তোমাদের আযাঢ়ের ঐ 'দর্পচূর্ণ'[৫] গল্পটি ঢের ভাল। মনের মধ্যে শেষে একটা আহ্লাদ হয়, আমি ঠিক ঐ রকমই আজকাল ভালবাসি।

তোমার 'বায়স্কোপ'[৬] দু-বার পড়েছি। অনেক জিনিস যা জানতাম না জানা গেল। আর ঐ যে ছোট ছোট পাণ্ডুয়ার ইতিহাস[৭] প্রভৃতি ওগুলি সবচেয়ে ভাল। কত ছোটখাট দরকারী ঘরের কথা যে ওতে জানা যায় তা' বলে শেষ করা যায় না। ঐ রকম যেন প্রতিবারে থাকে।

আর না, মেল ক্লোস হয় হয়—

ভাল আছি।

শরৎ

প্রাণধনবাবু কি আমাকে মনে করেন? হয়ত ভুলে গেছেন, না? আমি তাঁকে কিন্তু প্রায়ই মনে করি। অতি অল্প দিনের আলাপে তাঁর উপর আমার একটা বোধ করি স্থায়ী আকর্ষণ হয়ে আছে। অবশ্য এসব কথা তিনি যেন না শোনেন— হয়ত তা হ'লে কি মনে করবেন। তোমার বাড়ীর খবর লেখ না কেন?—শ

১৩

প্রমথনাথ,

ভাই অনেক দিন যাবৎ তোমার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ, বাড়ীর সকলেও ভাল আছেন। পরশু ভি-পি ডাকে তোমার 'ভারতবর্ষে'র এক খণ্ড 'স্যাম্পল্ কপি' দশ আনা পয়সা দিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ দাম ০ মাসুল খরচা একুনে। সেখানি ক্লাবে দিয়াছি— ফিরিয়া পাইলে পড়িব। যেদিন আসে, সেই দিন ঘণ্টা-খানেক কতক কতক দেখিয়াছি মাত্র।

আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, তোমাদের লেখার অভাব, কিন্তু ছাপাইয়াছ যে, এত ভাল জিনিস রহিয়া গিয়াছে যে স্থান সঙ্কুলান করিতে পার নাই।[১] বাস্তবিক এটা বড় আশার কথা। কেন না, আমিই এত বেশী টেলিগ্রাফ, রেজিস্টার্ড লেটার, শুধু পত্র, এবং উপহার মাসিক পত্র পাইতেছি যে, মনে হইয়াছিল, মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা লেখার জন্য বড়ই অসুবিধা এবং অভাব বোধ করেন, তাই আমার মত নগণ্য লোককেও এত বিব্রত করেন। যাঁদের কখনও নামও জানি না, তাঁরাও লম্বা চওড়া চিঠি দেন, শুধু যে বিপদে পড়িয়াই, এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি বাস্তবিক তাহা নয়, কেন না, তোমাদের মত এই মর্মে 'প্রবাসী'ও ছাপাইয়াছেন যে, তাঁহারা শীঘ্র আর কাহারও কোন লেখা পাইতে ইচ্ছা করেন না— কারণ ভাঁড়ারে তাঁহাদের অত্যন্ত বেশী জমিয়া গিয়াছে।

আমি নিজেও অনেকদিন আর কিছু লিখি নাই মুখ্যতঃ অসুস্থ বলিয়াই। তবে, 'যমুনা'র জন্য না কি না লিখিলেই নয়, তাই আষাঢ়ে গোটা দুই প্রবন্ধ (একটা প্রতিবাদ) লিখিয়াছিলাম মাত্র। গল্প লিখি নাই— লিখিতে ভালও লাগে না ! তবে, তোমার কথামত আমার একটা মতলব হইয়াছে। 'রামের সুমতি'র মত প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) 'সিরিজ অব্ স্টোরিজ' লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালীর 'আইডিয়েল' অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

'বিন্দুর ছেলে' বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি— একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ' কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে। 'ভারতবর্ষে'র মত কাগজের অন্ততঃ ২৬।২৭ পাতা— তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।

কৈ প্রভাতবাবুর[২] লেখা দেখিলাম না ত? ও ভদ্রলোক প্রায় শতাবধি গল্প লিখিয়াছেন। আর যে কি চর্বিত চর্বণ করিবেন আমি ত ভাবিয়াই পাই না, অথচ অগ্রিম টাকাও লইয়াছেন। এ দিকে 'সাহিত্য'-সম্পাদকও 'বঙ্গবাসী'[৩] কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে প্রভাতবাবুর লেখা তাঁর কাগজ ছাড়া আর কোথাও বাহির হইবে না। ব্যাপার কি!

তোমাদের কাগজ বাহির করিবার জন্য তোমাকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হয় ; এটা ভাল। এই সময়ে হয়ত তোমারও কায হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যই তোমার ভিতরে পদার্থ থাকে নাড়াচাড়া করিয়া এই সময়ে বাহিরে আসিতে পারে। এ সাহিত্যচর্চার সংস্রবই আলাদা। তোমার মত এক হিসাবে নিষ্কর্মা লোকের এই সময় যদি কিছু দায়ে পড়িয়া পরিশ্রম

করিবার সময় নিজের বস্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ এবং সুযোগ পায় সেইটাই লাভের কথা তোমার।

গতবারে তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে, "এ বিষয়ে এত সাধাসাধি" অনুনয় প্রভৃতি আরও কত কি হইয়া গিয়াছে যে আর বলা শোভা পায় না। আমি এইটাই ভয় করিয়াছিলাম যে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজেদের মন্দ না হইয়া যায় অর্থাৎ আত্ম-মনোমালিন্যে না দাঁড়ায় '

শরৎ

১৪

প্রমথনাথ,

ইতিপূর্বে বোধ হয় আমার অসম্পূর্ণ চিটিটা পেয়েছ। যে দিন চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ দেখি ডাক নিয়ে পিয়াদা যাচ্ছে, আর সময় নাই, কাজেই যেটুকু লিখেছিলাম বন্ধ ক'রে পাঠালাম। আজ তোমার আর একটা পত্র পেলাম।

প্রথমে কাজের কথা বলি। 'দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না। ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা। ওটার জন্য আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা 'ইম্‌মরাল্'। বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি, তা তোমাদের কাগজেই হোক্ আর ফণীর কাগজেই হোক্। আষাঢ়ের 'যমুনা'য় 'আলো ও ছায়া' ব'লে একটা অর্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু, এই একটা কথা যে, আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি— হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক্, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো।

সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে আমার কথা হয়েছে শুনে সুখী হলাম। তুমি যে বার বার বল্‌ছ আমি চাকরি ছেড়ে দিলেও ভয় নেই, এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। মিত্তির মশাই জবাব দিয়েছেন যে, তিনি ৬ মাসের ছুটিতে আছেন, এবং এ অবস্থায় কি করতে পারেন? কথা ঠিক! আরও ভাবছি যদি চাকরি করতেই হয়, তবে সেখানেই বা কি, আর এখানেই বা কি ; মৃত্যু একদিন হবেই এবং তাহা সত্যই আসন্ন, সে চিহ্নও চারিদিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক ছুটাছুটি ক'রে লাভ কি ! তবে, এই পূজার সময় একবার কলকাতায় যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে অধিক কিছু চিন্তা ক'রে নিজেকে এবং পরকে পীড়িত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে চুপ ক'রে আছি।

'ভারতবর্ষ' মোটের উপরে কি হয়েছে, তা কি তুমি নিজে জান না। আমাদের আষাঢ়ের 'যমুনা'য় এবার কিছু নেই, তবু বল দেখি ঐটুকু কাগজে যথার্থ 'রিড্‌অ্যাব্‌ল ম্যাটার' যতটা আছে, তার চেয়ে বেশী 'ভারতবর্ষে' আছে কি না! তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লক তোলা ছবির মত। রাগ ক'রো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছেই বলা যায় ব'লেই বললুম।

দ্বিজুবাবু থাকতে লোকে কত আশা করেছিল, তার চার ভাগের এক ভাগও যদি প্রথম সংখ্যাটায় বার হ'ত সেও ভাল হ'ত, কিন্তু তাও হয় নি। ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা,[১] সাহিত্য হিসাবে সেইটুকুই ভাল। তার পরে তাম্রলিপ্তি[২] আর বেদের তর্জমা।[৩] কি করব আমরা বেদের তর্জমা ক'রে? আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্ততঃ এমন একটা জিনিস 'কন্টিনিউয়াস্‌লি' থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে— সে কোথায়? একটা 'বোল্ড রিভিউ' থাকা প্রয়োজন— কই তা? শুধু তাম্রলিপ্তিতে সুবিধা হবে না দাদা, তা ব'লে দিলাম। গল্প অতি বদ্‌। এই কি তোমাদের সিলেক্‌শন?

'ছিন্নহস্ত' টা[৪] বোধ করি হবে ভাল। তোমার লেখাও[৫] পড়েছি— কিন্তু একে সাহিত্য বলা চলে না। তবে প্রথম বারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না— খুব চেষ্টা কর যাতে 'হান্‌ড্রেড্‌ টাইম্‌স' ভাল হয়। এবারের 'প্রবাসী'ও দেখলাম। তারা তোমাদের কাগজের চেয়ে ভালই করেছে। এই সমস্ত আমার স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত--- এর কতটুকু দাম সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যদি কিছু থাকে, সেটা তুমি নিজের কাছেই গোপনে রেখো। তবে, 'প্রবাসী' লোকের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়ে পড়েছে, এই সময় ঠিক প্রতিযোগিতায় তাকে টলান যায়। অন্যথা যায় না। কারণ সে 'এস্টাব্লিশড্‌'! যাক্‌ এ সব কথা। কেন না, আমি দূরে থেকে যা বলব, হয়ত ঠিক না হতেও পারে। তোমার সরজমিনে—'ম্যান অন্‌ দি স্পট্‌'। প্রভাতবাবুকে দাদন দিয়ে রেখেছ, গল্প কই হে? তার পরে তোমরা টাকা দেবার অধিকারে গল্পের জন্য যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন তেমনি গল্পই বোধ করি তিনি দেবেন।

যা হোক্‌, এ সব বাজে কথা। আসল কথা এই যে, এই সব বাহিরের হাঙ্গামা নিয়ে যেন আপোষে বিবাদ না হয়। তুমি গত বারে যে রকম খাপ্পা হয়ে উঠেছিলে, ভয় হয়েছিল এইবারে বুঝি ভীষণ একটা কিছু হয়। তোমার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

আজকাল আছি ভাল। গত মাস দুই যাবৎ ঘাড় নীচু করলেই মাথা ধ'রে উঠত, তা লিখবই বা কি, আর পড়াশুনা করবই বা কি' গত চিঠিতে তোমাকে জানিয়েছি যে, একটা গল্প লিখে যমুনায় পাঠিয়েছি— বস্তুটা ভালও হয় নি, অথচ দীর্ঘকায় হয়েছে--- তোমাদের কাগজে সেটা কিছুতেই চলত না। চলবার মত নয় বুঝেই আর পাঠালাম না।

ও কি প্রমথ, আমাকে 'ভারতবর্ষ' পাঠিয়ে দাম আদায় করছ যেন? আমি গরীব মানুষ, তোমাদের অত দামী কাগজ কিনে পড়বার যোগ্য লোক নই ভাই— আমি কোথাও থেকে চেয়ে টেয়ে প'ড়বার চেষ্টা করব,— আমাকে আর পাঠিয়ো না। আমি দরিদ্র ব'লেই এ কথা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জানালাম--- কিছু মনে ক'রো না।

বাড়ীর খবর ভাল ত? তোমার নাটক প্লে হবে নাকি? খুব ভাল, খুব ভাল— বড় আনন্দের কথা!

শরৎ

১৫

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট,
রেঙ্গুন
[ডাকমোহর, ২৫ জুলাই, ১৯১৩]

প্রমথ,

তোমাদের প্রেরিত ভারতবর্ষ[১] ও তোমার পত্র উভয়ই পাইয়াছি। কাগজখানির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এবারকার কাগজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। 'বিন্দুর ছেলে' তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটা মন্দ হয় নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে 'রামের সুমতি'র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় 'পথনির্দেশে'র কাছাকাছি।

পূজার সংখ্যার জন্য আমার সাধ্যমত একটি গল্প লিখিয়া পাঠাইব— কিন্তু, প্রকাশ করিবার জন্য কাহাকেও অর্থাৎ সম্পাদক-যুগলকে খোশামোদ করিও না। আমার শপথ রইল। কেন না, তোমার ভাল লাগিলেই তাহা যে তাঁহাদের ভাল লাগিবেই অথবা প্রকাশের যোগ্য হইবে— সে কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। কেন, তাহা পরে বলিব।

তোমাদের এবারের কাগজ পড়িয়া গোটা দুই প্রশ্ন মনে হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। ১ম সূরজ কওর সম্বন্ধে। সূরজ কওর বেশ্যা এবং খুনে। হরি সিংকে এক স্থানে বলিতেছে— 'এই ত দরশ পরশ হইল' আমি যে কায বলিয়াছি করিয়া আইস, তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না।' অর্থাৎ সোজা বাঙ্গলায়, 'কাজ ক'রে এলেই তোমার কাছে শোব।' ঠিক কি না? কেন না ইতিপূর্বে, নির্জন ঘরে বেশ্যা সূরজ 'হাসিয়া মুখে কাপড় দিয়াছে' এবং 'চোখে প্রেমের আহ্বান করিয়াছে' এবং 'হরি সিং আঁচল ধরিয়া ওডনা টানাটানি করিয়াছে।' কি প্রমথ, অস্বীকার করিবে. সমস্ত গল্পের 'ড্রিফ্‌ট'টা কি? অনাবৃত রূপ সে শুধু জানিয়া শুনিয়া মঙ্গল সিংকেই দেখায় নাই— পাঠককেও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে ' তাহাতে ছবি দিয়া জিনিসটি বেশ ফুটিয়াছে ! সাবাস!! 'তবে দেখ ' রূপ দেখ '' অনেকেই তাহা দেখিতে পাইয়াছে।[২]

২। ১৯৩ পাতা—'অন্ধকার বৃন্দাবন'। চতুর্থ স্ট্যাঞ্জা : 'করে না দধি মন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার'! কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাচিয়ে দধি মন্থ করলে. দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ করি বেশ ভালই লাগে। চোখ বুজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করিও, সুখ পাবে। তাছাড়া গোপীর মধ্যে যশোদাও আছেন। উপানন্দের[৩] স্ত্রীটিও 'দধি মন্থ' করতেন, চন্দ্রহারও পরতেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে পাচ্ছেন না ব'লে, তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন দেখ্‌ছি ! ভট্টিকাব্য না কোথায় এই কথাটা আছে না?[৪] কিন্তু এ ভট্টির দিন নয়— ইংরাজের রাজত্ব। আমি সময়াভাবে সব কাগজটা পড়ি নি— পড়ে বলব।

এই কবিতাটির তৃতীয় স্ট্যাঞ্জা—'যমুনা জল শিহরে, শুনি বাঁশীটি শ্যাম চন্দ্রমার।' শ্যামচাঁদটি তখন কোথায় শুনি? বোধ করি মথুরা থেকে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছিলেন, না হ'লে অত দূরে বৃন্দাবনের যমুনা-জল শিহরে কি ক'রে? অত দূরে আর একটা জেলা থেকে বাঁশী বাজালে? তবে, দেবতার কথা বলা যায় না, ওঁরা জাহাজের বাঁশীর মত ইচ্ছা করলে বাজাতে পারেন সম্ভব বটে !

৪র্থ স্ট্যাঞ্জা—'যায় না চুরি নবনী ক্ষীর, বলিয়া ফেলে অশ্রুনীর'— ক্রিয়া আছে ছত্রের কর্তাটি কি?

আর একটা কথা ভাই। ছেলে-ছোকরায় গল্প লিখলে ধরি নে। কোকিলেশ্বরের 'ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ' বাপ রে! যা হোক্, ১৬ এবং ১৮ লাইনে লিখছেন, 'দেবতাবর্গ' দেবতৃ[৫] শব্দের যষ্ঠী কি হয় পণ্ডিত মশাইকে জেনে ব'লে দেবে ভাই? যদি দেবতাবর্গই হয়, 'দেবতৃবর্গ না হয় (বাঙ্গলা ব'লে) তবে এবার থেকে যেন 'পিতাকুল' 'মাতাকুল' লেখেন। পিতৃকুল ইত্যাদি না লেখেন। কই বার কর দেখি এমনি লেখা, অক্ষয় মৈত্রের কিম্বা বিজয়বাবুর[৬] প্রবন্ধে? তোমাদের কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ সম্পাদকের কি এটাও নজরে পড়ে না? যদি নাই পড়ে, ত অত বেদ বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া ঠিক নয়।

দুটো একটা ভুলও আছে। যথা, 'মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ— বৈশাখ' ২৯৪ পাতা।[৭] গল্প ও উপন্যাস— 'রামের সুমতি'— কিন্তু রামের সুমতি ফাল্গুন ও চৈত্রে বার হয়েছিল। অর্থাৎ গত বৎসরে। বৈশাখের 'যমুনা'য় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না— তাতে 'পথনির্দেশ' আর 'নারীর মূল্য' ছিল। নিশ্চয়ই কোনটা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে না, অবশ্য সে জন্য আমি দুঃখও করছি নে, কেন না তাঁর কথার মূল্য আমার কাছে অতি অল্পই। কিন্তু ভাবছি 'অজ্ঞাতবাস' ফকিরবাবুর[৮] বইয়ের মত আমার কোন একটা বই যদি থাকত, আর বিদ্যাভূষণ তার হ'তেন প্রকাশক— তা হ'লে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য হ'ত। 'রত্নদীপ' নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ' কেন না, নায়ক রাখাল পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ করবার মানসে যাত্রা করেছেন এবং 'মানসী'তে বার হচ্ছে। হায় রে দ্বিজুদার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ'!

'সাহিত্য সমালোচনা'র মধ্যে পাঁচকড়ির 'নববর্ষ'ও[৯] উল্লেখযোগ্য। যার দুটো ছত্র 'কন্‌সিস্‌টেণ্ট' নয়। 'তারে জোর ক'রে শ্যামের বাঁশী' আর 'আমার মরণ হ'ল না' আছে কি না! 'নববর্ষ' পড়ে দেখো— এমন এলোমেলো গাঁজাখুরি 'জারগন' আর সম্প্রতি দেখেছি কিনা মনে হয় না। আরো একটু মন দিয়ে ' ভারতবর্ষ' পড়ি, তার পরে আশ্বিন সংখ্যায় 'সাহিত্যে' একটি বিরাট সমালোচনা লিখব। সমাজপতিও কিছু লিখে দেবার জন্য ঘন ঘন রেজিস্টার্ড লেটার এবং টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথাটাও রাখা হবে।

প্রমথ ভাই, দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও— তার পরে এই রকম অবিচার এবং মানুষকে 'মিস্‌লিড' ক'রো। নারীর মূল্য তাঁরও ভাল লেগেছিল— দুঃখ হয় শেষটা তিনি পড়লেন না। এতে অনেক সত্য কথা আছে, তাইতেই এটা প্রবন্ধের যোগ্য নয়।

যাক্। যথার্থ সুখও পেয়েছি। 'প্রাক্তন'[১০] গল্পটি যথার্থই উঁচু লেখা! আর জলধরবাবুর 'দিনাজপুর'টিও[১১] মন্দ নয়। 'ঘাটে'[১২] ছবিটি বেশ। নোলকটা না থাকলে আরো ভাল হ'ত। 'কানাকড়ি'[১৩] এখনও পড়ি নি। এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের[১৪] ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে— অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি— কিন্তু কোনদিন করি নি। 'আর্ট পেন্টিং' আমিও নিজে করি। 'অয়েল পেন্টিং' আমিও বুঝি— ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি নি—কিন্তু যমুনা ছোটো কাগজ ওতে সুবিধে হবে না। তাছাড়া 'অনিলা দেবী' নাম নিয়ে সমালোচনা করতে আর ইচ্ছা করে না। আম'দের ফণীন্দ্র ভায়ার প্রুফ দেখার চোটে আমার

লেখার ত ছত্রে ছত্রে ভুল বিরাজ কচ্ছেন— বিপক্ষ সেইগুলো তুলে ধরলেই ত গেছি! দেখা যাক কি হয়। যাই হোক তোমাকে না দেখিয়ে বা তোমার মত না নিয়ে কিছুতেই প্রকাশ করব না। তবে, আর একটা কথা ব'লে রাখি ভাই! তুমি মনে ক'রো না আমি সেই পুরাতন কথার শোধ তুলছি।[১৫]

চরিত্রহীনের এখন বাজারে অত্যন্ত দুর্নাম, তা সত্ত্বেও আমি সে জন্যে আজকের এই কথাগুলো লিখি নি। কথাগুলো যদি সত্য না হয়, ভালই, যদি সত্য হয়, ভবিষ্যতে সাবধান হ'লেই হবে। এই সুরজ কওরটা আমাদের ক্লাব-এর সকলেই একবাক্যে নিন্দা করছে। অনেকে এমনও বলেছে ওটা 'প্রকাশ্য অনাবৃত ইম্‌মরালিটি'। সত্যিও, ওর ছত্রে ছত্রে এই 'এক্সাইটিং' ভাব ছাড়া আর কিছু মাত্র দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। যা হোক আমারও একটা নজির হয়ে রইল। চরিত্রহীন প্রকাশ করার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে ইতিমধ্যে খুঁজে রাখতে হবে। আমি বিদ্রূপ করলে কিরূপ করি তা জানই— এমনি করে প্রতি ছত্রে প্রতি পাতা তুলে ধরে 'এক্সপোজ্‌' করব। আমি অনেক নজির এর মধ্যেই জোগাড় করেছি। রবিবাবু প্রভৃতি সর্বত্র হ'তেই।

হাঁ, আর একটা কথা। সেই সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখি নি। প্রথম থেকেই মানুষে তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয় নি প্রমথ! আর ক্রমশঃ প্রকাশ্য নভেল ওরকম না হ'লে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে— কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাকবে। আমরা এক রকম আশা ক'রে আছি, ওতে যমুনার পশার বাড়বে। নইলে দেখছি ত ভাই, এই সব খবরের কাগজে ফেকাসে, রক্তহীন উপন্যাস বেরিয়েই যাচ্ছে— কেউ পড়ে না। ঐ 'ভারতী'র বাগ্‌দত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি— অরণ্যবাস[১৬]— বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ ব্যাগার খাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে— অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের 'মন্ত্রশক্তি'![১৭] ঐ পুরুত আর মন্দির আর ঐ সব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না— অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়ি নি। অথচ আমার এই ব্যবসা।

দেখ না লেখবার কায়দা, বঙ্কিমবাবু, রবিবাবুর। প্রথমেই একটা 'সামথিং'! যাই হোক দেখাই যাবে। আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে কি না! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিল না। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশঃ হ'লে লোকের 'পেসেন্স' থাকে না। তা যতই শেষে ভাল হোক্‌।

কেমন আছ, বাড়ীর খবর লেখ না কেন?

শরৎ

মনে হয় প্রমথ, নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি, কিন্তু তার বলার কোন ফল হয় না। কেন না তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালি-গালাজ— প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছর্‌রাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু আমি 'জ্যাক্ অব্ অল্ ট্রেড' কিনা— সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক, নভেল সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর ক'রে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' ক'রে দিতাম।

হাঁ হাঁ— আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে। চোখ বেশ ক'রে খুলে রাখলেই দেখা যায়। দেখতে তুমিও পার, আমিও পারি, কিন্তু মনে রাখা চাই। আমি মনে ক'রে রাখি, তোমরা ভুলে মেরে দাও— এই প্রভেদ আর কিছু নয়।

১৬

রেঙ্গুন
৯-৮-১৩

প্রমথ,

তোমার চিঠি যেদিন পাইলাম তার পরদিন 'ম্যানাস্ক্রিপ্ট' পাইলাম। দেখিয়া শুনিয়া দিয়া পাঠাইতে গেলে, আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম ২৩।২৪ শ্রাবণের আগে পৌঁছিবে না। সেই জন্য ভাদ্রে কিছুতেই ছাপা হইবে না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠাইলাম না। এমন কোন অর্থ নাই যে পরের মাসে না বাহির হইলে আর উত্তর দেওয়া চলে না। ওটা আশ্বিনে ছাপাইলেই হইবে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলিবারও আছে। প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে এবং এমন সব কথা আছে যাহা 'ঝগড়া', ওটা উচিত কিনা সন্দেহ।[১] আমি ঐ কথাগুলাই আর একটা কাগজে লিখিয়া আশ্বিনের জন্য পাঠাইব মনে করিয়াছি। তবে, আক্রমণ করিতেই হইবে এবং তাহা একটু 'পোলাইট্' ধরণের— অনেকটা 'কানকাটা'র মত করিয়া। আশা করি ইহাতে তুমি মনে কিছু করিবে না। যাহা ভাল হইবে, নিশ্চয় তোমার জন্য তাহাই করিব। তাছাড়া দেখ 'গৃহস্থ'[২] কি বলে? দুঃখ এই যে আমি ওঁর 'অরিজিনাল পেন্টিং' দেখি নি, তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে তিনি বুঝিতেন এ কোন চিত্র-ব্যবসায়ীর লেখা— যার তার নয়।[৩]

আমি তোমার জন্য গল্প লিখিতেছি অর্থাৎ দু-দিন লিখিয়াছি আর দু-দিন লিখব। ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিও না— ওরে বাপ্ রে! সেই 'কুলগাছ' আর 'ব্যথিতে'র[৪] মৃত্যুশয্যা। আমি তাহ'লে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে। ১ হপ্তা পরে পাঠাব।

তুমি সমাজপতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ফণি তার চেয়েও বেশী করিয়া লিখিতেছে— অথচ সমাজপতি মহাশয়ের কালকের রেজেস্ট্রি পত্র এই সঙ্গে পাঠালাম, পড়িলেই বুঝিবে কি মুস্কিলে পড়িয়াছি। কি যে করি ঠিক করিতে পারি না, অথচ, আমার হাতেও গল্প লেখা নাই, মগজেও আসিতেছে না। তার ওপর আফিসের কাজ এত বেশী এ মাসটায় পড়িয়াছে যে, রাত্রি সাতটার পূর্বে বাড়ী ফিরিতে পাবি না। তার পরে লেখাপড়া, বিশেষ, মাথার ভেতর থেকে কিছু বার করা প্রায় অসাধ্য! তবে আমার নাকি বড় শক্ত মাথা, তাই এত ঘা খেয়েও কিছু কিছু ঠুক্‌লে ঠাক্‌লে বার হয়।

সকালে আজকাল আবার আরো বিপদ— লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে 'যিনি'[৫] আছেন তিনি বলেন 'খেতে পাবে না'। ইনি ত দিনরাত পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন,[৬] একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না।[৭] একদিন বলেছিলাম,

আমি শুয়ে শুয়ে ব'লে যাই, তুমি লিখে যাও— স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞেস করেন, অনুস্বরের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ 'ং' হবে না 'ং' হবে? কাজেই আমাকে সমস্ত নিজেই লিখতে হয়। রাত্রে একটু আফিমের ঘোরও ধরে উঠে, ব'সে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কায করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে পারি নে, তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিবীন এবং ভাগলপুরের আরো দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। দেখা যাক যমুনার অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব, তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না। এই যা আশা।

আর একটা কথা। সেদিন একটা চিঠি পেলাম (ভাবী সম্পাদক হইতে)। 'অয়ন' ব'লে একটা কাগজ ও 'কর্ম্মক্ষেত্র' ব'লে আর একটা কাগজের জন্য তাঁরা বিশেষ লোভ দেখিয়ে পত্র দিয়েছেন— কিন্তু লোভ দেখালে কি হয়? আমার পুঁজি কই? আমি ত আর সত্যেন দত্ত নই যে, বল্‌লেই কবিতা লিখে ফেল্‌ব ! শুনছি 'অয়ন' পত্রিকা আমার 'কোরেল'[৮] গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে— তবে বেনামি ছাপবে এ সর্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা নাকি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই।

আচ্ছা, আজকাল হুহু শব্দে এত মাসিক পত্রের আয়োজন হচ্ছে কেন? এটা কি খুব লাভের ব্যবসা? একে ত খোশামোদ ক'রে ক'রে প্রাণ অস্থির, তার পরে ঐ যে লিখেছ, এতটুকু স্বাধীনতা নেই।

আমার গল্পগুলো বই ক'রে ছাপিয়ে কি হবে? কে কিনবে? কত গল্পের বই রয়েছে, আমার বই কি কেউ পড়বে? আমার নষ্ট করার মত টাকা নেই— ইচ্ছেও নেই। তাছাড়া হাঙ্গামা কত— অ্যাড্‌ভার্টাইজ কর, ক্যানভাস কর, লোকের 'ওপিনিয়ন' সংগ্রহ কর— ও সব আমি চাইও না, পারবও না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে পেলে বাঁচি। অত হৈ-চৈ কে করবে? আমার ত সাধ্য নয়।

প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি। এতদিন এ কথাটা আমার মনে ওঠে নি। এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ সাব-এডিটর কি কিছু একটা করে না? অনেক কায তাদের করে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমি দিতে পারব। তাছাড়া ছবি 'জাজ্' করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা, এও (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি ক'রে দেব। ১০টা থেকে ৪।৫টা পর্য্যন্ত খাটলে আমি খুব পারি, অবশ্য তাম্রলিপ্তি টিপ্তি পারব না। তার পরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কাজ করি তখনও করব। দেখো ত যদি কেউ আমাকে নিতে স্বীকার করে। একজন ভাল এডিটর থাকলেই আমি কায চালিয়ে দেব। অন্ততঃ ছি-ছি কাগজ কোন মাসেই হ'তে দেব না, এ 'অ্যাসিওরেন্স' তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাকরি আমার খুব ভাল লাগবে, তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দু-দিন পরেই বলে তোমাকে চাই নে যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্তা হয়, আর তোমার চেনাশোনা থাকে তাহ'লে চেষ্টা দেখো— আমার বর্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে।

সমাজপতির সম্বন্ধে কি পরামর্শ দাও? তোমার মত্ ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিন্তু বিপদেও বড় পড়েছি তা বোধ করি বুঝতে পাচ্ছ। সমাজপতি সম্বন্ধে কি করা উচিত অতি

সত্বর জবাব দিয়ো। আর চিঠিটা হারিয়ো না, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো। কেন না, এক সময়ে যখন আমার নিন্দে সুরু করবে, তখন কাযে আসতে পারে। 'ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স'!

আজ রাত্রে কিছুই হ'ল না, কেবল চিঠিই লিখছি।

শরৎ

১৭

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
১৮-৮-১৩

প্রমথ,

আজ তোমার পত্র পাইয়া অনেক কথা জানিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক মহা বিপদ ঘটে গিয়েছিল। একটা দাঁত (কসের) প্রায় তিন চার বছর থেকেই নড়ে। ১০।১২ দিন পূর্বে হঠাৎ তাতে যন্ত্রণা সুরু হয়ে গেল। একটু একটু নড়ে কি না, তাই নাড়ালে একটু আরাম পাই। উনি[১] পরামর্শ দিলেন, খুব ক'রে নাড়াও, যদি ভিতরে বদ রক্ত থাকে ত বার হয়ে যাবে। তখন সেই ভাবে তাকে ঘণ্টাখানেক বেশ নড়ানো গেল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। সকালবেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারি নে। তারপরে সে কি যন্ত্রণা !! সে দিনরাত যে কি ক'রে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন।

পরদিন 'ডেণ্টিস্ট'এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও সঙ্গে গিয়েছিলেন, বল্‌লেন, ওরে বাপ্‌ রে ! একটি দাঁত তুল্‌লে সব কটি দাঁত দু-দিনে ঝুর্‌-ঝুর্‌ ক'রে পড়ে যাবে এবং বেশ একটু 'সায়েণ্টিফিক্‌' ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে,— অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চলে আসা গেল, তারপর জ্বর। বুঝতেই পাচ্ছ কি কাণ্ড হচ্ছে। আর সহ্য হ'ল না, তারে পরদিন তুলে এলাম।

সে যা 'ডেণ্টিস্ট'! প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধরে প্রায় আধ-ওপড়ানো-গোছ ক'রে তুলেছিল। যত বলি, ওটা না, ওটা না সায়েব থামো থামো— সে ততই বলে সবুর কর আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তারপর নড়া দাঁত ওপড়ানো হ'ল। ওপড়ানো ত হ'ল— কিন্তু রক্ত থামে না।

'ডেণ্টিস্ট' বললেন— বাবু, তোমাব দাঁত বড় খারাপ।

কথা শোন প্রমথ! তুই শালা তুলতে জানিস নে— রক্তপড়ার দোষ হ'ল আমার দাঁতের! যা হোক, এমনি ক'রে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর রক্ত বন্ধ ক'রে বাড়ী ফিরে এসে আবার জ্বর ! আজো সেরে উঠতে পারি নি। ৮।১০দিন লেখাপড়া, আফিস সমস্ত বন্ধ। না হ'লে তোমাদের লেখাটেখাগুলো শেষ হয়ে যেত। যা হোক, তাড়াতাড়ি ক'রে এইবার লিখে পাঠাব। ভেবো না।

আমার ঐ তিনটা গল্প[২] বই ক'রে ছাপানো সম্বন্ধে আমার আপত্তি নেই, যদি না কিছু ঝঞ্ঝাট

পোহাতে হয়। হাঁ বিক্রী হবে ব'লেই মনে হয়, কারণ এর মধ্যেই অনেকে জানতে পেরেছেন। তুমি যেমন করে ছাপতে বলবে তাই হবে— শুধু ছবি দেওয়া হবে না, এইটি আমার অনুরোধ। কপিরাইট্ বিক্রী করতে চাও কর, না করতে চাও ক'রো না— যা তোমার খুশী, আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। এ সম্বন্ধে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবার আবশ্যক নাই। তবে এই আশ্বিনে ভারতবর্ষে যে গল্পটা বার হবে, সেইটে নিয়ে চারটে একসঙ্গে ছাপলেই ভাল হয় বোধ হয়। কপিরাইট্ বিক্রী ক'রে যদি টাকা পাই ত এইচ্, স্পেনসার-এর বইগুলো কিনে ফেলি। যাহোক যা হয় ক'রো। আমার চাকরি ছাড়ার এত আবশ্যক নাই— ছুটি নিয়ে যাই— দেখি শুনি তার পরে যা হয় করা যাবে।

সমাজপতিকে চিঠির জবাব দিয়েছি। এই রকম লিখেছি যে, আপনি চতুর্দিকে অ্যাডভার্টাইজ করেন, তাতে প্রসিদ্ধ গল্পলেখক এবং চমৎকার গল্পলেখক দীনেন্দ্রবাবু, প্রভাতবাবু, সরোজনাথ প্রভৃতির উল্লেখ করেন, কিন্তু আমার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় মনে করি আপনার মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমজদার ও সমালোচক যখন আমার গল্পের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন না, তখন নিশ্চয়ই আমার গল্প ভাল নয়। এই সঙ্কোচেই আমি আপনার প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিতে ভয় পাই এবং ভবিষ্যতেও পাইব।

এখনো ত জবাব পাই নি। পেলে জানাব। বাস্তবিক লোকটি সহজ নয়। শুনলাম যমুনার বিনিময় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যত আক্রোশ তাঁর যমুনার উপর। অথচ, তিনি যমুনাটি আগ্রহে পড়েন।

আজ আর না, রাত্রি ১ ০ টা, শুইগে।

তোমার
শরৎ

১৮

১৪, লোয়ার পোজন্ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
[ডাকমোহর ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]

প্রমথনাথ,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। কন্যার জন্ম হয়েছে শুনে বড় খুশী হলাম। এই দুটি বেঁচে থাক— আর আবশ্যক নাই।

জ্বর জ্বর হয়েই আছে। ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছি, পড়াশুনো একেবারে থামিয়েছি। কেন না, আমার এ বিষয়ে নেশার মত ঝোঁক ধরে। একবার সুরু করলে মোটেই 'মডারেশন' থাকে না, হয়ত রাত্রি ৩ ৪ হয়ে যায়। হাঁ, নারীর মূল্য ও চন্দ্রনাথ দু-ই এইবারে শেষ হয়েছে।[১] আমি তোমোকেও সময়ে গল্প পাঠাতে না পারার জন্য লজ্জায় তোমাকে চিঠি দিতেই পারছিলাম না। যা হোক শুনলাম প্রভাতবাবু প্রভৃতির গল্প পেলে আর তাড়াতাড়ি নাই। তাছাড়া পূজার সংখ্যায় ওঁর গল্প দিয়ে আবার আমার গল্প দেবার স্থান সঙ্কুলানও হয়ত হ'ত না।

হাঁ, ঐসব গল্প বই ক'রে ছাপার জন্য কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দিতে হবে, কেন না বিস্তর ছাপার ভুল, 'সেন্‌টেন্স' লোপ প্রভৃতি দোষ আছে।

ভাই প্রমথ, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলি। আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার আর বেশী দিন নেই। হয়ত বা এই বছরটাই শেষ বছর। যদি হঠাৎ সরি ভাই, মনে-টনে রেখো। তুমি ছাড়া আমার বোধ করি আর বন্ধুই নেই— কত যে তোমাকে ভালবাসি, তা একটু পূর্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখছিলাম। যাক্ এ সব মেয়েলি দুঃখের কথা— যেতে হয় যাওয়া যাবে। তবে আর একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাকব। মরি ত সদ্গতি হবে— বামুনের কাঁধে চড়ে, পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে, নিমতলায় যাওয়া যাবে। কেমন? আমার কতটুকু ক্ষমতা ভাই, কিবা জানি, মাতৃভাষা আমার কাছে আর কি আশা করে? শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে কষ্ট হচ্ছে— একটু জোর পেয়ে সব কথা ভাল ক'রে জবাব দেবো। প্রাণধনকে আমার কথা বলো।

আর একটা কথা— 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটার অত্যন্ত সুনাম হয়েছে। অনেকের মত এইটাই 'বেস্ট'। অনেকের মত 'পথনির্দেশ', অনেকের 'রামের সুমতি'। ভাবি 'ইক্যুয়ালি ইণ্টেলিজেণ্ট' লোকদের মধ্যে এ রকম মতভেদ হয় কেন? এমন সংবাদও পেয়েছি যে 'পথনির্দেশ'টা 'ইম্‌মরাল'!!

ভাদ্রের যমুনায় দ্বিজুদার সম্বন্ধে একটি কবিতা বেরিয়েছে— ভারি সুন্দর ! ভাদ্রের ভারতবর্ষ পাই নি। বোধ করি তাঁরা পাঠাতে ভুলেছেন, কিম্বা হয়ত অফিস-এর ঠিকানায় পাঠিয়েছেন, কেউ মেরে দিয়েছে। যাই হৌক সে কথা কাউকে জানাবার আবশ্যক নেই— তোমার কপিটা পাঠিয়ে দিয়ো, একবার পড়ে ফেরত পাঠাব।

দিদির সম্বাদ এখনও পেলাম না, সেজন্য ভেবে ভেবে আরো যেন শরীর খারাপ হয়ে উঠেছে। সেখানে টেলিগ্রাফ যায় না[২]— চিঠির জবাবও পাচ্ছি না। সমাজপতির সম্বন্ধে যা লিখেছ ঠিক সেই জবাবই পেয়েছি। আমিও বুঝেছি ব্যাপারটা কি ' হ্যাণ্ডবিলও একখানা ফণি পাঠিয়েছিল— বাস্তবিক মিথ্যে কথা এমন নির্লজ্জভাবে বলেছেন যে, যে পড়ে তারও লজ্জা করতে থাকে। আমি তাঁকে কিছুতেই 'লেখা' পাঠাব না, কারণ তিনি তোমাদের শত্রু তার উপর সুবিধার লোক নন।

তোমার

শরৎ

১৯

৩০-৯-১৩

প্রমথ,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমার বাড়ীর খবর শুনে বড় চিন্তিত হয়ে থাকলাম, অতি শীঘ্র ভাল সম্বাদ দিয়ো। আপাততঃ একটু ভাল ক'রে ঘরের দিকে মন দাও, পরের কায দু-দিন পরে করলেও চলবে। বৌঠানের আবার কি হ'ল? বাহিরেই বা যাবে কেন? কলকাতায়

থাকতে পেলেই ত লোক বেঁচে যায়— তুমি ছেড়ে যেতে চাও কেন?

না, আমি পূজার সময় যাব না। যেতাম শরীর ভাল থাকলে। অসুস্থ থাকা পর্যন্ত কারু কাছে কিছুতেই যাব না। ও আমার ভারী লজ্জা করে। সারলেই পালাব নিশ্চয়।

গল্পটা[১] খানিক লিখেছিলাম— কিন্তু তোমার এমনি নামের মহিমা যে সেটা একেবারেই কদাকার হয়ে উঠেছিল ; শেষে না হ'লে কোনমতেই বলা চলে না ছাপার উপযুক্ত কি না' যদি দেখি ভাল হয় নি, তোমার নামে ছাপতে হবে। অঘ্রাণে ছাপা হ'লেই ভাল হয়— আমিও দু-দিন বিশ্রাম করি। অর্থাৎ পড়া লেখা যেমন বন্ধ করে আছি, তেমনই থাকি! তবু তোমাদের কিছু সত্যিই আটকায় না, কিন্তু যে বেচারার সত্যিই আটকাচ্ছে তার জন্যেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। লিখি নে বটে, কিন্তু ভাবতেও ছাড়ি নে। সেটা ভাল ভাবনা নয়, নিতান্তই দুর্ভাবনা। আমি ছাড়া সে বেচারার আর প্রায় কোন সম্বলই নেই। তবে, বুড়িকে এক রকম পরওয়ানা জারি ক'রে দিয়েছি যে, যমুনাকে বিশেষ সাহায্য করতেই হবে। সে আমার হুকুম কোন কারণেই অমান্য করতে পারে না, সেই ভরসা। তা হ'লে কি হয়, সে বেচারাও প্রায় শয্যাগত।

আমার নারীর মূল্যও শেষ হ'ল। বিস্তর সুখ্যাতি ক'রে অনেক পরিচিত অপরিচিত লোকেরই এ সম্বন্ধে চিঠি পেলাম— কিন্তু ভাবছি লোকে আমার নাম জান্‌লে কি ক'রে? হয় ফণির দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে।

এবার কি সুরু করি বল ত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধ করি সবচেয়ে 'ইণ্টারেস্টিং' হ'ত, তাইতেই বন্ধু বান্ধবের ভীষণ আপত্তি। তারা কিছুতেই রাজী নয় যে, আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি। মনে করেছি 'ইভলিউশন্ অব্ আইডিয়া অব্ গড়' কিম্বা 'ইভলিউশন্ অব্ আইডিয়া অব্ সোল্' সুরু করব।[২] অবশ্য ঠিক নারীর মূল্যের ধরণেই। তুমি যা বল, তাই করব।

আমি তোমাকে অনেক অপদস্থ করেছি, আমার সব মনে আছে— একটু ভাল হই, তারপর দেখা যাবে যদি শোধ করতে পরি। আমার, ব্যবহারে তুমি যত ক্ষুণ্ণই হয়ে থাক না কেন, একদিন এটা যাতে ভুলতে পার, সে কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি না। চিঠির জবাব একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো। বড় ভাল নই।

তোমার

শরৎ

পুনঃ— চন্দ্রনাথ তোমার ভাল লাগবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় নাই, কেন না, ওটা আমার ভাল লাগে নি। একে ত ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই অপূর্ণতা বেশী, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস র'য়ে গেছে। এই উচ্ছ্বাস বস্তুটিতে আমার ভীষণ ভয়। যাই হৌক পাঁচজনের ভাল লাগলেই ভাল। তবে ভাষাটা খুবই সরল—বোধ করি আশ্চর্য সরল এবং 'ডিরেক্ট' এটা অস্বীকার করা যায় না।

২০

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২২-১০-১৩

প্রমথ,

তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ চিন্তিত হলাম। এখন অন্য সব আলোচনা আমার সত্যই ভাল লাগে না। তোমার বাড়ীর খবর একটু একটু ক'রে জানাবে। বৌঠান কেমন আছেন, এবং কি রকম ব্যবস্থা করছ শীঘ্র লিখে চিন্তা দূর করবে। তোমার পিসীমা যখন ভাল হবেন, এবং অন্য খবর সব মঙ্গল ব'লে লিখতে পারবে, তখন আমিও আমার সম্বন্ধে আলোচনা করব, এখন নয়। হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করতে বিলম্ব ক'রো না।

যা হোক দুটো কথা জানবার আছে। যমুনা সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ—'নোটেড্'।

দ্বিতীয়, তোমার জন্যে যেটা লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা শেষ হ'ল।[১] নিতান্ত মন্দ হয়নিই ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মস্ত বড় হয়ে গেল— দুয়ের বার হয়ে গেছে। বিন্দুর ছেলের দেড়া বড় হয়েছে, কি উপায় করি? আবার তাড়াতাড়ি আর একটা লিখতে সুরু ক'রে দিয়েছি।[২] তুমি যদি বল তোমার উত্তর পাওয়া মাত্র ঐ বড়টা রেজেস্ট্রি ক'রে পাঠাতে পারি। তোমাকেই পাঠাব, কেন না তোমার জন্যে লেখা— যা খুশী করতে পার।

'মুল্য' 'টূল্য' সুরু করেছি বটে, এগোচ্ছে না। কারণ শরীর সারলেও বেশী চাপ দিতে সাহস হয় না। না, ওগুলো ফাঁকিতে সারা যায় না।

তোমাদের ভারতবর্ষ যে রকম উন্নতি করছে বাস্তবিক বড় সুখের বিষয়। কিন্তু আমি ত সত্যই, ভেবে পাই না এত উন্নতির হেতু কি? ইন্দ্রজাল তোমরা জানো বলতে পারি না। এক একবার ভাবি, দ্বিজুদা বেঁচে থাকলে না জানি কি রকম হ'ত!

তোমার নিজের যা লেখা আছে ছাপাও না কেন? আমি না পড়েই বলতে পারি, তা তোমাদের কাগজে শীর্ষস্থানে স্থান পেতে পারবে।

বিভূতির নভেলটা[৩] তোমরা ছাপালে ত খুব ভাল হয়। এমন গ্র্যাণ্ড বই আমি অনেক দিন পড়ি নি— তাই বা কেন, কোনদিন পড়ি নি। কিন্তু দোষও আছে— সেটা হচ্ছে এই যে 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট'এ গোলমাল আছে ব'লে মনে হচ্ছে— অর্থাৎ 'চ্যাপ্টার' আর ঘটনাগুলা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে বসাতে হবে। বস্তু আর ভাব যা আছে তা যথার্থই অতি সুন্দর, যে-কোন কাগজের গৌরবের জিনিস হবে কিন্তু আমার ভয় হয়, 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট'এর এই গোল থাকাতে অনেকেরই প্রথমটা পড়েই বিস্বাদ লাগবে। আর এগোতে চাইবে না— শেষ পর্যন্ত পড়বে না। আমি পুঁটুর (বিভূতির) চিঠি পেলে তোমাকে অন্য কথা জানাব।

শরৎ

আমার রামের সুমতি প্রভৃতির কাপিটাপি পরে হবে।[৪] তাড়াতাড়ি কি? সমস্তই আমার ঠিক করা আছে, পাঠালেই হয়।

২১

৩১-১০-১৩

প্রমথ,

তোমার পত্রের আশায় আশায় থাকিয়া বিলম্ব হইয়া গেল। আজ এই মাত্র তোমার চিঠি পাইয়াছি। যেমন সময়ে পাইলাম, তখন আর রেজেস্ট্রি করিবার সময় ছিল না, এবং 'আন্‌রেজিস্টার্ড' পাঠাইতে সাহস হইল না বলিয়া আগামী মেলে পাঠাইতে হইবে।[১] এ মেলে হইল না।

তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম এই ভাবিয়া যে, এত বড়টা তোমাদের কাযে লাগিবে কি না। এখন দেখিতেছি 'বিন্দুর ছেলে'র ডবল হইয়া গিয়াছে। আমার গল্পের একটা নেচার‍্যাল্‌ সমাপ্তি আছে, প্লট্‌ হিসাবে সেটা সম্পূর্ণ আপনা আপনি হয়, আমি গরজ বুঝিয়া ছোট কিম্বা বড় করিতে পারি না। এখানে আমার গুটিকতক সমজদার সাহিত্যিক বন্ধু আছেন, তাঁদের মতে, আমার অপরাপর গল্পের চেয়ে— আর্ট প্রভৃতি হিসাবে, এবং লেখার হিসাবেও 'ফার মোর এক্সেলেণ্ট'— তবে আমি নিজে ঠিক সে কথা বলিতে পারিব না, আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে নিজে ঠিক 'জাজ্‌' নই। তোমরা ভাল বলিলেই এখন সার্থক হয়। একটু মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়ো— তবে এটা অবশ্য বলিতে পারি, তোমাদের কাগজে এ পর্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার চেয়ে কোনমতেই নিকৃষ্ট হইবে না। এখন তোমাদের রুচি! একে তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি প্রকাশ করিতে পার অর্থাৎ যা ভাল বুঝিবে তাই করিয়ো। আমার শুধু এই অনুরোধ যে ছবি দিতে পারিবে না। তাহাতে অনর্থক পয়সার শ্রাদ্ধ অথচ আমার মতে আবশ্যকীয় নয়। অন্ততঃ আমার গল্পে নয়। আশা করি আমার এই অনুরোধটা একবার রাখিবে। তাহাতে আমারও আহ্লাদ হইবে, তোমাদেরও পয়সা বাঁচিবে এবং গ্রাহকও খুশীই হইবে, অন্ততঃ দুঃখিত হইবে না।

শরৎ

আগামী মেলে রেজিস্টার্ড তোমার ঘরের ঠিকানায় পাইবে।

২২

'বিরাজ বৌ'

প্রমথনাথ,

আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছ। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তারপর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম। গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং 'ইম্‌মরাল্‌' ইত্যাদি ছুতা করিয়া 'রিজেক্ট' করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও 'রিজেক্ট' করার কারণ দর্শাইয়ো না।

আমার 'চরিত্রহীন' তোমাদের বদ্‌নামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী টেলিগ্রাফ করিয়াছে 'চরিত্রহীন ক্রিয়েটিং অ্যালার্মিং সেন্‌সেশন্'। আমি জিজ্ঞাসা করি, কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে— 'ক্যারেক্‌টার আন্‌কোশ্চেনেব্‌ল' নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে— অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয়-কুটুম্বের নষ্ট হইতেছে— কেহ কথাটি বলে নাই! ('কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু, এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! সোনার হরিণ কত কি কীর্তিই সুরু করিয়া দিয়াছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! 'ডিটেক্‌টিভ স্টোরি' ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠান্‌দি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর[১] 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা, তেমনি এও)। কোন দোষ নাই কেন না নাম 'রত্নদীপ'! (এবং লেখক প্রভাতবাবু) আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী?

যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিম্বা জার্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই 'ইম্‌মরাল্' কিনা। কিন্তু তোমরাও ভুল বুঝিয়াছ বলিয়াই আমার যত দুঃখ। তোমাদের 'সূরজ কওর' সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না! টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শন' বেস্ট বই ! যাই হৌক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে, চরিত্রহীনে এক বর্ণও 'ইম্‌মরালিটি' আছে। কুরুচি থাকতে পারে, কিন্তু যা পাঁচ জনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন', এর মধ্যে 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। 'রত্নদীপ' নাম দিয়া— বাড়ীর কেচ্ছা সুরু করি নাই।

যাই হৌক, তোমাকে আমি একটু ভয় করি বলিয়াই 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে এইটুকু আবেদন করিলাম। এবং তোমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে 'ইম্‌মরাল্' বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি রেজিস্টার্ড করিয়া পাঠাইবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না, তোমাকে কোন কিছু পাঠাইয়াছিলাম কি না। এ সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

তোমার বাড়ীর অনেকটা ভাল খবর পাইয়া খুব সুখী হইলাম। হাঁ চেঞ্জ-এ পাঠাও। আমার যাওয়ার সম্বন্ধে— শরীর বেশ করিয়া না সারিলে এক পা নড়িব না। যেমন আছি, তেমনি থাকিলে 'এক্স'মাস' নাগাদ দেখা যাইবে।

মূল্য সুরু করিয়াছি। 'ভগবানের মূল্য' 'বিধবার মূল্য' পূর্ণ তেজে অগ্রসর হইতেছে। ভাল কথা, তোমার সেই কাণাকড়ির মূল্যের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম— আজ তাহাকে হঠাৎ পাইয়াছি। দুই-চারি দিনে তাহাকেও ঠিক-ঠাক করিব।

আমার 'রামের সুমতি' প্রভৃতির কপি শীঘ্রই পাঠাইব। একটু ভালো করিয়া ছাপাইলে ভাল হয়— অবশ্য যা বুঝিবে তাই করিবে।

এইবার কাযে মন দিই।

শরৎ

২৩

রেঙ্গুন
১৩-৩-১৪

প্রমথ,

পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়াছি। রক্ত আমাশা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। বেশ রোগটি, না? তোমার কেমন? শুনিলাম, আমি নাই— এই মর্মে হরিদাসবাবুকে জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু, তুমি বুদ্ধিমান হরিদাসবাবুকে সে সম্বাদটা দাও নি কেন? তা হ'লে তিনি ত আমার চিঠি না পাওয়ার দরুন, লেখা না পাওয়ার দরুন দুঃখ করতেন না।

আজ ২০০ পেলাম ভাল। ছোটগুলাও পাঠাচ্ছি। লোভে পড়ছি নাকি, তাও আবার ভাবছি। শুনি সাহিত্যিকের মৃত্যু ইহাতেই ঘটে। হরিদাসবাবুকে বলিয়ো তিনটা ছোট গল্প যেন না ছাপান। এইবারের ছোট গল্পটা (সম্ভবত ভালই হবে) এক ক'রে চারটা গল্প চতুষ্পদ নাম দিয়ে ছাপালে বেশ হবে, কি বল? বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে। ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগ্‌গীর দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আট-ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাতবাবুও দোষ খুঁজে না পান। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে— ঐগুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। হরিনাম যেই করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি হরিনাম গাইব। দেখি এতে কি হয়।

বৈশাখের জন্য হরিদাসবাবুকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস 'গৃহদাহ' নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি— এতেও ঐ শিক্ষা কাযে লাগাব। ফাঁদে পা দেব না। বিরাজ বৌ নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে— ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না। কেমন আছ? ছেলেমেয়ে কেমন? গৃ - কেমন? ভায়া, পিসিমা— সব ভাল ত? সম্ভবত টোয়েন্টিয়েথ্ এপ্রিল স্টার্ট করব।

তোমার
শরৎ

কি খাটুনি বাপ্ রে! রক্ত আমাশা হয়ে শাপে বর হয়েছে— আর যাচ্ছি না।

২৪

রেঙ্গুন
২৮-৩-১৪

প্রমথ,

নানা কারণে তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরি করিয়াছি। 'ইন্‌জেক্ট' করিতে আমার ভরসা হয় না— ওসব আমি পারিব না। জান বোধ হয় আমি ভয়ানক 'ওপিয়াম-ইটার'— তাহায় রক্ত আমাশা! ব্যাপার এই। যা হোক এদেশে ম্যাংগোষ্টিন ফলে এ রোগ খুব সারে, আমি

তাই খাই— প্রায় সেরে এসেছে। ভয় নেই। না হ'লে, এ মুল্লুকের রক্ত আমাশায় লোক ২৪ ঘণ্টায় পর্যন্ত মরে। তবে ভাবনা এই ছিল যে আমার অত সুকৃতি নাই।

আমার এই, তারপর এদিকের হঠাৎ 'নিউরালজিক্ পেন' পিঠের নীচে হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ শনি— ২০।২৫ টাকা বোধ করি ঔষধ শুধু লাগল— কিছুতেই সারছে না। রাঁধাবাড়া, অফিসের কাজ করা, ডাক্তার, ঔষধ মালিশ করা— সমস্তই দরকার— গোদের উপর বিষফোঁড়া, চাকর পালিয়েছে। মন কি রকম, বোঝা বোধ করি শক্ত নয়। তার ওপর ফণির যমুনায়— থাক সে কথা।

একটা গল্পের অর্ধেক লিখে আজ পাঠাব মনে করেছিলাম, কিন্তু রেজেস্ট্রির সময় নেই— সেইটা তোমার ঠিকানায় আগামী মেলে পাঠাব যদি সময় থাকে। আর আমার ওপর যদি ভরসা করতে পার, তা হ'লে অর্ধেকটা ছাপিয়ো— ১০।১২ দিন পরে শেযটা শেষ ক'রে দেব।[১] খানিকটা পড়লেই বুঝতে পারবে। তবে ছাপাবার তখন সময় থাকবে কিনা জানি না।

এবারের ভারতবর্ষ পেয়েছি। প্রবন্ধগুলি সবই প্রায় ভাল। হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখতে লজ্জা বোধ হচ্ছে।

শরৎ

২৫

৫৪, ৩৬ স্ট্রীট, রেঙ্গুন
[ডাকমোহর, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫]

প্রমথ,

তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম তাহারা সবাই ভাল আছে। তোমার আবার জ্বর হইতেছে শুনিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। ব্যাপার কি, ম্যালেরিয়া নাকি? বোধ হয় তাই। তা যদি হয় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

খাট দুটা[১] ভাল হয় নাই, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম— নেহাৎ জাবাড়েগোছের হইয়াছে— মিস্ত্রীর অসুখ না হইলে আর একটু চলনসই হইলেও পারিত। যা হোক কতক কাজে লাগাইতে পারিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। মাপ দিতে ভুল করিয়াছিলে, তাই আবার বেঞ্চি করিয়া গচ্ছা লাগিল—সেটা নেহাৎ তোমারই দোষ।

খাটের দাম ২৩্ + ১্ পেতলের স্ক্রু। আর বাঁধবার দড়ি, কিছু কুলীর খরচ। সেটা 'কন্টিজেন্ট? এক্সপেন্স'।

এই ২৪্ টাকার বাকী ২০্ টাকা দেবার জন্য তোমার যেন আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। প্রতি পত্রেই সেই কথা। এটা জানিয়া রাখ বিশ টাকা না পাইলেও আমার দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিবে না, পাইলেও বিশেষ দুঃখ দূর হইবে না। আমার অভাব উহাতে বাড়েও না কমেও না। দিলে ভাল হয় দাও, না দিলে ভাল হয় দিও না। আমি আর বকাবকি করিতে পারি না। কি একটা তুচ্ছ কথা কতবার উল্লেখ করিবে? তুমি ত আমাকে ঢের জিনিস দিয়াছ, আমি ত অম্লানমুখে লইয়াছি— কখনও টাকা দিবার জন্য মনের মধ্যে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। যেমন

করিয়া দিলে তোমার ভাল বোধ হয়, তাই দিয়ো। চোরবাগানেই[২] দিয়ো।

এঁকে[৩] ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না— তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবা মাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য 'বি, আই, এস্, এন্'কে ইন্টিমেশন্ দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ জাহাজে বার্থ পাওয়া যাইবে। তারপর যেদিন হোক্ টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিয়ো। তাঁর ৪৫ ্ + ভেলুর[৪] ৪ ্ = ৪৯ ্।

তোমার শরীর অসুস্থ, তোমাকে কোন উপরোধ করিতেই লজ্জা করিতেছে। কিন্তু আমার একটি বন্ধুর ৪।৫ মার্চ নাগাদ ফিরিবার কথা আছে। খুব সম্ভব তিনি ছেলেমেয়ে পরিবার লইয়া আসিবার পথে চোরবাগানের সন্ধান লইয়া আসিবেন— সে হইলে অনেক আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই বড় কষ্ট পাইতে হইবে। জিনিসপত্র গুছাইয়া বাঁধিয়া জাহাজে তুলিয়া দিতে হইবে। যে সব জিনিসের আবশ্যক নাই (কারণ আমি ১ বৎসরের মধ্যেই আবার ফিরিয়া যাইব) তাহা তোমার ওখানে থাকিলেই সুবিধা। তবে বইগুলা কোনমতে প্যাক করিয়া নষ্ট না হয় এরূপে আনা চাই। রঙের বাক্স, আরও একটা ছোট বইয়ের বাক্স আনিবার আবশ্যক নাই। বড় সিন্দুকটাও দরকার নাই। কি কি আনা চাই তা' সেই ভাল জানে।

আর একটা কথা। ৪।৫ জোড়া গায়ে গাঁথা বঁড়শি—বড় সাইজের ২।৩ জোড়া, মাঝারি সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাঁধা কড়া ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সুতা— ভাই, নিশ্চয় দিয়ো। ওঁর কাছে টাকা চাহিয়া লইয়ো। আর ঘড়িটা যদি চলে তবে, না হ'লে নয়। অচল ঘড়ি আমার বইয়ের আলমারিতেও একটা আছে। মাঝে মাঝে চলে, মাঝে মাঝে থামে। তাতে আবশ্যক নাই।

যা হোক ফার্স্ট অ্যাভেলেব্‌ল টিকিট রিজার্ভ করিবার চেষ্টা করিবে। আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে চাই না— তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো না।

হরিদাস ভায়াকে বলিবে আমি একটা গল্প লিখিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। এইবার শেষ করিয়া পাঠাইব। এ মাসে যাবে না বোধ করি, কারণ সময় নেই।

এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না··· সব লোকেই দেখতে চায়, উঁকি মারে— এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায় অনেক লিখেছিলাম— ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছুই হয়ে উঠছে না—দেখছি!

হরি ভায়ার পিতাঠাকুর মশায় আছেন কেমন? বোধ করি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।....

হরিদাসের কথা আমি প্রায়ই মনে করি। সত্যই 'এ গুড্ ম্যান' যথার্থ এই উপাধিটা আজকাল কেন, সব কালেই পাওয়া শক্ত। আমার মনের বিশ্বাস 'হি ডিজার্ভস্ রেসপেক্ট অ্যাণ্ড অ্যাফেক্‌শন'— না? তোমার কথাই সত্য।...

শরৎ

ভাল কথা, আজকাল ভারতবর্ষ আগের চেয়ে ঢের ভাল হচ্ছে, না? আমার মতও এই, আজকাল অনেক বন্ধুবান্ধবেরও মত দেখছি এই। যারা মোটেই সুখ্যাতি করত না বরং নিন্দা করত, তারাও এখন বলে— মন্দ না— আমাদের দেশের তুলনায় এই এর চেয়ে আর ভাল হয় না। বুঝেছ? এইবার আর ভারতবর্ষের মার নাই— টিকিয়া গেল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

১০-১-১৩
ডি, এ, জি'র অফিস
রেঙ্গুন

প্রিয় উপীন,

তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সত্যই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে, একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা ইচ্ছে ক'রেই করে। ইচ্ছা না ক'রেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর এক রকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। 'সেন্সেটিভ্' ব'লে একটা কথা যে আছে, আমার কাছে সেটা অপর্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেনকে[২] আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, আজ পর্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে, কেনই বা লেখা বন্ধ করে!

তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে[৩] ভাল কর নি। ওটা 'বোঝা'র[৪] জুড়ি, ছেলেবেলার হাত-পাকানর গল্প; ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝা'ই যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না— ওটা তোমরা পাঁচজনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হ'লেও যে সমাজপতির কাছে পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলকাতায় থাকতে, তোমার কাছে পাঠাতাম; ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো কাশীনাথ যেন প্রকাশ না করে। যদি করে তা লজ্জায় বাঁচব না।

তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?...

গিরীন[৫] তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি। এত বৎসরেব পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই।

উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে— একদিন তার একখানা বই[৬] কিনতে চাই— তুমি নিষেধ ক'রে বলো যে, শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট ক'রে চেয়েও ছিলাম— অথচ সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন ক'রে দিয়েচি— আমি লিখতাম ব'লেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও-বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল[৭] থেকে

হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না। যাক, এজন্য দুঃখ করা নিষ্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই।

আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (অয়েল পেন্টিং) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে। তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া— (এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি, কিন্তু না টিকাও বরং ভাল, কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউন্টেন পেন তোমার হাতে অক্ষয় হোক্— ও কলমটা অনেক জিনিসিই লিখেচে— খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হ'লে যা সাধ্য সংশোধন ক'রে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো।

শরৎ

২

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২৬-৪-১৩

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য হইয়াছি, তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ করিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেও কি তুমি বিশ্বাস করিবে?

আমার কলকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে— আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হৌক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়ে দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে— আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনাও করিতে পারি না।

তবে এই বলি, তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার। আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ, আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ

বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম।

আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে, আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি, তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মুর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবামাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না।

আমি সুরেনকে কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এ সব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমি সমাজপতিকে লিখি, ওগুলো আর ছাপাইবেন না— তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হৌক, এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমি যে ঐ কথা সমাজপতিকে বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতে পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার 'আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি', আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

থাক এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক না বুঝিয়া, সব দিক না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্বোধের কায করিয়াছ এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি— আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে 'ফলস্ পজিশন'এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়। অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে–– বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় জলধর সেন প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে।

সে-ই হইতেছে ভারতবর্ষের মোড়ল। এখন দ্বিজুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও রেজেস্ট্রি চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম— সে বলে,

এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধুবান্ধব ক্লাব প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে হিস্ট্রি জান।

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে— অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম— বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো।

সেবক

শরৎ

৩

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
১০-৫-১৯১৩

প্রিয় উপেন,

আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ, ইহাতে যে কত তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না, ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজ ভাবে আমার কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম— সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এতবড় আহম্মক? না হয় বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি— এতে পাণ্ডিত্য কোথায়?

যাক্। বি-এ, এম্-এ, বি-এল্, এ টাইটেলগুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের ইভ্‌নিং ক্লাবে অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। ডি, এল্, রায় এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি 'অমূল্য' হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবিবাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এইভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক— দু দিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। তবে চেষ্টা করা চাই— পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা! আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজে। তবে আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না।

চরিত্রহীন তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়াছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে, সে-ই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত। কিন্তু তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি ম্যানাস্ক্রিপ্ট পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে।

তাহারা সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে ! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই— অবশ্য সে ও-রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্যের কথা নয়, কিন্তু নিজেই তাহারা বলিতেছে, চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা যতদূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (স্টাইল এবং চরিত্র-বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই, যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা মেসের ঝি-কে আরম্ভেই টানিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব, তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম।

আর এক কথা— প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি— এবং সেইরূপ করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই। আরো এক কথা— তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না, কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখা পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে।

যাই হৌক— চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা দিবে না। কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়, তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক! তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোর-জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ, তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও বিন্দুমাত্র কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু 'ডিপ্লোম্যাটিক' চাল চালিয়াছ— তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া 'আমরা' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে।

পথনির্দেশ এবং রামের সুমতি সম্বন্ধে আমার অভিমত পথনির্দেশটাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে, তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথনির্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ 'সার্কামস্‌টেন্স'-এর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্যের অভাবে শেষ হবার পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের মত দুটো গল্পই 'সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে এক্সেলেন্ট'।

দ্বিজুবাবু বলেন, গল্পের আদর্শ।

ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম কিছু একটা বার হয়, তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট ক'রে যেন লিখতেই পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি, অবশ্য গল্প (প্লট) ঠিক তাই থাকবে। তারপরে হয় চরিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আর প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হ'লে শুধু গল্পতেই কাগজ যথার্থ 'বড়' ব'লে লোকে স্বীকার করে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য ক'রেই। এ বিষয়ে তোমার অভিমত জানাবে।

যদি গল্প লেখার কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু নভেল ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি, রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনারও ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী ব'লে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো, আমি 'রি-রাইট্' করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসছে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যে দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা[১] হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত— এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সে-ই জানে। আমি জানি না।

তোমার 'ক্রয়-বিক্রয়'[২] গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং 'কনক্লুশন' বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিল না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা ক'রে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার[৩] কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক ক'রে রেখেচি— একদিন পাঠিয়ে দেব।[৪]

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে?[৫] তাকে জবাব দিতে পারি নি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই— কোনদিন ও-কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা। আজ এই পর্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি[৬] একটা রিট্ন্ স্টেটমেণ্ট' পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন 'ডিনাই' কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়োমানুষ!... শরৎ

৪

১৪, লোয়ার পোজনডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২২ শে আগস্ট, '১৩

প্রিয় উপীন,

অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেক দিন আমাকে কোন সম্বাদ দাও নাই। নাই দাও, সেজন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইবে,[১] তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম[২]। এ সম্বন্ধে আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি, 'বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই—'[৩]। আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই হয়ত তোমার 'বেস্ট' এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই— শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড় ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব করচি— কিন্তু আমার আত্মনির্ভরই বল, আর 'প্রাইড'ই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেক দিন পড়ি নি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন। কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্যে এমনটি হয়ে থাকে, তা হ'লে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার 'স্টাইল'টি বড় সুন্দর। আমি যদি এমনি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এমনি অধিকার থাকত, তা হ'লে বোধ করি গল্প আরো ভাল হ'ত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে, কিন্তু খুসী হ'লে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারি নে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই— এই বর্ষাকালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল, দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি—

শরৎ

ফণীন্দ্রনাথ পাল[১]কে লেখা

১

ডি, এ, জি'র অফিস
রেঙ্গুন
[জানুয়ারী ১৯১৩]

ফণীবাবু,

আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে?[২] আমাকে 'চন্দ্রনাথ' করে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হবে না।

এসে পর্যন্ত[৩] আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি, না হ'লে এতদিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে[৪] আমার কথা মনে করিয়ে দিবেন।

শরৎ

২

রেঙ্গুন
[মাঘ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,

'রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না,[১] কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট ক'রে (১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।... আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সেদিকে চোখ রাখব।

আর এক কথা, আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়।

এবারের 'সাহিত্যে' আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ[২] ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলায় অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে[৩] আমাকে যেমন লজ্জিত করেছেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন, এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ

হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি— আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা, ও-রকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভরে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম সাবজেক্ট নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি, তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে যে কোন সাবজেক্ট— তাতেই আমি স্বীকার আছি।

'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একবারে ছাপাবেন, আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

'চরিত্রহীন' প্রায় সমাধার দিকে পৌঁচেছে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারি নে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।...

আব একটা কথা— আপনি যমুনা ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন, চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন— অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে, একটু নির্বাচন ক'রে দিতেও পারি। পৌষের যমুনা বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক-টিকিট), কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক থেকে ফেরত পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি শুধু গল্পই লিখি নে। সব রকমই পারি, শুধু পদ্য পারি নে।

আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে নিরুপমা দেবীর রচনা— কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয় কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি, সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌঁছায় নি: তা ছাড়া এ আমার পেশা নয় ; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোনদিন হ'তেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোনমতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি ক'রে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিস থাকবে ; এ কথা প্রকাশ করে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি, গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল— একটু ক্ষতি স্বীকার ক'রেও, তাতে অনেকটা অ্যাড্‌ভার্টাইজমেণ্ট-এর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেকবার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে[৪] না তাই। তবে আপনি যদি চন্দ্রনাথটা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিসটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েছে— সুতরাং নূতন ক'রে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান, আমাকে জানাবেন।...

আঃ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

রেঙ্গুন
১২-২-১৩

প্রিয় ফণীবাবু,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি ক'রে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিস থাকে, দু-দিনে হোক দশ দিনে হোক সে-কথা আপনিই প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস ক'রে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

দ্বিতীয় কথা— 'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বা'র করতে পারলেই বড় ভাল হ'ত— কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প 'ক্রমশঃ' বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয় নি, তার জন্যে আলোচনা বৃথা।

আমি দু-একদিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় রামের সুমতির চেয়ে ভাল, তবে দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা ক'রেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা ক'রে দেখি কি হয়!

৩য় কথা— 'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই! চরিত্রহীন বার করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই— কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় ক'রে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা— সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাঁকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, এক দিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হ'লে হাজার চেষ্টাতেও দোকান চলবে না— দু-চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হতে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাইপাঁশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারি নে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে, কেমন ক'রে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা— সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন, না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেছেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেছেন ত?

৬ষ্ঠ— আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু-এক দিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন্ মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে রামের সুমতি শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিস পড়তে পারে।

৭ম— বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছনে মেলাই কতকগুলো টাকা নষ্ট না ক'রে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল।

অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাশান হয় তা হ'লে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সিলেকশন-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে পড়ে ছাইমাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাইমাটি দেওয়া দু-ই মন্দ।

৮ম— শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া ক'রে আপনাকে দেন, সে ত নিশ্চয় ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি ভারতীতে লেখেন, আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয়ত অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা লিখবেন। এঁরা সব বড় লেখিকা, এঁদের হয়ত যমুনার মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই, না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি— অনিলা দেবী।

ছোট গল্প— শরৎচন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প— অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে একজন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী, বি-এ, তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিক পত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি— আমাদের যমুনার জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই, যমুনা আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ ক'রে যে তাঁরা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হ'লে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না মতলব করেচেন, তখন এই জিনিসটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে 'বিষয়বুদ্ধি' বলে, তাও অবহেলা করবেন না। প্রবাসী প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে।

আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিকপত্রও একটাও লই না— আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি, যদি তাই হয় তা হ'লেও চিন্তার কথা কিছু নাই— আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিস আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোনদিন বা আপনার জন্য, কোনদিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না।

আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধরে ভাবছি— এক একবার ইচ্ছা করে, এইচ্, স্পেনসার-

এর সমস্ত 'সিন্থেটিক ফিলোসফির' একটা বাঙ্গলা সমালোচনা— সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা— এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেনসার-এর শত্রু-মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া, দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়— কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়), অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ-রকম জোগাড় ক'রে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ ব'লে মনে করবেন। লেখা রেজিস্ট্রি ক'রেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্যদশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এ সব কথা আর লিখবেন না?

আশীর্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক— সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব, সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠিপত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল— না থাকায় বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল— যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক, ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব, এমন কথা কোনদিন মনেও করবেন না! আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন— অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা—'চ্যারিটি বিগনস্ অ্যাট্ হোম্' সত্যি না?

একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্বাদ জানিবেন। ইতি—

শরৎচন্দ্র চট্টো

৪

রেঙ্গুন
২৮শে মার্চ, ১৯১৩

প্রিয় ফণীবাবু,

এই মাত্র আপনার রেজেস্ট্রি প্যাকেট পাইলাম। যদি রেজেস্ট্রি করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল— কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি আন্‌রেজিস্টার্ড পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব।

বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান— (১) পথনির্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ[১] ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন ক'রে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন, না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল ক'রে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন, গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখিতেছি। অবশ্য আপনার ক্লেম্ যে আমার উপর ফার্স্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে কটা দিন বাঁচিয়া আছি— আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়— তা ছাড়া গল্প-টল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে প'ড়ে গল্প লেখা। যা হৌক লিখব— অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়।

অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি— এ ক্ষতি আমার নিজের কিছুতে করিব না। যা হৌক আপনার বৈশাখটা গোলমালে এক রকম বার হয়ে যাক, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা।

আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন, আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ ক'রে দেবেন— যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশি নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ— ক'টা লোকেই বা পড়ে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রম আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি— সেইটাকেই বেশি লাভ মনে করি। তাছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু সমস্তটাই দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে।

'পথনির্দেশ'টা সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা, 'নারীর লেখা'য়[২] বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনী'র নাম হইয়া গিয়াছে। 'ভুমার সঙ্গে ভূমির' ইত্যাদি এটা অনুরূপার— আমোদিনীর নয়।

নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে ছাত্রীও বটে।

শরৎ

৫

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণীবাবু,

আপনার প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটি মন্দ নয়, দেওয়া চলে। 'চক্ষু'[১] সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির একশেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয়, আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি— আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই, আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন, কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক্। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকিটা পরিবর্তন পরিবর্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকিটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ বা দুই-ই, কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি, আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব— তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান— বাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, ১৯, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা।

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে, কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র যমুনা তাঁকে দিন— তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে আমি নিয়মিত যমুনা ছাড়া আর কোথাও লিখিব না, তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই, সে কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নামও আছে। অনেক সময়ে এবং বেশীর ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল ব'লেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে 'মানসী'র শ্রীযুক্ত ফকিরবাবুর[২] সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন, তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না— শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কতদিন শ্রাদ্ধ 'সাহিত্য' কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে, আমার লেখার ক্ষমতা কাশীনাথের অধিক নয়। এটাতে

যে নাম খারাপ হয়, উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে, এই জন্যই কোন মতেই সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা হ'লেই সারা হব দেখচি।

আরও একটা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীনের পত্র পাই— তাঁহাদের সহিত উপীনের চন্দ্রনাথ লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাতে এবং কাশীনাথের 'সাহিত্যে' প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায়, এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মতলব করিয়াছে।

চন্দ্রনাথ যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে, আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'ইয়েস্ অর্ নো', আমি তারপরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে, আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা-তা গল্প ছাপা নয়, অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই), সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া গ্র্যাণ্ড ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব, তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইব। শুধু চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প, কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় ব'লে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ-বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই— জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সারল? ইতি—

আপনাদের স্নেহের

শরৎ

৬

এপ্রিল ১৯১৩

প্রিয় ফণীবাবু,

আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ

মন্দ সমালোচক নই— সুতরাং এই দিকটায় একটু চেষ্টা করিব,— অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ ভি-পি-পি ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া ডেলিভারী লইব। প্রবাসী, সাহিত্য, মানসী, ভারতী। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না— অত লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি— ঠিকানা ১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট। বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা।

আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ।

কিছু মনে করিবেন না— আপনি, আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাগার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি—

শরৎ

৭

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
৩-৫-১৩

প্রিয় ফণীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্তন উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব।

চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি, তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্বে শেষ হইবে কিনা সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ 'ইম্‌মরালিটি'র সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। চরিত্রহীন আর্ট-এর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এ রকম ধরণের নয়।

চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতে ছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে, বুঝিবা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব।

আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে— এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন। যমুনার উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশি লক্ষ্য, তার পরে আর কিছু।

চরিত্রহীন সেই অর্ধেক লেখা হইয়াই আছে— কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তার চেষ্টা করতেই হবে— কারণ সেটা 'অল্‌রেডি' প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে যমুনা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সবচেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর-বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশি? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম, তা হ'লে যমুনার সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হ'ত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না।

তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব— কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড় কম হয়ে গেছে। খাটতে পারি নে।

আর একটা সমালোচনা লিখচি— দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত যমুনার কিরূপ সম্বন্ধ— যদি উচিত বিবেচনা করেন ছাপাবেন, না হয় সাহিত্যে দেবেন।[১]

না, সে গল্প আজও পাই নি। নিরূপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন, তা হ'লে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্তমানে আমার ভার নেন তা হ'লে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরূপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। সুরেন, গিরীন, উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কিনা জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়— কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প-টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগে না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোরজবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না।

প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম।[২] আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে ডি, এল, রায়কে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি। এর ক্ষতি ক'রে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটা গোলে পড়েচি। সেও— 'অ্যাক্যুয়েন্‌টেন্স' নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হ'লে আর কি! প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২°৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয় না— কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, জেনারেল হেল্‌থ এ দেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না।

ইতি—শরৎ

৮

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
১০-৫-১৯১৩

ফণীন্দ্রবাবু,

আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া।[১] তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয়, তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্‌। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা আর্ট-এর ধার ধারে না, তারা হয়ত নিন্দা করিবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কায হবে। তবে ওটা সাইকোলজি এবং অ্যানালিসিস্‌ সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নাই। এবং এটা একটা সম্পূর্ণ 'সায়েণ্টিফিক্‌ এথিক্যাল্‌ নভেল! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ
শরৎ

৯

১৪, লোয়ার পোজন্‌ডং স্ট্রীট, রেঙ্গুন
[বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,

গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের যমুনার জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে, কায করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্র কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিয়া বলিবেন— এই ত ব্যাপার! যা হয় এ মাসটা এক রকমে চালান— ভাল হ'লে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না— তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া ভারি খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন— দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য।

চরিত্রহীন অর্ধ-লিখিত অবস্থাতেই, প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করাতেই— আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকিটা লিখিব।[১]

গল্প এ মাসে আর পারিব না— কেন না, সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয়, আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে— সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম— অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না। কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত, তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের যমুনা সত্যই ভাল হইয়াছে। গল্পটি[২] বেশ। প্রবন্ধটিও[৩] ভাল।

— শরৎ

১০

রেঙ্গুন
১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,

...আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।...

উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিন নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতিপূর্বেই চেষ্টা করিতাম, এতদিন এমত চুপ করিয়া থাকিতাম না।...

আরো একটা কথা এই যে, শতদ্বারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি, এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালবাসে সে এই কাগজই পড়িবে, এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু, অশ্রদ্ধা ক'রে, যা-তা ক'রে, তর্জমা ক'রে পরের ভাব চুরি ক'রে— এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।...

আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না। 'বিন্দুর ছেলে'[১] আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ 'সিন্‌সিয়ার' হওয়া চাই— যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভাল করিয়াছেন— তাতে পাঠক যাই বলুক।

'নারীর মূল্য'[২] আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না

হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।...

চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই গ্র্যাণ্ড করিব। লোকে যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না। তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর মরাল্ হৌক ইম্‌মরাল হৌক, লোকে যেন বলে, 'হ্যাঁ, একটা লেখা বটে।' আর এতে আপনার বদ্‌নামের ভয় কি? বদ্‌নাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? 'চরিত্রহীন' এর নাম!— তখন পাঠককে ত পূর্বাহ্ণেই আভাস দিয়াছি— এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শন' তাহারা একবার যদি পড়ে, তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা আর্ট হিসাবে— সাইকোলজি হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?...

টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার ; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায় তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই। ...একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্য-সভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই সে জোরও নাই!

— শরৎ

১১

রেঙ্গুন
১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু,

তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি'[১] পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়— নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার ...র এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে, অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই— আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির 'প্যাথস্' ; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে, মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই 'হেল্‌দি' নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।...

দুই একটা কথা চরিত্রহীন সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে, ঐ সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করাও শক্ত। ইম্‌মরাল ত লোকে বলিতেছেই— কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশি ইম্‌মর‍্যাল্‌ ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।...

শরৎ

১২

পরম কল্যাণীয়,

...মাঝে মাঝে মনে করিতেছি, কিছু ছুটি লইয়া বর্মাতেই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকি, আর কলিকাতায় ফিরিব না। যা হয় পরে লিখিব। আপাততঃ ভাল আছি, কিন্তু লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

তোমরা আমাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিতে বলিতেছ সত্য, কিন্তু আমার ওটা পছন্দ হয় না। চাকরি-বাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর কাহারো কাছে গিয়া থাকা— সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বরং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘরে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি। আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু আছে তাহা জানি, গেলে কিছুদিন যত্ন যে না হয় তা মনে করি না, কিন্তু আমি আর কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে[১] গিয়াই থাকিব, কেন না সেইটাই এক রকম আমার বাড়ীঘর দোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো— ক্রমাগত যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয়, পাছে মরিয়া গিয়া তাঁদের বিব্রত করি। তবে আর বোধ হয় কোন আশঙ্কার হেতু নাই। বর্ষাকালটাই আমার বড় শক্ত কাল। বর্ষা ত শেষ হইল, এইবার ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিব বলিয়া ভরসা করিতেছি।

আমার অসময়ে এই চরিত্রহীন যদি শেষ না করিতেই পারি, আর কে করিতে পারিবে তাহা গতবারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার একটা জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

আর একটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি। নারীর মূল্য শেষ হইয়া গেল, ইহার যে এত বড় সুখ্যাতি হইবে তাহা মনেও করি নাই। কিন্তু এখন পরিচিত অপরিচিত লোকের নিকট হইতে ইহার বহু আলোচনা ও চিঠিপত্র পাইয়া মনে হইতেছে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে যেমন প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বোধ করি ঠিক তাহাই হইতে পারিত।[২]...

তবে এও একটা কথা, যাঁহারাই প্রতিবাদ করুন না, নিতান্ত স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া অবহেলা না করেন যেন। ভাল কথা, এটা যে আমার লেখা তাহা মণিলাল[৩] জানিল কিরূপে? মানসী, প্রবাসী, সাহিত্য এঁরাই বা জানিলেন কেমন করিয়া? তুমি ত প্রচার করিয়া দাও নাই? অবশ্য যাহারা আমার লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহারা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু সাধারণের ত বুঝিবার কথা নয়।...

শরৎ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

...তোমরা 'নারীর মূল্য' লেখাটার অজস্র সুখ্যাতি করিতেছ— আর পুঁটু সে-লেখাকে চাবকাইয়া দিয়াছে।[২] 'নারীর মূল্য' আর লিখিব না।[৩] তবে এ সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিবার আছে, নানা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। পুঁটুকে লিখিয়া দিলাম,[৪] বুড়ি যেন এ সম্বন্ধে কিছু না লেখে। লেখার প্রতিবাদ আমার সহ্য হয় না। সেটা গালাগালির মত দেখায়। যদি আমার লেখার বিরুদ্ধে তোমাদের কিছু বলিবার থাকে, কথায় বলিও। তাহাতে সুবিধা এই, দু পক্ষের পরস্পরকে বুঝিতে ভুল হয় না এবং বুঝাপড়ার শেষ হয়। তাহাতে সত্যকার উপকার হয়, লাভ হয়।...

(সৌরীনবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই পত্রাংশটি সৌরীনবাবুর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।)

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

৬৭।৯ লুইস্ স্ট্রীট
রেঙ্গুন
৩-১-১৫

প্রিয়বরেষু,

আসিবার সময় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সেদিন আপনার পিতাঠাকুর মহাশয়ের অসুখ হওয়ায় আপনি দোকানে আসিতে পারেন নাই। আমিও আর যাইতে পারি নাই। তলপেটে একটা প্রবল ব্যথা হওয়ায় ৪।৫ দিন নড়িতে চড়িতে পারি নাই। পথে ভারি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি দুই মেলে টিকিট না পাওয়ায়, আর অপেক্ষা করিতে না পারায় অবশেষে ডেকের টিকিট লইয়াই রওনা হই। অসম্ভব বেশি ভীড় প্রভৃতির জন্য এখানে আসিয়াই জ্বর হয়। ৬।৭ দিন পরে ভাল হই।

প্রমথ[২] একজোড়া প্রকাণ্ড খাট তৈরি করিবার ফরমাস দিয়াছিল। তাহা তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং খুব সম্ভব ৪।৫ দিনের মধ্যে আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিব। কিন্তু সে ত ছত্রপুরে[৩] গিয়াছে। তাই মনে করিতেছি, আপনাকে টেলিগ্রাফ করিলে যদি লোক পাঠাইয়া 'ওহার্‌ফ' হইতে খাট দুটা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন ত বড় ভাল হয়।

আমি আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে একটি বইও আনিতে পারি নাই। একখানি ভারতবর্ষ আমার সঙ্গে নাই। ঐ দুটো গল্প[৪] যে দুই সংখ্যার ভারতবর্ষে আছে, দয়া করিয়া যদি পাঠাইয়া দেন আমি একটু দেখিয়া শুনিয়া দিই।

আপনার কাছে আমি বহু বিষয়ে ঋণী। যদিও বলা বাহুল্য, তথাপি না বলিয়াও ত থাকিতে পারি না। নিজেদের কর্তব্যও আমরা সব সময়ে করি না। এটাও বোধ করি আমাদের অন্তর্নিহিত স্বভাব। অথচ বাহিরের সংসারে সমস্তই ন্যায্যমত না করিলে সংসারই অচল হইয়া পড়ে।

যাই হোক কলিকাতার হাঙ্গামা হইতে[৫] দূরে আসিতে পারিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। দেখি যদি নূতন কিছু করিতে পারি।

আপনার বাড়ীর সম্বাদ জানাইবেন। বিশেষ করিয়া আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় কেমন আছেন ইহাই শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

আমি নিজে ভাল আছি। আমার ভালবাসা জানিবেন। ইতি—

আপনার
শরৎ

২

৬৭।৯ লুইস্ স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২৭-১-১৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র এবং ভারতবর্ষগুলা যথাসময়ে পাইয়াছি। শীঘ্রই ফেরৎ পাঠাইব।

টাকার কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ৯৯ জন লোকই খুসী হয় এবং আশীর্বাদ করে। অবশ্য আমি আশীর্বাদ করিতেছি না, তবে আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষ করিতেছি।

আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় যদি কিছুও 'ইম্প্রুভ্' করিয়া থাকেন, যখন চিঠি লিখিবেন তাহা জানাইবেন। কারণ, উনি বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত আপনার কোন অমঙ্গল হইবে না।

উপীনবাবুর[১] চিঠি ত পাই নাই। বোধ করি শেষকালে মত বদলাইয়াছেন।

আমি বেশ ভাল আছি এবং যা পারি নির্বিবাদে লিখিবার অবকাশ পাইতেছি। মেল ক্লোজ্ করিবার সময় হইয়া আসিল। ইতি—

আপনার
শরৎ

৩

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন
২২-৯-১৫

প্রিয়বরেষু,

'পল্লী-সমাজে'র[১] এইরূপ শেষ করিয়া পাঠাইলাম। সেদিন যেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে ছিলাম, সেটা ভাল বোধ না হওয়ায় 'কনক্লুশান'টা অন্যরূপ হইল। ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইলাম এ মাসে সমস্ত ছাপিবার, সেইজন্য ধীরে সুস্থে পাঠাইতেছি।

অবশ্য আমি নিজেই জানি 'সরস' বলিতে যা বুঝায়, এ গল্প তার ধার দিয়াও যায় না— নিতান্তই কট্‌মটে পদার্থ খাড়া হয়েছে— তা হোক্, দুই একটা ইণ্টারেস্টিং গল্পও ভাল। প্রবন্ধও ত অনেকে পড়ে।

আপনার দেওয়া ৫০ টাকা পাইয়া সত্যই অতিশয় বিস্মিত হইলাম। যাই হোক বহু ধন্যবাদ।

সেই তিনটা গল্প[২] এক করে একটা বই করার পারমিশান্ বহুকাল পূর্বেই দেওয়া আছে। আপনি ছাপিতে দেবেন। পল্লী-সমাজ বই করা যদি আবশ্যক মনে করেন, ভারতবর্ষে শেষ হইয়া গেলেই সেটা ছাপিতে দিতে পারেন। অর্থাৎ আমার পারমিশান রহিলই। যদি আপনি ভাল মনে করেন (বই প্রকাশ করিলে আপনার ক্ষতি না হয়) তা হইলে সেও আর একটা বই হইতে পারে।...

আমার ডান হাতটায় এত ব্যথা যে, লেখা ভারি শক্ত। কিছুতেই আরাম হইতেছে না, ডম্বল ভাঁজিতে গিয়া[৩] এ এক কাণ্ড ঘটিল।

প্রমথর 'ট্যাঙ্ক অ্যাংলিং'[৪] বেশ হইয়াছে। সে ভারি খুসী, বাস্তবিক হবার কথাই ত।

এবারের ভারতবর্ষ আজও পেলাম না। আপনাদের আফিস হইতেই ভুল হইল কিম্বা এখানেই চুরি গেল। আজ পোস্ট আফিসে একবার খোঁজ করিয়া দেখিব। কারণ ও-আফিসের ভুল হওয়া সম্ভব নয়— এখানে চুরি যাওয়াই সম্ভব।

অপরাপর সম্বাদ অম্‌নি এক রকম। আপনাদের কুশল মাঝে মাঝে লিখিবেন।

আপনাদের— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
৫-১০-১৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। এই গল্পটা[১] বেশ হওয়ার কোন আশা আমার ছিল না। কারণ প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম এ সকল বস্তু প্রবন্ধ হইলেও হইতে পারিত। আসলে এ ধরণের লেখাকে ঠিক গল্প বলাও সকলের মত না হইতে পারে। যাক্, যদি দু'একজনের ভাল বোধ হয় সেও আমি আহ্লাদের কথা মনে করিব। আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ছাপবেন। আপনার নিজের জিনিস হইলে যা করিতেন ঠিক তাই। এতে ভাল না হয় সেও আমার কপাল, ভাল হয় সেও আমার কপাল।...

হাতটা কিছুতেই ভাল হইতেছে না। মধ্যে ডান পা'টাও আগাগোড়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া জয়ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা এখন কমিয়াছে এই যা। প্রতি মাসেই কিছু না কিছু একটা ছোট হোক্ বড় হোক্ প্রবন্ধ হোক্ ছাপিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টাই করিব। যদি না পারি সেটা আমার অনিচ্ছার জন্য নয়, অক্ষমতার জন্যই হইবে না।

অন্যান্য বিষয়ে ভাল আছি।

আপনাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষ' পেলাম। প্রথমটা কে যে চুরি করিল তা বলিতে পারি না।

আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু ভাল করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়। আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ করি ভাল। আমি ত মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।

৫

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
১৫-১১-১৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। জ্বর হইয়াছিল বলিয়া জবাব দিই নাই। এখন ভাল হইয়াছি। আমার বিজয়ার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা জানিবেন।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'[১] যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই— এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ[২] ছিল সে সকল যে, কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতে পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

যদি বলেন ত আরও লিখি— আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোনমতেই প্রকাশ না পায়।[৩] এমন কি আপনি ছাড়া উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না— তা ভালই হোক মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি— এসব নেই।

বাস্তবিক 'তিনমাস'[৪] যে ত্রিশ বছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল। অথচ কি নীরস ! কি কটু ! আপনি দুঃখিত হবেন না— এইটা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মত। মহারাজের[৫] ওটায় ত এর শতভাগের এক ভাগও আত্মম্ভরিতা নেই। তাতে 'আমি'ও যেমন আছে, 'তুমি'ও তেমনি আছে— 'ওরা' 'তারা'ও বাদ যায় নাই। রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখানো শোনানো দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়, না তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়— তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে, না বলা না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

বাঃ, এ যে আপনাকেই লেকচার দিচ্ছি ! মাপ করবেন— এ সব আমার চেয়ে আপনি নিজেই ঢের বেশি জানেন-- সে আমি খুব জানি। যাই হোক, শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে, দয়া ক'রে আমাকে জানাবেন। ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবে না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি।[৬] অর্থাৎ শেষ করব ব'লে লিখচি। ভালই হবে। কমেডি হবে ট্রাজেডি নয়। কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের বলতে অনুকরণ। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে বড় উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।

প্রমথ চলে গেছে কি? আমি অনেকদিন তার চিঠি পাই নি। সে যে ভাল হচ্চে, এই আমাদের ভাগ্য।[৭] বাস্তবিক, সত্য কথা বলতে অমন বন্ধু আর হয় না। বন্ধু বলতে ত এই ! ও যদি না বাঁচে, আমার ত মনে হয়, আমার 'বন্ধু'র দিকটা যথার্থই খালি পড়ে যাবে।

আপনার পিতাঠাকুরের খবর কি? কেমন আছেন আজকাল? আচ্ছা 'যমুনা' আজকাল কি চলে? ফণী নাকি বই ছাপিয়েচে? সে বল্‌ত, আপনার এক একটা গল্প আমি ৩০।৪০ বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। আপনার লেখাই আমার আদর্শ। অথচ এমনি গুরুভক্তি যে, একখানা বইও পাঠালে না। আমি তার সব লেখাই পড়েচি এবং সে সব লেখা যে কি, সে ত আমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না। অবশ্য নানা কারণে আমিও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি নাই।[৮] যাক্, পরচর্চায় কাজ নেই।

গত মাসের ভারতবর্ষ তেমন ভাল হয় নাই। সমস্তই মেয়েদের লেখা— নতুন কাণ্ড বটে,[৯] কিন্তু 'ওয়ার্থ' হিসাবে অন্যান্য বারের চেয়ে নীচে। সে ত হবারই কথা। কিন্তু একটা কায হয়েচে— ফাইল অনেকটা 'ক্লিয়ার' হয়েচে, না?

আপনি আমাকে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন— সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই— আসিবার সময় মনেই হয় নাই— তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে। পুলিশে ঘাঁটা'ঘাঁটি করিয়া তাহাদের (আমার সব বইগুলিরই) এমন অবস্থা করিয়া দিয়াছে যে, বিক্রী হওয়া শক্ত। মলাটে কিসের দাগ লাগিয়াছে— এগুলির অনেক দাম এবং পরের বই— আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়া আছি, কিন্তু কোন রকম উপায়ও দেখি না। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারি না। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। আপনাকে অনেক রকমেই ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছি, তাই হঠাৎ এগুলির দাম বলিয়া দিতেও ইচ্ছা হয় না। বইগুলি বরং আমাকে দান করুন। আমি অনেক আশীর্বাদ করিব। এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যহ এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া লজ্জা পাইব না।

উপেনবাবু, জলধরদাকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবেন। বহুকাল পূর্বে জলধরদার একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জবাব দিয়াছিলাম কিনা মনে হয় না। যাই হোক্, সেজন্য তিনি পথ চাহিয়াও নাই, তাও জানি।

আপনাদেরই
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
৭-১২-১৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। বৈষ্ণব বইগুলি সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, সে আপনার উদারতা। আমি ত সম্মত হইবই।

নূতন গল্পটা[১] আশা করি ঠিক সময়েই পাঠাইতে পারিব। তা যদি না পারি, একটা ছোট গল্প পাঠাইয়া দিব। কারণ, অসম্পূর্ণ গল্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে চাহি না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার ভরসায় ছাপাইতে বলিতেও আমি পারি না। তবে চন্দ্রকান্তের কাহিনী স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি। এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়রা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করেন। আমার বড় আশা আছে— ইহা অন্ততঃ যে সকল লেখা ছাপা হয় এবং হইয়াছেও তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক চেষ্টা ও যত্নের জিনিস, অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ[২]— তা অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও প্রথমটা মন্দ— এমন দেখাও যায় ত। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা হবে কি? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া সে ত ভূমিকাতেই লেখা আছে।[৩]

শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার[৪] স্বাক্ষরিত একটা ভ্রমণ 'সমুদ্রবক্ষে' নাকি অনেক দিন হইতে আপনাদের ফাইলএ পড়ে আছে। আমারও যেন স্মরণ হয় সেটা দেখেচি। তিনি ক্রমাগতই আমার কাছে সেটা চাইচেন। তিনি বলেন, আপনাকে চিঠি লিখিয়া কোন জবাব পান নাই।

সেটা যদি একটু খোঁজ করিয়ে পাঠিয়ে দেন ত ভাল হয়। তাঁর বিশ্বাস সেটা খুব ভাল (অবশ্য আমি পড়িনি), তাই সেটা ফিরিয়ে নিয়ে আর কোন কাগজে পাঠালে হয়ত ছাপা হতেও পারে। এই জন্যই নাকি তাঁর লেখাটিতে এত প্রয়োজন।

আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। একটু চিন্তা করে যদি এই প্রশ্নটির জবাব দেন বড় উপকার করা হয়। এবার যখন পত্র লিখিবেন তখন এই কথাটির অতি অবশ্য জবাব দিবেন, অনুরোধ করিতেছি। আমার বই যে কিরূপ বাজারে চলে এবং বিক্রী হয় আজও পর্যন্ত আমি তার কিছুই জানি না। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আমার ৬খানা বই (নভেল) ধরুন গড়ে দাম ১।০, যদি ছাপা হয়ে বিক্রী হবার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহাতে অন্য সব খরচ বাদে আমাকে দোকানদার যদি ২০্ টাকা মাসে দেন— সেটা কি তাঁর খুব দুঃসাহস? এতে ভবিষ্যতে তাঁর কি খুব লোকসান হবার সম্ভাবনা?

অপরাপর কথা পরে লিখিব। 'মেল'এর আর দেরি নাই।

আপনার— শরৎ

৭

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২৫, ১২, ১৫

করকমলেষু,

এবারকার ভারতবর্ষ[১] চমৎকার হইয়াছে। আমি নিজে ত পড়িবার জিনিস অনেক পাইলাম। আচ্ছা, একটা কথা— 'জড় জগৎ'[২] সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু প্রতিবাদ করে, ধরুন আমার দিদিকে দিয়া যদি কিছু লিখাইয়া লই, আপনারা সে প্রতিবাদ কি ছাপিবেন? অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করার পর। [সিম্বল অর্থাৎ কল্পনা প্রতিমা খাড়া করিয়াই কাজ চলিতেছে (একটা উদাহরণের মত উল্লেখ করিলাম) জার্মাণির সকল পণ্ডিতই ত তা মানে নাই। তাদের মতামতটারও ত একটু মূল্য আছে। তাছাড়া হেল্‌ম হোজ[৩] কি শুধু ষ্টাণ্ডার্ড সম্বন্ধে ঐ বলিয়াই শেষ করিয়াছেন? তখন সবাই মানিয়া লইয়াছিল কি? আপনিই বলুন না? আর এটা ত শুধু পদার্থ বিদ্যার— ফিলসফি অব্ সায়েন্স]

পল্লি কাহিনী না সমাজ?[৪] কি এটা। এবার ছাপার বোধ করি বেশি ভুল আছে। শেষটা পাঠাচ্ছি।[৫] গত মাসে তেমন ভুল ছিল না। এক জায়গায় মনে আছে 'আরক্ত' না হয়ে রক্তাক্ত ছাপা আছে।

বড় তাড়াতাড়ি, মেল ক্লোজ হয় হয়।

—শরৎ

৮

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন

করকমলেষু,

ভায়া, আমি যে চিঠি লিখেছিলাম, তা কি হাতে পড়ে নি? মায়ের[১] বিবাহ সময়ে ত উপস্থিত হইবার ত সৌভাগ্য ছিল না, যাই কি করে? আচ্ছা প্রমথর খবর কি? সে আমার চিঠির কোন জবাব দেয় না, আপনাদের মুখেও তার খবর পাই না।

আমি এক রকম বড় পীড়ায় শয্যাগত। হাঁটুর নীচে থেকে (ডান পা) পায়ের নখ পর্যন্ত ফুলে পড়েচে। এখানকার ডাক্তারেরা ঠিক বলতে পারে না কেন? তবে আজ কাল ঢের কমেচে, অথচ জ্বলা যন্ত্রণা নেই— খাই দাই লিখি পড়ি ঘুমাই— শুধু উঠতে হাঁট্‌তেই পারিনে। কি জানি এ সারবে কি আবার কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। তবে আজ দুদিন থেকে যে রকম কম্‌চে মনে হচ্ছে হয়ত আর আফিস যেতে বেশি দেরি হবে না। দেখি কি হয়?

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি মায়ের বিবাহ যেখানে গত বৎসরের আগে থেকে স্থির হয়ে ছিল

সেই ঘরেই ত! তা যদি হয় সাংসারিক যা কিছু দেখে বাপ-মা দেয় সমস্তই পরিপূর্ণভাবে আছে। এখন শুধু জগদীশ্বরের কৃপায়— মা আমার বুড়া বয়স পর্যন্ত সিঁদুর ও নোয়া নিয়ে পুত্র পৌত্র নিয়ে থাকুন এই আমার আশীর্বাদ।

পল্লী-সমাজের সম্বন্ধে কোন কথাই আমার বলবার নেই। নির্ভুলও হয়েচে বাহ্যব্যাপারও সকলেরই মনোমত হয়েচে। ইহাতে লাভ লোকসান আপনার অদৃষ্টে যাই ঘটুক— আমার ইচ্ছা লোকে (পাড়া গাঁয়ের কথায়) মানে যেন। এই বইখানিতে একটা মূল কথাই (বিবাহের কথাটাই) বলা হয় নি। ইচ্ছা করি এই কথাটি আর একখানা বইএ বলি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখানে পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে লোকে নিন্দা অখ্যাতি করে নাই— সেই আমার লাভ— কলিকাতায় লোকে এ বইখানিকে কিভাবে নিলে সেটা আমি জানি না। বিরুদ্ধ মত কেউ বলে কি? অবশ্য ত্রুটির কথা আমি বলিনি— সে ঢের আছে— শুধু মোটামুটির কথা।

একটা প্রার্থনা আছে। একখণ্ড 'মনু' একটু ভাল এডিশান (অর্থাৎ নোট-টোট্ আছে) যদি পাঠিয়ে দেন আমার এই 'সমাজের মূল্য'[২] লিখতে একটু সুবিধে হয়। বইখানা আমার নেই। অবশ্য আরও কত কি রেফারেন্স চাই, কিন্তু এ পোড়া দেশে ত মেলবার যো নেই। মনে যা আছে তার উপরেই বারো আনা নির্ভর। আবার স্মরণ শক্তিও আমার ভারি কম।

এখান থেকে যা হবার হবে— কলিকাতায় গিয়ে এর দ্বিতীয় পার্ট লিখব।

আর না। আমার কোটী কোটী আশীর্বাদ জানিবেন-- এইবার সত্যই বুড়া হইলাম ভাই— চল্লিশের উদিকে যে পা দিলাম তা বেশ টের পাচ্ছি। এখন আমরা বুড়ার দল যেন আমার মত মনের সঙ্গে আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করতে পারি— আমি নিজের ও পরের সম্বন্ধে ভগবানের কাছে এই ভিক্ষা করি।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন

করকমলেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। "মেজদিদি"[১] চমৎকার ছাপা হইয়াছে। চমৎকার কাগজ এবং ছাপা। সে ত হইয়াছে কিন্তু এই অভাগীর ছাপা এবং কাগজ বাঁধাই আশ্চর্য শস্তা। এখানকার অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারে না আপনার লাভ কি থাকিতে পারে। বই যাই হোক্, শুধু শস্তার জন্যও যে ইহা বেশি বিক্রী হইবে তাহা বুঝা যায়। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন— ইহাতে দুপক্ষেরই উপকার, ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও।...

আপনার কাজ আপনার দোকান প্রমথ বোধ করি নিজের বলিয়াই মনে করে। আমিও তাই করিতেছি। আপনার অনেক সুনাম বদনাম দুই শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনার বিশেষ শত্রুও কোনদিন বলে নাই, হরিদাসবাবু টাকা কড়ি ব্যবসা সম্বন্ধে 'জোচ্চোর'। সেটা সবাই স্বীকার করে লোকটা অতিশয় ধূর্ত বটে, পাকা ব্যবসাদার বটে, কিন্তু পরের জিনিস পরের পয়সা ঠকাইয়া কোন দিন লয় না। অথচ এই দোষ দেওয়াটা যে কত সহজ সে আমি জানি।

এ দোষ যখন আপনার কেহই কোন দিন দেয় নাই, শত্রুরাও যখন আপনাকে টাকা কড়ি সম্বন্ধে বিশ্বাস করে এবং বলে হরিদাস কাহারও যথার্থ প্রাপ্য আত্মসাৎ করে না, তখন আমি বন্ধু হইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করিবই।

যাই হোক্ আমার সমস্ত ভারই আপনার। যা ইচ্ছা তাই করিবেন। আপনার মত না লইয়া ত কোন দিনই আমি আর কোন কাজ করিব না। আমার বই আপনার নিজের বলিয়া যেমন করিয়া এবং যা করিয়া হোক্ প্রকাশ করিবেন। যদি তাহাতে কখন মন্দও হয়— মনে করিব হরিদাসবাবু পাকা ব্যবসাদার হইয়াও একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ক্যালকুলেশান ঠিক রাখিতে পারে নাই। এই পর্যন্ত। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি— আপনি খাঁটি লোক। পুরুষ মানুষের পক্ষে এর চেয়ে সুনাম আর আছে কি না জানি না। আমিও আশীর্বাদ করি— আপনার আর যা কিছু সুনাম দুর্নাম হৌক এ কথাটা যেন চিরদিন সবাই স্বীকার করে লোকটা খাঁটি লোক ছিল। যাই হৌক, আমার লেখা বইয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর আলোচনা হইবার আবশ্যক পর্যন্ত নাই।

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। এখানে আমার একটি বন্ধু এই লড়াই সম্বন্ধে একখানা প্রসিদ্ধ বইএর ভাব লইয়া একখানা নভেল লিখিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, ইহাতে দূষ্যত কিছু নাহিই। বরঞ্চ আমাদের মহামহিম ব্রিটিশরাজ সম্বন্ধে একজন যথার্থ রাজভক্ত লোক যেমন করিয়া লিখিতে পারে তাহাই করিয়া লিখিয়াছে। দোষ গুণ সমস্ত রাজ শাসনেরই আছে, কিন্তু বাস্তবিক আমাদের রাজা যে পরের বিপদ নিজের মাথায় লইয়া এই যুদ্ধে এতটা স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন, শুধু পরকে বাঁচাইবার জন্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে অন্যায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে হাত দিয়াছেন, এ সম্বন্ধে বোধ করি কোন মানুষেরই কোন সন্দেহ নাই। - সে সেই কথাই বেলজিয়মের লড়াই লইয়া লিখিয়াছে। বইখানি ভালই হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের লোক যাহারা এই সব কাহিনী ভালবাসে, তাহাদের বোধ করি বিশেষ রকম ভাল লাগিবারই কথা। অথচ নভেলে যাহা থাকা উচিত এবং যা লইয়া নভেল হয়, তাহাও আছে। এই আট আনা সিরিজের করিয়া কি ছাপান যায় না? ইচ্ছা হয় আপনাকে পাঠাইয়া দিই, পড়িয়া যদি সঙ্গত এবং নির্দোষ মনে করেন, তাহা হইলে প্রকাশ করিলে তাহার বড় উপকার করাই হয় কি বলেন? পাঠাব? এ রকমের বই চলবে কি? কথার জবাবটা ব্যবসার দিক দিয়াই দিবেন। আমি অনুরোধ আপনাকে করিতেছি না, এবং ব্যবসা সম্বন্ধে আপনি যে কাহারও অনুরোধ রাখিতে বাধ্য নহেন তাহাও জানি। এবং ইহাও জানি আমার কাছে যাহাতে দোষ নাই, হয়ত তাহাতে সত্যকার দোষ আছে। বিশেষতঃ এ সকল ধরণের বই বিশেষ চিন্তা করিয়াই প্রকাশ করা উচিত।

একটা নিরপেক্ষ উত্তর দিবেন। কারণ দোষ থাকিলে সকল পক্ষেরই ইহাতে অমঙ্গল। যা ভাল বোঝেন বলিবেন। অপরাপর সম্বাদ পরে জানাইব।

আপনাদের— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাঁ, আমার ছবিটা বোধ করি না ছাপালেই হ'ত। কি রকম যেন লজ্জা করে। যে চেহারা !

১০

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন

করকমলেষু,

অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল, না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্মা দেশের ব্যারাম— দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবানই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চির জীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া, আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং ডিস্‌পেপসিয়াও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ খাও দাও, স্নান কর, লেখাপড়া কর, কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড! অথচ গোদ নয়— কি যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারেন না— কতদিনে সারিবে কিম্বা কোন দিন সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না। দুদিন বা কিছু কমে দুদিন বা ঠিক তেমনি হইয়া দাঁড়ায়। গতবারে যখন লিখি, তখন এইরূপ কমিবার মুখে আসিতেছিল বলিয়া খুব একটা আশা হইয়াছিল, কিন্তু তার পরেই আবার যখন ধীরে ধীরে তেমনি হইয়া উঠিতে লাগিল তখন আশা ভরসা সব গেল। এই মানসিক চঞ্চলতা বশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। এই কথাটি জলধরদাকে জানাইয়া এই 'সমাজ ধর্মের মূল্য' পড়িতে দিবেন। ইহার ফেয়ার কপি করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম— বাকি লেখাটা ফেয়ার করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তারপর যাহা লিখিব মনে করিয়াছি, তাহা শুদ্ধ মাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়ম কানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটা তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরৎ পাঠাইবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক ভায়া এই সোসিওলজি লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি— অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্র লোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।

আপনি যদি এইটুকুর শেষ দিকটা পড়িয়া দেখিতে পারেন আর সাজেষ্ট করিয়া দিতে পারেন যে কি করিয়া কোন অংশ পরিবর্তন করিলে কাহারও গায়ে লাগিবে না, অথচ, সব কথাগুলি বলাও যাইতে পারিবে, আমি সেইরূপ করিবার একটা চেষ্টা করিব। তবে আরও যেটুকু লেখা আছে, সেটুকু পাঠাইবার পূর্বেই মতামত দিবেন। জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহা দুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া

মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়— হয়ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল ! ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম— মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়া ছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন— তাই ভাল।

মনের অস্থিরতায় অনেক বাজে কথা লিখিয়া ফেলিলাম ! মাপ করিয়া চিঠিখানি পড়িবেন এই ভরসা।

আর একবার প্রমথ ভায়ার খবরটা মনে করিয়া আমাকে জানাইবেন।

আপনাকে আন্তরিক শত সহস্র আশীর্বাদ করিলাম।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলধরদাকে বলিবেন— যাহা আরম্ভ করিয়াছি অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত' শেষ না হওয়া পর্যন্ত হঠাৎ বন্ধ কিছুতেই হইবে না।

১১

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন্। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত— এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন— তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি, বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটো বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন,[১] সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে হয়ত বা টাকা কড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে— অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।

আর যদি মরি— আপনাকে রাইট অফ্ করিতেই হইবে। আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।

আমার এখানে কত টাকা চাই, সহস্রবার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্কোচ হইতেছে—

অথচ আপনি ছাড়া আমার আপনার কেহও নাই। আপনি আমাকে ৩০০্ 'তিনশ' টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি। যা কিছু নিজের সঞ্চিত ছিল— এই দুই মাসের অসুখে সব ত গিয়াছেই বরং কিছু ওদিকেও হেলিয়াছে। আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করিতে চাইনা বলিয়াই এরূপ লিখিলাম। তবে উচিত অনুচিত বলিয়া একটা কথা আছে। নিজের দরকার এবং গরজে আপনার দয়ার উপরেই জুলুম করিতেছি বলিয়াও মনে হইতেছে। সেইজন্য যদি মনে করেন এত দেওয়া উচিত নয়, যা ভাল বিবেচনা করিবেন পাঠাইবেন। আমি তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত লইব। টি, এম, ও. করিয়া দিবেন। না হইলে অনেক দেরি হইবে।

জলধরদা একটা গল্প অতি অবশ্য চাহিয়াছিলেন। লিখিয়াছিও কিন্তু এত কাটাকুটি হইয়াছে যে হয়ত ছাপা শক্ত। এমনিই পাঠাইতাম যদি আগে মেল থাকিত, কিন্তু এখন এই সঙ্গে পাঠানর কোন মূল্য নাই, তাই যায়গায় যায়গায় (যে গুলা অত্যন্ত কাটাকুটি) শুধরাইয়া পরের মেলেই অপর সব লেখার সঙ্গেই পাঠাইব।

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া— আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি— এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজি তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আফিস হইতে কি পাইব জানি না— এখানকার নিয়মকানুন সবই বড় সাহেবের মর্জি। যাই পাই— আপনি যা আমাকে দিবেন সেই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন

শ্রীমান্ হরিদাস ভায়া—

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

আমার শত কোটী আশীর্বাদ জানিবেন। কাল আপনার দেওয়া তিনশ' টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না। দেখি কি হয়।

কবিরাজি তেল মালিশ করিয়া একটু কমিয়াছে কমিবার মুখে দাঁড়াইতেছে বলিয়াই আশা হইতেছে। ভগবান কি করিবেন তাঁরই মালুম।

শ্রীকান্ত এবং একটা যা-তাই গল্প রেজেষ্ট্রি করিয়া আজই পাঠাইব। অত্যন্ত ভীড় বলিয়া অনেক সময় আগের দিন রেজেষ্ট্রি না করিলে নাকি সময়ে যাইতে পায় না— এই খবর কাল রাত্রে পাইলাম। যদি এই চিঠির পরেই না যায়, পরের মেল পর্যন্ত যেন নিশ্চয় অপেক্ষা করা

হয়। গল্পটায় কাটাকুটি বড় বেশি, একটু এডিট্ করার আবশ্যক। জলধরদা আশা করি ঠিক করিয়া লইবেন।

আপনার দয়ায় আরোগ্য হইয়া যাইব আশা করিতেছি। আর বোধ করি ভয় নাই— কারণ ওদেশে কবিরাজ আছে— এখানে নাই। এ সব রোগ ডাক্তারের চিকিৎসায় সারে না।

সুধীরকে[১] একটা মেজদিদি আর পল্লী-সমাজ দেবেন। এইজন্য সে আমাকে আপনাকে অনুরোধ করিতে লিখিয়াছে।

নিত্যাশীর্বাদক—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

১৪ লোয়ার পোজনডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
৭-১-১৪

প্রিয় মণিবাবু,

অনেক দিন হইয়া গেল আপনার চিঠির জবাব দিই নাই। এই ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া আছি, ইহার উপর আপনি আর যেন কিছু মনে করিবেন না।

আপনার লেখার সমালোচনা শুনিয়া আপনি যে দুঃখিত হন নাই, একথা আপনার নিজের মুখে শুনিয়া বড় স্বস্তি পাইলাম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, আমার নিজের ত এই বিদ্যা, অপরের দোষ দেখাই, হয়ত বা তিনি কি ভাবিয়াছেন। যাক— বড় সুখী হইয়াছি।

আমি তার পরেও আপনার বইটা আর একবার আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম, সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে— এবার আরও যেন একটু বেশি করিয়া বুঝিয়াছি, কেন এ লেখা সকলের আমার মত ভাল লাগে না। যথার্থই আপনার লেখার টোন্‌টা কবির মত। অ্যাবষ্ট্রাক্ট ভাবের কবিতা যে-সব লোকের ভাল লাগে না, তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

যে-সব কবিতায় বা ছোট গল্পে অনেক ফ্যাক্ট আছে, ঘটনা আছে, ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে, তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না বোঝা সহজ। এইখানে আরো একটা কথা বলি। অনেক দিন পূর্বে বসুমতী কাগজে আপনার 'বিন্দু'র সমালোচনা (?) করিয়া বলে, 'হিন্দুর বিধবার রাত্রে আর এক বাড়িতে যাওয়া কি রুচি, ইত্যাদি ইত্যাদি'। (আমার এক বন্ধু এই সমালোচনার কথাটা আমাকে জানান— আমি নিজে ঠিক কথাগুলা দেখি নাই। সেইটা শুনিয়া একবার আমার মনে হয় এই লোকটার স্পর্দ্ধার মত আমিও একটা কঠিন প্রতিবাদ করিয়া কোন কাগজে ছাপাইয়া দিই[২]— আমার মনে হইয়াছিল বলিব এবং খুব কড়া করিয়াই বলিব, 'লেখকের রুচি খুব ভাল, শুধু তুমি গোঁড়া এবং নির্বোধ তাই ইহাতে দোষ দেখিয়াছ'। বিন্দুর অপরাধটা যে কি আমি তাহা ত কোন মতেই ভাবিয়া পাইলাম না। সে বেচারা আর একটা নিতান্ত নিরুপায় হতভাগা সঙ্গীকে রাত্রিতে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিল, যদি আবশ্যক হয় এক ফোঁটা মুখে জল দিবে কিম্বা এম্‌নি একটা কিছু করিবে— এই ত। এইতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল। হয়ত বা মনে মনে একটু স্নেহও করিত— খেলার সঙ্গী— ইহা কি দোষের না রুচি বিগর্হিত? কারণ, সে বিধবা— অর্থাৎ হিন্দুর বিধবার সুমুখে কেউ যদি মরে, আর সে যদি একটা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলেও সে বাঁচে, হিন্দু বিধবা তাও যেন না করে— যেহেতু সে বিধবা এবং যে লোকটা মরিতেছে সে পরপুরুষ! এই ইহাদের হিন্দু বিধবার আদর্শ!

মনে হয়, লোকগুলা এতটাই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পরের দোষ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে এবং দেখায় এবং লোকে সেই সমালোচনা পড়িয়া বলে, 'ঠিক ত! ঠিক কথাই বলিয়াছে।'

আমি ঠিক বলিতে পারি না সমালোচনা কিরূপ ছিল, যেমন আমার বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি সেইমত বলিলাম। আপনি নিজে হয়ত এই সমালোচনা দেখিয়াছেন।

আবার কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেখানে সেখানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না।

আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে— আপনার আর রক্ষা থাকিবে না— মার্ মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে। আর এই লোকগুলা নিতান্ত বেহায়া গালিগালাজ করিতে বিশেয পটু, সেইটাই ইহাদের জোর— অর্থাৎ এরা চীৎকার করিয়া এবং গায়ের জোরে জিতিবার চেষ্টা করে এবং জিতিয়াও যায়।

দিন দিন আমাদের সাহিত্য যেন একেবারে একছাঁচে ঢালা গোছ হইয়া উঠিতেছে— প্রতি দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। (তাই এক একবার আমার মনে হয় উচ্ছৃঙ্খল লেখা লিখিতে সুরু করিয়া দিব— কেবল রাগের উপরেই যা-তা লিখিয়া ফেলিব !) আমি কিছু দিন পূর্বে আমার দিদির নামে 'নারীর মূল্য' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান, আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি। এজন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানান যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন— ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র। কত লোকে কত সমালোচনা (ভয়ানক প্রতিবাদ) করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ আজ পর্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্যন্ত খাই না। (কিছু মনে করিবেন না মণিবাবু, আপনার কাছে এ-সব বলা অন্যায়।) আমি যা' তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এ-সব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং আমি ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া দিলেন তাহা আর কত লিখিব। আর পরেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম, না হইলে ইচ্ছা ছিল, ঐ রকম করিয়া 'ঠাকুর দেবতার মূল্য' এবং 'হিন্দু শাস্ত্রের মূল্য' বলিয়া প্রবন্ধ সুরু করিব। যাক্ নিজের কথাতেই চিঠি পূর্ণ করিয়া দিলাম— কেমন আছেন? শরীর সারিল কি? নূতন কিছু লিখিলেন? হাঁ ভাল কথা, যা লিখিবেন শেষটায় অস্থির (ইম্‌পেশেণ্ট্) হইয়া শেষ করিবেন না— এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়।

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা অনুরোধ, যাহাই এই চিঠিতে লিখিয়া থাকি না কেন দোষ লইবেন না— যদি বা কিছু অন্যায় বলিয়াও থাকি তাহা হইলেও।

পুঃ— আপনার ভাষার দু-একটা তুচ্ছ খুঁত লইয়া প্রায়ই লোকজনকে হৈ চৈ করিতে দেখি। অবশ্য, আমি নিজে আপনার (ওই খুঁতগুলার) মত লিখি না, কিন্তু দোষও দেখি না। আপনি জানিয়া শুনিয়াই ঐ ভাষা এবং বানান লিখিতেছেন— বেশ করিয়াছেন। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন, শুধু পরের কথায় ছাড়িবেন না। আর যদি নিজে দেখেন ওগুলা বদলানো আবশ্যক, তখন বদলাইবেন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়[1]কে লেখা

১৪, লোয়ার পোজনডং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
২০-৩-১৪

প্রিয় হেমেন্দ্রবাবু,

মাঝে অনেকদিন রেঙ্গুনে ছিলাম না, দিন কয়েক পূর্বে ফিরে এসে আপনার চিঠি পাই। গত মেলেই সে চিঠির জবাব দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু দেহটা সে সময় এতই মন্দ ছিল যে, পাছে অসঙ্গত কিছু লিখে বসি, এই আশঙ্কায় জবাব দিই নাই। কিছু মনে করিবেন না। শরীরের জন্য আমার সব সময়ে সহজ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে, ভরসা এই যে আমি বুড়ো মানুষ,[2] আপনাদের কাছে সব সময়েই ক্ষমার্হ।

চরিত্রহীন, বোধ করি আগামী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হবে। সে ঠিক কথা,— শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ পাঠক কিভাবে ও বস্তুটাকে গ্রহণ করবেন, আন্দাজ করা যায় না। আমার লেখার ওপর আপনার অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি। অনেকেই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু, লেখা আমার নিতান্তই মামুলি ধরণের। বিশেষত্ব আর কি আছে? তবে, এটা ঠিক করে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার সঙ্গে ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। এ কি মনে করবে, ও কি বল্‌বে, সেদিকে প্রায়ই তাকাই নে। বোধ করি, এই জন্যেই লোকের মাঝে মাঝে ভালও লাগে— কখন বা লাগেও না, তবুও বড় একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে লেখককে অপমান করতে চায় না। আপনার লেখার বিশেষত্ব আছে। আমার খুব ভাল লাগে। অনেক দিন পূর্বে ফণিকে ব'লে পাঠাই যেন সে আপনার অনুগ্রহটা বেশি ক'রে আদায় করবার বিশেষ চেষ্টা করে। আমার বাঙ্‌লা ভাষার ওপর মোটেই দখল নেই বল্‌লে চলে— শব্দ সঞ্চয় খুব কম। কাযেই আমার লেখা সরল হয়— আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব। আমার মূর্খতাই আমার কাজে লেগেচে। আচ্ছা, ভারতবর্ষে 'হরিদ্বার' প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্তে 'হেমেন্দ্রনাথ রায়' স্বাক্ষর করা ছিল, সে কি আপনিই? এ কথাটার জবাব দেবেন।

মাঝে মাঝে সময় পেলে সম্বাদ দেবেন। আপনার চিঠিটা যে কোথায় রেখেছি, খুঁজে পেলাম না, তাই ফণির ঠিকানায় পাঠালাম। হয়ত সব কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। শরীরটাও বড়

দুর্ব্বল ঠেক্‌চে। আজ এই পর্যন্ত— পর-পত্রে অপরাপর কথা জানাব। আমার অনেক কথাই বল্‌বার আছে।

ফণিকে এবং 'যমুনা'কে একটু দেখবেন। আপনি যদি সত্যই দেখেন, আমার তাহ'লে অর্দ্ধেক ভাবনা কমে যায়। এটা আমার আন্তরিক কথা— মন যোগানো কথা নয়। মন যোগানো কথা বড় একটা বলিও নে।

আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুধীরচন্দ্র সরকার[১]কে লেখা

১

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর,

কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে।[২] যদি দু-এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশি হইবে। আর একটা কথা, রিরাইট্ করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক কপি আমি পাই নি। যদি রেজিষ্ট্রি করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আঃ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

৫৪, ৩৬নং ষ্ট্রীট
রেঙ্গুন
১৫, ২, ১৬

পরম কল্যাণবরেষু

সুধীর, আমার বড় অসুখ। ডান পা'টা হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ফুলে উঠেছে। কি ব্যায়রাম জানা যায় না! কি হবে তাও ডাক্তার বলতে পারে না। হয়ত অতি সত্বর কলিকাতাতেই চিকিৎসার জন্য যাইতে হইবে। শুধু উঠতে হাঁটতে পারি না। এ ছাড়া আর কোন রোগের যন্ত্রণাও নেই। কিন্তু ভয়ে মন আমার কণ্টকিত হয়ে উঠছে। কেবলই ভাবি যদি না সারে। এমনি পঙ্গু হয়েই চিরদিন যদি কাটাতে হয়, এই বেলা চরিত্রহীনের ম্যানাস্‌ক্রিপ্টটা লিখিয়ে নিতেই হবে। ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে। তবে আজকাল নিজেই বেশ লিখচি—কারণ আর সব কাজই বেশ করতে পারি।

পরের মেলে ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট পাঠাব। চন্দ্রনাথ কি ছাপা হয়ে গেছে? ৮০০ কপি বেশি ছাপানো মন্দ কি? বেশ তাই কোরো।

আঃ
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

পরম কল্যাণবরেষু শ্রীমান সুধীরচন্দ্র সরকার

নিরাপদ দীর্ঘজীবনেষু—

কাল তোমার টেলিগ্রাম এবং তাহার আগের দিন পত্র পাইয়াছি।... শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না— করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল— অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে— সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতে ছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে একখানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে।... আজ দেড় মাসের উপর হইতে আফিস প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। কোন মতে টিকিয়া আছি মাত্র।...

পল্লী-সমাজ এই জন্যই ভাল হইতে পারিল না। এই জন্যই এত লোক নিন্দা করিল। শরীর সুস্থ, মন সুস্থ থাকিলে শেষটা এরূপ হইতে পারিত না। চরিত্রহীন এরূপ হইয়া যাইলে বড় লাগিবে।

আমার শতকোটী আশীর্বাদ জানিবে।

বেশত আসিতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাইবে কি? তাছাড়া এত ভীড় জাহাজে হয় যে লোক মরিয়া মরিয়া আসে।

আর এক কথা। কলিকাতার স্বাস্থ্য এখন কেমন? এখানে অত্যন্ত বসন্তের প্রকোপ, ওখানেও কি তাই? গত বৎসরের মত কি? এই খবরটা আমাকে অতি অবশ্য দিবে।

আঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট, রেঙ্গুন

১, ২, ১৬

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকা সত্ত্বেও মহাশয়ের আশীর্বাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজেকে বারম্বার ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আপনি নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও

ত প্রায় তাহাই। আমারও বয়স (৩৯) ঊনচল্লিশ হইয়াছে। তথাপি যদি বয়সে কিছু ছোট হই ত আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

পত্রে আপনি নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই আপনার জন্মভূমির প্রতি মমতা ত যায়ই নাই, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিম্বা এ কথাও হয়ত ঠিক নয়, কারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই যে জন্মভূমি পল্লী-জননীর প্রতি স্নেহ জন্মে তাহাও নয়।

আমি কলিকাতা-প্রবাসী অনেক বড়লোকের জন্মস্থানগুলি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি— কিন্তু তাহাদের দুর্দশার সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহার শতাংশের একাংশও যদি সেদিকে দান করেন, বোধ করি দুঃখী গ্রামগুলির সৌভাগ্যের আর অন্ত থাকে না।

আমার নিজের ত সময় এবং সাধ্য দুইই এত সামান্য যে তাহা সম্পূর্ণরূপে গণনায় বাহিরে ফেলিয়া দিলেও কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। তথাপি আমি শুধু এই চেষ্টাই করি যদি একটা লোকেরও তাহার পল্লীর উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই জন্যই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ক্লেশকর হইলেও পল্লী সম্বন্ধে সত্য কথাগুলিই বলিবার চেষ্টা করি। শহরের লোকেরা কল্পনা করিয়া পল্লীগ্রামের যে সকল সুখ্যাতি প্রচার করেন, অনেক সময়েই যে তাহা যথার্থ নয়, বরঞ্চ পল্লীগ্রাম ক্রমশ অধঃপথেই যাইতেছে, এই সত্য কথাটা এই পল্লী-সমাজ বইটাতে বলিবার চেষ্টা করিয়া ছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করায় এবং সফলতায় যাহা প্রভেদ, আমার লেখাতেও বোধ করি ততটুকুই মাত্র হইয়াছে।

আপনি এটাকে নাটক আকারে প্রকাশ[১] করিবার উপদেশ দিয়াছেন। হয়ত করিলে ভালই হয়, কিন্তু আমার নিজের ত সে ক্ষমতা নাই। অন্ততঃ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া ত কখনো দেখি নাই। যদি আর কেহ কষ্ট করিয়া করেন (যাঁহার ক্ষমতা আছে) বোধ করি ভাল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ত শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। এবং কোন থিয়েটারই তাহাদের সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া তাহাকে স্টেজ করিতে চাহিবে না। তবে আপনার উপদেশটিও মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি কিছু করিতে পারি চেষ্টা করিব। পূর্বে গ্রাম সম্পর্কীয় আমার 'পণ্ডিত-মশাই' বইটাকেও কেহ কেহ নাটক করিবার কথা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু হয় নাই। সেটাও বোধ করি আরও ভাল হইলেও হইতে পারিত।

যাই হোক্, আপনার এই উপদেশটিকে আমি বিস্মৃত হইব না এবং সেজন্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

নিঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুবোধ রায়[১]কে লেখা

৫৪, ৩৬নং ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন
১০-৩-১৬

পরম কল্যাণবরেষু,

আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্বাদ করিতেছি, আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০|১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না— তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ও-পারে গিয়া এ-সব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লী-সমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি— স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই— তবুও যে কতক কতক মিলিযাছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে-কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া, — বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া— তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।— যদি আপনার ধৈর্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে-সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি !

তারপর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ-কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়া মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুরলীধর বসু[১]কে লেখা

৫৪, ৩৬নং স্ট্রীট
রেঙ্গুন
৭,৪,১৬

পরমকল্যাণবরেষু,

বহু দিন পরে আপনার পত্রের জবাব দিতে বসিয়াছি। বিলম্ব এত বেশি হইয়াছে যে আপনি নিশ্চয়ই এ আশা অনেক দিন পূর্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত কুঁড়ে মানুষ। আমার পক্ষে এ রকম অপরাধ প্রায় স্বাভাবিক। তবে, এ ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ এই আছে যে বড় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহা এতই বেশি যে এখানে থাকা আর চলিল না— বায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এ পত্র যখন আপনার হাতে পড়িবে তখন আমি আর এ ঠিকানায় থাকিব না। যদি দয়া করিয়া কখনো এ পত্রের জবাব দেন, তবে যেমন করিয়া আমার বর্তমান ঠিকানা অবগত হইয়াছিলেন, তেম্‌নি করিয়াই জানিতে পারিবেন। যদিচ, বুঝিতেছি সে আবশ্যক আর হয় ত আপনার হইবে না।

কিন্তু সে কথা যাক্‌। আমার লেখা পড়িয়া আপনার ভাল লাগিয়াছে। এই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। আপনি যে এই কথা জানাইয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন, সেজন্য আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি— আশীর্বাদ করিতেছি আপনিও এম্‌নি সুখী হোন।

ভগবানের কাছে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্র-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা

১ শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে থাকতেন, বিভূতিবাবুরাও তখন কিছুদিন ভাগলপুরে ছিলেন। বিভূতিবাবুর পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট তখন ভাগলপুরে সাব-জজ ছিলেন। বিভূতিবাবুর বৈমাত্রেয় দাদা ইন্দুভূষণ ভট্ট ছিলেন ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী। শরৎচন্দ্র ভট্টদের বাড়িতে দাবা খেলতে যেতেন, পরে এঁদের বাড়িতে বসে লেখাপড়াও করতেন। সেই সূত্রে ভট্ট পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ও বিভূতিবাবুর সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছিল। তা ছাড়া শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে যে 'সাহিত্য-সভা' করেছিলেন, বিভূতিবাবুও সেই 'সাহিত্য-সভার' অন্যতম সদস্য ছিলেন।

২ পুঁটু বিভূতিবাবুর ডাকনাম।

৩ শরৎচন্দ্র ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অফিসে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন এবং প্রায় ৪ মাস কলকাতায় থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে ফিরে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, প্রধানত তাঁর হাইড্রোসিল অপারেশন করাতে।

৪ বিভূতিবাবু ওই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তাঁদের বাড়িতে থাকতেন। তিনি বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন।

৫ বিভূতিবাবুর জ্যাঠতুতো ভাই সিতিকণ্ঠ ভট্টের পুত্র।

৬ *শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড)*-এ 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

৭ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা দুই ভাই। এঁরা ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বাল্যবন্ধু।

৮ বিভূতিবাবুর ভগ্নী নিরুপমা দেবীর ডাকনাম।

৯ এই খাতাখানি সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী পরে নিজেই লিখেছিলেন :

> আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া দিত।... সেই ক্রমবর্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে— যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাঁহার তরুণ জীবনের সাহিত্য-রুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল।—*ভারতবর্ষ*, চৈত্র ১৩৪৪

নিরুপমা দেবীর এই লেখায় 'ছোটদা' হলেন বিভূতিভূষণ ভট্ট, আর 'তাঁহার সম্মানিত বন্ধু' হলেন শরৎচন্দ্র।

১০ বিভূতিভূষণ ভট্টের ভগ্নী ক্ষণপ্রভা দেবী।
১১ ইন্দুভূষণ ভট্টের পুত্রের ডাকনাম।
১২ বিভূতিবাবুর স্ত্রী।
১৩ শরৎচন্দ্রের এই দাম্পত্য প্রেমচর্চার কথা *শরৎচন্দ্র* (*১ম খণ্ড*)-এ 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।
১৪ শরৎচন্দ্রের মদ খাওয়ার কথা *শরৎচন্দ্র* (*১ম খণ্ড*)-এ 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।
১৫ বিভূতিবাবুর পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট মহাশয়ের তিন বিবাহ। বিভূতিবাবু, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি ছিলেন নফরবাবুর তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। শরৎচন্দ্র 'নতুন মা' বলতে বিভূতিবাবুর মা-কে বুঝিয়েছেন।
১৬ বিভূতিবাবু আর এক ভগ্নী।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা

পত্র ১

১ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায়। প্রমথবাবু ছেলেবেলায় মজঃফরপুরে তাঁর কাকার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন। এই মজঃফরপুরেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রমথবাবু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) যে সময় বি. এ. পড়তেন, সেই সময় কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও ওই কলেজে এফ. এ. পড়তেন। কলেজে নাটক অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রমথবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর পরিচয় হয় এবং ক্রমে এঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

প্রমথবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর প্রথম পরিচয়ের কয়েক বছর পরের ঘটনা— ওই সময় কলকাতায় 'ইভনিং ক্লাব' নামে একটা নামকরা ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর সম্পাদক ছিলেন এই প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। হরিদাসবাবুও ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

প্রমথবাবু একদিন ক্লাবের এক সভায় ক্লাবের মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা বার করার প্রস্তাব করেন। কাগজ চালানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা তা সম্ভবপর নয় বলে, সদস্যরা প্রমথবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। তখন হরিদাসবাবু বললেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যদি সম্পাদক হন, তাহলে তিনি খুব বড়ো করে এবং জাঁক করে একটি মাসিক পত্রিকা তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে বার করতে প্রস্তুত আছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পাদক হতে রাজি হ'লে হরিদাসবাবুদের প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে একটি কাগজ বার করা স্থির হয়। সেই কাগজই হল *ভারতবর্ষ*।

শরৎচন্দ্র ওই সময় রেঙ্গুনে থাকতেন। *ভারতবর্ষ* বার করা স্থির হলে প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে *ভারতবর্ষ*-র জন্য লেখা আদায় করবেন বলে হরিদাসবাবুকে আশ্বাস দেন। তাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই এই *ভারতবর্ষ* সংক্রান্ত।

ভারতবর্ষ পত্রিকা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন (১৩২০ সালের আষাঢ়) মাসে প্রথম প্রকাশিত হলেও, প্রায় দেড় বছর আগে থেকে এই কাগজ প্রকাশের কথা ওঠে। প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রকে

তাঁর ছেলেবেলার সাহিত্যচর্চার কথা উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র এখানে সেই প্রসঙ্গ নিয়েই 'গত কথা' বলেছেন।

৩ শরৎচন্দ্রের এই বাসস্থানের কথা উল্লেখ করে তাঁর রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস তাঁর *শরৎ-প্রতিভা* গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন :

> বোটাটং ল্যান্সডাউন স্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের বাড়ীতে শরৎদা বাস করিতেছিলেন, সেই লাইনে সবই কাঠের বাড়ী ছিল। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের অনতিদূরেই ঐরাবতী নদী। সহরের উপরে থাকা শরৎদা মোটেই পছন্দ করিতেন না।

৪ শরৎচন্দ্রের এই দোকানের কথা-প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র দাস তাঁর *শরৎ-প্রতিভা* গ্রন্থে লিখেছেন :

> একবার তিনি একটা চায়ের দোকান করিয়া অফিসে আসিয়া খবর দিলেন, আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি। দেখবে ত চল ' প্রথমতঃ বন্ধুদের মধ্যে কেই বিশ্বাস করিলেন না বটে, কিন্তু অফিস ছুটির পর তিনি জোর করিয়া দু-চার জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁর চায়ের দোকান দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাঁর বাড়ীর অনতিদূরেই একটা কাঠের বাড়ীতে বন্ধুরা সকলেই দেখিতে পাইলেন, নূতন একটা চায়ের দোকান খোলা হইয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে ত শরৎবাবুর চাকরি ছেড়ে দিতে হবে? চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দুদিনেই সাবাড় হয়ে যাবে।
> —না হে না, বসতে হবে না, জান আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? এক টিন দুধে কত চিনি মিশোতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। সকালবেলা দুধের টিন কিনে দেবো। সারাদিন কত টিন দুধ খরচ হবে সন্ধ্যাবেলা হিসেব করলেই পয়সা ধরা পড়বে।
> রেঙ্গুনে তখন গরুর দুধে চা হতো না। পয়সা খরচ করিয়াও খাঁটি দুধ পাওয়া যেত না।

রেঙ্গুনে চায়ের দোকান একটা লাভজনক ব্যাবসা। এই ব্যাবসার কথায় সতীশবাবু বলেছেন :.

> এখানে এক একটা চায়ের দোকান দু-তিন হাজার টাকা দামেও বিক্রী হয়। এ দ্বারা স্পষ্ট অনুমান করিতে পারেন, এদেশে চা-এর প্রচলন কিরূপ। সকাল পাঁচটা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত এক একটা দোকানে বিক্রী দু-তিন শ টাকার ঊর্ধ্বে ছাড়া নীচে নয়।

৫ রেঙ্গুনে চাকরি করার সময় শরৎচন্দ্র প্রধানত রেঙ্গুনের বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরি থেকেই বই নিয়ে পড়তেন। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর *ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে লিখেছেন ... 'দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের 'বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরি' হইতে অনেক ইংরেজি সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন।'

৬ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন।

৭ রেঙ্গুনে সাধারণত কাঠের বাড়ি। শরৎচন্দ্র যে বাড়িতে থাকতেন, তার কাছেই একটা বাড়িতে একবার আগুন লেগে যাওয়ায় শরৎচন্দ্রের বাড়িটিও পুড়ে গিয়েছিল। এই গৃহদাহের ফলে শরৎচন্দ্রের বহু জিনিস নষ্ট হয়েছিল।

৮ শরৎচন্দ্র এক সময় বহু পরিশ্রম করে ৬০০/৭০০ বাঙালি কুলত্যাগিনীর জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সব কাহিনি নিয়েই তিনি লিখেছিলেন 'নারীর ইতিহাস'। *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি পুড়ে গেলেও শরৎচন্দ্র আবার *চরিত্রহীন* লিখেছিলেন, কিন্তু 'নারীর ইতিহাস' আর লেখেন নি।

৯ ইভিনিং ক্লাব।

১০ শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ভাগলপুরে অবস্থানকালে সমবয়সি কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুদের নিয়ে একটি সাহিত্য-সভা গঠন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে এই সাহিত্য-সভার সভাপতি ছিলেন। গুরুজনদের লুকিয়ে কোনো একটা নির্জন স্থানে গিয়ে এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন হত। সপ্তাহে একদিন করে সভা বসত। সভার সদস্য ও সদস্যাদের গল্প-কবিতা পড়া হত। শরৎচন্দ্র নিজেই এই সব গল্প-কবিতা বিচার করতেন এবং গুণাগুণ অনুসারে প্রতিটি গল্প কবিতায় নম্বর দিতেন। সাহিত্য-সভার একমাত্র সদস্যা ছিলেন নিরুপমা দেবী। ইনি সভার অন্যতম সদস্য বিভূতিভূষণ ভট্টের কনিষ্ঠা ভগ্নী। নিরুপমা দেবী তখন বালবিধবা। তিনি সভায় যোগ দিতেন না। তিনি অন্তঃপুরেই থাকতেন এবং তাঁর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টের হাত দিয়ে তাঁর লেখা পাঠিয়ে দিতেন।

১১ শরৎচন্দ্রের আঁকা প্রথম চিত্রটির নাম ছিল 'রাবণ-মন্দোদরী'। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে তাঁর 'মহাশ্বেতা' নামক ছবিখানিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই 'মহাশ্বেতা' ছবিটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার তার *ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র* গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁহার 'রাবণ-মন্দোদরী'খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। এখানা দেখা গেল, সেই সব অস্পষ্টতা দোষ রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোক সম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল, তাও নয়।'

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্র মে মাসে আসতে পারেননি, এসেছিলেন অক্টোবর মাসে। এবার এসে তিনি মাসখানেক ছিলেন।

পত্র ৩

১ শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার আগে যখন কলকাতায় ভবানীপুরে কিছুদিন ছিলেন, সেই সময় প্রমথবাবু কলকাতায় পাথুরেঘাটায় থাকতেন। শরৎচন্দ্র পাথুরেঘাটায় প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, গিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন।

প্রমথবাবু কলেজ ছেড়ে কিছুদিন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন। সেই সময়ও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এলে পাথুরেঘাটায় গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসতেন এবং নিজের ছেলেবেলার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

২ *সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শরৎচন্দ্র প্রথম রেঙ্গুন যাওয়ার সময় তাঁর ছেলেবেলার লেখাগুলো তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে যান। সমাজপতি তাঁর *সাহিত্য* পত্রিকায় ছাপাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কিছু লেখা শরৎচন্দ্রের অন্য মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চান। উপেনবাবু তখন শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই সাহিত্যে ছাপাবার জন্য সুরেনবাবুর কাছ থেকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলাকার লেখা 'কাশীনাথ' গল্পটি দেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্য-রচনা সংশোধন না করে ছাপাতে চাইতেন না। তাই উপেনবাবু শরৎচন্দ্রকে না বলে 'কাশীনাথ' ছাপতে দিলে, তিনি উপেনবাবু ও সমাজপতি উভয়ের উপরেই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্রের দিদির নাম অনিলা দেবী। শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

৪ ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত *যমুনা* মাসিক পত্রিকা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক মাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র একবার দেশে এসেছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্রনাথ পালের পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় হলে ফণিবাবু তাঁর কাগজকে নিজের কাগজ ভেবে নিয়মিত লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ফণিবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র *যমুনা*-য় লিখতে রাজি হন। আর শুধু তাই নয়, তিনি স্বনামে ছাড়া ছদ্মনামে তাঁব দিদির নাম দিয়ে লেখারও কথা দেন।

৫ ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা *যমুনা*-য় শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৬ শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা *যমুনা*-য় অনিলা দেবীর নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭ শরৎচন্দ্র এই সময় *চরিত্রহীন* উপন্যাসটি লিখছিলেন *ভারতবর্ষ* পত্রিকা বার করবার আয়োজন হলে প্রমথবাবু *ভারতবর্ষ*-এ ধারাবাহিকভাবে বার করবার জন্য শরৎচন্দ্রের *চরিত্রহীন* চান।

৮ *ভারতবর্ষ*-য়।

৯ শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *যমুনা*-য় *'নারীর লেখা'* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

১০ শরৎচন্দ্র এই *দ্বাদশ মূল্য*-র মধ্যে এক 'নারীর মূল্য' ছাডা আর কোনোটি লেখেননি। তবে পরে 'সমাজের মূল্য' না লিখে 'সমাজধর্মের মূল্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটা অনিলা দেবীর নামে ১৩২৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *ভারতবর্ষ-য়* প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪

১ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, সেই সময় তিনি *চরিত্রহীন* লিখছিলেন। *যমুনা*-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল *যমুনা*-য় ছাপবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে *চরিত্রহীন* চান। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে গিয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

২ প্রমথবাবু বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন যে, *ভারতবর্ষ*-র জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের কাজ থেকে *চরিত্রহীন* এনে দেবেন।

৩ জলধর সেন।

৪ শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে *চরিত্রহীন*-এর কিছুটা পাণ্ডুলিপি ছিল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় *চরিত্রহীন সাহিত্য* পত্রিকায় ছাপাবার জন্য পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে সেই সময় সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে পড়তে দিয়েছিলেন। সমাজপতি *চরিত্রহীন* পড়ে খুব ভালো বললেও, *সাহিত্য* পত্রিকায় ছাপাতে অরাজি হয়েছিলেন। পরে *যমুনা*-য় ছাপা হবে দেখে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং নিজে *সাহিত্য* পত্রিকায় ছাপবার জন্য আবার *চরিত্রহীন* চেয়েছিলেন।

৫ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৬ ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *যমুনা*-য় 'পথনির্দেশ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫

১ ছাত্রজীবনের শেষে এক সময় শরৎচন্দ্র যখন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে সন্ন্যাসী সেজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মজঃফরপুরে যান, তখন সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথবাবুর পরিচয় হয়। (কীভাবে এঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ *শরৎচন্দ্র*-এ (*১ম খণ্ড*)-এ দিয়েছি।) ওই সময় শরৎচন্দ্রের ঝোলার মধ্যে অসমাপ্ত *'চরিত্রহীন'*-এর পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য কিছু লেখাও ছিল। প্রমথবাবু এই মজঃফরপুরেই প্রথম শরৎচন্দ্রের লেখা পড়েছিলেন।

২ সুধাকৃষ্ণ বাগচী। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর *যাঁদের দেখেছি* গ্রন্থে এক জায়গায় সুধাকৃষ্ণ বাগচী সম্বন্ধে লিখেছেন :

> তাঁর লেখবার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। সে যা-তা কথা কইতে পারতো অনর্গল। এই সুধাকৃষ্ণ বড় গুণী ছেলে। পরে সে *জাহ্নবী*-র (নবপর্যায়) সম্পাদক হয় এবং আমার একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিজের নামে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে দেয়।

৩ এই গল্পটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের কিছু ছাপ আছে। সম্ভবত সেই কথাটাই তিনি একদিন গোপনে বন্ধু প্রমথনাথকে বলেছিলেন। এখানে তারই ইঙ্গিত করেছেন।

৪ পাঁচুগোপাল।

৫ প্রাণধন চক্রবর্তী। ইভিনিং ক্লাবের অন্যতম সদস্য।

পত্র ৬

১ *চরিত্রহীন যমুনা*-য় প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও, *সাহিত্য*-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং *ভারতী* পত্রিকার সহ-সম্পাদক, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই তাঁদের কাগজে *চরিত্রহীন* প্রকাশ করবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর কাছে *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি দেখে সেই সময়েই সৌরীনবাবু *ভারতী*-র জন্য *চরিত্রহীন* চেয়েছিলেন।

২ সুধাকৃষ্ণ বাগচীর লেখা *পুণ্যের জয়*-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৩ *ভাবতবর্ষ* পরিচালনার ব্যাপারে প্রমথবাবু একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

৪ *ভারতবর্ষ* পত্রিকার কর্তৃপক্ষ *চরিত্রহীন* পছন্দ করবেন না এইরূপ নিশ্চিত হয়েই. শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথকে তামাসা করে এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

৫ শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুর কাছে *চরিত্রহীন*-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পাঠিয়ে কিছু অংশ পাঠিয়েছিলেন।

৬ ওই প্রবন্ধে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'কানকাটা কন্দকাটা বা উড়িষ্যার খোন্দ জাতিরা বাইবেল কথিত কানা নাইট জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।' শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে এক প্রবন্ধে ঋতেনবাবুর সিদ্ধান্ত যে ভুল, তা প্রমাণ করেছেন।

৭ শরৎচন্দ্র এখানে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন।

পত্র ৭

১ ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে *ভারতবর্ষ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
২ মারি কোরেলির *মাইটি অ্যাটম* উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে শরৎচন্দ্র 'পাষাণ' লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বাল্যরচনাটি কীভাবে হারিয়ে যায়।
৩ *'চন্দ্রনাথ'* ১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা *যমুনা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল।
৪ '২০ বছরের নয়', ১২/১৩ বছরের। '২০ বছরের' ওটা একটা কথার কথা।

পত্র ৮

১ 'পথনির্দেশ' গল্পের নায়িকা হেমনলিনী বিধবা ছিল।
২ শরৎচন্দ্রকে লেখা প্রমথবাবুর চিঠিতে এই কথাটা ছিল।
৩ প্রতি সংখ্যার দাম ছিল আট আনা।
৪ রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* উপন্যাসের নায়িকা।
৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস।
৬ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*-এর ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত *চোখের বালি* এবং ১৩১০ বৈশাখ থেকে ১৩১২ আষাঢ় পর্যন্ত *নৌকাডুবি* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৯

১ *ভারতবর্ষ*-র প্রথম সংখ্যার কিছুটা অংশ মাত্র সম্পাদনা করেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মারা যান।
২ দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর সময় দিলীপবাবুর বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর কয়েক মাস।
৩ হাইকোর্টের জর্জ সারদাচরণ মিত্রকে *ভারতবর্ষ*-র সম্পাদক করা হবে, এরূপ একটা কথা উঠেছিল। কিন্তু তাঁকে সম্পাদক না করে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেনকে সম্পাদক করা হয়েছিল।
৪ সারদাবাবু একটি *বিদ্যাপতির পদাবলী* সম্পাদনা করেছিলেন।
৫ সারদাবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন।
৬ অনুরূপা দেবী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নগেন্দ্রনাথ বসু।
৭ শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের সাহিত্য-সভা-র যাঁরা সভ্য-সভ্যা ছিলেন, তাঁরা হলেন : বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরূপমা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

পত্র ১০

১ নীলকর সাহেবরা যেমন অত্যাচারী ছিল, তাদের গোমস্তারাও ঠিক তেমনি অত্যাচারী ছিল।
২ মণীন্দ্রকুমার মিত্র। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে চাকরি করতেন, মণিবাবু সেই অফিসে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। এই মণিবাবুই তাঁর

অফিসে শরৎচন্দ্রের চাকরি করে দিয়েছিলেন। মণিবাবু এই সময় ছ-মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন।

৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাস।

৪ দ্বিজেন্দ্রলালের *কালিদাস ও ভবভূতি* ১৩১৭-১৩১৮ সালের *সাহিত্য*-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ১১

১ *ভারতবর্ষ*-র প্রথম সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসুর লেখা প্রবন্ধ 'কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন'।

২ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা প্রবন্ধ।

৩ *ভারতবর্ষ*-র প্রথম সংখ্যায় সাতটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ছবি ছিল এবং ছবিগুলি মন্দ ছিল না।

৪ শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা *যমুনা*-য় প্রকাশিত হয়।

৫ শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা 'আলো-ছায়া' শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতে ১৩২০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যার *যমুনা*-য় প্রকাশিত হয়। আষাঢ় সংখ্যায় লেখার সঙ্গে লেখকেব নাম নেই। ভাদ্র সংখ্যায় লেখকের নামের জায়গায় আছে শুধু শ্রী . . .।

৬ ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা *যমুনা*-য় (পৃ. ১৫০—১৮২-তে)।

৭ মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৮ ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা *সাহিত্য* পত্রিকায় দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিত 'দাদা' গল্প।

৯ ফণিবাবু তাঁর *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশ করবার আশায় শরৎচন্দ্রের এই বাল্যরচনাগুলি শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতেই তাঁর মামাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। প্রমথবাবু ফণিবাবুর সংগৃহীত এই লেখাগুলির কথা জানতেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে চিঠিতে এই লেখাগুলির কথা বললে, শরৎচন্দ্র তারই উত্তরে এই কথা লিখেছিলেন।

'ক্ষুদ্রের গৌরব' ১৩২০ সালের মাঘ সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি প্রবন্ধ। এই লেখার শেষে লেখকের নামের জায়গায় ছিল : 'শ্রাবণ ১৩০৮, শ্রী.....চট্টোপাধ্যায়'। শরৎচন্দ্রের এই বাল্যরচনাটি তাঁদের ভাগলপুরের সাহিত্য-সভার মুখপত্র হাতে-লেখা *ছায়া* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ফণিবাবু শরৎচন্দ্রের মামাদের কাছ থেকে *ছায়া* পত্রিকাটি চেয়ে নিয়ে তা থেকেই এটা *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

'ছায়া'—এই নামের শরৎচন্দ্রের কোনো রচনা *যমুনা* পত্রিকায় দেখছি না। মনে হয়, ওই সময় *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া' গল্পটাকেই শরৎচন্দ্র 'ছায়া' বলে উল্লেখ করেছেন।

'বিচার'— এটি একটি ছোট গল্প। ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যা *যমুনায়* এটি প্রকাশিত হয়। এই লেখার শেষে নাম আছে— শ্রীমতী অনুপমা দেবী। শরৎচন্দ্র ১২-২-১৩ তারিখে অর্থাৎ ১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে ফণিবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার তিনটে নাম— সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী। ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো? বড় গল্প— অনুপমা।'

শরৎচন্দ্র যমুনা পত্রিকায় খুব ছোটো গল্প একটিও লেখেননি। বড়ো গল্পগুলোই (যেমন—*'বিন্দুর ছেলে'* ৩২ পাতার) অনুপমা দেবীর বদলে শরৎচন্দ্র নামেই লিখেছিলেন। এই কারণেই ফণিবাবু বিচার এই ছোটো গল্পটি পেয়ে শরৎচন্দ্রের রচনা ভেবে শরৎচন্দ্র নাম না দিয়ে অনুপমা দেবী দেননি তো? কিন্তু এই গল্পটি পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, এটি শরৎচন্দ্রের লেখা নয়। রাজপুতানার কয়েকজন নরনারীর কথা নিয়ে লেখা *যমুনা* পত্রিকাব ৪/৫ পাতার এই গল্পটি একটি জোলো গল্প।

১০ *চরিত্রহীন* ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র এবং ১৩২১ সালের *যমুনা* পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়। পরে বাকিটা লেখা হলে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১১ *ভারতবর্ষ*-র প্রথম সংখ্যার 'সংকলন' অধ্যায়ে এক জায়গায় লেখা ছিল :

> 'শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় 'মিশর-মণি' নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার নাটকখানি মিনার্ভায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।'

শরৎচন্দ্র এই লেখাটা পড়ে প্রমথবাবুকে ওই কথা লিখেছিলেন।

পত্র ১২

১ শবৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার আগে তাঁর অন্যান্য বাল্যবচনার সঙ্গে *দেবদাস*ও সুরেনবাবুর কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

২ *ভারতবর্ষ*-র আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। শবৎচন্দ্রের রচনা প্রথম *ভারতবর্ষে* প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায়। সেই লেখাটি হল *বিরাজ বৌ*।

৩ পূজার পর আসতে পারেননি। এসেছিলেন পরে জুন মাসে ছ-মাসের ছুটি নিয়ে।

৪ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা।

৫ *'দর্পচূর্ণ'* যতীশচন্দ্র বসুর লেখা।

৬ ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমথবাবুর প্রবন্ধ।

৭ 'পাণ্ডুয়া-কাহিনী'। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম নেই।

পত্র ১৩

১ পত্রিকার শেষ দিকে 'নিবেদন'-এ ছিল :

> প্রতি সংখ্যায় ১৫ ফর্মা—১২০ পৃষ্ঠা দিতে আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম, কিন্তু সহৃদয় এবং শুভানুধ্যায়ী লেখকগণের অনুকম্পায় আমরা এত প্রবন্ধ পাইয়াছি যে, এবার ১৯ ফর্মা অর্থাৎ চারি ফর্মা অতিরিক্ত দিয়াও অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের স্থান দিতে পারিলাম না।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩ সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র।

পত্র ১৪

১ *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতবর্ষ' নামক বিখ্যাত কবিতাটি (যার প্রথম পঙ্‌ক্তি—'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!') প্রথমেই ছাপা হয়েছিল। এ ছাড়া *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সূচনা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সুন্দর প্রবন্ধও ছিল।

২ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন' প্রবন্ধটিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, 'তাম্রলিপ্তি' বা 'তাম্রলিপ্ত' নামে কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি।

৩ কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যের 'ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ' প্রবন্ধটির প্রতি ইঙ্গিত।

৪ একটি ইংরাজি বই-এর ছায়া অবলম্বনে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির লেখা উপন্যাস। এটি *ভারতবর্ষে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫ প্রমথবাবু লেখা প্রবন্ধ 'বায়স্কোপ'।

পত্র ১৫

১ *ভারতবর্ষ* দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যা।

২ এই সচিত্র গল্পটির লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গল্পটি ছিল সংক্ষেপে এই .

> সুন্দরী যুবতী সূরজ কওর সুন্দর সিংকে ভালোবাসে, কিন্তু সুন্দর সিং পাত্তা দেয় না। এতে রাগে সূরজ কওর হরি সিংকে নিজের ঘরে ডেকে এনে, সুন্দর সিংকে হত্যা করবার জন্য তাকে বলে। হরি সিং সূরজ কওরের ঘরে গিয়ে তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে।
> এদিকে প্রেম দেঈ তার মেয়ে চন্দ্রার সঙ্গে হরি সিং-এর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। হরি সিং সূরজ কওরের পাল্লায় পড়েছে জেনে, প্রেম দেঈ মঙ্গল সিংকে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে বলে, সূরজ কওরকে হত্যা করতে হবে।
> মঙ্গল সিং রাজি হয়ে একদিন রাত্রে লুকিয়ে সূরজ কওরের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং আলমারির এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকে।
> সূরজ কওর সেদিন অনেক রাত্রে তার ঘরে ফিরে বুঝতে পেরেছিল, কে একজন তার ঘরে লুকিয়ে আছে। তবুও সে কোন উচ্চবাচ্য না করে, পায়ের নূপুর খুলে, গায়ের জামা খুলে, বুকের উপর সূক্ষ্ম মলমলের চাদর দিয়ে ঘরের বড়ো আয়নাটার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার বুকের ওই সূক্ষ্ম চাদরটা একটু সরে গেল। তখন মঙ্গল সিং আর সম্পূর্ণ লুকিয়ে থাকতে না পেরে, মুখটা বার করে সূরজ কওরের রূপ দেখতে লাগল।
> মঙ্গল সিং ধরা পড়ে সমস্ত কথা কবুল করল। কিন্তু সেও সূরজের রূপে মজল। সে সূরজকে ধরতে গেলে, সূরজের হাতের আংটিতে যে বিষ ও সুচ লুকানো থাকত, সূরজ মঙ্গল সিং -এর হাতে সেই সুচ ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিয়ে মঙ্গল সিংকে হত্যা করল।
> ওদিকে হরি সিং সুন্দর সিংকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই তার হাতে নিহত হ'ল।
> প্রেম দেঈ তার ভাবী জামাতা নিহত হয়েছে শুনে, একদিন নিজে গিয়ে সূরজ কওরের পিঠে

ছুরি বসিয়ে দিল।

এই ঘটনার একটু পরেই সুন্দর সিং সূরজ কওরের কাছে আসে। সে সূরজ কওরের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নেয় এবং মুখে চুম্বন করে। মুমূর্ষু সূরজ কওর অল্পক্ষণ পরেই হরি সিং-এর কোলে মাথা রেখে মারা গেল।

৩ কৃষ্ণের পালক-পিতা গোপরাজ নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৪ *ভট্টি* কাব্যের (রাবণ বধ কাব্য) রচয়িতা ভট্টি। কেউ কেউ বলেন, উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরি ও ভট্টি একই ব্যক্তি। যাই হোক, এই *ভট্টি* কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে :

বিবৃত্ত-পার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং
সমুদ্বহচ্‌-চারু-নিতম্ব-রম্যম্‌॥
আমন্দ্র-মন্থ-ধ্বনি-দত্ত-তালং
গোপাঙ্গনা নৃত্যমনন্দয়ৎ তম্‌॥

রামচন্দ্র যজ্ঞে উপদ্রবকারী রাক্ষসদের দমন করবার জন্য বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমে যাওয়ার পথে এক জায়গায় গোপীদের দধি মন্থন দেখতে পান। সেই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি।

৫ 'দেবতাবর্গই' ঠিক, দেবতৃবর্গ ঠিক নয়। কেননা মূল শব্দ 'দেবতৃ' নয়, 'দেবতা'। শরৎচন্দ্র নিজেই এখানে ভুল করেছেন।

৬ বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৭ শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষর শেষদিকে গত বৈশাখ মাসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও গল্প-উপন্যাসের একটি তালিকা ছিল।

৮ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৯ ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *সাহিত* পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

১০ অমলা দেবীর লেখা।

১১ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন। সেবার সাহিত্য-সম্মেলন দিনাজপুরে হয়েছিল বলে শরৎচন্দ্র দিনাজপুর বলেছেন।

১২ 'ঘাটে' ছবির শিল্পী নরেন্দ্রনাথ সরকার। এক স্নানের ঘাটের ওপরে দাঁড়ানো অল্পবয়সি একটি সুন্দরী যুবতীর পূর্ণাঙ্গ ছবি। যুবতীটির নাকে একটি নোলক আছে বটে।

১৩ প্রমথবাবুর লেখা একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি। এটি পড়বার জন্য প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে ছিল সদ্য প্রকাশিত *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ছবি নিয়ে অবনী ঠাকুরের সমালোচনা।

১৪ *ভারতবর্ষ* দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ বড়ো একটি আলোকচিত্র (ফোটো) ছাপা হয়। ওই ছাপা ফোটোর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়মূলক একটি লেখার মধ্যে ছিল : 'মহামহিম ভারত সম্রাটের বিগত জন্মদিন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সি.আই.ই. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।'

ভারতবর্ষ পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের ছাপা এই ফোটোটি দেখেই শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে অবনীন্দ্রনাথের কথা লিখেছিলেন।

১৫ খুব সম্ভব অবনীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যই হোক, বা অন্য কিছু হোক, কোনো একটা সম্বন্ধে এক সময় কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। সে কথা প্রমথবাবু জানতেন। শরৎচন্দ্র এখানে তারই ইঙ্গিত করেছেন।

১৬ *বাগ্‌দত্তা* ও *পোষ্যপুত্র* অনুরূপা দেবীর লেখা। এ দুটি উপন্যাসই *ভারতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
দিদি নিরুপমা দেবীর লেখা। দিদি ধারাবাহিকভাবে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, *ভারতী* পত্রিকায় নয়। নিরুপমা দেবীর *অন্নপূর্ণার মন্দির ভারতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
অরণ্যবাস-র লেখক অবিনাশচন্দ্র দাশ। *অরণ্যবাস প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭ *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অনুরূপা দেবীর উপন্যাস।

পত্র ১৬

১ প্রমথবাবু তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ দেখে দেবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেই শরৎচন্দ্র তখন প্রমথবাবুকে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। প্রমথবাবু প্রবন্ধটিতে 'ঝগড়া'র কথা থাকায় শেষ পর্যন্ত তা ছাপা হয়নি।

২ *গৃহস্থ* ছিল সেকালের একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী (কিছুদিন সম্পাদকও) ছিলেন রামরাখাল ঘোষ। ওই সময় ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *গৃহস্থ* পত্রিকায় 'আলোচনা' নামক সম্পাদকীয় অংশে তিনি লিখেছিলেন .

> গত ফাল্গুন মাসের কলিকাতাব ধর্ম সমবায় কোম্পানি নির্মিত হিন্দুস্থান বীমা সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশাব উদ্রেক হইয়াছে। ... এই প্রদর্শনীতে সর্বসমেত আঠার জন চিত্রকরের কার্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা' কল্পনাটি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার 'প্রথম দর্শন' চিত্রে রমণীর পাশ-বালিশের মত পা-গুলি অতি কদাকার হইয়াছে। যে কোন দর্শকের মনে বীভৎস রসের সঞ্চার হইবে।

৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর শরৎচন্দ্রেব ভয়ানক রাগ ছিল। তাই তিনি অবনীন্দ্রনাথের 'অরিজিনাল্ পেন্টিং' দেখে সমালোচনাটি করতে পারলেন না বলেই এই কথা লিখেছিলেন।

৪ 'কুলগাছ' গল্পের লেখক সরোজনাথ ঘোষ আর 'ব্যথিত' গল্পের লেখক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দুটো গল্পই ছবিসহ *ভারতবর্ষ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

৫ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

৬ হিরণ্ময়ী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। *শরৎচন্দ্র* (প্রথম খণ্ডে) 'পত্নী-প্রেমিক' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

৭ শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে যখন বিয়ে করেন, তখন হিরণ্ময়ী দেবী মোটেই লেখাপড়া জানতেন না। পরে শরৎচন্দ্র নিজে তাঁকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

৮ পরবর্তীকালের পরিবর্তিত 'ছবি' গল্পটি।

পত্র ১৭

১ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

২ 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশ'।

পত্র ১৮

১ ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায়।
২ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বাড়ি হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। এই গ্রামের পোস্ট অফিস পানিত্রাস। গোবিন্দপুর পানিত্রাসের পাশেই। টেলিগ্রাফ যায় না, এটা ঠিক নয়, হয়তো দূরে গ্রামাঞ্চলে বলে টেলিগ্রাফ যেতে দেরি হতে পারে।

পত্র ১৯

১ *বিরাজ বৌ*।
২ শরৎচন্দ্র তখন এ কথা বললেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি এগুলি আর লিখতে পারেননি।

পত্র ২০

১ *বিরাজ বৌ*।
২ *পণ্ডিত মশাই*।
৩ বিভূতিভূষণ ভট্টের। খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র এখানে বিভূতিবাবুর *স্বেচ্ছাচারী* উপন্যাসটির কথা বলেছেন।
৪ 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথনির্দেশ' এই গল্প তিনটি নিয়ে *বিন্দুর ছেলে* নামে যে বইটি *গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স* থেকে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর এই *বিন্দুর ছেলে* বইটি অল্প টাকাতেই *গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স*কে কপিরাইট বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

পত্র ২১

১ *বিরাজ বৌ*। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বইটিরও কপিরাইট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

পত্র ২২

১ *নবীন সন্ন্যাসী* উপন্যাসটিরও লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পত্র ২৪

১ *পণ্ডিত মশাই*।

পত্র ২৫

১ শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুর অনুরোধে তাঁর জন্য দুটি খাট রেঙ্গুনে তৈরি করিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

২ শারীরিক অসুস্থতাবশত ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ জুন মাসে শরৎচন্দ্র অফিসে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি চোরবাগানে ছিলেন। ডিসেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রকে হঠাৎ তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হয়, যাওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁকে চোরবাগানে রেখে গিয়েছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

৪ শরৎচন্দ্রের কুকুরের নাম ছিল ভেলু। শরৎচন্দ্র কলকাতায় আসার সময় ভেলুকেও রেঙ্গুন থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ ইনি শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের পুত্র।

২ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্রের মাতামহের অন্যতম ভ্রাতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র।

৩ *সাহিত্য* পত্রিকায় ১৩১৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় 'কাশীনাথ' প্রকাশিত হয়।

৪ *যমুনা* পত্রিকায় ১৩১৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় 'বোঝা' প্রকাশিত হয়েছিল। *যমুনা* পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, শরৎচন্দ্রের বাল্য-বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি নিয়ে *যমুনা*-য় ছাপিয়েছিলেন।

৫ ইনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা।

৬ ছোটোগল্পের বই।

৭ চাঁচল মালদহ জেলার অন্তর্গত। গিরীনবাবুর পিতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চাঁচল রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। গিরীনবাবু ও তাঁর দাদা সুরেনবাবু ছেলেবেলায় চাঁচলে থেকে লেখাপড়া করতেন এবং উভয়েই চাঁচল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাস করেছিলেন।

পত্র ৩

১ এই ভয়েই ফণিবাবু শেষে শরৎচন্দ্রকে *যমুনা* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক করে ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকার শেষে সংবাদ বিভাগে এই বিজ্ঞাপ্তিটি প্রচার করেছিলেন :

> যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্যে যোগদান করিলেন। যমুনার পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত— অতএব পরিচিতের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

শরৎচন্দ্র অল্প কয়েক মাস *যমুনা* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

২ উপেনবাবুর 'ক্রয়-বিক্রয়' গল্পটি ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যা *যমুনায়* প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ভাগলপুরে যে সাহিত্য সভা গঠন করেছিলেন, যোগেশবাবু সেই সাহিত্য সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। সাহিত্য সভার আর এক সদস্য বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন, 'সাহিত্য সভার মুখপত্র হাতে-লেখা পত্রিকা *ছায়া*-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন, এই যোগেশবাবু।' (*ভারতবর্ষ*, ১৩৪৪ চৈত্র)।

৪ শরৎচন্দ্র এঁদের প্রত্যেককেই কলম উপহার দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এই কলম উপহার পাওয়া সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন :

> আমার নামে একটি একেবারে সোনার কলম, নিরুপমাব নামেও একটি 'ওয়াটারম্যান'। আমি ত উহা পাইয়া অবাক। এত দামী কলম লইয়া কি করিব। 'আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে' এই মনে করিয়া দাদাকে (শরৎচন্দ্রকে) পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন— বেশ করেছি দিয়েছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে (*ভারতবর্ষ*, ১৩৪৪ চৈত্র)

৫. গিরীনবাবু এই সময় বাঁকিপুরে থাকতেন।

৬. ৯৬ পৃষ্ঠায় পত্র ৫-এর পত্রপরিচিতি দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪

১ দু-তিন মাস পরে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে আসতে পারেননি। এসেছিলেন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ছ-মাসের ছুটি নিয়ে।

২ ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩ 'লক্ষ্মীলাভ' গল্পেরই একটি ছত্র।

ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা

পত্র ১

১ *যমুনা* পত্রিকার সম্পাদক।

২ উপেনবাবুর পিতা পূর্ণিয়ায় ডাক্তারি করতেন। উপেনবাবু ওই সময় পূর্ণিয়ায় গিয়েছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্র ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে রেঙ্গুন থেকে এলে তখনই তাঁর সঙ্গে ফণিবাবুর পরিচয় হয়।

৪ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পত্র ২

১ 'রামের সুমতি' ১৩১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় দু মাসে *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২ ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বাল্য-স্মৃতি' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ 'বোঝা' ১৩১৯ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৪ শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার আগে চন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

পত্র ৪

১ ফণীবাবু বৈশাখেই 'চন্দ্রনাথ' ছেপেছিলেন। ১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন এই ক-টি সংখ্যায় 'চন্দ্রনাথ' ছাপা হয়েছিল।

২ অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত।

পত্র ৫

১ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায়। প্রবন্ধের লেখক কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

২ *মানসী* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পত্র ৭

১ শরৎচন্দ্রের সমালোচনাটির নাম ছিল 'কানকাটা'। এই 'কানকাটা' সমালোচনাটি শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২ প্রমথবাবুর সেই চিঠিটা এই :

১৫/১ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা
২১শে এপ্রিল ১৯১৩

মাই ডিয়ার শরৎ

প্রত্যহই তোমার চিঠি পাইব মনে করি কিন্তু নিত্যই হতাশ হইয়া পড়িতে হইতেছে। তোমার চরিত্রহীনের জন্য আমরা যতই ব্যস্ত হইতেছি, তুমি ততই আমাদের সম্বন্ধে নির্দয়রূপে উদাসীন হইয়া বসিয়া আছ।

একটা বৃহদনুষ্ঠানের ভার লইয়াছি। প্রথম হইতেই তোমার লেখা পাওয়া যাইবে বলিয়া সকলের কাছে 'বড়মুখ' করিয়া কথা কহিয়াছি, কিন্তু আজ যদি তাহাদের সমক্ষে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হই, আমার মুখ কোথায় থাকিবে? তোমার স্নেহ ও ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়াই লোকের কাছে তোমার সম্বন্ধে দম্ভ করিয়াছিলাম। কিছু ভুল করিয়াছি কি?

যমুনা সম্পাদক ফণীবাবু কে আমি তা জানি না, তবে তোমার উপর এতটা জোর খাটে

যে আমাদের এতদিনকার প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষা হইতেছে। আমার একার যে তোমার উপর এতটা জোর আছে, তাহাই আমার বিশ্বাস। অপরেরও যে সেরূপ জোব আছে, সত্য হইলেও আমার সে কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যাহা হউক *যমুনা*-র জন্য তোমার যাহা সংকল্প তাহার আমি প্রতিবন্ধক হইতে চাহি না— তবে নূতন *যমুনা*-র প্রেমে পুরাতনদের একেবারে ভোলা কর্তব্য নহে। আমার সমস্ত অবস্থা পূর্বাপর আগের পত্রে লিখেছি— এখন আর আমার অন্য পথ নাই। তোমার *চরিত্রহীন* চাই-ই চাই। যমুনা এত ছোট (আকারে) কাগজ যে তাতে তোমার *চরিত্রহীন* বার হতে পারে না। কাজেই যখন তার স্বার্থেব কোন হানি হবার সম্ভাবনা নাই— তখন তুমি আমার আব্দার উপেক্ষা কববে কেন?

কাল তখন আমি বাড়ী ছিলাম না। যমুনা-সম্পাদক দয়া করে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখের সংখ্যা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার 'নারীর মূল্য' সকলকে পড়ে শুনালাম। ডি-এল-রায় 'ওয়াজ ইন্ এক্‌সট্যাসি ওভার ইট।' তিনি বলিলেন যে, আমি লিখলেও উহা ছাড়া আর কিছু লিখিতে পারিতাম না। বরং অত বেফারেন্স দিতে পারিতাম না। আর তোমার 'এরিউডিশান'-এর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি বন্ধুত্ব গৌরবের লোভ সংবরণ করতে না পেরে অনিলা দেবী ও শরৎ যে এক তা প্রকাশ করতে বাধ্য হই। তিনিও তাতে আহ্লাদিত হলেন।

চরিত্রহীন পাঠাতে বিলম্ব কচ্ছ কেন? খোলসা করে লিখবে কি? আমাদের অবস্থা ত বুঝলে, নইলেই চলবে না।

অনুষ্ঠান পত্র বুধবার প্রকাশ হবে। আর প্রথম মাসের জন্য লেখা ১৫ই বৈশাখ প্রেস-এ যাবে। আর বিলম্ব কোরো না। দয়া করে পত্র পাঠ তোমার উপন্যাসটি পাঠাও কিম্বা খুব কঠোর ভাবে স্পষ্ট করে লিখে দাও যে 'দিব না', তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

[ইতি— প্রমথ]

পত্র ৮

১ ফণীবাবু এই সময় শরৎচন্দ্রের কাছে *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি চাইছিলেন। শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথ ভট্টাচার্যের আগ্রহাতিশয্যে কিছুদিন আগেই *চরিত্রহীন*-এর পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পত্র ৯

১ ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় *চরিত্রহীন* প্রথম ছাপা শুরু হয়। ১৩২১ সালে *চরিত্রহীন*-এর আংশিক মাত্র *যমুনা* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তারপর আর ছাপা হয়নি।
২ স্নেহের জয়।
৩ বঙ্গভাষা ও স্যার আশুতোষ।

পত্র ১০

১ ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হয়।

২ শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি প্রথমে ১৩২০ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা *যমুনা*-য় প্রকাশ করেছিলেন।

পত্র ১১

১ ১৩২০ সালে ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের বড়দিদি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এইটিই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। *বড়দিদি* ইতিপূর্বে ১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা *ভারতী* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুই সংখ্যার লেখায় লেখকের কোনো নাম ছিল না।

পত্র ১২

১ শরৎচন্দ্রের বড়ো ভগিনী বা দিদি অনিলা দেবীর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলায় বাগনান থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে।
২ শরৎচন্দ্রের এই কথা থেকে জানা যায়, তিনি অসুস্থ অবস্থায় 'নারীর মূল্য' না লিখে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় লিখলে তাঁর এই লেখাই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও ভালো হত। অর্থাৎ অসুস্থ না হলে তিনি আরও বহু গ্রন্থাদি পড়াশুনা করে এই প্রবন্ধটি ভালো করে লিখতে পারতেন।
৩ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১ ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে বিভূতিভূষণ ভট্ট সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। ওই সময় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন সৌরীনবাবু বিভূতিবাবুদের বাড়িতে গেলে সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীনবাবুর পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।
২ ১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে 'নারীর লেখা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ওই প্রবন্ধে তিনি আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্ট *যমুনা*-য় শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য'ও পড়েন। *যমুনা*-র কয়েক সংখ্যায় 'নারীর মূল্য' পড়ে বিভূতিবাবু ওই সময় বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহনকে লিখেছিলেন :

> শরৎদার 'নারীর মূল্য' জ্বালাতন করিয়াছে। নিজেই 'নারীর লেখা'য় মেয়েমানুষের পাণ্ডিত্যের চেষ্টাকে খুবই গালাগালি করিয়াছেন। এদিকে নিজে ত মেয়েমানুষের বেনামীতে বেশ 'রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট' সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ রকম শিখণ্ডীর ন্যায় অবস্থায় মেঘনাদের ন্যায় নামের আড়ালে যুদ্ধ করিলে আমরা নাচার।...আমি বুড়িকে এই স্ত্রী-নামধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রীলোকের স্বত্ব-রক্ষাকারী 'ডন্ কুইক্সটো'র কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।...

সৌরীনবাবু রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার সময় তাঁর চিঠির সঙ্গে তাঁকে লেখা বিভূতিবাবুর

ওই চিঠিটির একটি নকলও শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সৌরীনবাবুকে লেখা বিভূতিবাবুর চিঠিটি পড়ে তখন সৌরীনবাবুকে এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্র 'আর লিখব না' বললেও, 'নারীর মূল্য' লিখে শেষ করেছিলেন।

৪ বিভূতিবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি বিভূতিবাবু কি তাঁদের বাড়ির কারও কাছেই পাওয়া যায়নি।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর অধিকাংশ পুস্তকেরই প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের এবং *ভারতবর্ষ*-র পত্রিকায় অন্যতম স্বত্বাধিকারী।

২ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য।

৩ প্রমথবাবু কলেজ ছেড়ে কিছুদিন পাথুরেঘাটার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি পোর্ট হেল্‌থ অফিসে চাকরি নেন। চাকরি করার সময় তিনি শারীরিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি ছেড়ে প্রমথবাবু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রথমে মধ্যভারতের ছত্রপুর রাজ্যে গিয়েছিলেন।

৪ 'আঁধারে আলো' ও 'মেজদিদি' এই দুটি গল্প। এই দুটি গল্প ১৩২১ সালের *ভারতবর্ষে*-এ যথাক্রমে ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি গল্প এবং পরে প্রকাশিত (*ভারতবর্ষ*-র ১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যায়) 'দর্পচূর্ণ' গল্পটি নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর *মেজদিদি* গল্প-গ্রন্থটি করেছিলেন।

৫ শরৎচন্দ্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ছ-মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে বাস করেছিলেন। এখানে তারই উল্লেখ করেছেন।

পত্র ২

১ উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *ভারতবর্ষ*-র পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ *ভারতবর্ষে*-র যুগ্ম-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে, উপেনবাবু জলধর সেনের সঙ্গে কিছুদিন (১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত) *ভারতবর্ষ*-র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। উপেনবাবু ছেড়ে দিলে, একা জলধর সেনই সম্পাদক থাকেন। উপেনবাবু হরিদাসবাবুর আত্মীয় ছিলেন।

পত্র ৩

১ *পল্লীসমাজ* প্রথমে ১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের আলোকচিত্র সহ *পল্লীসমাজ*-এর মাত্র অল্প অংশ, দুই পরিচ্ছেদ ছাপা হয় এবং লেখার শেষে ক্রমশ থাকে। এরপর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছাপা হয়। কিন্তু লেখার শেষে ক্রমশ ছিল না। শরৎচন্দ্র প্রথমে এইখানেই

তাঁর *পল্লীসমাজ* শেষ করেছিলেন।

২ *আঁধারে আলো, মেজদিদি* ও *দর্পচূর্ণ*।

৩ শরৎচন্দ্র নিজে যেমন ডাম্বেল ভাঁজতেন, তেমনি তাঁর অন্যতম মাতুল ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ডাম্বেল ভাঁজেন শুনে তিনি তাঁকে একজোড়া ডাম্বেল উপহার দিয়েছিলেন। ভূপেনবাবুর পুত্র তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শরৎচন্দ্রের দেওয়া সেই ডাম্বল দেখেছি।

৪ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য রচিত একটি গ্রন্থ।

পত্র ৪

১ *পল্লীসমাজ।*

পত্র ৫

১ 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' ১৩২২ সালে *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মাঘ সংখ্যা থেকে ছাপা শুরু হয় এবং পর বৎসর মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হয়। ১৩২৩ সালের মাঘ মাসেই এই লেখাগুলি 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

২ এই সময় *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির 'ভ্রমণকাহিনী' বেরুচ্ছিল। শরৎচন্দ্র কারও নাম না করেই তাঁর লেখার প্রথমেই এঁদের প্রতি একটু কটাক্ষ করেছিলেন। যেমন তিনি লিখেছিলেন :

কে গিয়াছে কাশী, কে গিয়াছে খুলনা, কে গিয়াছে সিমলা পাহাড়— অমনি ভ্রমণকাহিনী। যে পাহাড়ে পর্বতে উঠিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। আর যে জন জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা ত একেবারে অসাধ্য।

৩ শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' প্রথম দুমাস ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন। তখন লেখক হিসাবে নাম ছিল— 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা'।

৪ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখিত 'য়ুরোপে তিন মাস'। তিন মাসের কাহিনী বহু মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল বলে শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন।

৫ বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাবও এই সময় *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ' লিখছিলেন।

৬ *বৈকুণ্ঠের উইল।*

৭ প্রমথবাবু ছত্রপুরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গিয়ে প্রথমদিকে কিছুদিন একটু সুস্থ থাকলেও ক্রমে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি ছত্রপুর ছেড়ে যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে যান। সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি তো দূরের কথা, বরং তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে থাকে এবং সেখানে যাওয়ার চার মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রমথবাবুর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানতে পেরে, শরৎচন্দ্র তাঁর *কাশীনাথ* বইখানির গ্রন্থস্বত্ব বাল্যবন্ধু প্রমথনাথকে দান করেছিলেন। হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের এই দানের কথা প্রমথবাবুকে জানালে, প্রমথবাবু তখন হরিদাসবাবুকে লিখেছিলেন :

প্রিয়বরেষু,

হরিভাই, কাল সন্ধ্যায় তোমার পত্র পাইয়া অবধি আমি কি পর্যন্ত যে আত্মহারা হইয়া আছি, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে!

জীবনে এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কখনও অভ্যস্ত নহি, আর আমাকে কিসের জন্য কি যোগ্যতার জন্যই বা লোকে দিবে। এখন দেখিতেছি, অযোগ্যতাও একটা বিশেষ গুণ। শরতের সব কার্যই বিচিত্র— যেদিন হইতে তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইহাই লক্ষ করিয়া আসিতেছি। তাহার কার্য তাহাকেই সাজে— তাহার তুলনা নেই। এ অপ্রত্যাশিত অননুভূত সহানুভূতি পাইবার আমি ত ভাই কোনো হিসেবেই যোগ্য নই।...শরতের কাণ্ড! পৃথিবীটা আমার কাছে নূতন করিয়া তুলিয়াছে। শরৎকে আর কি বলিব, সে দেবতা।... আমি আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য যাহা করিতে পারি নাই, আজ তোমরা তাহা করিলে। ... তোমাদের কোটী কোটী নমস্কার— তোমরা এখন আমার অনেক উচ্চে, তোমরা দাতা— আমি গৃহিতা।

৮ শরৎচন্দ্র *যমুনা* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকলেও এবং *যমুনা*-র প্রতি সত্যিকার দরদি হলেও, তিনি *ভারতবর্ষ* পত্রিকায়ও লিখতেন বলে, ফণিবাবু সব সময়েই ভাবতেন শরৎচন্দ্র হয়তো বা তাঁর ছোটো কাগজে আর লিখবেন না। তাই তিনি *যমুনা*-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার জন্য ১৩২১ সালে 'আষাঢ়' মাসের *যমুনা* পত্রিকায় আগে ঘোষণা করে 'শ্রাবণ' মাসে *যমুনা*-র অন্যতম সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নামও ছেপেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সময় *যমুনার* প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে— ফণিবাবুকে এই আশ্বাস বার বার দেওয়া সত্ত্বেও, ফণিবাবুর এই সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্যই শরৎচন্দ্র তাঁর উপর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি এতখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে, *যমুনা* পত্রিকায় তখন তাঁর *চরিত্রহীন* ছাপা হতে থাকলেও, *যমুনা*-য় *চরিত্রহীন* অসমাপ্ত রেখে *যমুনা*-র সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং এর পর থেকে তাঁর সকল রচনাই কেবল *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ছাপাতে শুরু করেছিলেন।

৯ ১৩২২ সালের কার্তিক সংখ্যা। এই সংখ্যাটি 'মহিলা সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অনুরূপা দেবী, কামিনী রায়, নিরুপমা দেবী প্রমুখ ৪২ জন মহিলা লেখিকার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি ছাপা হয়েছিল।

পত্র ৬

১ *বৈকুণ্ঠের উইল।*

২ শ্রীকান্ত পুস্তকাকারে ছাপাবার সময় শরৎচন্দ্র এই প্রথমাংশটা বাদ দিয়েছিলেন।

৩ 'শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী'র আরম্ভটা ছিল এইরূপ :

আরে যাঃ—এই ত বটে ! মনে মনে প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বুঝি বা ইহজন্মে হাতের লেখা আর ছাপার অক্ষরে দেখা ঘটিল না।

৪ রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এলে, ইনি পরে রেঙ্গুন থেকে কলকাতার *বাঁশরী* নামক মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৩ ও ৩৪ সালে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস লিখেছিলেন।

পত্র ৭

১ ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যা।

২ ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ। এটি *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় ছাপা দীর্ঘ ২২ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ।
৩ জার্মান বৈজ্ঞানিক।
৪ ১৩২২ সালের পৌষ সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় *পল্লীসমাজ* নামের বদলে *পল্লীকাহিনী* নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক এই ভুল করায় শরৎচন্দ্র তাই এই প্রশ্ন করেছিলেন।
৫ শরৎচন্দ্র এই সময় হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষটা আর লিখতে পারেন নি। তাই *ভারতবর্ষ* পত্রিকার পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত যা ছাপা হয়েছিল, সেই পর্যন্ত দিয়েই তিনি *পল্লীসমাজ* গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন।

পত্র ৮

১ হরিদাসবাবুর কন্যা শ্রীলাবণ্য দেবী।
২ সমাজ-ধর্মের মূল্য। এই লেখাটি ১৩২৩ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৯

১ *মেজদিদি* গ্রন্থটি ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১১

১ শরৎচন্দ্রের এই দুঃসময়ে হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে মাসে ১০০্ টাকা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় লেখার জন্য ৫০্ টাকা আর তাঁর বই বিক্রয়ের হিসাব থেকে ৫০্ টাকা।

পত্র ১২

১ পুস্তক-প্রতিষ্ঠান এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্সে-এর অন্যতম মালিক সুধীরচন্দ্র সরকার।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১ মণিলালবাবু *ভারতী* পত্রিকার লেখক ছিলেন। এই *ভারতী*-তেই শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের *বড়দিদি* প্রকাশ করেছিলেন। সৌরীনবাবু ছিলেন তখন ভারতীর সহ-সম্পাদক। সৌরীনবাবুই একদিন *ভারতী* অফিসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মণিলালবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন।
২ এই চিঠি লেখার কয়েকমাস পরে ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যা *যমুনা* পত্রিকায় 'মাতৃভাষা

ও সাহিত্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন :

> কে কোথায় কোন্ বিধবা বঙ্গনারীকে দিয়া এক মুমূর্ষু হতভাগ্য পর পুরুষের মুখে জল দিয়া সাহিত্যে বিষম কুরুচি টানিয়া আনিয়াছেন। এই সব লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে মহা তোলপাড় হইতেছে, যথার্থ কি তাতে দোষ, কি হইলে ঠিকটি হইত, এসব খুঁটি-নাটি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কিছুই আমার নাই।
>
> কোন সাহিত্য-সেবককেই আমি উপদেশ দিতে পারি না, এই কর, কিম্বা এই করা উচিত। শুধু এইটুকু বলি, হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্য সেবা করুন যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়। তখন কি উচিত, কি উচিত নয়, তাহা দেশের হৃদয় ও প্রাণই বলিয়া দিবেন।

যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি এ পর্যন্ত (১৯৬৯ খ্রি.) তাঁর কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

হেমেন্দ্রকুমার রায়কে লেখা

১ হেমেন্দ্রবাবু *যমুনা*-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের অনুরোধে চাকরি ছেড়ে *যমুনা*-য় আসেন। শরৎচন্দ্র তখন যমুনা পত্রিকায় নিয়মিত লিখছিলেন। সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর পরিচয়।

২ এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স মাত্র ৩৮ বছর। এর অনেক আগে থেকেই শরৎচন্দ্র সকলের কাছে নিজেকে 'বুড়ো হয়েছি' বলে পরিচয় দিতেন। আর এই সময় থেকেই তাঁর জ্বর, অর্শ, আমাশয়, ফোলা প্রভৃতি একটা-না-একটা রোগ প্রায় লেগেই থাকত।

সুধীরচন্দ্র সরকারকে লেখা

পত্র ১

১ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স নামক পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স শরৎচন্দ্রের *পরিণীতা* (আগস্ট ১৯১৪), *পণ্ডিত মশাই* (সেপ্টেম্বর ১৯১৪), *চন্দ্রনাথ* (মার্চ ১৯১৬), *নিষ্কৃতি* (জুলাই ১৯১৭), *চরিত্রহীন* (নভেম্বর ১৯১৭) ও *নারীর মূল্য* (মার্চ ১৯২৪)—এই ছয়খানি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (*নারীর মূল্যে*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করেছিলেন।

২ এই সময় *চন্দ্রনাথ* ছাপা হচ্ছিল।

পত্র ৪

১ চিঠিটা কাকে লেখা তা জানা যায় না।

২ *পল্লীসমাজ* উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রমা' নাটক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি, শরৎচন্দ্রের নামে যে 'রমা' নাটক প্রচলিত তা একরূপ তিনিই (হরিদাসবাবুই) রচনা করেছিলেন। কেন না তিনিই প্রথমে নাট্যরূপ দিলে পরে শরৎচন্দ্র তাতে স্থানে স্থানে সংশোধন ও কিছু কিছু অদলবদল করেছিলেন মাত্র। এই গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠায় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছি হরিদাসবাবু কলেজে পড়ার সময়ে কলেজের নাটক-অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এই নাট্যানুরাগ থেকেই হরিদাসবাবু পরে তাঁর কয়েকজন ধনী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে 'আর্ট থিয়েটার' নামে একটা থিয়েটারের দল গঠন করেছিলেন। এই 'আর্ট থিয়েটার' সেকালের একটা নামকরা থিয়েটার ছিল।

সুবোধ রায়কে লেখা

১ চুঁচুড়া-নিবাসী জনৈক সাহিত্যিক।

মুরলীধর বসুকে লেখা

১ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মুরলীধরবাবু কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে *কালি-কলম* নামে একটা কাগজ বার করেছিলেন।

শিবপুরের চিঠি

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১

শিবপুর
২৯, ৬, ১৬

ভায়া,

আমাকে ব্যথাটা কুঁজো করে ফেলেছে। কাল খুবই ভিজে বাড়ল বোধ করি। আসলে ব্যামোই আমার এই বুকটা।

কাল যে বলেছিলাম একটা পরামর্শ করবার আছে। পারটিকুলার্স্ না জানায় কাল সুবিধা ছিল না। চিঠি লিখেও সব কথা বলা যায় না। কিন্তু সময় নেই, যা পারি চিঠিতে বলি। একটা জবাব দিয়ে দেবেন। হয়তম ৩।৪ দিন বা বেশি দেখা হবে না।

জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর[১] বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে',[২] আমার কাজ কর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই। কিন্তু আপনার কাছে ধার করার একটা ভাব্না এই যে, আমার শরীরের অবস্থায় সব রকম সম্ভব। যে দেনা পূর্বে থেকেই আছে, সেটাই যে কতদিনে শোধ যাবে জানিনে, তার ওপর এ দেনা শোধ যাওয়া সম্ভবও খুব অসম্ভবও খুব। দেহ ভাল থাকলে জোর করেই চাইতাম। কি রকম ব্যবস্থা করলে যে ভবিষ্যতে আপনাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয় এটা আপনিই ঠিক করে দেবেন। আমি তাই করব। আমি ঠিক জানি তাই সব চেয়ে ভালো হবে।

সুরেন[৩] আজ যে চিঠি লিখেচে সেটা এই সঙ্গে পাঠালাম। তারও একটা জবাব দেবেন। আমি চিঠি লিখে দেব।

আমি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যদি কোন রকম ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে লিখে দেবেন. আমি কাল একটা গাড়ী ভাড়া করে যাব। আর যদি সে প্রয়োজন না বোঝেন খোকাকে[৪] টাকা দিতে পারেন এবং সাবধানে নিয়ে আসতে বলে দেবেন। কিন্তু একটা খামের ভিতরে পুরে।

একটা বই বিক্রী করলে চলে হয়ত। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে না সরকারদের[৫] কাছে এ কথা বলি। কি রকম করা সম্ভব জানাবেন।

আপনার
শরৎ

২

৫, ফার্স্ট বাই লেন, বাজে শিবপুর
২-২-১৭

পরমকল্যাণবরেষু,

হরিভায়া, কাল রাত্রে আসার পর নানা কারণ ঘটায় আজ সকালেই আপনাকে পত্র লিখিতেছি। গিয়া বলিলেই হয়ত ভাল হইত কিন্তু সে সময়ও নাই। কোথাও যাইতে ইচ্ছাও করিতেছে না। বাড়ীটা বদলাইতেই হইবে।

১। আপনি আমাকে ২০০ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এ টাকাটা বোধ করি ২ মাস পরে ঐ ওদের (সরকারদের) হিসাব থেকে শোধ হতে পারবে। না পারে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততঃ অনেকটা হবে।

২। ডাক্তার প্রভৃতির দাম চুকিয়ে দিয়ে বেশি কিছু যে বাকি থাকবে মনে হয় না।

তা ছাড়া এই ৫।৬ মাস থেকে দেখচি আমার অবস্থার পক্ষে বেশি খরচ হচ্চে। আমার প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ডএর দরুন টাকাটাও ইতিমধ্যে গেছেই, তা ছাড়াও ধার। বেশি ওষুধ আর বদ্দিতে।

অথচ আপনার কাছে ডেবিটের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেচে—শোধ হবার ত কোন আশাই দেখিনে। দেখচি ১২৫এর কমে মাস চলেই না। (তা ত হবেই) আফিংই ত লাগে ১৪।১৫ টাকা। তার ওপর এই মাস থেকে আবার— বাড়ী ভাড়াটাও ৮টাকা বাড়বে।

শনিবার দিন আমার ভাইকে না হয় ইঁদুর[১]কে পাঠিয়ে দেব। একটা খামের মধ্যে মুড়ে দেবেন।

এখন গুছিয়ে লেখা গেল না। যখন দেখা হবে বলব।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশা করি ত অন্ততঃ এই সব হতে পারলেই অশান্তিগুলো যাবে। আর যাওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

শরৎ

৩

বাজে শিবপুর
২রা মাঘ, ১৩২৪

ভায়া,

এঁকেত আপনি বেশ চিনেন, তাই পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। আপনার অমতে বা যাতে আপনার কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে কাজ যে আমি করিব না, সে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। যে কারণে আমি এই লোকটির মঙ্গল ইচ্ছা করিতেছি, সেই হেতুটা আমার অনুরোধে এঁর মুখেই শুনুন। আমি নিশ্চয় জানি, রিজ্নেবল্ যা কিছু এবং তাতে যদি কারও সত্যকার উপকার হয় তাতে আপনার সহানুভূতি আছেই।

আমি এঁকেত বুঝাইয়া বলিয়াছি যে, হরিদাস আমার পাবলিশার্ নয়, সে আমার ভাইয়ের

মত স্নেহের বস্তু এবং হিতৈষী। সে যদি আমার কোন কাজে ক্ষুণ্ণ হয় তা আমাকে দিয়া হইবে না।

সকল কথাই স্পষ্ট বলিয়াছি এবং এই লোকটিও দেখি (অন্ততঃ এখন) স্পষ্ট কাজ করিতেই চায়।

জীবনে মানুষের ত অনেক ভুল ভ্রান্তিই হয়— সে কিছু নূতন করিয়া আপনাকে মনে করিয়া দেওয়া প্রয়োজন নয়।

তাই এর প্রার্থনা যদি সঙ্গত হয়, আর যদিই বা আমাদের একটু কিছু সাহায্য করিলে এর বিশেষ উপকার হয়, তাই আপনাকে বলিতে এবং আপনার সম্মতি লইতেই পাঠালাম।

যদি ছেলে খেলা হয় তাও দয়া করিয়া এঁকে বুঝাইয়া দেবেন। আপনার এক্সপিরিয়েন্স ও মুখে না হোক মনে মনে স্বীকার করিবেই। কেনই বা এ বেচারার ক্ষোভ থাকে যে হয়ত কিছু একটা ভবিষ্যতে করিতে পারিতাম— শুধু পরের জন্যই হইল না।

আপনার সময় অল্প বটে, তবে, ইচ্ছা করিলে একটু সময় করিতেও পারেন। এই আমার আবেদন ও নিবেদন।

আঃ শ্রীশরৎদা

৪

১লা নভেম্বর। '১৮
বাজেশিবপুর

পরমকল্যাণবরেষু,

আজকাল ভাল আছি বটে, কিন্তু কলকাতায় যেতে ডাক্তার বারণ করেন। অনেক দিন থেকেই দেহটা বোধ করি নিস্তেজ হয়ে আসছিল, তাই ডেঙ্গু, ওয়ার-ফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা কোনটাকেই এ বছর বাদ দিতে পারলাম না।

মনে করচি, কিছুদিন ভাগলপুর থেকে ঘুরে আসি। বাড়ীর ডাক্তার আছে, বিশেষ ভয় নেই।

আসল কথা কিন্তু 'ভারতবর্ষ' নিয়ে। দাদার[১] সহে্গ কতকটা কথাবার্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন মীমাংসা হোলো না, একেত এবার দারজিলিঙ্ থেকে আসার পরে তাঁর কানের এতটা উন্নতি[২] হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দু-চারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে। আমি ত আজকাল জোরে কথা কইতেও পারি নে, পারাও বারণ।

আপনার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারলে ভালই হোতো, কিন্তু আমার ত নড়বার চড়বার জো নেই। আপনিও যে কাজকর্ম ছেড়ে আসতে পারেন সেও সম্ভব মনে করিনে। তবে রবিবার দিন দুপুর বেলা গাড়ী করে যদি এদিকে একটু বেড়াতে বার হন ত হোতেও পারে।

ভাবছিলাম কিছুকাল যদি লেখা-পড়া বন্ধ করি ত সত্যিকারের কোন প্রকার অপযশ আপনাদের কাগজে পৌঁছয় কিনা।

আবার এমনও হোতে পারে হয়ত দু-পাঁচ দিন ভাগলপুরে বাস করার পরেই লেখার এনারজিটা ফিরে পেতে পারি। সে হলেত ভাল হয়।

আমার নাটকের কতদূর হোলো? বোধ করি শেষ হয়ে গেছে? একটা উত্তর দেবেন।

আপনাদের— শরৎদা

৫

বাজেশিবপুর
২১শে চৈত্র, ১৩২৫

ভায়া,

এখনই বেলগেছেতে[১] যাচ্ছি এবং একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে মণ্টুর[২] জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, পাছে তাকে এতদূরে এসে ফিরে যেতে হয়। বিশেষতঃ এণ্ডারসন সাহেবের জন্যে একটা চিঠিও দিতে হবে— যদি তাকে দিয়ে একটু কাজ পাওয়া যায়[৩]। নইলে নিজেই দেখা করতাম।

কাল বাড়ী এসে চিঠি পেলাম। অনেকদিন থেকে রূপনারায়ণ নদীর ধারে[৪] একটা মাটির বাড়ী করবার চেষ্টা করচি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে আমার ভারি মায়া হচ্চে। তাছাড়া বাড়ী করার খরচটাও বেশি থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে সেদিনের টাকা থেকে নিজে ৭০০ টাকা দিই, আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০ তাহলে সুন্দর সুবিধে হয়।

আর যদি ৪০০ টাকা দেওয়ার অসুবিধে হয় তাহলে আর করি কি! তাই ইঁদুরের হাতে একখানা ক্রস্ চেক ফর ৪০০ পাঠালাম। নেন ত নেবেন না হয়। কিন্তু টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। সই ঠিক আছে— ফেরৎ আসবে না।

আশীর্বাদক—
শরৎদা

৬

বাজেশিবপুর, ১১.৮.১৯

পরমকল্যাণবরেষু,

সেদিন রাত্রে যে গ্রন্থাবলী করার একটা কল্পনা হয়, সেটা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহা অত্যন্ত নীচতা। যাহার জন্য সতীশবাবু[১] এক বৎসর যাবৎ আসা-যাওয়া করিতেছেন সেটা না হয় নাই হইল, কিন্তু অপর কোথাও করা অত্যন্ত ঘৃণিত নীচাশয়তা। যাহাকে নীচতা বলিয়া বুঝিব তাহা করিব না।

অবশ্য এ কল্পনা আমি কাহাকেও বলি নাই এবং বলিবও না। আপনিও কাহাকেও বলিবেন না আশা করি।

সতীশবাবু আজ সকালেও আসিয়াছিলেন। মত দিই নাই, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে এরূপ ইন্‌ভল্‌ভড হইয়া পড়িয়াছেন যে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়। আপনার আশ্রয়ে আমার একপ্রকার করিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু— আজ এই পর্যন্তই ভাবিতে পারিয়াছি। তিনি বলেন ত এই তিন বৎসরে ২৫।৩০ হাজার টাকা হয়ত দিতেও পারেন— অসম্ভব নয়, সম্ভবও নয়। অথচ সে হইলে আমার পশ্চিমে যাওয়ার একটা উপায় হয়, ইহাও সত্য। ওদিকে যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

আগামী বৃহস্পতিবার কিম্বা শুক্রবার যাহোক একটা ফাইন্যাল করিয়া ফেলিব। এই ক্রমাগত লেখার উপর খাওয়া পরার নির্ভর করাটা ভাল নয়,— আর ইহাও মনে করি— এরা যে টাকা দেবে বলে— সে তো বর্তমান অবস্থায় সারা জীবনেও পাওয়া যায় না।— অবশ্য জীবনটার মেয়াদ যদি আরও ১০ বছর ধরা যায়। আপনার দোকানের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে— আবার নাও হইতে পারে। কারণ— চিপ এডিশন তারাই কেনে যারা কোন কালে বই কেনে না। চলিতে অক্ষম না হইলে বোধ করি নিজেই একবার যাইতাম। আমার আশীর্বাদ জানিবেন !

শরৎদা

৭

৭,৪,২০
২৬৬ শিবালয়
বেনারস সিটি

পরমকল্যাণবরেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। এখানে[১] ভারি গরম পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত মন টেকে না এমন হইয়াছে। কাল ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস যাওয়া যায় না— একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর[২]। শ'দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

একছত্র লেখা বার হয় না, একি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি। এমন মনে হচ্ছে বুঝিবা আর কখনো লিখিতেই পারব না, যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে— কে জানে !

একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন— তিনি ত আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ করে রয়ে গেলেন, আমিও হাঁ করে রয়ে গেলুম ! আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল ! আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরও বিভীষণ ! তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোন্ মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী ! অবশ্য আমি নিজের আইডেনটিটি গোপন করেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারি পশার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন— পারিশ্রমিক ত নিলেনই না— বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন— ইনি কে এবং কোথায় আছেন ! ধর্মস্থানে বৃহস্পতির এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি ! আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের[৩] ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, একি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু কিন্তু ৪৮এ কিম্বা বড় জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে

মৃত্যু বললেন না— উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বলতে লাগলেন— এঁর যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয় ত তারপরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন !!![৪] তবে রক্ষে, এই যে সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি করে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বলতে পারলেন, আমি ক্রমাগত তখন থেকে তাই ভাবচি। কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের[৫] দলে গিয়ে মিশি।—

শরৎদা

আমাকে আপনারা এখন থেকে 'সমীহ' করে চলবেন। নিশ্চয়ই একটা 'কেউ-কেটা' নয়— চাই কি শাপ-মন্যি দিয়ে ভস্ম করেও দিতে পারি। আবার রাজা করেও দিতে পারি।

এখানে আরও একজন নামজাদা গোণক্কার আছেন— সুধীর ভাদুড়ি। ইনিও গণনা করলেন—আমি যে একটা ভয়ানক ধার্মিক লোক এ সত্য ইনিও আবিষ্কার করেছেন ! দেখচি আবার সেই দলে গিয়ে আমাকে ভেড়ালে।

৮

বাজে শিবপুর
১৫, ৫, ২০

ভায়া,

অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির— আপনি আমার চসমাটা বামাপদর দোকান হইতে আনাইয়া লইয়া— সেই আপনার নিজের লোকটিকে দিবেন। সুধা[১] জানে কি রকম এক কাঁচের চশমা করা চাই। নম্বর (+২·৫) দামও শুনি ১৮ , ২০ টাকা। বাস্তবিক জুতায় যদি পরের কথায়—৩২। ০(?) খরচ করিয়া ফেলিতে পারি[২]— আপনাদের কথায় ১৮ , ২০ টাকা খরচ করিব এ আর বিচিত্র কি? আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।

যাক্, আপনাদের কথাই রাখি— ঐ এক কাঁচেই (+২·৫) চশমা করিয়া দিন। ফ্রেম সোনার ত আছেই। বাতিল— কাঁচগুলাও— ত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

শরৎদা

৯

বাজে শিবপুর
হাওড়া
২১শে ভাদ্র' ২৯

ভায়া,

শিশিরবাবুর[১] ঠিকানা জানিনে, আপনি একবার যদি কোন উপায়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন! 'আঁধারে আলো'[২] কতদূর হ'ল জানেন কি? একটা কথা শুনলাম যে গল্পের ঠিক

স্পিরিটটা নাকি দুএক জায়গায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে— হলে আমাদের দু পক্ষেরই ক্ষতি। ভবিষ্যৎ দু দিকেই একটু ডার্ক আভায় দেখা দেবে। দেখুন, আমি ত অনেক ভেবে চিন্তেই গল্প লিখি। সুতরাং তাকে বদ্‌লাবার আবশ্যক হলেও একটু ভেবে চিন্তেই করা উচিত।

আপনাকে যে লিখলাম তার কারণ আপনি নিজেও একটু মাঝখানে আছেন। তাঁদের প্লটটা একবার যদি দেখবার সুযোগ হ'ত তাতে কোন পক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা ত নাই-ই, আমিও একটু আধটু সাজেষ্ট কোরতাম। জিনিসটা দর্শকের মনোরঞ্জন করা এই ত? পাঠকের যদি করতে পেরে থাকি (একটু শিখিয়ে নিলে) ত এদেরও পারব— অন্ততঃ ভরসা ত হয়।

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

ভাগলপুর

১৫ই কার্তিক ১৩৩২

ভায়া,

অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, ভরসা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল।

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এখানে[১] এসে আট্‌কে গেছি। আমার ভোলা চাকর কালাজ্বরে শয্যাগত। বহু ইন্‌জেকসান দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আনি! এখানে পূজো বাড়ীর নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পিলে এম্‌নি দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর আমার?

১৫।২০ দিন পূর্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে। এখানে এসে এমন সুন্দর হয়েছে যে পিছনে কামান দাগ্‌লেও চম্‌কাইনে। আমার সম্পূর্ণ আশা হয় যে, শ্রীযুক্ত জলধর দাদাকে এবার আপনি বিদায় দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের ট্র্যাডিশনের কোন প্রকার অমর্যাদা হবে না[২] এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না। এইত সম্বাদ! আপনার শ্রীঅর্শ কেমন আছে জানতে পারলে সুখী হব। আশা করি সেরে গেছে এরূপ দুঃসম্বাদ দেবেন না।

সুধাকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।

শুঃ— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

১

৬, নীলকমল কুণ্ডু লেন,
বাজে শিবপুর, ১৯, ৯, ১৬

সবিনয় নিবেদন,

কোন কারণেই যে হঠাৎ আপনার চিঠি পেতে পারি এ আশা আমি কখনো করি নি। আজ শ্রীমান্ মণ্টুরও একখানা চিঠি পেলুম।

প্রায় মাস পাঁচেক হ'তে চল্ল আমি এ দেশে এসেচি। আসা পর্যন্তই আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেচি কিন্তু ঘটে ওঠে নি। একে ত কোথা দিয়ে গেলে আপনার বাড়িতে পৌছানো যায় তা জানি নে, তার ওপর এও একটা সঙ্কোচ ছিল, পাছে অসময়ে গিয়ে আপনার সময় নষ্ট করি। এখন আপনি নিজেই যখন ডেকেচেন তখন ত নিশ্চয়ই যাবো। দেখি, কাল বুধবারে যদি আপনার আফিসে গিয়ে হাজির হ'তে পারি। না পারি শনিবারে আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাবই।

আমার দেখা করবার একটা বিশেষ হেতু আছে। আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ, একটু বেশি রকম পক্ষপাতী। তাই বাইরের লোকেরা আপনাকে যখন গালি-গালাজ করে তখন আমারও লাগে। দুই পক্ষের লেখাই আমি মন দিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার মুসকিল হয়েচে এই যে, না পারি ঠাওরাতে আদের ক্রোধের কারণ, না পারি বুঝতে আপনি বা কি বুঝিয়ে বলেন। এ-সব তর্কাতর্কি নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের হয় তাতে আমার সংশয় নেই। কিন্তু, ছাপার অক্ষরে একটা অক্ষরও আমার মাথায় ঢোকে না। আমার বুদ্ধিটা মোটা ; কোন জিনিস সেই জন্যে বেশ একটু মোটা ক'রে বুঝতে না পারলে আমার বোঝাই হয় না। দেখা করবার হেতু এই। ভেবেচি, মুখোমুখি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেব ব্যাপারটা বাস্তবিক কি। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর পণ্ডিত মশাইকে একদিন এই প্রশ্নই করেছিলুম। তিনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। আমাদের মণিলাল[১]কেও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার আপনার পালা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু (নাট্যকার) এক দিন আমাকে বলেছিলেন, আমি বাঙ্লা সাহিত্যের একটি রত্ন।[২] তার কারণ আমি যে ভাষায় লিখি তাই ঠিক। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র ওঁরা ভাষাটাকে একেবারে মাটি ক'রে দিচ্চেন। ওঁদের ওটা ভাষাই নয়। আমি নিজে কিন্তু কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলুম না, আমার ভাষার সঙ্গে 'সবুজপত্রে'র ভাষার পার্থক্যটা কি। এই কথাটাই আপনার কাছে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে বুঝে আসব।

আমার কোন লেখা আপনি পড়েছেন কি না জানি নে, যদি প'ড়ে থাকেন তা'হলে কোন অসুবিধেই হবে না।

পণ্ডিত মশাই সেদিন বলেছিলেন বাঙ্লা ভাষাটা সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়া চাই এবং তাই নিয়েই বিবাদ। কিন্তু ঘেঁষাটা যে কতখানি চাই তা তিনিও জানেন না, আপনারাও না। দেখি এই মীমাংসাটা যদি আপনার কাছে গেলে হয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

৬নং নীলকমল কুণ্ডু লেন
বাজে শিবপুর
২১, ৯, ১৬

সবিনয় নিবেদন,

কাল আপনি আমাকে একখানি বই দিয়েছিলেন।[১] এই বই পাওয়াটা আমার এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে তা থেকে একটা বিশ্রী বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়েচে। সে বই পড়ি আর না পড়ি পাওয়াটা স্বীকার করা যে অন্ততঃ একটা ভদ্রতা এও আর যেন মনে পড়ে না। কথাটা দম্ভের মত শোনালেও জিনিসটা সত্য। তাই আপনার বইখানা অনেক দিনের পর এই ত্রুটিটা আজ যখন প্রথম দেখিয়ে দিলে তখন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ত পারি নে। এক দফা ধন্যবাদ এ জন্য আর এক দফা ধন্যবাদ এই চিঠির শেষে পাবেন।

কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প প'ড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাই নি। এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা। এ কাজ অনেকেই করবেন ব'লে আপনাকে যে দিনরাত শাসাচ্চেন সে ইঙ্গিতও কাল আপনার ঘরে ব'সেই শুনে এলুম। সুতরাং এ কাজ আমি করব না। কিন্তু তাঁরাও যে কি করবেন, শিব গড়বেন কি বাঁদর গড়বেন সে তাঁরাই জানেন। তাঁদের ভাল লেগেছে— এ এক কথা, কিন্তু এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য কোন্‌খানে কোথায় এর মধুর কাব্যরস— সবচেয়ে এ লেখা লিখ্‌তে পারা যে কত শক্ত, এ কথা বুঝবে বোধ করি শুধু তারাই যাদের নিজেদের হাতেকলমে লেখার বাতিক আছে। আর সে লেখা পড়বার বাতিকও দেশের পাঁচ জনের আছে। কিন্তু সে যাক্। আমার আসল কথাটা এই যে, এক রবিবাবুর লেখা প'ড়ে মনে হয়েচে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারি নে, আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা প'ড়ে মনে হ'ল চেষ্টা করলে আমি এমন ক'রে কিছুতেই লিখ্‌তে পারি নে। এই কথাটা জানাবার জন্যই এই পত্র।

কাল সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষ' আফিসে আসি এবং সেইখানেই 'সোমনাথের গল্পটা' শেষ ক'রে জলধরবাবু প্রভৃতি কয়েক জনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। আমি আমার মত এই ব'লে দিই যে, এ বই পড়া উচিত তাদেরই বেশি কোরে যারা নিজেরা বই লেখে। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা সরল কথোপকথন অথচ এমনিই রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল, মুক্ত পথ তাঁরা যত শিখ্‌তে পারবেন, যারা বই লেখে না তারা তেমন কোরে শিখ্‌তে পারবে না। তাদের শুধু ভালই লাগবে কিন্তু গ্রন্থকারদের ভালও যেমন লাগবে শিক্ষাও তেমনি হবে। এই আমার মোটের উপর বক্তব্য। এখানে একটা অনুরোধ আপনাকে কোরব। আপনি দয়া ক'রে এইটে মনে করবেন না যে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভেতর এতটুকু অত্যুক্তি— ইতর লোকে যাকে বলে 'খোসামোদ' তাই আছে। কারণ আমি জানি ইতিমধ্যে যত লোকের যত প্রশংসা আপনি এই 'চার-ইয়ারি' উপলক্ষে পেয়েছেন তার মধ্যে উপরোক্ত এই ইতর কথাটা যে আছে তা নিজেই হয়ত অনুভব করেছেন। অন্ততঃ আমি হ'লে ত তাই করতুম। কারণ, এটা আমি নিশ্চয় বুঝতুম এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। তারা বুঝবেই না।* ইংরিজিতে যে একটা কথা আছে 'আর্ট টু হাইড আর্ট' সেটা তারা

না ধরতে পেরে মনে করবে এর চাঁচা-ছোলা সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্যই নেই। এই ধরুন না মাড়ওয়ারীরা বাড়ি তৈরি করায় এবং তাকে পয়সা খরচ ক'রে কারুকার্য করিয়ে নেয়।

পাঠকের ইন্‌টেলিজেন্স এবং কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছুন পর্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হ'তেই পারে না। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌চি নে। সেদিন যে আলোচনা হয় তা থেকেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম। যাক্। আবার যদি কখনো দেখা হয় এ-কথা হবে। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে আজ বিদায় নিলুম। এমনও হ'তে পারে আমার ভাল লাগার দাম হয়ত আপনার কাছে খুবই সামান্য।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

শিবপুর
২, ১০, ১৬

আজ এইমাত্র আপনার পত্র পেলুম। সেদিন আপনাকে যে চিঠিখানা লিখেছিলুম, অথচ পাঠাই নি— পাছে হঠাৎ আপনি কিছু একটা মনে ক'রে বসেন— সেইখানাই আজ পাঠিয়ে দিলুম। একদিন যেদিন হোক আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাব।— শঃ

* সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?
আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত নন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' প'ড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েচে ব'লেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।—শঃ ২-১০-১৬।

৪

৬, নীলকমল কুণ্ডু লেন
বাজে শিবপুর. হাওড়া
১১-১০-১৬

সবিনয় নিবেদন,

কয়েক দিন হ'ল আপনার চিঠি পেয়ে জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে আছি। যাওয়াও ঘটে উঠ্‌ল না ব'লে নিজের মনেই এক প্রকার ক্লেশ বোধ করচি। পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে যদি বাড়ি থাকেন, বিকালবেলায় একবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু কি একটা আমার স্বভাব বড়লোকের বাড়ি যাবো মনে হ'লেই কেমন সমস্ত মনটা দ্বিধায় সঙ্কোচে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাই যাই-যাই ক'রেও যাওয়া হয় না।

এই সঙ্কোচটা যদি কাটাতে পারি পরশু নিশ্চয়ই গিয়ে হাজির হব, আর যদি না যাই ত তার কারণ আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না। সে কথা কিন্তু যাক্।

আপনার এই বইখানার সমালোচনা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা অতি উচ্ছ্বাসের দোষেই যে কাগজওয়ালাদের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি তা বোধ হয় নয়। আপনি ত জানেন আমাদের কাগজে 'নামের ভার' না থাক্‌লে ধারটা কেউ অর্থাৎ কোন সম্পাদক যাচাই ক'রে দেখ্‌তে চান্ না। আমার সমালোচনা নিশ্চয়ই ভালো হবে না, কারণ, এ বিষয়ে শক্তি আমার বড় কম কিন্তু নামটা নীচে লিখে দিলেই যে-কোন কাগজেই তা স্থান পাবে ; সুতরাং তাই আমি আগামী মাসে করব কিনা ভাব্‌চি। হয় 'ভারতবর্ষে' না হয় 'প্রবাসী'তে।[১] তবে, কিনা অক্ষমের তুলির আঁচড়ে জিনিসটার চেহারা পাছে আজ-কালকার ইণ্ডিয়ান আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনার মত দেখায়, সেই আমার ভয়। আর আপনার নিজের ত তাহলে কথাই নেই— আহ্লাদ রাখবার আর জায়গাই থাক্‌বে না। তবে যদি অভয় দেন ত করি।

আপনার 'বড়বাবুর বড়দিন'— শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু[২]রা যাকে বলেন 'মুন্সিয়ানা' তার যদিচ কোনো অভাব নেই (না থাক্‌বারই কথা !) আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমঝদারদের সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই টের পাচ্চেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেচেন, একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোল্‌বার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমিও যে তা বলি নে তা নয়। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস ক'রে তুল্‌তে আপনি ভারি পারেন, কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ ক'রে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প ক'রে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেম্‌নি ক'রে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই— অথচ, কত বড় না একটা জীবনের ট্র্যাজিডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড্ বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। তাইতেই সেদিন লিখেছিলুমও চারইয়ারির কথাগুলো ঠিকমত বোঝবার জন্যে পাঠকের এডুকেশন এবং কালচার বিশেষ একটা পর্যায়ে পৌঁছান দরকাব। তা না হ'লে এর সমস্ত সৌন্দর্যই তার কাছে ঝুটো হয়ে যাবে।

কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা লেখায় কোনমতেই থাকা সম্ভবপর নয়, থাকেও না। বোধ করি এই জন্যেই 'বড়দিন' আমার ভাল লাগে নি। ওর মরালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।

আবার এমনও হ'তে পারে আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি। হয়ত তাই। সুতরাং আমার ভাল না লাগার দাম একেবারে নাও থাক্‌তে পারে। হয়ত বা আগাগোড়াই অনধিকার-চর্চা ক'রে যাচ্চি। তা যদি হয় আমাকে মাপ করবেন। অনধিকার-চর্চার কথাটা আমি অতি-বিনয় ক'রে বলচি নে। কারণ, আমি লেখাপড়া শিখিনি,[৩] ইংরিজি ভাল ক'রে না পড়াশুনা থাক্‌লে লেখার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয় না। এ ক্ষমতাটাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

বড় বড় লোকের বড় বড় সমালোচনা যারা পড়ে নি, তারা স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে অমনি এক রকম ক'রে বুঝতে যে পারে না তা নয় বটে, কিন্তু যে-সব জিনিস তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তাদের ভেতর তারা এক পাও ঢুক্‌তে পারে না। কপাট যে বন্ধ, সে যে

বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শুধু বন্ধ কপাটের পানে চেয়ে আছে এও ঠাওর পায় না। এই জন্যেই ত সব জিনিসেরই সবাই সমালোচক। মনে করে কথার মানেগুলো যখন বুঝ্‌তে পারচি তখন সমস্তই বুঝচি। ইংরিজির কথা এই জন্য তুল্‌লুম যে বাঙ্‌লা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই সে শেখবার বালাইও নেই। এও যে রীতিমত সাক্‌রেদি ক'রে শিখতে হয় এ ধারণাও নেই।

আমার ধারণা আছে ব'লেই এত কথা বল্‌লুম। এ-সব কথা আমি বিদ্বান লোকের মুখে শুনেচি। অতএব, আমার ভাল-না-লাগার মূল্য আপনি এই আন্দাজে দেবেন। আমি জানি আমি যা-তা একটা সমালোচনা লিখে ছাপ্‌তে দিলেই তা ছাপা হয়ে যাবে এবং সেজন্য আপনার অনুমতি চাওয়াটাও বাহুল্য কিন্তু আপনার লেখার উপর আমার একটু বেশি শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার অক্ষমতা জানিয়ে আপনার মত জান্‌তে চাচ্চি। যদি আপত্তি না থাকে ত দুটো একটা কথা বল্‌বার সাধটা মিটিয়ে নিই। আমার বিজয়ার শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

১

বাজে শিবপুর,
২৯শে পৌষ ১৩২৪

শ্রীচরণেষু,

আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু[১]র কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎসবের সময় হয়ত আসিবেন; কিন্তু, তখন দেখা করা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন।

কয়েক দিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, এ সভায় আপনার পায়ের ধূলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না।

এবার যখন বাড়ি আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।[২]

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
২৬শে বৈশাখ ১৩২৯।

শ্রীচরণেষু,

ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না— এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই, বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্লা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্ব্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়লোকের বাড়িতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন, তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।[১]

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

বাজে শিবপুর
হাওড়া
২৯শে বৈশাখ '২৯

শ্রীচরণেষু,

ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন এত বড় অপবাদ যদি দিয়াই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা। অতএব, আপনার পত্রের স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

আমার অপরাধের কথা যাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা সীমা আর কোথাও ইহার রাখেন নাই। ইহার পরে আমি আর কি বলিব।[১]

আমরা প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

বাজে শিবপুর
হাওড়া
২রা মাঘ '৩০

শ্রীচরণেষু,

সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছু মাত্র অবকাশ নেই সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা কহার মতই সহজ, অথচ, একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।[১]

সত্যেন্দ্র[২] বেঁচে থাক্‌লে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় ক'রে আন্‌তে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হোতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি।

কলকাতায় এসে আপনার ত নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠ্‌ব না। আমার শত কোটী প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমল হোমকে লেখা

১

বাজে শিবপুর
১৬, ৮, ১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে।[১] ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন— এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ— দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে[২]। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণের' সময় সি, আর, দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।

তোমার কাগজের নামই শুনেছি— কখনো চোখে দেখি নি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর[৩]ত এখন জেলে। চালাও জোরসে! তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

বাজে শিবপুর
১২ই ভাদ্র '৩০

অমল,

আমাকে বিসর্জনটা[১] দেখাও। শুনলাম আবার না কি হবে। সেদিন সুধীরের[২] দোকানে গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা[৩] পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তো কার? অমন ইংরেজি কি ও বুড়ো লিখতে পারে? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা!

যাকগে ইংরেজি। আমি ওর কি-ই বা বুঝি? অভিনয়টা কিন্তু সত্যিই বুঝি। সখের থিয়েটার অনেক করেছি। ফিমেল পার্টও বাদ যায় নি। রবিবাবুর অভিনয় দেখি নি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম একবার। লোকটাকে হয়ত তোমরা রবিবাবুর নিন্দুক

বলেই জান। একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীতসমাজে বিসর্জন অভিনয়ের গল্পটা শুনতে! অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হচ্ছে, আর দুখানা দশ টাকার টিকিট কিনবে। তার পর আমাকে জানাবে ও যথাসময়ে এম্পায়ারের সাম্‌নে হাজির থাকবে। কিন্তু তোমারও কি টিকিট লাগবে অমল রবিবাবুর অভিনয়ে? তা লাগে লাগুক।

তোমাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহেন্দ্রনাথ করণ[১]কে লেখা

১

বাজে শিবপুর
শিবপুর,
১০, ১০, ১৮

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পড়িয়া সুখ-দুঃখ দুইই পাইয়াছি। আমার লেখায় আপনারা যে ব্যথা পাইয়া নীরবে সহ্য করেন নাই, ইহা আমাকে কম আনন্দ দেয় নাই। এ সম্বন্ধে আমি আজ পর্যন্ত ১২।১৪ খানি পত্র পাইয়াছি। প্রত্যেককে আলাদা করিয়া জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয় মনে করিয়া ছাপার লেখার ভিতর দিয়াই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্বেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে বসিলাম। কারণ, সকলের বেদনাই এক ওজনের নয়, এবং সকলেই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার অবসানের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমি 'দেশে' পোদ জাতির অস্পৃশ্যতার কথা যখন লিখি, তখন 'দেশ' বলিতে আমার নিজের গ্রামটাই মনে ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটি পোদ বালক পানের ব্যবসা করিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ছেলেটি আমার দিদিকে মা বলিত। তাহার এক সময়ে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক পীড়া হয়। দিদি তাহার বমি প্রভৃতি পরিষ্কার করায়, তাহাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করায় পাড়ার লোকে অনেক কথা বলে। দিদি তাহাতে এই জবাব দেন যে, আমাদের গৃহদেবতা 'দামোদর' যদি তাঁহার হাতে 'ভোগ' না খান ত তিনি স্বপ্ন দিবেন। কারণ এই বিশ্বাস বাড়িতে সকলের ছিল যে, কিছু একটা অনাচার হইলেই 'দামোদর' স্বপ্ন দেন। অবশ্য এবার তিনি কোন প্রকার আপত্তি করিয়া স্বপ্ন দেন নাই। সেই পীড়ার সময় আমার স্পষ্ট স্মরণ হয় দিদিকে দিনে ৫।৬ বার করিয়া স্নান করিতে হইত।

তবে, এখন সম্বাদ লইয়া জানিতেছি যে সকল জেলায় এক প্রকার প্রথা প্রচলিত নাই। যেমন আজও কোন কোন জায়গায় .... ছুঁইলে কাপড় ছাড়িতে হয়, কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে হয় না।

এইবার আমার নিজের কথা বলিব। আমার লেখার যথার্থ তাৎপর্য আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন জাতিকে আমি অস্পৃশ্য মনে করি না এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না। বরঞ্চ, লোকের যখন বাধে তখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে বাধে।

বই ছাপাইবার সময় এই ছত্রটা[২] ত আমি তুলিয়া দিব বটেই, আর ইহা জাতি-বিশেষের একটা মনঃপীড়ার কারণ হইবে বুঝিলে আমি লিখিতাম না। কিন্তু, আমার সকল লেখার সহিত আপনার পরিচয় থাকিলে এ সন্দেহ আপনার হইত না যে, উঁচু জাতকে সত্য সত্যই 'উঁচু' জাত মনে করিয়া তাহাদিগকে 'বড়' করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে বা 'নীচু' জাতিকে মনোবেদনা দিয়া হিউমার সৃষ্টি করিবার জন্য এ কথা লিখি নাই। বরঞ্চ উল্টা। ...

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

বাজে শিবপুর,
৪ঠা আশ্বিন '২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রখানি আমি দুইবার করিয়া পড়িয়াছি। আমার সেই পত্রখানির অংশবিশেষ যদি আপনার কোন কাজে আসে ত আমি খুশিই হইব। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন আমার লেশমাত্র আপত্তি নাই। তবে আমার চিঠি লেখার প্রণালী এত কাঁচা, এত এলোমেলো যে ভাষার দিক দিয়া একটু লজ্জা করে। মহেন্দ্রবাবু, আমি কেবল দুইটি জাতি মানি।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই কোন একটা সুনির্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের— মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনা বোধ, ইহার আন্তরিকতা,— এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগ্দীই বা কি— ওইগুলো না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনার জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বেশ নাম। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও কথাটাও ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমশঃ একটা বাদ দিলেই চলিয়া যাইবে।

আপনি ঘৃণা দিয়া ঘৃণার প্রতিশোধ দিবার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় আপনার কথাই সত্য। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, সেই জন্য মতামত দিতে পারিলাম না। তবে, এটুকু বুঝিতে পারি কেবলমাত্র ভাল মানুষের দ্বারাই সংসারের সকল কাজ চলে না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজী আবদুল ওদুদ'কে লেখা

বাজে শিবপুর, ২০-৩-১৮

সবিনয় নিবেদন,

দিন দুই হইল আপনার পত্র এবং 'মীর পরিবার' পাইয়াছি। শেষ গল্পটা (হামিদ) ছাড়া আর তিনটি গল্পই পড়িয়াছি। আজকালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটা ভাল কথা বলিতে, সর্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যই আমি ভারি খুশি হইয়াছি। এই আপনার প্রথম চেষ্টা হইলে ভবিষ্যতে যে আপনার কাছে অনেক বেশি আশা করা যায় তাহা বলাই বাহুল্য।

আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু, আমি নিজে এইরূপ রচনারই পক্ষপাতী। তবে একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। আমি অনেক দিন এই ব্যবসা করিতেছি, হয়ত যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছি,— আশা করি, অযাচিত উপদেশ দিতেছি মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। কথাটা এই যে, সকল জাতির মধ্যেই ভাল-মন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি— সমস্তই।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র[১]কে লেখা

৫ ফার্ষ্ট বাই লেন
বাজে শিবপুর, ১৯-১২-১৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সেদিনের কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়। ভারি আনন্দে বিকালটা কেটেছিল। আর একদিন গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার লোভটা আমার প্রায়ই হয়। কিন্তু আপনার সময় বড় কম, পাছে বিঘ্ন হই, সেই ভয়েই ওদিকে যেতে পারি না। অভয় দেন ত আর একদিন গিয়ে পড়ি। তাছাড়া আমার নিজের একটু গরজ আছে। আমি 'পল্লী-কাহিনী' বলে একটা বই লিখ্‌চি।[২] এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে এবং সুরেনবাবুর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। আর কিছু না হোক, তাতে উপদেশ নেওয়া ত হবে।

'পল্লী-সমাজে' আমার নিজের খেয়াল মত যা হোক একটা কিছু লিখেছিলাম। এবার পাড়াগাঁয়ের কোন বিশেষ দিকটা নেব তাই ভাবচি।

যদি দু'ছত্র লিখে সময়টা নির্দেশ করে দেন ত সেই মত যাবো।

আমার তামাকের বন্দোবস্তটা[৩] কিন্তু এবার নেহাৎ চাই-ই।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন—

নিঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিরুপমা দেবী[১]কে লেখা

বাজে শিবপুর
হাওড়া
২৭-৪-১৭

পরম কল্যাণীয়াসু,

তোমার প্রত্যাশায় ছিলুম। আজ পেলুম। বিপদটা মারপিট[২]। ভয় নেই। প্রায় কাটিয়ে এনেচি। কিছু বেশি খরচ হয়ে গেল। তা যাক্। বিভ্রাট কেন বাধালুম তা কি বলা যায়। ও যে আমার স্বভাব।

খুকি[৩] এসেচে? আবার ছেলেমেয়ে নিয়ে? খুকুমণির আবার ছেলেমেয়ে হ'ল কবে? এ তো ভারি আশ্চয্যি।

আচ্ছা, শীগ্গীর যাচ্ছি। একবার তাকে দেখা চাই। আমি তাকে বড় ভালবাসি।

খাতা দুটো পাঠিয়ে দিচ্ছি— দেরি হবে না।

হরিদাসকে[৪] বলতে তোমাকে ত কোন কথা আমি বলিনি। আমি শুধু লিখেছিলুম, যখন তোমার টাকা চাই তাকে লিখে পাঠিয়ো। শুধু, দুছত্র— 'এই ঠিকানায় আমাকে ১৫০ টাকা পাঠিয়ে দেন।' বাস্। নাইলে 'আমার গল্প নেন যদি' এই বলে আমি তোমাকে পরের কাছে চিঠি লিখতে বোলব? গঙ্গাপেরে[৫] লোক ছাড়া এত বুদ্ধি আর কার? তবে, একটা কাজ হাতে নিলে তার দায়িত্ববোধ যে তোমার আছে সে আমি জানি। শুধু মুরশিদাবাদের মানুষ বলেই একটু মনে করিয়ে দেওয়া। এই যা। সত্যি, এমন করে না লিখ্লে তোমার লেখা আর হবেই না। ধম্মকম্মর চাপে[৬] সাহিত্যচর্চার টিকিটুকুও তোমাতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি মনে করচি, এখন থেকে তোমাকে এমনি কোরে বাধ্য কোরে প্রতিমাসেই কিছু না কিছু লিখিয়ে নেব।

বুড়ি, সব লেখাই কোন লোকের সমান ভাল হয় না। 'দিদি' আর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' এর মত ভাল পাছে না দাঁড়ায়, এই ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে খাতিরটুকু বজায় থাকে, তাকে সম্ভ্রম বলে না দম্ভ বলে। কিন্তু তাই বলে রাগ কোরো না যেন। আমার মুখের কথা রূঢ় শোনালেও ভেতরে যে আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তাতে সংশয় কোরো না। তাছাড়া তোমাদের মানুষ করেচি বলে মনে মনে আমার একটা গর্ব আছে। অথচ, জিনিষটা সত্য নয়, তাও যে না বুঝি তাও নয়।— তবুও মুরুব্বিয়ানা করবার লোভ ছাড়তে পারিনে— শক্ত কথা বলে ফেলি।

আমাদের এবং আমার খবর ঐ এক রকম। আরও পাঁচজনের মত ভাল মন্দে মেশানো।

সেদিন বড় ভাগ্নীর ছেলে মরায় কাঁদাকাটা খুব খানিক্‌টে হয়ে গেল। আবার সেদিন দিদির এক জায়ের ছেলে এসেচে, তার মাথার চুল পর্যন্ত লিভার আর ন্যাবায় হল্‌দে হয়ে গেছে। তার আবার কি হবে খোদা জানেন।

আমার মুস্কিল হয়েচে এই যে, আমি শহরের কাছেই আছি। আর লাভ হয়েছে এই যে, আমাদের আত্মীয় কুটুমেরা আমাকে যে এত ভালবাসতেন তা প্রকাশ পাচ্ছে। এতদিন আমার বিরহে তাঁরা যে কি মনোকষ্টেই দিন কাটিয়েছেন, তা এখন টের পাচ্ছি।

আর বেশি কথা লিখবার সময় নেই। ভাগলপুর থেকে সুরেন[৭] এসে কাঁধে ঘোড়সওয়ার হয়ে বসেচে— এখুনি কলকাতায় যেতে হবে।

আমার শতকোটী আশীর্বাদ জানিয়ো। চিঠির জবাব দিয়ো এবং পুঁটুকে[৮] বোলো যে আমি চললুম বলে। আচ্ছা, তোমাদের ওখানে আজকাল মশা ও ছারপোকার দৌরাত্ম্য কেমন? বাইরের ঘরে শোবার যো আছে ত?

তোমাদের

শরৎদা

কুমুদিনীকান্ত কর[১]কে লেখা

বাজে শিবপুর
শিবপুর-পোষ্ট
হাওড়া

প্রিয়বরেষু,

দার্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া এইমাত্র তোমার পোষ্টকার্ড পাইয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি আশ্চর্য হইলাম।

আত্মমর্যাদা বোধ এবং চাকরি একত্রে দুইটা প্রায় অসম্ভব। তোমার পক্ষে এরূপ একটা ঘটনা যে কোনদিন না কোনদিন ঘটিবে আমি জানিতাম।

সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে তোমার কিছু একটা শাস্তি বোধ করি অনিবার্য, কিন্তু সে শাস্তি গুরুতর না হওয়াই সম্ভব। কারণ ঝগড়ার নিজস্ব মেরিট ছাড়াও তাহার অন্য হেতু আছে। সে যাক্, কিন্তু, চেষ্টা করাও প্রয়োজন।

আমি কালই রাখালের[২] সহিত দেখা করিয়া ডিটেল জানিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু, তোমার চিঠিতে প্রায় কিছুই খোলসা করিয়া লেখা নাই বলিয়াই বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমায় কি করিতে হইবে, তাহা পত্র পাঠ লিখিবে। অবশ্য আমার যথাসাধ্য করিবই।

(১) কাহাকে (সি, জি, র অফিস বলিতে ত কিছুই বুঝায় না। ব্যক্তি বিশেষের নামে ত চিঠি লেখা চাই) এবং (২) কি মর্মে চিঠি লিখিতে হইবে। (৩) তাহাতে কি প্রার্থনা করিতে হইবে। (৪) কাগজপত্র কাহার কাছে পাঠানো হইয়াছে, (৫) এ, জি,র কিম্বা ডেপুটি এ, জি, দ্বারা চিঠি লিখাইয়া পাঠানো দরকার। কিম্বা আর কোন বিশিষ্ট হইলেও হয় কি না। (৬) মারামারি কি গুরুতর? (৭) কি জন্যে হইয়াছে। (৮) রেঙ্গুনে কাহাকেও তোমার অবস্থা জানাইয়া এ, জি,কে জানানো হইয়াছে কিনা। (৯) তাঁহার রির্পোট তোমার সম্বন্ধে কিরূপ ইত্যাদি খুলিয়া লিখিয়ো।

তুমি ত জানো এখানে আমার পরম বন্ধু মণি মিত্র ডি, এ, জি আছেন, তাছাড়া এ, জি,র অফিসের অনেক বিশিষ্ট লোকই আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু কথা এই হইতেছে যে, তাঁহারা কাহাকে কি ভাবে চিঠি লিখিবেন? হঠাৎ সি, জি,র অফিসের কোন লোককে চিঠি লিখিয়া কি ফল হইবে ইহাই হয়ত তাঁহারা বলিবেন। একটু বিশেষ খোঁজ খবর লইয়া আমাকে ডেফিনিট্ পত্র লিখিবে, কারণ উতলা হইয়া অস্থিরচিত্ত ভাবে উপকার করিতে বলায় কিছুই ফল হওয়া সম্ভব নয়।

রেঙ্গুনের এ, জি,র অফিসে যাহাতে মন্দ রিপোর্ট না দেয় তাহার চেষ্টা সর্বাগ্রে করিবে, ফলাফল তাহারি উপর বিশেষ নির্ভর করে। আমি চিঠি ত অনেককেই লিখিতে বলিতে পারি, যেমন, বলরাম আইয়ার, মণি মিত্তির, উপেন মজুমদার, তা ছাড়া আরও অনেক অফিসার ত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ঠিক কি লিখিতে এবং কাহাকে লিখিতে বলিব?

মাথা ঠাণ্ডা করিয়া চিঠির জবাব দিবে এবং শীঘ্র দিবে, কারণ দুর্গাপূজা উপলক্ষে এখন প্রায় সমস্ত অফিসই বন্ধ এবং প্রায় লোকই কলিকাতা ছাড়া। অফিস খুলিলেই তাহারা ভ্রমণ সারিয়া ফিরিয়া আসিবেই।

যেন তোমার চিঠির জবাব পাই। আমি এক প্রকার ভালই আছি। তোমার অন্যান্য কুশল সমাচার দিবে।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

বাজে শিবপুর (হাওড়া)
২৪।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

আপনার পত্র এবং 'মিলন'[২] আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার বই যে আপনার ভাল লাগে ইহার চেয়ে গ্রন্থকারের বড় পুরস্কার আর কি আছে। আপনি ভক্তির দাবী জানাইয়াছেন। ভক্তি যেখানে শুধু বিনয় নয়, সত্যকার বস্তু, সেখানে এ দাবী আছে বৈকি। তবে, ভক্তি কাহাকে করি সেটাও একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেইজন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজের নন, তখন বিধবা-বিবাহ দিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা ক্ষণিকের খেয়াল 'হেম ও গুণী'র[৩] অবস্থা দেখিয়া করুণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে? এতে কি আপনার সত্যকার আপত্তি নাই? তা যদি থাকে, অথচ একটা 'মিলন' হইয়া গেলেও মনটা খুশি হয়— এই যদি হয় ত এ 'মিলনে'র বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে, লেখা হিসাবে অর্থাৎ রচনার ভাল-মন্দ বিচারে এ লেখার দাম ধার্য করিতে যাওয়া এটুকু চিঠির কর্ম নয়।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২৯।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না— আমি এম্‌নি অগাধ কুঁড়ে।

তবুও আপনাকে দু'খানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম যে কি করিয়া, ভাবিতে গিয়া দেখি ঐ যে আপনি ভক্তির দাবী করিয়াছেন,— উহাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বস্তুটা মানুষকে দিয়া কত অদ্ভুত কার্যই না করাইয়া লয়। আমাকে যে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে, তাহাকেই চিঠি লিখিতেছি, তাহার কথার উত্তর দিতেছি,— ইহার অন্তরে কি বিপুল অহঙ্কারই না প্রচ্ছন্ন থাকে!

আপনাকে আমি কিছুই শিখাই নাই, কখনো চোখেও দেখি নাই, কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কি পরিচয় কিছুই জানি না, অথচ, নিজেকে যখন আপনি আমার ছোট বোন বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, এ সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, তখন এ ভাগ্য যাহার ঘটে, তাহাকে এক প্রকার নেশার মত পাইয়া বসে।

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দুঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমিও যে আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পারি, প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনের মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পারিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমার বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুশি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, 'বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।' তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই— তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজকাল রাশি রাশি বাঙ্‌লা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে, শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রী হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে, তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার **পরিশিষ্ট**[১] লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,— স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্বাদ করিতেছি তুমি কাহারো চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। 'যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই...'

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে— অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন সত্তা নাই।

'হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা নাই তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?'

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

মঙ্গলবার। ৫ই আগস্ট '১৯
বাজে শিবপুর—(হাওড়া)

পরমকল্যাণীয়াসু,

আপনার খাতা এবং ভিতরের অন্যান্য লেখাগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি, এবং এত সত্বর উত্তর দিতে বসিয়াছি দেখিয়া অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। মনে হইতেছে এইবার আপনাকে

অনেক কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার মত গুছাইয়া পত্র লিখিবার শক্তি আমার এত অল্প যে হিতৈষী বন্ধুরা বেশ স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দেন যে আমার একান্ত বিশৃঙ্খল ও ছেলেমানুষের মত এলোমেলো পত্রের সমস্তটুকু পড়িয়া উঠিতে তাঁহাদের ধৈর্য রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে, এবং যদিচ কোন মতে তাহা শেষ হয় ত মানে বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয়। অভিযোগটা নিতান্ত যে ভিত্তিহীন নয় তাহা অতিবড় বিনয়ের দোহাই দিয়াও প্রতিবাদ করা চলে না। এবং ইহার নমুনা হইতে যে আপনাকে বঞ্চিত করি নাই এ সংবাদ গোপনে যদি আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রকাশ করেন ত আমি অভিমান করিব না।

যাই হৌক একটু ধৈর্য ধরিয়া পড়িবেন, এবং দুই একটা কথা জানিতে যে কৌতূহল হইয়াছে, সংলগ্ন মনে হইলে উত্তর দিবেন। খুশি হইব।

(১) আমার ঠিকানা জানিলেন কি করিয়া?

(২) একটা প্রবাদ আছে 'শ্রীকান্ত' বইখানা নাকি আমারই আত্মজীবনী। এ জনশ্রুতির ইঙ্গিত আপনার কাছে পৌঁছিল কোন্ সূত্রে?

(৩) পবিত্রকে[১] জানিলেন কিরূপে? সেদিন সে দেখা করিতে আসিয়া আপনার 'মিলন' গল্পটি আমার টেবিলের উপর হইতে লইয়া অতিশয় মন দিয়া পড়িতেছিল। অথচ, সে এমন কিছুই বলে নাই আপনার সে আত্মীয়।[২] সুতরাং আপনি তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন শুনিয়া বড় আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আপনার সে যে আত্মীয় এ কথা আমাকে না বলিবার হেতু কি যে থাকিতে পারে আমি কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। মনে হইতেছে তাহারই কাছে আপনি আমার খবর পাইয়াছিলেন। আবার দেখা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

আপনার সে আত্মীয় বলিয়াই রক্ষা, না হইলে আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার পত্র এবং লেখা অপরে পড়িয়াছে এবং সে সম্বাদ আপনি জানিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া আমি অতিশয় লজ্জা অনুভব করিতেছিলাম। তথাপি যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন।

(৪) আমার অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু আছেন। তাঁহাদের পত্র লিখিতে এবং বন্ধুর মতই অসঙ্কোচে লিখিতে আমার বাধ-বাধ করে না। কিন্তু আমাদের সমাজ এবং তাহার বিধি-বিধান এমন যে ছোট বোনটিকেও চিঠি লিখিতে শুধু সঙ্কোচ নয় শঙ্কা হয়, পাছে, আপনার অভিভাবক বা স্বামী কিছু মনে করেন এবং সেজন্য আপনাকে দুঃখ পাইতে হয়। আপনার আচরণে সকলে খুশি হন না, এই আভাসটুকু আপনার পত্রের মধ্যে একাধিকবার দেখিয়া ভয় হয় পাছে এজন্য কেহ আপনাকে খোঁটা দেয়। তবুও যে আপনাকে এত কথা লিখিতে বসিয়াছি তাহার এইমাত্র কারণ যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে আপনার পত্র পড়িয়া এই কথাই আমার বার বার মনে হইয়াছে, যে-বয়সে নারীর আত্মমর্যাদা জন্মে ইহা সেই বয়সের লেখা। এই গাম্ভীর্য, এই সাহস ও সংযম স্ত্রীলোকের পঁচিশের এদিকে জন্মিতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আপনার সম্বন্ধে আমার ভুল হইতেও পারে কিন্তু ভুল না হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব। কারণ, একান্ত তরুণ বয়সের অনাত্মীয় রমণীর সহিত পত্রের আদান-প্রদান করিতে কেন সঙ্কোচ ও দ্বিধা হয় যদি সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ত অনায়াসেই বুঝিবেন। তবে সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, আমাকে তুমি দাদা বলিয়া ডাকিয়াছ। দাদার কাছে ছোট বোনের লজ্জা করিবার বিশেষ কিছু নাই। বড় ভাইয়ের সম্মান এবং মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

আমাকে যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা হয় লিখিয়ো এবং যত খুশি দাদার উপর অত্যাচার উপদ্রব করিয়ো আমি আনন্দই পাইব।

তোমার চিঠির এবং লেখার ধরণ ও ভঙ্গী দেখিয়া আমার কেবল বুড়িকে মনে পড়ে। তোমাদের হাতের লেখাটা পর্যন্ত যেন এক।

এই ৪।৫ দিন জলে ভিজিয়া জ্বরের মত হইয়াছে— কোথাও বার হইতে পারি নাই বলিয়া তোমার খাতাখানা বেশ মন দিয়া পড়িবার অবকাশ পাইয়াছি। পড়িতে পড়িতে কি মনে হইয়াছে জানো? একটা দামী জিনিসের দোকান অগোছালো এলোমেলো হইয়া পড়িয়া থাকিলে যে জিনিসের দাম জানে তার যেমন কষ্ট বোধ হয়— ঠিক তেম্‌নি। ঠিক্ এই অবস্থায় একদিন বুড়ির লেখাগুলা পাইয়াছিলাম।

তোমার অনেক দামের মালমশলা মজুত আছে দিদি, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। আমার ব্যবসাও এই বলিয়া খালি মনে হয়, তার মত তোমাকেও যদি হাতে ধরিয়া বছরখানেকও শিখাইতে পারিতাম ত ইতিপূর্বে আমি যে আশীর্বাদ তোমাকে করিয়াছিলাম তা শাখায় শাখায় ফুলে-ফলে ফুটিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইত না। 'দিদি'র মত আর একখানা বই লোকের চোখের উপর পড়িতে অতি অল্প সময়ই লাগিত। কিন্তু সে যখন হইবার নয় তখন দুঃখ করিয়া আর কি করিব ! মনে ভাবি, এমনতর কত শতই না শুধু একটুখানি শেখানোর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কে তাহার খবর রাখে ! শুধু যে সব আবর্জনা, যারা কেবল চুরি করা ছাড়া আর কোন শক্তিই ধরে না তারাই কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি নোংরা দিয়া বাংলা সাহিত্যকে দূষিত এবং ভারাক্রান্ত করিতেছে। যারা সংসারে সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, নিজের প্রাণ দিয়া যারা স্নেহ প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়াছে, তারা আড়ালেই পড়িয়া থাকে। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া যাদের অনুভূতি শুদ্ধ ও সৎ হইতে পায় নাই,— তাদের উপরেই আজকাল সাহিত্যসৃষ্টির ভার পড়িয়াছে বলিয়াই বাংলা সাহিত্য আজকাল এমন করিয়া নীচের দিকে চলিয়াছে।

লীলা কেবল হৃদয়ে অনুভব করিলেই একটা জিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জিনিসই কিছু-না-কিছু শিখিতে হয়, এই শেখাটা কেবল নিজে নিজেই সব সময়ে হয় না।...

যাই হোক, তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনায় 'অধ্যায়' ভাগ করিতে হয়, এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না, সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। এবং বুদ্ধি-সাপেক্ষও বটে।

এখন হইতে সত্যকার শিক্ষা আরম্ভ হোক। অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার বইয়ের ধরণে লিখিতে সুরু কর এবং দুটো অধ্যায় করিয়া লিখিয়া আমাকে পাঠাও। আমি কাটিয়া-কুটিয়া (আমার সামান্য শক্তির মত) তোমাকে ফিরিয়া পাঠাইব। এবং তাহারই পাশে পাশে কেন কাটিলাম তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিব।...

তোমার খাতাখানা ২। দিন পরে ফিরাইয়া পাঠাইব। 'কালো' গল্পটাকে অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার 'পরিণীতা'র ধরণে আর একবার পাঠাইতে পারো না? দিদি, প্রথমে অনেক দুঃখ, অনেক

কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না। এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য! অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্যসত্যই নষ্ট হয় না— আর একভাবে ফিরিয়া আসে। রাত্রি অনেক হ'ল, উপরে যাবার জন্যে তিনি ভয়ানক চেঁচামেচি করচেন— তাই আজ এইখানেই শেষ করি। আজও পেটে ভাত পড়ে নি বলে বোধকরি চিঠিখানা আরও গোলমেলে হয়ে গেল, একটু কষ্ট করে পোড়ো এবং কোথাও যদি কোন কথা অসংলগ্ন বা দোষের থাকে বড় দাদা বলে মাপ কোরো। আমার আশীর্বাদ জেনো।

রাত্রি ১২।।০টা

তোমার দাদা

পুঃ— যখন বুঝিব, তখন আমি নিজেই মাসিকপত্রে ছাপিতে দিব। আমি দিলে কোন সম্পাদকই কখনো 'না' বলে না। তাহারা জানে আমি উপযুক্ত না হইলে দিই না। সংসারের কাজে নাকি তোমার সময় খুব কম। হইবারই কথা। তবুও এই কথাটাই সত্য যে অনবকাশের মধ্যেই হয়ত বা কখনো কখনো সময় পাওয়া যায়, কিন্তু অবকাশের মধ্যে কোনকালে কাজ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

৪

বাজে শিবপুর (হাওড়া)
১৪।৮।'১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত দোর-জানালা খুলে শুই। সেদিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এমনি ভিজেছে যে শীত করছে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হ'য়ে পথে কম ভিজিনি। দুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বরের মতো হলো। কিন্তু একদিনেই সারলে না— বাড়তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরও চমৎকার। কদিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটা নীচেয় এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগল যে অস্থির হয়ে উঠলাম। দিন চারেক পূর্বে একদিন সকালে উঠে দেখি খানিকটা জায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন এক্‌জিমার ভাব হয়েছে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছুদিন থেকে শুনছিলাম এদিকে খুব বেরিবেরি হচ্ছে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাইনি। ভাবলাম, বুঝি আমাকেই ধরেছে, ভয়ে যাই আর কি! কষে টিন্‌চার আইডিন্‌ লাগাতে সুরু করে দিলাম, কিন্তু বার কয়েক ঘন ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরিবেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বকতে লাগলেন, 'আপনার কি এতটুকু কোনও বিষয়ে সবুর নেই? এবার না হয় কষ্টিক্‌ কিংবা অ্যাসিড্‌-ট্যাসিড্‌ লাগিয়ে যা পারেন করুন, আমি চললাম।' যাই হোক্‌, পরে ঠাণ্ডা হয়ে ওষুধ আর মালিশের ব্যবস্থা করে বলে গেলেন পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে দিয়ে যেন চুপ করে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়— কোন কালে

আমি অম্বলের রুগী নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেকুর উঠছে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে— আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মতো হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবু হোসেনে লাখ কথার এক কথা বলে গিয়েছেন যে, অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়। মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না, রোগা হয়ে গেল— ঘর সংসাব রান্নাবান্না কিসের জন্যে- যেখানে দু'চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাব— ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে তো শীগ্‌গীর হও— এযে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁটা করে তুললে। বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না, দিদি ! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেখানে বোধহয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় তো আমি যেন বরঞ্চ নরকে যাই।

হ্যাঁ, আরও একটা আছে। দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালালো। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে একথা বলিনি, শুকিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে।

কিন্তু আর নয়। আপাততঃ এইখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েছি। এখন থেকে এমনি একটা না একটা উপলক্ষ করে তো চলতে হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ-দৈন্য আপদ-বিপদের মাঝখান দিয়ে তো আজ চল্লিশের কোঠা পার হলাম। শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছোন নি। সে হিসেবে তো অন্ততঃ পিতৃপিতামহদের হারিয়েছি। আর কি চাই।

যাক্‌গে। বুড়ো মানুষের বাঁচা মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাইনে। কিন্তু তুমি তো দিদি তেমন ভাল নেই। শরীরের যত্ন কোরো— এখন পরিশ্রম করার দরকার নেই। ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এস, তারপরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো তো মন দিয়েই পড়লাম, সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও তো আয়ত্ত করা চাই ভাই, নইলে শুধু শুধু তো নিজেরই অনুভূতিমাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই তো করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশিদিন লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোনটা বাদ দিতে হয়, কোনটা চেপে যেতে হয়—

'ঘটে যা তা সব সত্য নয়,
কবি তব মনোভূমি, রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।'

এত বড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু তো লিখতে নেই, কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য

যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে কেটে-কুটে দিয়ে দূর থেকে বসে ততটুকু হবে না। তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈ কি? আর যদি এবারেও শীতের পূর্বে বেরিয়ে পড়তে পারি তো তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও[১] না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুঁড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে তো বাস্ এই পর্যন্তই।

ব্রাহ্ম মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ করি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূরে থেকে শুনতেই ব্রাহ্ম মহিলারা উচ্চ শিক্ষিতা। দু'চারজন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন। তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি। তাই তাঁরা আমার সামনে কিছুতেই স্বস্তি পান না। অন্তরটা তাঁদের এম্‌নি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদের মতো সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাংলা দেশে আর নেই। দিদি, আমি কোনও কালে খাওয়া ছোঁয়ার বাচবিচার করি নে, কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দু'জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হোন তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐরকম মেশানো জাত হলে আমি তাদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে, শরৎবাবু শুধু লেখেন বড় বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বড় গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয় ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোনা গলায় কথা কয়ে যতদূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেছি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি, এ, পাস করা সত্ত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

এই মেয়েদের নিন্দে করচি বলে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্ছে, কিন্তু জানই তো দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা ও স্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জিত আলোর দম্ভ, এবং যা সত্য নয় তার ভাণ— এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বলব, এদের ডজনখানেক গাড়ি বোঝাই করে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম, আর কিছু না হোক্ ভায়ার কাজে লাগতে পারত।

'দাদার মর্যাদা?' কি করে জানবে তোমার তো দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুসি হলাম। আমি তাঁকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। কিন্তু দিদি, একটি কথা তাঁকে বলতে ইচ্ছে করে। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশিজন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি, আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি অনেক দুঃখে মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়। পরপুরুষের রূপেও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়।

তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজেরা নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ সকল কথা হয় তো তুমি সব বুঝবে না, আমার বলাও হয় তো সাজে না, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে তুমি তো শুধু মেয়েমানুষই নও, আমার ছোট বোন। না, আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

'কাহিনী'র[১] ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানিনে। কিন্তু কল্পনা যদি হয় তো বাহাদুরি আছে বটে। সাহসের তো অন্ত নেই দেখি? কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানিনে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্মল চরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে। তোমাকে দিদি হয় তো বলতেও পারে। কারণ বয়েসে হয় তো তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোনও নারীর অমর্যাদা হবে না এই তো আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো, কোনও ক্ষতি নেই। আর তাছাড়া তুমি নিজেও তো খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুনতে পাই সে নাকি এরই মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে যে অল্প দিনের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যাবে, যে কারও চেয়ে ছোট জায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ঐ 'মিলন'টা ছাপাবার জন্যে আমায় খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়।

তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বলবে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকেব অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য ধরে এক বৎসর অপেক্ষা করে যখন মাসিকপত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাকবে না।

আমি তো তোমাকে শিষ্যা করতে সম্মত হয়েছি। শেষকালে বুড়ির মত যেন গুরু-মারা বিদ্যে পেয়ে বসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই। হয় তো বা শেষকালে তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্রি কিছুই নয়, কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এতে স্বীকার করবো যখন লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাক্‌রেদ করবো না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখছি। আমি কষ্ট করে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ সরে পড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে 'আপনার জানিত শ্রীরামপুর !' আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত?[৩] তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুলতে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌভাতে নিমন্ত্রণ নিতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি ছোড়দি।

ডিহিরীতে[৪] যাচ্ছ? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখন আমি ঐ ডিহিরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী[৫] কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম। আর ফাঁস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ, সে কতকালের কথা। তখন রেল হয় নি। ছোট ষ্টীমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হতো।

তোমাদের বাংলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ডান হাতি সূর্য ওঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা

কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেছি। কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না।

'ভবঘুরে'র তো কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না। আচ্ছা, বর্মার[৬] অতো কথা জানলে কি করে? ম্যাজিস্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে 'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডেল থেকে এ লঞ্চে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বললে? যদি যথার্থই বর্মায় থেকে থাকো সে কোন জায়গায়? ও দেশটার হেন স্থান নেই যেখানে এ দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েচে। অথচ আমার মত বাদশা-কুঁড়েও দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বই তো নয়। ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি সত্যি? কার কাহিনী?

তুমি বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীরের অযত্ন করো না। তোমাকে দেখিনি তবুও কেন জানিনে তোমার ওপর আমার বড় স্নেহ জন্মেছে। ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এখন মনে হচ্ছে যদি না এতো কুঁড়ে হতুম তো হয় তো শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখার জন্যে কানপুরে যেতাম। কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে[৭] অনেক আশীর্বাদ করছি। তারা মা বাপের গুণ যদি পায় তো সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। মরে গেলে কিছুতে চলবে না। তাহলে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে।

দাদা

পুঃ— সত্যি বলছি তোমার ঐ গোছানো চিঠি লেখার কাছে আমার এই এলোমেলো পাঠাতে লজ্জাই করে। আজকের গল্পের প্রথম অধ্যায়ের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

৫

বাজে শিবপুর।
৭ই ভাদ্র '২৬

পরমকল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ওই একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখ্‌তে পারলে না। কেন জানো? বার ব্রত জপতপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা' কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই, না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এসব ব্যাপার কিছু কিছু না করে? যাক্। তোমার উপর আমার দ্বিতীয় আশা। তোমার যে বয়স এই বয়সই মানুষের রওনা হবার বয়স। তাই তোমাকে আমি শিখিয়ে নিতে চাই। আর এই জন্যেই তোমার কোন লেখা কোথাও ছাপাতে সম্মত হই নি। আমি নিশ্চয় জানি প্রথমে নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে নিজের নামে দেখবার সাধ অনেকেরই হয়, কিন্তু এও জানি এক বছর তোমার সবুর সইবে।

কিন্তু শেখানোর সে সুবিধা নেই, থাকাও সম্ভব নয়। তবু একবার ওদিকে বোধ হয় যাবো, যেখানেই থাকি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াই সম্ভব। তোমার হয়ত একবার মনেও হতে পারে এইত এঁদেরই বই পড়ি তা পড়েও যদি শিখ্‌তে না পারি, ইনি দুদিনে এমন কি শিখিয়ে আমাকে রাজা করবেন? এ কথা খুব সত্যি, বাস্তবিকই এ শেখাবার জিনিস নয়। তবু— এই ধর না— 'তুলসী মৃত্যুকালে যখন তার ...... ইত্যাদি ইত্যাদি'।

আমি কিন্তু উপস্থিত থাক্‌লে লেখবার আগে তোমাকে এই কথাটা বলে দিতাম যে, যে-তুলসী মরেছে যে সমস্ত গল্পের মধ্যে আর আস্‌বে না তার সম্বন্ধে পাঠকের বেশি কৌতূহলও থাকে না, সেটা আর্টের দিক থেকে অপল্‌কা। সুতরাং তার সম্বন্ধে প্রথমেই দু'পাতা ইতিহাস পাঠককে ক্লান্ত করে, আমি হ'লে কোথায় আরম্ভ কোরতাম বলবার পূর্বে এই কথাটা বল্‌তে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।

ধরো, যদি এমনি কোরে সুরু হোতো— একদিন তুলসীর মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মশেষে পরিণত হইয়া আসিতেছিল! তাহার তেরো বছরের মেয়ে মঞ্জরী অদূরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখের উপর নির্বাণোন্মুখ চিতার দীপ্তরশ্মি কতক্ষণ ধরিয়া যে বিচিত্র রেখায় খেলা করিতেছিল কেহ নজর করে নাই, হঠাৎ এক সময়ে তাহারই প্রতি তারা ঠাকুরাণীর চোখ পড়ায় তিনি যেন চমকিয়া গেলেন। মনে হইল ওই যাহার নশ্বর দেহের এইমাত্র সমাপ্তি হইল সেই যেন অকস্মাৎ তাহার ছেলেবেলার মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি তুলনাহীন রূপ, তেমনি শান্ত মাধুর্য, মুখের উপর ঠিক যেন তেমনি বিষাদের গাঢ় ছায়া মাখানো। এবং এই সদ্য মাতৃহীনার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চিন্তার সূত্র অতীত দিনের অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনীর ভিতর দিয়া ছায়াবাজীর মত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল সেই যেদিন তুলসী স্বামী হারাইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার বাড়িতে প্রথম পা দিয়াছিল, তাহার পরে কেমন করিয়া সে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপের সমস্ত লাবণ্য লোকচক্ষু হইতে একান্ত গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়া ইত্যাদি....

লীলা, এই অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ এ কথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবাব খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

তারপর গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দিবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবেন প্রথমে তাঁহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধর যাঁকে তুমি খুব জানো, তোমার বাবা কিংবা তোমার স্বামী। তারপর এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধর তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে মামলা-মকদ্দমার মধ্যে, তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর মধ্যে চাকরির মধ্যে উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভাল করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,— তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

আরও অনেক ছোট-খাটো জিনিস আছে যেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া না দিলে চিঠি লিখিয়া জানানো শক্ত। এইগুলোই একদিন তোমাকে বলিয়া দিয়া আসিব। কিন্তু সেদিন

যে করে হইবে সে আমার বিধাতা-পুরুষই জানেন। আর একটা কথা। নিজের জীবনের ঘটনা লইয়া স্পষ্ট করিয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে নাই। তোমার খাতাটা যে আমি কতলোকের লোলুপ দৃষ্টি থেকে শুধু এই জন্যেই আড়াল করে রেখেছি তা' বল্‌তে পারি নে। পাছে পড়িয়া তাহারা কিছু একটা মনে করিয়া বসে।

দ্বিতীয় কথা। 'শিশির পাবলিশিং হাউস' বলিয়া এখানে একটা বড় রকমের ব্যাপার খোলা হইতেছে। আমি ত তাদের অনেক কান্নাকাটির জ্বালায় নিজের নাম দিয়েছি। (যদিচ লেখা দিতে হয়ত কোনকালেই পারব না) যদি নামের জোরে তাদের কোন উপকার হয়, তিন হাজার চার হাজার গ্রাহক জোটে। তারা প্রতি মাসেই একখানা করিয়া বই চমৎকার করিয়া বাঁধাইয়া প্রকাশ করিতে চায় এবং বৎসরে অন্তত ৪।৫ হাজার বিক্রয় করিবে বলে। আমি তাদের অনেক ধর-পাকড়ের জ্বালায় এইটুকু স্বীকার করেছি যে যদি সময় পাই. লেখা পরীক্ষা করে দেব, আর দেব ৬।৭ মাসের মধ্যে তোমার লেখা কোন একটা বই। নিজে সমস্ত দেখে শুনে দেব। তারা তাই তোমার বইয়ের আশায় হাঁ করে চেয়ে আছে, আর আমি আশা করচি তুমি দাদার মান্য রেখে একটা লিখে দেবে। এবং তা এমন হবে যে আজ পর্যন্ত কোন মেয়েমানুষের হাত দিয়ে সে রকম আর হয় নি। তোমার বই তোমারই থাকবে শুধু প্রকাশ করবার জন্যে বছরে তারা (এক একখানা বইয়ের জন্যে, ৪।৩,০০০।৭২৫ টাকা প্রায়) ৭২৫ টাকা করে দেবে। তুমি বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের স্ত্রী এবং আর যাই হোক দুঃখীর বোন নও, তোমার টাকার জন্যে লেখা নয়,— শুধু যা সর্ত তাই তোমাকে জানালাম। আমার মান রাখবার চেষ্টা করবে। বছরে ২খানা বই লেখবার সময় না পাও অন্তত ১খানাও লেখা চাইই। কেন জানি নে তোমার ওপর আমার ভারি আশা হয়েছে— বোধ করি চিঠি লেখার ধরণ দেখেই। সাহিত্যই আমার সত্যিকারের ব্যবসা, তাই যেখানে সে লোভ পাই ছাড়তে পারি নে। কিন্তু নিজের জীবনের ঘটনা নিয়ে আর স্পষ্ট আলোচনা কোরো না। শৈলবালা ঘোষজায়ার নাম শুনেচ? সে তাই করে সকলের অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু বেচারাদের দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ তাদের কেউ শেখায় নি, শেখবার জন্যে তাদের দাদা নেই।

আমার একটু পরিচয় চাই না কি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই। থাক্‌লেও তাকে আবার দিদি বলা কিসের জন্যে, সে কি তোমার কাছে এ সম্মান পাবার যোগ্য? শ্রীকান্তটা আর একবার পড়ে দেখো হয়ত তার উপরে ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা বেবাক মিথ্যে। তারপরে আমার বিদ্যে-সিদ্যে কিচ্ছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম,— ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাব্‌তে হবে না, উপোস করেই দিন কাট্‌বে। অবশ্য বেশিদিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মত হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে স্বর্গগত হ'ন। হয়ত তারপরেই একজনের পাপের টাকা নিলে সাংসারিক সকল দুঃখ ঘুচ্‌তে পারতো কিন্তু অত ছোট হতে পারি নি। তারপরে পড়তে সুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা করে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারিনি কেবল সেই রাগে। বর্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরাণী--- হঠাৎ বড়সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেচি। কিন্তু আকস্মাৎ এম্‌নি কপাল ফিরে গেল যে একেবারে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লেখক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর চেলা হয়েও দিন কাটাতে

ছাড়ি নি। লীলা, আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেচি শুধু ছোট কাজ কখনো করিনি। যখন মরবো— ফরসা খাতা রেখে যাবো যার মধ্যে কালির আঁচড় এক যায়গায়ও থাক্‌বে না। যাক্।

তোমার ওখানে গিয়ে কেন উঠ্‌তে চাই নে? তার মানে আমার প্রাণের ভয় আছে। যেখানে গোটাতিনেক খুন হয়ে গেছে সেখানে যেতে মানুষের ভয় হয়ই। সেটা স্বাভাবিক। ঠিক না?

না দিদি না। তামাসা করচি। যাবো বই কি। আমি অনেক ঘা খেয়েচি— পরের সোনা কানে দিতে যাবার মত অতবড় আহাম্মক আমি নই। তা ছাড়া তোমারি ত' দাদা।

আর একটা কথা। মেয়েমানুষের মুখে শুদ্ধ হলেও 'লাউ' 'লেবু' চলে না। নাউ, নেবু, নুন— এই বল্‌তেই হয়। দাদাকে 'আপনি' কেন? আমাকে 'তুমি' বলে ডেকো। পুরুষমানুষ হলে 'আপনি' বলা শোভা পেত। আমাদের বাড়িতে ছোটবোনেরা আমাদের 'আপনি' বলে না, 'তুমি' বলেই ডাকে।

সেই দশ বছরের ব্রাহ্ম মেয়েটি ত' চমৎকার। দেখতে ইচ্ছে করে যে। কিন্তু সত্যি বলে যেন বিশ্বাস হয় না। হয়ত একটা ভুল অখ্যাতি রটেচে। আমি অমন যে কয়েকটা জানি। মেয়েমানুষের অখ্যাতিতে আমার হঠাৎ বিশ্বাস করতে যেন প্রবৃত্তি হয় না। কারণ রটলেও বেচারারা চুপ করে সহ্য করে, না পারে প্রমাণ করতে, না পারে হৈ চৈ করতে। তুমি দিদি ও সব ছোট কথায় কান দিয়ো না। হৃদয়ের রস মরে যায়— শুকিয়ে উঠ্‌তে হয়। তোমার বড় ছেলেটি ভাল হয়েচে ত'? ছোটটি? আমি ছেলেপিলে ভারি ভালবাসি। আমাকে এর পরের একটি দিয়ো ত', আমি নিজের ধরণে মানুষ কোরব। দেবে?

এখন আমার ছেলে হচ্ছে আমার 'ভেলু' কুকুরটি, একে সবাই চেনে,— সবাই জানে কুকুরটিই শরৎবাবুর প্রাণাধিক প্রিয়।

আচ্ছা আমার এই সব এলোমেলো চিঠি পড়ে তোমাদের হয়ত ভারি হাসি পায়। মনে হয় এ লোকটা বই লেখে কি কোরে, না? তা' বটে।

তোমার হার্ট ডিজিজ শুনে ভারি চিন্তিত হই। আর হার্টের অপরাধটাই বা কি? সে যে এখনো টিকে আছে এই ত' আশ্চর্য। বর্মার চাইটোএ আমার বোনকে চিন্‌তে? উষা? শশীর স্ত্রী? একদিন হঠাৎ এসে বললে উষা— দাদা, এসো একবার আমাদের ওখানে। কিন্তু যাই যাই করে যেতে পারলাম না, তার পরেই সে মরে গেল— আর দেখা হল না। তারা কায়স্থ কিন্তু তার মায়ের কাছে আমি খুব ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিলাম। শশীও ছিল আমার বাংলা স্কুলের সতীর্থ।

আবার মনে করিয়ে দিচ্চি—তাদের কথা দিয়েছি ৬।৭ মাসের মধ্যে আমার বোনের একখানা বই দেব। এদের বৃত্তান্ত যে কোন মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনের মধ্যে খুঁজলেই পাবে।

তুমি আমার অসংখ্য আশীর্বাদ জানিয়ো। কেমন আছো শীঘ্র লিখিয়া জানাইয়ো।

তোমার দাদা

৬

বাজে শিবপুর
২৪।১১।১৯

পরমকল্যাণীয়াসু

কাল রাত্রে ১০ টায় দিদির বাড়ি থেকে ফিরে আজ সকালে তোমার ও সরোজের চিঠি পেলাম। তার পত্র ইংরাজিতে। তেমন ইংরাজি জানি না বলিয়া ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিদ্বান বন্ধুবান্ধব কেহ আসিলে পড়াইয়া লইয়া পরে জবাব দিব।

দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম,[১] নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,— আর কিছু দিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য,— কাবু হইয়া পড়িলাম (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই— তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে!) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকার দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।

দুপুরবেলা একটা ট্যাক্সি লইয়া তোমার স্যাঁক্‌রার কাছে গিয়াছিলাম। বৌ বাধা দিয়া বলিতেছিল, আজ বার হোয়ো না, তোমার ফিরতে কখনো ১০$\frac{1}{2}$ টা রাত্রির এদিকে হয় না,— হিম লাগবে। আমি বলি বৌ, হিম বরঞ্চ সহ্য হবে, কিন্তু লীলা বলবে যে 'বিদেশী' দাদা এ কি করলে, সেটাই সহ্য হবে না।— কিন্তু ফল কিছু হোলো না, সে গেছে কাশীতে কি একটা কাজে। আর একটা স্যাঁক্‌রা কেবলি দিন কাটাচ্ছে। কি বলে? আট দিনের কড়ার? ভাল তাই হোক্।

সরোজকে বলো জুতোতে রবার দেবার কথাই ফাইন্যাল ছিল[২]— চামড়া নয়। হয় সে ভুল করেছে, না হয় ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে। চামড়ার তলায় আমার কাজ নেই।

তুমি খুব সাবধানে থাকবে। আমি ত' আবার যাবো, আমার জন্যে মন খারাপ কোরো না। আমি প্রায় ভাবি এমন ধারা ভগিনী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মণি ত' বুঝবে না, কিন্তু চনি আমার কথা জিজ্ঞেস করবে বৈ কি। আশীর্বাদ করি তারা দীর্ঘজীবী হোক্। মানুষ হোক্।

... তুমি আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানিবে।

... ভোলা[৩] তোমার গল্প কত রকমে যে বাড়িয়ে করেচে তার কূলকিনারা পাওয়া কঠিন।

তোমার দাদা

৭

বাজে শিবপুর। ৯ই আগষ্ট '২০

পরম কল্যাণীয়াসু,

... আমার মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহু দিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।[১]...

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে-বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?...

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে— এ ধারণা সত্যও নয়, সাধুও নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জিত পুণ্যের জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরেজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালো-গোরার মকদ্দমায় পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই।[২]... বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই।

দাদা

৮

বাজে শিবপুর। ৩০, ৩, ২১

পরম কল্যাণীয়াসু,

... বরিশাল কনফারেন্সে[১] আমার যাবার বড় ইচ্ছা ছিল, শুধু আমার নতুন পাঠশালার[২] কাজে এমনি ব্যস্ত রইলাম যে সময় পেলাম না। নিজেকে এখন সাবেক পরিচিত সকল কাজের বাইরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচি, এতে অনেক প্রকারের সাংসারিক ত্রুটি, অনেক রকমের দুঃখ কষ্টের ব্যাপার ঘটবে— সেইগুলো সইবার এখন ডাক পড়েচে। তাছাড়া এই দীর্ঘ জীবনের

জালে অনেক গ্রন্থি পড়ে গেছে, অথচ ধীরে সুস্থে খোলবার মত বয়সও হাতে নেই— কাজেই একটুখানি তাড়াহুড়োই চলচে।

তোমার বাবার শরীর বোধহয় আজকাল ভাল আছে, সরোজের চিঠি থেকে তাই যেন মনে হ'ল।

আমার খবরটা পৌঁছে দেবার লোক তুমি পাবেই— অতএব এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দাদার চিরদিনের স্নেহ ও আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি রইল। তোমরা কেবল এই প্রার্থনা কর আর যেন বিক্ষিপ্ত না হই।...

তোমার দাদা

৯

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২৭শে জুন, '২১

পরমকল্যাণীয়াসু,

লীলা আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে জবাব দিই নি তা নিতান্তই সময়ের অভাবে। যথার্থই দিদি এখন আমার এক মুহূর্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা[১] যদি সার্থক হয় তা আবার হয়তো সময় পাওয়া যাবে।

আজকাল আমার সেই দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলান্‌টিয়ার— আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬। ৭ জন যখন 'জান্ গিয়া' বলে গুলি খেয়ে পড়ে মরে গেল-— তখন আমি পালাই নি, কিন্তু আমার লাগে নি। অনেকদিন আশ্চর্য হয়েছি সেদিন কি করে মেশিনগানের গুলি লাগে নি।[২] আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।

তুমি আমার জন্যে যখন ভাব্‌তে ছাড়বে না, তখন এই রকম কখন বিলম্বে কখন যথাসময়ে খবর পাবেই।

সরোজের শরীর ভাল নেই? কি হল? তোমার অত্যধিক অত্যাচারে বেচারা হয়ত আত্মরক্ষার জন্য অসুখের ছল করচে।

তোমার বাবার বয়স হয়ে আস্‌চে— এম্‌নিই ত স্বাস্থ্য ভাল নেই— তাঁর জন্যে তোমার উদ্বেগ ত থাক্‌বেই। তবে, আশা বা সান্ত্বনার কথা এইটুকু যে হয়ত কিছুই মন্দের জন্যে ঘটে না। কারণ, যে ভাবে সংসারের চাকা ঘুরে আস্‌চে সেটা ঠিক না হলে এতদিন অচল হতো। ছেলেরা ভাল শুনে সুখী হোলাম। আমার আশীর্বাদ তোমরা জেনো। গিরিজা[৩] ভালই আছে।

দাদা

১০

বাজে শিবপুর
১, ১, ২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

গয়া থেকে ফিরে এলাম।[১] কংগ্রেস শেষ হবার আগেই চলে এসেছিলাম,— দেহটা নিতান্ত অপটু হয়ে পড়ল ব'লে। যাবার আগেই তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব ভেবেছিলাম কিন্তু কাজে হয় নি, গয়ায় গিয়ে সেখান থেকে লিখ্‌ব মনে করি তাও ঘটে উঠ্‌ল না। ফিরে এসে জবাব দিচ্চি। এই যে লিখ্‌ব লিখ্‌ব ভাবি, অথচ লিখি না,— এর একটা দাম আছে, নিতান্ত ফেলে দেবার জিনিস নয়। কিন্তু এ কথা কটা লোকে আর বোঝে? তারা বলে তোমার দাম তুমিই নিয়ে থাকো, আমাদের অদামী চিঠির জবাবটা দিয়ো। তা হলেই আমাদের হবে।

একদিন আমার সম্বন্ধে সবাই বল্‌তো ওর ভারি দয়া-মায়ার শরীর। আর, আজ সবাই,— বোনেরা ভায়েরা ভাগ্নীরা, বন্ধু বান্ধবেরা সকলে বলাবলি করচে ওর দেহে দয়া-মায়ার বাষ্পও নেই। আমি বলি এরও দাম আছে, তারা বলে ও দামে আমাদের কাজ নেই, তোমার আগেকার অ-দামী বস্তুটাতেই আমাদের প্রয়োজন। ঘরের গৃহিণী পর্যন্ত ওই সুরে সুর মিলিয়েছেন, হয়ত বা তাঁর গলার জোরটাই এখন সকলের গলা ছাপিয়ে উঠ্‌চে।

তুমি ত হাল ছেড়ে দিয়েচ,— আমার বাঁচা-মরা এখন তোমার কাছে প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। উঠবেই ত।

গিরিজার আর বড় খবর পাই নে। সে এখন বড় দলে মিশেচে। আমাদের ছোট দলের ছোট গণ্ডি যে কাটিয়ে বেরিয়ে গেল, তাকে ধরে নিরর্থক টানাটানি করবার জোর আমার নেই। একবার কে যেন বলেছিল সে শরীর সারাতে মস্ত একটা সাহিত্যিক দল নিয়ে তাদের কার্মাটারের বাড়িতে গেছে। শরীর সেরেছে কিনা জানি নে, কিন্তু তার সত্যিকারের কবি-প্রাণটা যে তাতে আনন্দ লাভ করেচে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

তোমার দেহ এখন কেমন? আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

—দাদা

১১

বাজে শিবপুর
৩রা মে ১৯২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

...কয় দিন হইল আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে যথা সর্বস্ব ছিল, ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হওয়ায় সমস্তই শেষ হয়ে গেল। বাড়িটা[১] শেষ হয় নাই, পুকুর শেষ হয় নাই, ভাবিয়াছিলাম এ বছর আর ফেলিয়া রাখিব না সমস্তই শেষ করিব, কিন্তু পুঁজি নিঃশেষ হওয়ায় সমস্তই স্থগিত রহিল। কিন্তু এটা ত তত বড় বিপদ নহে, অনেকে[২] আমার মারফৎ তাহাদের যথা সর্বস্ব আমারই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল এই বিশ্বাসে যে আমি কখনো ফাঁকি দিব না।

এখন এইগুলি কড়ায় গণ্ডায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার কাঁধেই ছিল,[৩] কি যে তাহাদের বলিব ভাবিয়া পাই না। অথচ এ কথা নিশ্চয় যে আমি বন্ধ করিলে তাহাদের হাঁড়ি বন্ধ হইবে। ভগবান যদি দেন ত সে আলাদা কথা। অনেক সময়ে তিনি দেন না, মানুষকে অনাহারে অর্ধাহারে মরিতে হয়। ভাবিতেছি মাস দুই তিন কোথাও দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া দেখিব যদি হাজার পাঁচ ছয় টাকাও অন্ততঃ উপার্জন করিতে পারি। হয়ত কতক রক্ষা হয়। আত্মীয়দের সংসার লইয়াই মস্ত ভাবনা।...

তোমার দাদা

১২

বাজে শিবপুর, ১৭. ৫. ২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

কিছুকাল এখানে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক হইল বরিশাল[১] হইতে বাটী আসিয়া পৌঁছিয়া তোমার পোষ্টকার্ড পাইলাম। এই জনাই যথাসময়ে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই। তোমার শরীর যদি পুরী কিংবা এম্‌নি কোন সমুদ্র তীরের কাছাকাছি জায়গায় ভাল থাকে ডাক্তারে বলিয়া থাকে তো তাহাই করা উচিত। শরীরের কোনরূপ বৃথা অযত্ন অবহেলা করায় লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি এবং অন্যায়। আমি সময় মত হয়ত গিয়া দেখা করিতে পারিব কিন্তু কোথাও দীর্ঘদিন আমার থাকা সম্ভব মনে হয় না। ২১শে রাত্রের গাড়িতে বোম্বাই যাইতেই হইবে এবং তথা হইতে ১লা জুন মাদ্রাজে যাইব। নাগপুরের পথে ফিরিয়া আসিব দিন ১৬।১৭ পরে। দিনতিনেক পরে ঢাকা ও ময়মনসিংহ যাইতে হইবে। এই ত' আপাতত স্থির হইয়াছে।

হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে।[২] বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া আর বোধ হয় এখন কেহ আর এতবড় কবি নাই।...

—দাদা

১৩

বাজে শিবপুর, ১৮।১২।২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

নবদ্বীপ থেকে তোমার চিঠি পেলাম।[১] কাল আমার বন্দুক প্রভৃতির পাকা করার দিন ছিল, এবং আজ আমাদের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কংগ্রেসের সভায় যাবার দিন। এ দুটো কাজ না করলে কিছুতেই চলে না বলে তোমার ওখানে যেতে পারিনি। কাল কিংবা পরশু নিশ্চয় রওনা হব।

প্রভাসের[২] ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে বলা যায় না, তবে সে ধীরে ধীরে সেরে উঠ্‌বে বলা চলে।

তোমার বাবার মৃত্যুর শোকে তোমার ত যথেষ্ট সান্ত্বনা আছে।[৩] কিন্তু আমার কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। সুধীরের[৪] মুখে শুনিলাম আমাকে নাকি তিনি কিছুই দিয়া যান নাই? অন্তত গোটা দুই গরুও[৫] যদি দিয়া যাইতেন।

.. দাদা

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
৩১শে অক্টোবর, '১৯

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
নিরাপদদীর্ঘজীবেষু।

এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া এত আনন্দ বোধ করিলাম যে জবাব লিখিতে বসিয়া গিয়াছি।

লীলার রোগটা যে ঠিক কি হইয়াছিল তাহা এখন জানি না বটে, কিন্তু সেই যে শুনিয়াছিলাম হার্টের স্প্যাজম হয়, সেই পর্যন্তই একটা দুশ্চিন্তা লাগিয়াছিল। এই বস্তুটির যথার্থ চেহারাটি আমার বিশেষ করিয়া জানা আছে কিনা !

মায়া জিনিসটা আমার দেহের মধ্যে বড় কম। তবুও কেন যে যাকে কখনো চোখেও দেখি নাই তার জন্য এত বড় উৎকণ্ঠা এই কয়টা দিন অহর্নিশ ভোগ করিলাম, এই কথাটা মনে করিয়া আমি নিজেই আশ্চর্য হইতেছি।

অথচ, এ কথাও সত্য যে কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় জানিতাম এত বড় নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিবে না। আমার সঙ্গে একবার তার দেখা হইবেই।

যাক্ বাঁচা গেল। আপনি নিজে যে কতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন সে আপনার আমাকে ডাক্তার করিয়া তুলিবার কল্পনা হইতেই অনুভব করিয়াছিলাম। কেন না— একটুখানি স্থির হইয়া ভাবিলেই টের পাইতেন আমার 'আইডেনটিটি' অতবড় যায়গায় গোপন করিয়া রাখা হয়ত কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

আবার বিড়ম্বনা এই যে যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত কোথায় ডাক্তারি করি, এবং কতদুর করি তা হইলে ত বিপদের আর অবধি থাকিত না। একে তো কোথায় হার্ট আর কোথায় পিলে তাও আজ জানিনা, তা ছাড়া ওষুধের নাম এক একোনাইট এবং দুই বেলেডোনা ছাড়া তিনটা নাম মনে করিতে পারিতাম বলিয়াও ভরসা ছিল না।

যাই হোক্, আমি যাচ্ছি। আমার একটা জায়গা ঠিক করিয়া দিবেন,—'তা' ধর্মশালাই হোক্ আর কালীবাড়িই হোক্ আসিয়া যাইবে না।

তামাক ও চায়ের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিয়া লইতে পারিব। জঙ্গল-ঘেরা পাহাড়ের মাঝখানে একদিন জোগাড় হইতে বাধে নাই, এ তো শহর।

ভগিনীকে আমার শতকোটী আশীর্বাদ দিবেন। এবং রবিবারে যদি পাঞ্জাব মেল-এ বার্থ পাই ত ওই দিনেই রওনা হইয়া পড়িব। একটা লোক (একটু চালাক গোছ) স্টেশনে পাঠাইয়া দিবেন (সোমবার বেলা ৩।।° আন্দাজ বোধ হয়)। আমাকে চেনা কঠিন নয়। শুধু এইটুকু বলিয়া দিবেন, একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বৃদ্ধ মুসলমান[২] ফার্স্ট কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে নামিলেই যেন সাহস করিয়া কাছে আসে। কারণ, আসলে সে মুসলমান নয়, কেবল মূর্তিটাই ওই রূপ।

রবিবারে যদি যাওয়ার স্থানাভাব হয় ত নিরুপায়। তা' হইলেও সোমবারে জায়গা পাইবই আশা করি। সে অবস্থায় মঙ্গলবারে পৌঁছিব।

আপনার ত বোধহয় বাহনের অপ্রতুল নাই— এই দুটা দিনই যদি দয়া করিয়া স্টেশনে লোক পাঠান ত বড়ই ভাল হয়। একে ত আমি পাড়াগাঁয়ের লোক তাহাতে বুড়া হইয়াছি,— সাহায্য না পাইলে হয়ত অতবড় শহরে কোথায় হারাইয়া যাইব।

ছেলেরা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার সাদর সম্ভাষণ জানিবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ —এখন দেখিতোছি টিকিটের খাতা শূন্য। বেয়ারিং চিঠি গ্রহণ করিবেন এবং মার্জনা করিবেন। আমি গিয়া দাম দিব।

২

বাজে শিবপুর
হাওড়া ৩।১১।২০

প্রিয় সরোজ,

আমি ভাগলপুর হইতে ফিরিয়াছি। সেই বুকের ব্যথাটা সারে নাই বটে, তবে অনেক কম। বয়স হইল, এখন এ সব চলিবে এবং সেজন্য নালিশ করা বৃথা।

লীলা ও তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। এবং ছেলেদের দিবে। এখনও ইচ্ছা আছে একবার বাহির হইয়া পড়ি। গৃহিণী নিষেধ করেন যে, এরূপ অবস্থায় অত লম্বা ট্রেনে জার্নি বোধ হয় ভাল নয়। তাছাড়া কাজের চাপে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি, বিশেষ করিয়া ইংলিশ ট্রান্‌স্লেশানের জন্য[১]। এবার যাহাতে আর দেরি না হয় সে বিষয়ে মন দিব। না হইলে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি হয়ত আর হইবেই না। মানুষের জীবনটাকে মোটেই বিশ্বাস করাশ্র চলে না।

শরৎদা

পুঃ— চিঠিপত্র ভাই আমি এমনি দেরিতেই দিই, সেজন্য কিছু মনে করিয়ো না। মনটাই আসল জিনিস, সেটা খাঁটি থাকিলেই হইল।

গিরিজাকুমার বসু[১]কে লেখা

চিঠির উপর ডাকঘরের
স্ট্যাম্পের তারিখ ৯, ৪, ২০

পরম কল্যাণবরেষু,

গিরিজা, তোমার চিঠি এবং তার দুইই পাইয়াছি। কিন্তু **একেবারে** নিরুপায় বলিয়াই কিছু দিতে পারি নাই।[২] তা না হইলে তোমাকে অপ্রতিভ কিছুতেই করিতাম না। তুমি আমার নাম করিয়া যে কথা দিয়াছ সে আমারই কথা দেওয়া। না রাখিতে পারার দায়িত্ব বা দুর্নাম আমার, তোমার নয়। অপরে এ কথা যদি বা নাই বুঝে তুমি বুঝিতে চেষ্টা করিয়ো।

আর বৈশাখ মাসই ত কেবল একটা মাস নয়, বছরে আরও মাস ত আছে, তাতেও ত আমার লেখা যাইতে পারিবে।

শিশির[৩] টেলিগ্রাম করে, জলধরদা পত্রাদি দেন, কমলিনী অফিসের[৪] থেকেও চিঠিপত্র আসে, কিন্তু এটা ত দেখিতেছ কোথাও কিছু দিতে পারি না। চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কাশীর গুণে একটা ছত্রও লিখতে পারি না। শিবপুরই বোধ হয় এ পক্ষে ভাল। বৈশাখের প্রথমেই ফিরিব।

একটা দরকার হইতেছে ২০০ টাকার, এই পত্র পাবামাত্রই পাঠাইয়ো, আমি কাল পরশু রেজিষ্টার্ড ডাকে ক্রস চেক পাঠাব। আমি ছাড়া আর সকলে ভাল আছে, শুধু প্রভাস একটু ভুগিতেছে। ভরসা করি তোমরা সকলে ভাল আছ এবং দেশের অবস্থা ফিরিবার অনুকূল।

তোমরা আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানিবে।

শরৎদা

কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

বাজে শিবপুর। হাওড়া
১২, ১০, ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কেদারবাবু, আপনার অবস্থা শুনিলাম, এবার এ অধীনের অবস্থাটা শুনুন।

কিছু দিন হইতে পিঠের উপরটায় শির-দাঁড়া ধরিয়া অল্প-স্বল্প ব্যথা উপভোগ করিতেছিলাম, বিশেষ কাহারো তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। না আমার না গৃহিণীর। অকস্মাৎ একরাত্রে ব্যথায় ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখি নিঃশ্বাস ফেলে কাহার সাধ্য! অনেক তাপ সেক মালিশাদি করিয়া সকালে একটু ভাল লক্ষণ যদিবা দেখা দিল সন্ধ্যা হইতে এমন হইল যে ডাক্তার ডাকা অনিবার্য হইয়া উঠিল। সেই অবধি ভুগিতেছি। তাহার উপরে আবার এক দিন মোটর স্লিপ্ করায় কোমরেও দারুণ হ্যাঁচ্‌কা লাগিয়া আছে। তবে আফিম ভরসা। ইহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান শ্রীদেবাদিদেব আমাদের প্রতি বর দিয়াছিলেন যে রক্তবাহ্যে না করিয়া আর আমরা কৈলাস গমন করিব না। সেটার সূচনা না হওয়া পর্যন্ত আমিই বা কি আর আপনিই বা কি— নির্ভয়ে থাকিতে পারেন— কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

এই জন্য সুরেশকেও জবাব দিতে পারি নাই। গত বারের আপনার— নিজেও দুটান টানে! বড় চমৎকার বড় উপভোগ্য হয়েছে। কালী ঘরামীও[২] অনিন্দনীয়। প্রায় সকলগুলিই ভাল হইয়াছে। সুরেশের ইন্‌কম্‌প্লিট গল্প সম্বন্ধে এখনও বলিবার সময় আসে নাই। আর দু'চারটে লেখা দেখি। একথা শুনিয়া সে যেন বলার চেয়ে বেশি কিছু না ভাবিয়া লয়। কাগজ ছবি ইত্যাদিকে অবশ্য ভাল কিছুতেই বলা যায় না, তবে ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করা সাজে।

আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব— যেখানে দু চক্ষু যায়। অসুখের জন্য এবার ভারতবর্ষের দেনা-পাওনাটাও লেখা হয় নাই।

আপনার
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বজায় থাকিলে প্রবাস-জ্যোতিঃর আর যাই হোক, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। আমার মনে হয় এ দুঃসময়ে আপনার আফিমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য ! এবং কর্তব্য পালনের ন্যায় বড় জিনিস সংসারে আর নাই।

২

বাজে শিবপুর। হাওড়া
১৮. ১১. ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কেদারবাবু, আপনার চিঠি ভাগলপুরের ফেরৎ পাইয়াছি। আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা যথেষ্ট নিন্দার হইয়া পড়িল, কিন্তু নিতান্তই বাধ্য হইয়া। ভরসা করি ভবিষ্যতে আর হইবে না। প্রথমটা ত শয্যাগত অসুখ ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পরে যখন দেহ সুস্থ হইল তখন অন্য উপসর্গ জুটিল। আপনাদের লেখাটা এ মাসে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু, যেহেতু 'ভারতবর্ষে' দেওয়া হইল না, সেইহেতু আপনাদেরও দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের না দিয়া আপনাদের দিলে তাঁহাদের শুধু অপরিসীম ব্যথিত করাই হইত না, অপমান করা হইত।

এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত হইবে।[১] আমাকে লইয়া যাঁহারাই যে কিছু কারবার করেন তাঁহাদিগকেই এইরূপ ভুগিতে হয়। আমি কেবল নিজেই অন্যায় করি না, আরও পাঁচ জনকে বিড়ম্বিত করি। এটা আপনাবা নিজগুণে ক্ষমা কবিয়া লইবেন। স্বভাবং !

এখন আছেন কেমন? মাঝে মাঝে খবরাদি দেবেন। আমি যতটা পারি শীঘ্রই পাঠাইতেছি, এ বিষয়ে এবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

অপরাপর বন্ধুবান্ধবদিগকে আমার নমস্কার দিবেন এবং নিজেও গ্রহণ করিবেন।

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

বাজে শিবপুর। হাওড়া
৯ই এপ্রিল '২৪

প্রিয়বরেষু,

কেদারবাবু, আমার আচরণের সঙ্গে আমার কথা মিলবে না। তাই যদি বলি কত দিন মনে মনে ভেবেচি হঠাৎ যদি আবার দেখা হয়ে যায় কত আনন্দই না দুজনের হয়, এ হয়ত আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কখনো আপনাকে চিঠিপত্র লিখি না— আমি প্রায় কাউকেই লিখি না— অথচ, আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন সে কথা এক দিনের জন্যেও ভুলি নে।

কাগজে খবর পেয়ে আমার দীর্ঘ জীবনের জন্যে কামনা করেছেন, এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার?

কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন? আপনাকে সত্য সত্যই বলচি কাল যদি এর ফেরবার ডাক পড়ে বলি নে যে বাপু পরশু এসো,— একটা দিন পরে যাবো।

অনেক দিন ত বাঁচলাম। এখন গুটি গুটি রওনা হলেই কি বেশ দেখতে শুনতে শোভন হয় না? আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি বলেন ৪৯ পুরো না হ'লে কিছুতেই যাওয়া চলবে না— আমি বলি,

করই না বাবা কিছু দিন মাপ। মার্ক পাবার বিধি ত ইংরেজের জেলেও আছে। দাও কিছু ছাড়।

আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু, এ ছাড়া আর বিশেষ কোন রোগ বালাই নেই। লোকে কেবলই আমাকে খাটাতে চায়!

আপনি নিজে কেমন আছেন? কাশীতে আর থাকেন না কেন?[১] ও স্থানটার একটা গুণ এই যে পরিচিত লোকগুলোর মাঝে মাঝে মুখ দেখা যায়।

মাঝে মাঝে এমনি এক আধ বার সম্বাদ নেবেন। আমার প্রীতি এবং নমস্কার নেবেন।

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

বাজে শিবপুর। হাওড়া

১৪-১০-২৪

প্রিয়বরেষু,

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। নানা কাজে ভুলে থাকি, প্রতিদিন অনেক চিঠিই ত পাই, কিন্তু কালে-ভদ্রে লেখা আপনার কয়েক ছত্র আমাকে যে আনন্দ দেয় তা সত্যই দুর্লভ। প্রীতির মধ্যে দিয়ে আসবার সময়ে সে যেন অনেকখানি সঙ্গে ক'রে আনে। কেদারবাবু, মানুষের সত্যকার ভালবাসা আমি টের পাই,— এখানে আমার বড় বেশি ভুলচুক হয় না।

আপনার শরীর ভাল নয়, একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন সে জীর্ণ হয়ে এলো। একদিন যদি সে ভার বইতে আর না চায় হায় হায় আমি কোরব না, কিন্তু ব্যথা পাবো। তখন নূতন লেখার সঙ্গে সঙ্গে কেবলি মনে হবে, একজন আর নেই, এ লেখা যাঁর আনন্দ দিয়ে গ্রহণ করবার হৃদয় ছিল, শক্তি ছিল।

আপনার নিজের লেখার সম্বন্ধে কখনো আপনি একটি কথা বলেন নি, আমিও কখনো একটি কথা বলি নি। অথচ, যেখানে যা বেরিয়েচে সমস্ত পড়েচি। প্রশংসার বদলে প্রশংসা দিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ হোতো। কেবলি মনে হোতো পাছে আপনার বিশ্বাস না হয়, পাছে আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

বৎসরও আসবে, বিজয়াও আসবে — একদিন কিন্তু আপনিও আসবেন না, আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন, সেদিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না— নিতান্তই আমার পুরণো হয়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল— ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে এর পরে কি আছে দেখতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনে। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন। সত্যের সুমুখেই যদি এসে পড়ে থাকেন, আপনার সত্য আশীর্বাদ আমার ফলবে।

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা

কল্যাণীয়বরেষু,

তোমাদের কাগজের[১] দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

বাজে শিবপুর। হাওড়া
২রা কার্তিক '২৯

প্রিয় পাঁচকড়ি,

তোমার পত্র পাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। আমরা সকলে কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি সেজদি[২] আরোগ্য হইয়া উঠুন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অমরবাবু[৩] যে তাঁর মেয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন সে তো জানা কথা ভাই। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ স্নেহশীল ও উদার প্রকৃতির মানুষ।

মুখুয্যে মশাই[৪] আজও এখানেই আছেন। তিনি নিরন্তর চিন্তিত হইয়াই আছেন। পাছে তিনি গেলে এই বিপদের উপর আবার একটা উপদ্রব বাড়ে, এই জন্য তাঁকে আমি যাইতে দিই নাই, বিশেষতঃ তাঁর বেশি কিছু করিবারও যো নাই। তুমি ২।১ দিন অন্তর দুই এক ছত্র করিয়া খবর দিয়া আমাদের সকলের চিন্তা দূর কর, এই অনুরোধ বৌ[৫] তোমাকে করিতে বলিলেন। এখানকার এক প্রকার মঙ্গল।

তুমি আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবে ও পূজনীয়গণকে আমার প্রণাম দিবে। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিদাস শাস্ত্রী[১]কে লেখা

১

বাজে-শিবপুর। হাওড়া
২৮, ৩, ২৫

... তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র পড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু সময় কি শুধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক্ দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হইল... মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩ এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়— তখন কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক্— শারীরিক দিক্। কিন্তু আর একটা বড় দিক্ আছে— সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবানও নাই— দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতে সকল মাধুর্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে...অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই !

... সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্বিষহ হইয়া উঠে। ... তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি-সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতিবড় প্রেমেরও নাই। ...একটা কথা। —যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশি। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না। পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।... সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।...

ইং ১৯২৫

...সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।...

২

শিবপুর। হাওড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

কাল বাড়ি থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। আমার অভ্যাসের দোষে বহু দিন তোমাকে পত্র দিতে পারি নি। জানি অন্যায় যে কত বেশি হচ্ছে, তবু হয়ে ওঠে নি, এমনি কুঁড়েমি আমার। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে তোমরা ছোট ভাইয়ের মত, দাদার অপরাধ নেবে না।...

আমার যথাপূর্বং। যদি না ঢের বেশি বেড়ে গিয়ে থাকে। কন্সটিপেশান আমাকে নিয়ে তবে যাবে এইটেই অবশেষে স্থির হয়েছে— যাক্, একটা কিছু এত দিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হৌক বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি ব'লেই হৌক— এ রোগটা ঢের কমে থাকে। অতএব, শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস ক'রব ঠিক করেছি। খুব সম্ভব, এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সকলে চলে যাবো।...

তুমি কেমন আছ হরিদাস? সব ভাল ত? কেদারবাবু শুনেছি আমার সম্বাদের জন্য ব্যস্ত। বাস্তবিক আমাকে তিনি কি চোখেই যে দেখেছিলেন ' কিন্তু ভুল করেছিলেন— আমি তার যোগ্য নই।

কিছুদিন থেকে শিবপুরে আর প্রায়ই থাকি না, মন ভাল লাগে না। কোথায় যে লাগবে তাও ছাই ভেবে পাই নে। দেখি এবার বাড়ি গিয়ে গোলাপের আর জুঁই মল্লিকার চাষ করে।

যাবার সময়ে বুড়ো বয়সে ওদিকের পথটা ভগবান কি বন্ধুর করেই রেখেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনদের আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে হয়— যৌবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইহকালের মিয়াদ ফুরোয়। ইতি—৫ই ফাল্গুন '৩২

দাদা

৭[১]

বাজে শিবপুর,
হাওড়া
২৯, ৬, ২৫

মা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীর আমার বেশ ভালই আছে। কোন অসুখ বিসুখ নেই, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। হরিদাস[২] তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে।

হরিদাস আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমার মত সেও তোমাকে দেখবে। তাকে সকল কথা জানিয়ো। অমন ভাল ছেলে কাশীতে আর নেই। তা' ছাড়া সে নিজে চিকিৎসক।

প্রভাসের[৩] বৃন্দাবন থেকে শীঘ্র আসার কথা আছে; সে এসে পড়লে আমি কাশীতে একবার যেতে পারি।

প্রকাশের[৪] বিয়ে হয়ে গেছে, দিদি এখন এখানেই আছেন।

তুমি বাসা বদল ক'রে ভালই করেছ। এ ঘর কি তোমার পছন্দ-মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২৲১ টাকা ভাড়া বেশি দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়িভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই, কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়িভাড়া চাইবেও না।[৫]

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে তোমার খবর দিয়ো, তোমার সকল কথা আমি হরিদাসের কাছেই শুন্‌তে পাবো।

আমার সেই ভোলা চাকরটির বড় অসুখ। চিকিৎসা চল্‌ছে, অল্প বয়স, তাই আশা হয় সে সেরে উঠবে।

তোমার শরৎ।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

বাজে শিবপুর। হাওড়া
২৮, ৪, ২৫

...শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু[১] বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাসপাতাল থেকে তাকে মোটরে ক'রে বাড়ি আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন এ্যাকিউট গ্যাস্ট্রীটিস্। সাত দিন সাত রাত খাই নি ঘুমুই নি— তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চাম্চে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না ; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কাম্ড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগলো— তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা ! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

... ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু-বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে। অর্থাৎ পাগলা কুকুর কামড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা ইন্‌জেকশান্ এর আজ ১০টা ইন্‌জেকশন্ হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে,— কারণ ইওর লাইফ ইজ ট্যু ভ্যালুএব্‌ল্ ! দেখাই যাক্, ভ্যালুএব্‌ল্ লাইফের শেষটা কি দাঁড়ায় !—

তোমার শরৎ

রাধারাণী দেবীকে লেখা

১

বাজে শিবপুর, হাওড়া
১৪. ৮, ২৫

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণী, আজ তোমার চিঠি নরেনের[১] হাত থেকে পেলাম। ... আমার লেখা বেশি করে পড়ায় মেয়েদের অনেক সময় বিড়ম্বনা ভোগ করতেও হয়। এই যেমন আমার অভিমত প্রকারান্তরে সমর্থন করবার ফলে তোমাকে গালাগালি খেতে হ'ল। আমার নিজের সংস্কার বলে বড় বেশি বালাই নেই। তাই বহু সময়ে— তোমাদের কথা এত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করি যে, অনেকে সইতে পারে না। এই জন্যেই বোধ হয়— কোনো দুজন লোকের ধারণা আমার সম্বন্ধে এক নয়। কত অদ্ভুত দুর্নামই যে আমাকে নিয়ে প্রচারিত আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

পুরুষেরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস করে দিলাম ; আবাব মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো। কত মেয়ের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় আছে, তারা আমাকে আপনার লোকের চেয়ে আপনার ভাবে। তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে ত যায়ই না, বরঞ্চ সৎপথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে ত তারই খোঁজ পায়। আমাকে যদি তুমি দাদা বলেই ডাকো ত আমার লেখায় সত্যিকার দুর্নীতি কোথাও নেই এ বিশ্বাস যেন তোমার নিঃসন্দেহে থাকে।

তুমি ছেলেমানুষ, সাহিত্য নিয়েই যদি থাকো ত একটা বড় অবলম্বন পাবে। আমি মনীষী নই, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।...

আমার স্নেহাশীর্বাদ্ জেনো।

শরৎদা

২

বাজে শিবপুর,
২৫, ৮, ২৫

রাধারাণী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ...সাহিত্য ব্যাপারে তোমাকে কিম্বা তোমাদের সাহায্য করার আমার আজও উৎসাহ আছে। একদিন ছেলেবেলায়— নিরুপমা, সুরেন গঙ্গো, গিরীন গঙ্গো প্রভৃতিকে নিয়ে আমি ছোট অখ্যাত অজ্ঞাত সাহিত্য-সভা করেছিলাম। তাই ত আজ বাঙলা-সাহিত্য তাদের কাছে কত কি পাচ্ছে।

তেমনি আবার একটা গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে চাই। যদি কেউ ভবিষ্যতে ভাল হয়, যদিচ তাদের কাজ চোখে দেখে যাবার আমার আর সময় হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সব আলোচনা করব। সাবধানে থেকো, আমি ভাল আছি।

বড়দা

৩

কল্যাণীয়া রাধারাণী,

তোমার এইমাত্র চিঠি পেলাম। কুঁড়ে মানুষ, তাছাড়া না থাকে হাতের কাছে চিঠির কাগজ, না থাকে খাম, না পাই খুঁজে ডাকটিকিট— নানা কারণে চিঠির জবাব দেওয়া ঘটে ওঠে না। তুমি ছোট বোন, অভিমান করতে পারো, এ ক্ষেত্রে আমারই দোষ— তোমার রাগ হবারই কথা। কিন্তু কি করি ভাই, বুড়োমানুষ সব কাজেই ত্রুটি হয়ে পড়ে।

সরসীবালা বসু[১] নামটি বোধহয় ইতিপূর্বে শুনেছি। তবে তাঁর কোন লেখা পড়েছি বলে ঠিক মনে হচ্ছে না। বিশেষতঃ বোধ হয় তুমি জানো না যে, নির্বিচারে গল্প উপন্যাস আমি একেবারেই প্রায় পড়িনে। আমার পড়ার বই আলাদা।

বড়দা

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১

বাজে শিবপুর,
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩২

প্রিয়বরেষু,

পৌঁছানো খবর[১] একটা দিতে হয় প্রথা আছে। কিন্তু তুমি তো জানো আমি সকল 'প্রথা'র বাইরের মানুষ। তবুও দিচ্চি শুধু এই কথা মনে করে হয়ত তোমরা ভাব্‌বে। এখানে এসে মনে হচ্চে কি-ই বা এত কাজ ছিল, আরও দুদিন থাকলেই হোতো। কি যত্নটাই তোমরা আমাকে করেছ। মানুষের জীবনে এই দিনগুলোই শুধু মনে থাকে। ছেলেমেয়েদের আমি আশীর্বাদ করি, এবং প্রার্থনা করি তোমরা নিরাপদে এবং কল্যাণে থাকো।

তোমার গৃহিণী কি রকম করেই যে আমাদের সকল দিকে নজর রেখেছিলেন, আমি তাই এখানে এসে গল্প করচি।

— তোমার শরৎ

ডাক্তার রমেশ[২] ও তোমার রমেশদিদি[৩] বোধ হয় চলে গেছেন।[৪] সবাই মিলে কত আদরই আমাদের করলে। ইচ্ছে ছিল তাঁদেরও একটা চিঠি লিখি। কিন্তু সে চিঠি কি আর পৌঁছবে। আর একবার ঢাকায় যেতেই হবে।

২

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২১শে এপ্রিল '২৫

ভাই চারু,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার চিঠিপত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়, তবুও তোমাকে এই কথাটা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে— একটা মৃতপ্রায় বাছুর, তারপরেই একটা জবাই করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বললে, একটা গোধাও ত ছিল! আমি বললাম, কই, আমি ত তা দেখি নি।

তারপর তোমরা ষ্টেশন থেকে চলে গেলে, গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুনি আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে, মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজীতে যাকে বলে সুপারষ্টিশান সে আমার নেই, কিন্তু তিন তিনটে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্তের শান্তি দিলে না।

বাড়ি এসে শুনলাম, ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

২৭শে এপ্রিল '২৫

বাড়িতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার। পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এতবড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয়— তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিষ টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে অব্‌জেক্টিভ্‌টা কিছুই নয়, সাব্‌জেক্টিভ্‌টাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বইত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান[১] কিছুতেই মিথ্যে নয়।

তোমার শরৎ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

৩০শে জানুয়ারি '২৬
শিবপুর। হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে আনন্দ পেলাম। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বছর মাস দিয়ে মাপ্‌তে গেলেই ভুল হয়। অথচ, এই ভুল অধিকাংশ লোকেই করে।

তুমি ফিরে এলে[১] আবার দেখা হবে। বাইরের লোকের জানাবার দরকার কি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজ শ্রীমান্ হরিদাস শাস্ত্রী থাকেন। খাঁটি মানুষ। তাঁকে বাস্তবিকই আমি বড় ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় তোমার আলাপ নেই। যদি পারো— পরিচয় কোরো, খুসি হবে।

আমার মেজভাই[২] এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। আরোগ্য হবার মুখে চলেছেন, আশা করি শীঘ্রই পুনরায় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

আমি ঠিক ভাল নই বটে, তবে মোটের ওপর আছি এক রকম। কন্‌সটিপেশান-এর জ্বালাই হয়েছে আমার সব চেয়ে অশান্তি। রোজ রোজ তাল ও ল হত্যাকি বাটা খেয়ে চালিয়ে যাচ্চি।

সম্প্রতি একজন কোব্‌রেজ আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। ভরসা দিয়েছেন এ রোগ মানসিক। অতএব মাস খানেকের মধ্যেই আমাকে নিরাময় করতে পারবেন। পারেন ভালই, না পারেন আমার হত্যাকি এবং লিকুইড প্যারাফিন্ ত আর কেউ ঘুচোবে না। দিন কেটে যাবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ রইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্র-পরিচিতি

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কন্যা।

২ শরৎচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার কৃষ্ণদাস অধিকারীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের সময় শরৎচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনদের না জানানোয় অনেকেই তাঁর এই বিয়ের কথা আদৌ জানতেন না। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন কেউ কেউ হিরণ্ময়ী দেবী কোথাকার কী জাতের মেয়ে এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করত। শরৎচন্দ্রের দিদিদের অঞ্চলের কেউ কেউ নাকি জেনেছিল, হিরণ্ময়ীদেবী বৈষ্ণবের মেয়ে এবং ঠিক হিন্দু প্রথায় নাকি তাঁদের বিয়ে হয়নি। তাই যারা শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করত তারা শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে একঘরেও করেছিল।

৩ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৪ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র।

৫ শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশক মেসার্স এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ও আত্মীয় ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র ৪

১ *ভারতবর্ষ*-সম্পাদক জলধর সেন। জলধরবাবু সাহিত্যিক মহলে 'দাদা' নামে পরিচিত ছিলেন।

২ জলধরবাবু কানে খুবই কম শুনতেন। শরৎচন্দ্র এখানে সেই কথারই উল্লেখ করে পরিহাস করেছেন।

পত্র ৫

১ শরৎচন্দ্রের কুকুর 'ভেলু' এই সময় বেলগেছের পশু হাসপাতালে ছিল।

২ দিলীপকুমার রায়।

৩ কলকাতার মেডিকেল কলেজের বিখ্যাত সার্জন ছিলেন অ্যান্ডারসন সাহেব। খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র ভেলুর জন্যই অ্যান্ডারসন সাহেবকে দিয়ে বেলগেছে হাসপাতালের কোনো ডাক্তারকে কিছু বলাবার চেষ্টা করেছিলেন।
৪ শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ির নিকটে।

পত্র ৬

১ বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে এবং হরিদাসবাবুর মতেই শরৎচন্দ্র শেষে সতীশবাবুকে গ্রন্থাবলি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে হরিদাসবাবুর একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সতীশবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহও হয়েছিল।

পত্র ৭

১ শরৎচন্দ্র এই সময় কিছু দিনের জন্য সপরিবারে বাজে শিবপুর থেকে কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং উপরোক্ত ঠিকানায় বাড়ি ভাড়া করে বাস করেছিলেন।
২ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর।
৩ শরৎচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজেকে নাস্তিক বললেও, তিনি মোটেই নাস্তিক ছিলেন না।
৪ শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল ৬২ বৎসর বয়সে।
৫ শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় একবার সন্ন্যাসী হয়ে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে দেশে দেশে ঘুরেছিলেন। এখানে তারই ইঙ্গিত করেছেন।

পত্র ৮

১ হরিদাসবাবুর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।
২ শরৎচন্দ্রের এই জুতা কেনার কাহিনিটি পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য।

পত্র ৯

১ শিশিরকুমার ভাদুড়ি।
২ শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'কে সিনেমায় রূপায়িত করেন। শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প 'আঁধারে আলো'-ই প্রথম সিনেমায় রূপায়িত হয়। তখন সিনেমায় সবাক ছবি শুরু হয়নি, তখন নির্বাক ছবির যুগ ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' থেকে নির্বাক ছবি-ই হয়েছিল।

পত্র ১০

১ ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়িতে প্রতি বছরই খুব ধুমধাম করে সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা হত। শরৎচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজায় প্রায়ই মামার বাড়িতে যেতেন।
২ *ভারতবর্ষ*-সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন কানে খুবই কম শুনতেন। এ ছাড়া এক সময় বীরেন্দ্রনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি জলধরবাবুর সহকারী ছিলেন, তিনিও কানে খাটো ছিলেন। তাই কালা হওয়াটাকেই *ভারতবর্ষ*-র সম্পাদক হওয়ার অন্যতম যোগ্যতা বলে শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

পত্র ১

১ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২ নলিনীকান্ত সরকার তাঁর *শ্রদ্ধাস্পদেষু* গ্রন্থে লিখেছেন, ক্ষীরোদবাবু শরৎচন্দ্রের দত্তা পড়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'কি বই-ই লিখেছে হে! চরিত্রগুলি একেবারে জীবন্ত, আর তেমনি ডায়ালগ।' নলিনীবাবু আরও লিখেছেন

> এর কিছুকাল পরের ঘটনা। ... ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র বললেন— ওহে তোমার সঙ্গে শরৎ চাটুজ্যে মশায়ের দেখা হয়?
> —হয়। কেন বলুন না।
> —দেখা হলে বোলো ক্ষীরোদবাবু আপনাকে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম জানিয়েছেন।
> ... বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— শরৎবাবুকে প্রণাম জানাবার মত কারণটা কি ঘটল? ভাবে গদগদ হয়ে ক্ষীরোদবাবু বললেন— 'দেনা-পাওনা' পড়লাম সম্প্রতি। পড়েই মনে হয়েছে, দেখা হলে শরৎবাবুকে প্রণাম করে অভিনন্দিত করতাম।
> . শরৎচন্দ্রকে খবরটি দিলাম। শরৎচন্দ্র শুনে চমকে উঠলেন।

পত্র ৩

১ প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রকে শুধু বই উপহার দেননি, তিনি তাঁর একটা বই শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গও করেছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমথবাবু নিজেই লিখেছেন—' প্রায় বিশ-বাইশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত আমার *আহুতি* নামক গল্প-সংগ্রহ আমি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করি। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে নয়,— সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের খাতিরে।' *মাসিক বসুমতী*, মাঘ ১৩৪৪

পত্র ৪

১ এই সময়কার *ভারতবর্ষ* বা *প্রবাসী*-তে শরৎচন্দ্রের কোনো সমালোচনা দেখা যায় না। তাই মনে হয় সমালোচনাটি তিনি লেখেননি।

২ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ এটা শরৎচন্দ্রের বিনয় মাত্র। শরৎচন্দ্র যে কীরূপ পড়াশুনা করেছিলেন, তা *শরৎচন্দ্র*-এ (১ম খণ্ড) 'রেঙ্গুনে পড়াশুনা ও সাহিত্য সাধনা' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

পত্র ১

১ প্রমথ চৌধুরী।

২ রবীন্দ্রনাথ এই সময় যেতে পারেননি, পরে ১৩৩০ সালে একবার গিয়েছিলেন। শিবপুর ইনস্টিটিউটে সভা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেই সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর অভিভাষণে 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ

ওই প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি।'

পত্র ২

১ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধুর আহ্বানে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিলে, দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করেন।
শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করে কংগ্রেসের আদর্শ বা নীতি অনুযায়ী চরকা কাটা, খদ্দর পরা, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা—সমস্তই করতে থাকেন।
শরৎচন্দ্র এই সময় রবীন্দ্রনাথকেও কংগ্রেসে যোগদান করানো যায় কিনা চিন্তা করেন। তিনি ভাবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি কংগ্রেসে যোগদান নাও করেন, অন্তত তাঁকে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করানো এবং তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে চরকা ও খদ্দরের প্রচলনের ব্যবস্থা করাতে হবে।
দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, কবি তখন ইউরোপে ছিলেন। কবি বিদেশ থেকে ফিরে এলে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর কাছে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ও চরকা-খদ্দর প্রচারের কথা নিবেদন করলেন।
কবি কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না।
এতে শরৎচন্দ্র একরকম রাগ করেই কবির কাছ থেকে চলে এলেন।
কবি অসহযোগ ও চরকা-খদ্দর সমর্থন না করায় শরৎচন্দ্র এই সময় রাগের বশে কারও কারও কাছে কবির বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কথাও বলতেন।
শরৎচন্দ্র যাঁদের কাছে কবির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবির কাছে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে আসেন। এই শুনে কবি শরৎচন্দ্রের উপর খুব অসন্তুষ্ট হন।
এদিকে শরৎচন্দ্র আবার কারও কারও মুখ থেকে তাঁর উপর কবির অসন্তোষের কথা জানতে পারেন। তখন তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে কবিকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

পত্র ৩

২৬ বৈশাখ তারিখে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে মার্জনা চেয়ে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্রকে একটা উত্তর দিয়েছিলেন। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠির স্বর কিছুটা কঠিন ছিল। তাই শরৎচন্দ্র কবির সেই চিঠি পেয়ে কবিকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

পত্র ৪

শরৎচন্দ্র একবার তাঁর *ষোড়শী* নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি গান লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্রকে তখন একটি উত্তর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিটি পাওয়া যায় না। সম্ভবত সময়াভাববশতই তখন গান লিখতে পারবেন না ব'লে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবার কথা শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের *ষোড়শী* নাটকে গান লিখে না দেওয়ায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর তখন মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অমল হোমকে লেখা

পত্র ১

১ এই চিঠিখানি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় লেখা। অমলবাবু এই সময় লাহোরের দৈনিক *ট্রিবিউন* পত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন।

২ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেন্ট রবীন্দ্রনাথকে যে 'নাইট' উপাধি দিয়েছিলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তা ত্যাগ করেন।

৩ কালীনাথ রায়।

পত্র ২

১ বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন* নাটকটি এই সময় কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জয়সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন।

২ এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার।

৩ *বিসর্জন* অভিনয় দেখে নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (থিয়েটার-মহলে 'ভুনি বোস' নামে পরিচিত) কলকাতার ইংরেজি দৈনিক *ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ*-এ এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশ করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ করণকে লেখা

পত্র ১

১ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির জনৈক ব্যক্তি।

২ ১৩২৪ সালের পৌষ সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী'র একস্থানে পোদজাতির অস্পৃশ্যতার কথা লেখা ছিল। শরৎচন্দ্র গ্রন্থ প্রকাশের সময় সে কথাগুলি বাদ দেন।

কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা

১ ইনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা

১ দ্বিজেনবাবু কলকাতায় মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন। দ্বিজেনবাবুর দাদা কবি এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শরৎচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর পরিচয় হয়।

২ এই 'পল্লী-কাহিনী'র কোনো হদিস পাওয়া যায় না। মনে হয় শরৎচন্দ্র এই কাহিনিটি লিখতে লিখতে ত্যাগ করেছিলেন, নয়তো পল্লী-কাহিনীকে তাঁর ওই সময়কার লেখা কোনো বইয়ের নামে নামকরণ করেছিলেন। দ্বিজেনবাবু 'বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লিগ-এর সম্পাদক ছিলেন বলেই হয়তো শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন।
৩ দ্বিজেনবাবু ধূমপায়ী ছিলেন না বলেই এই কথা লিখেছিলেন।

নিরুপমা দেবীকে লেখা

১ শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের সাহিত্য-শিষ্যা তিনি *দিদি*, *অন্নপূর্ণার মন্দিব* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা।
২ শরৎচন্দ্র হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে যখন থাকতেন, তখন সেখানকার এক অধ্যাপক তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 'ঐ বন্ধুর বাড়ির' সামনেই বাস্তার অপর দিকে অন্য এক পোড়ো বাড়ির রকে বসে কয়েকটা অত্যন্ত বদ ছেলে রোজ আড্ডা দিত এবং নানা আলোচনা করত। এদের দলের একজন তো একদিন ওই অধ্যাপকের দশ-এগারো বছরের এক বালিকা কন্যাকে একটা চিঠি লিখেও বসল।
অধ্যাপক সকল ব্যাপার শরৎচন্দ্রকে জানালে, শরৎচন্দ্র শুনে বললেন, ওরা ভালো কথায় ওখান থেকে যাবে না, ওদের মার দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওখান থেকে তাড়াতে হবে। শরৎচন্দ্রেব এই কথায় অধ্যাপক শরৎচন্দ্রের শঙ্কব মাছের চাবুকটি নিয়ে পরদিনই সকালে ওই রকবাজ ছেলেদের কাছে গিয়ে চাবুক নাচাতে নাচাতে বললেন, তোমবা এখান থেকে তোমাদের এই আড্ডা যদি না তোলো, তাহলে আমি চাবুকে তোমাদের এখান থেকে তাড়াব।
রকবাজ ছেলেদের একজন বলল--- 'আমরা তো আপনার জায়গায় বসে আড্ডা দিইনি, আপনি বলবার কে?'
'তোমরা এখান থেকে যাবে কিনা বলো?'
'না, আমরা যাব না।'
এইভাবে অধ্যাপকের সঙ্গে ওই ছেলেদের যখন চেঁচামেচি হচ্ছিল, তখন গোলমাল শুনে পাড়ার কয়েকজন লোকও এসে গেল। অধ্যাপকের বড়ো ছেলে এসে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং অধ্যাপকের ছেলের পাশেই ছিলেন পাড়ার যুবক রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যাপক কথা বলতে বলতে যখন হাতের চাবুকটা নাচাচ্ছিলেন, সেই সময় রকের একটা ছেলে অধ্যাপকের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিলে রজনীবাবু বাধা দিতে গেলেন। এই চাবুক নিয়ে তখন রজনীবাবুর সঙ্গে ওই ছেলেদের বেশ ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। রজনীবাবুর গায়ে খুব জোর ছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত চাবুকটি কেড়ে নিলেন এবং ধস্তাধস্তির সময় প্রতিপক্ষের একজন তাঁর মাথায় ইট ছুড়ে মেরেছিল বলে তিনি রাগে ওই দলের যাকে সামনে পেলেন, তাকেই সেই চাবুক দিয়ে চাব্কাতে লাগলেন। তারা তখন ছুটে পালাতে লাগল। একজন ছুটে পালাতে গিয়ে পাশের একটা পুকুরে পড়ে গেল। সে পুকুরের জলে পড়বার আগে রজনীবাবু তাকে এমন চাবকালেন যে তারই পিঠে ওই চাবুকটা ছিঁড়ে গেল।
সেইদিনই মার-খাওয়া ওই ছেলেদের অভিভাবকরা একত্র হয়ে অধ্যাপকের নামে এবং রজনীবাবুর নামে কোর্টে নালিশ করল। অধ্যাপকও এই কথা জানতে পেরে তাঁর এক উকিল বন্ধুর পরামর্শে ওই ছেলেদের বিরুদ্ধেও নালিশ করলেন। মামলা বেশ জমে উঠল।
মার-খাওয়া ছেলেদের দল পরে জেনেছিল যে, চাবুকটা ছিল শরৎচন্দ্রের। এবং তারা এও জেনেছিল যে, শরৎচন্দ্রই তাদের মেরে তাড়াবার কথা বলেছিলেন। এজন্য তারা শরৎচন্দ্রকে

আসামি করতে না পারায় শরৎচন্দ্রের নামে মিথ্যে করে নানা অপবাদ রটাতে লাগল। শরৎচন্দ্র আরও রেগে গেলেন।

কিছুদিন পরে অবশ্য শরৎচন্দ্রই উভয় পক্ষকে ডেকে মামলাটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ওই অধ্যাপক বন্ধুটি একদিন এই মামলার প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, 'শরৎবাবু মিটমাটের চেষ্টা না করলে, আমি ওই সব বদ ছেলেদের একেবারে শায়েস্তা করে দিতাম।'

এই মারামারি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তাঁহার সযত্ন রক্ষিত শঙ্কর মাছের চাবুকটির পল্লীর কয়েকটি দুষ্টের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়া দশাপ্রাপ্তি দেখিয়াছি।' (মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৪৪)।

৩ নিরুপমাদেবীর ছোটোবোন ক্ষণপ্রভা দেবী।

৪ শরৎচন্দ্রের বইয়ের প্রকাশক ও *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

৫ নিরুপমাদেবী এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে তাঁর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্টর বাড়িতে থাকতেন।

৬ নিরুপমাদেবী বাল্য-বিধবা ছিলেন এবং জীবনভর ধর্ম-কর্ম নিয়েই থাকতেন।

৭ মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৮ বিভূতিভূষণ ভট্ট।

কুমুদিনীকান্ত করকে লেখা

১ শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু। ইনি রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে শরৎচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন।

২ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমুদিনীবাবু রেঙ্গুন থেকে বদলি হয়ে পুণায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের কাছাকাছি ছিলেন। রাখালবাবু কুমুদিনীবাবু ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই পরিচিত ছিলেন। রাখালবাবু ওই সময় কলকাতায় এসেছিলেন।

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ কানপুর প্রবাসী জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক।

২ লীলাদেবীর লেখা বই।

৩ শরৎচন্দ্রের 'পথ-নির্দেশ' গল্পের নায়ক ও নায়িকা।

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথ-নির্দেশ' গল্পে নায়িকা হেমনলিনীর সঙ্গে নায়ক অবিবাহিত গুণীনের বিয়ে না দিয়ে বই শেষ করেছেন। লীলা দেবী শরৎচন্দ্রের এই গল্পের শেষাংশের ভাব নিয়ে বাড়িয়ে গল্পটির পরিশিষ্টের মতো করে *মিলন* নামে একটি বই লেখেন এবং এই বইয়ে হেম ও গুণীনের মধ্যে বিয়ে দেন। লীলাদেবী তাঁর এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

পত্র ৩

১ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
২ আত্মীয় ছিলেন না। পবিত্রবাবু লীলাদেবীকে অমনি দিদি বলতেন।

পত্র ৪

১ লীলাদেবীর স্বামী সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। লীলাদেবী এই সময় তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল কানপুরে ছিলেন।
২ লীলাদেবীর লেখা গল্প।
৩ লীলাদেবীর পিতা রায়সাহেব অক্ষয় চৌধুরী রেলওয়েব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন। শ্রীরামপুরে তাঁর খান তিনেক বড়ো বাড়ি ছিল, আর জয়রামপুরে ছিল তাঁর জমিদারি। জয়রামপুর বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।
৪ লীলাদেবীর পিতা ডিহিরীতেও একটা বিরাট বাংলো বাড়ি করেছিলেন।
৫ এক প্রকার ফল।
৬ লীলাদেবীর স্বামী এক সময় চাকরির সূত্রে বর্মায় গিয়েছিলেন। সেই সময় লীলাদেবীও তাঁর স্বামীর সঙ্গে বর্মায় যান।
৭ অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্র ৬

১ শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভালোই জানতেন। রেঙ্গুনে থাকার সময়েই তিনি ঘরে পড়ে এই চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি রেঙ্গুন, বাজে শিবপুর এবং সামতাবেড় যখন যেখানে থেকেছেন, তখন সেখানে পাড়ার দুঃস্থদেব বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। শুধু ওষুধই নয়, তিনি কারও কারও পথ্যও কিনে দিতেন।
শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর থেকে যখন এই চিঠিটি লেখেন, তার ছয় সাত বছর পরে তিনি তাঁর দিদির বাড়ির কাছে বাড়ি করে বাস করতে থাকেন। সেখানে বাস করার আগে তিনি কখনো কখনো হাওড়া থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে দিদির বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। দিদির শাশুড়ির শ্রাদ্ধোপলক্ষে দিদির বাড়ি যাবার সময় তিনি যখনই শুনলেন যে সেখানে লোকের ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, অমনি তিনি যাবার সময় ওষুধপত্র নিয়ে সেখানে গেলেন। শরৎচন্দ্র যে কী ধরনের দরদি ও পরোপকারী ছিলেন, এ থেকেও তা বেশ বোঝা যায়।
২ শরৎচন্দ্র এই সময় কানপুরে লীলাদেবীদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার জুতো বিখ্যাত বলে সেখানে নিজের পায়ের জন্য জুতোর অর্ডার দিয়ে এসেছিলেন।
৩ শরৎচন্দ্রের ভৃত্য। শরৎচন্দ্র কানপুর যাওয়ার সময় ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পত্র ৭

১ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে তাঁদের স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে আনেন। এনে বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করতে গিয়ে শুনলেন, অম্বা আগে থেকেই শাল্বরাজের বাক্‌দত্তা। এই শুনে ভীষ্ম তখনই অম্বাকে শাল্বর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অম্বার হাত ধরে তাঁকে হরণ করেছিলেন বলে শাল্ব অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

পরে অম্বা পরশুরামের শরণাপন্ন হলে পরশুরাম অম্বাকে সঙ্গে নিয়ে শিষ্য ভীষ্মের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'তুমি অম্বাকে স্পর্শ করায় শাল্ব এঁকে গ্রহণ করছেন না, এখন তুমিই এঁকে গ্রহণ করো।'

ভীষ্ম বিয়ে করবেন না, এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় গুরুর আদেশ কিছুতেই মানতে পারলেন না।

তখন অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তপস্যা করতে যান। মহাদেব অম্বাকে বর দেন, 'তুমি পরজন্মে দ্রুপদরাজের কন্যারূপে জন্মে পরে পুরুষত্ব লাভ করবে।' মহারথ যোদ্ধা হবে ও যুদ্ধে ভীষ্মকে নিপাতিত করবে।

এই বর পেয়ে অম্বা চিতা জ্বালিয়ে আগুনে আত্মাহুতি দেন।

এদিকে যথাসময়ে দ্রুপদরাজের কন্যারূপে অম্বা জন্ম নিলেন এবং যৌবনে এক যক্ষের কৃপায় পুরুষত্ব লাভও করলেন। দ্রুপদরাজের প্রথমে কন্যা ও পরে পুত্ররূপী এই সন্তানই হলেন শিখণ্ডী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাতেজা ভীষ্মকে পরাজিত করবার জন্য অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর জন্মবৃত্তান্ত সবই জানতেন, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দেখে স্তব্ধ হয়ে শরবর্ষণ সহ্য করেছিলেন। শিখণ্ডী ও অর্জুন উভয়েই বাণে বাণে ভীষ্মকে জর্জরিত করেছিলেন। ভীষ্ম এইভাবে শরবিদ্ধ হয়ে রথ থেকে পড়ে যান। তাঁর দেহ শরসমূহে সমাবৃত ছিল বলে, দেহ মাটি স্পর্শ করল না। ভীষ্ম শরশয্যাতেই শয়ান হলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে একটা ব্যর্থ প্রণয়ের ব্যাপার ছিল। তাঁর এই ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত জনরা সকলেই জানতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা আলোচনা করতেন। এমনকী কেউ কেউ এ নিয়ে শরৎচন্দ্রকে নানা প্রশ্নও করতেন। শরৎচন্দ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের শর-বর্ষণ সহ্য করার মতোই এ ব্যাপারে সকলের সকল কথাই নিঃশব্দে সহ্য করতেন। কারও কোনো আলোচনা বা কথারই উত্তর দিতেন না।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আছে :

> একদিন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে গিয়ে বললেন, 'পিতামহ! আপনার কাছে নানা উপদেশ শুনেও আমার জ্ঞাতিবধ জনিত শোক যাচ্ছে না। পরলোকে যাতে এই জ্ঞাতিবধ পাপ থেকে মুক্তি পাই, তার জন্য আরও কিছু উপদেশ দিন।' তখন ভীষ্ম এই গল্পটি বললেন :
>
> পুরাকালে গৌতমী নামে এক ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। একদা সর্প দংশনে তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। ওই সময়ে এক ব্যাধ সেই সাপটিকে বধ করতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণী ব্যাধকে বললেন, সাপকে বধ করলেও আমার পুত্র আর জীবিত হবে না। অথচ তুমি প্রাণী-হত্যার জন্য পাপগ্রস্ত হবে। অতএব ওকে ছেড়ে দাও।'
>
> এই শুনে সাপ বললে, 'আমি মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে একে দংশন করেছি। আমার কোনো দোষ নেই।'
>
> এমন সময় মৃত্যু এসে বললে, 'আমি কাল কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সাপকে পাঠিয়েছিলাম। অতএব কালই এজন্য দায়ী।'
>
> এই সময় আবার কাল এসে বললে, 'আমি, মৃত্যু বা সাপ কেউই দায়ী নই। ওর পূর্বকৃত কর্মই ওর বিনাশের কারণ।'
>
> সব শুনে ব্রাহ্মণী ব্যাধকে বললেন, 'আমার পুত্র নিজ কর্মের জন্যই মৃত্যু বরণ করেছে। আর আমার কর্মদোষেই আমি পুত্রহারা হলাম।' ভীষ্ম এই গল্প বলে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'কালের

প্রভাবেই সকলের মৃত্যু হয়। তোমার কোনো দোষ নাই। অতএব তুমি শোকহীন হয়ে শান্তি লাভ করো।'

এই কাহিনিটি বলে, মনে হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নিজের ভাগ্য বা নিজের কর্মফলের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

পত্র ৮

১ দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন পুরোদমে চলছে, সেই সময় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হয়েছিল। শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর আহ্বানেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আগেই অবশ্য দেশবন্ধু সম্পাদিত *নারায়ণ*-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটির প্রকাশ নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

২ শরৎচন্দ্র তাঁর দিদির বাড়ির কাছে এই পাঠশালাটি করেছিলেন। এই সময় তিনি বাজে শিবপুরে থাকতেন, তাই দেখাশুনার অভাবে পাঠশালাটি তখন বন্ধ হয়ে যায়। বছর দুই পরে তিনি ওই অঞ্চলে আবার একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বালিকা বিদ্যালয়টি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং স্থানীয় লোকেরা শরৎচন্দ্রের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করেছেন।

পত্র ৯

১ এই সময় অসহযোগ আন্দোলন পুরো দমে চলছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে থেকে কংগ্রেসের কাজে তখন ডুবে ছিলেন।

২ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ইংরাজ সরকার 'রৌলাট আইন' পাস করলে, তখন গান্ধিজি বলেছিলেন

> রৌলাট আইন ভারতীয়দের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও তাদের জন্মলব্ধ স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। অতএব এই অসঙ্গত ও অপমানজনক আইন ভারত সরকার যতদিন না প্রত্যাহার করবে ততদিন আমরা সম্মিলিতভাবে এই আইন মানতে অস্বীকার করব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থা (প্যাসিভ রেজিসট্যান্স) গ্রহণ করব।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে এটাই হ'ল মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহের প্রথম আবেদন। তিনি এই সময় দেশবাসীর কাছে রৌলাট আইনের প্রতিবাদে প্রথমে ৩০ মার্চ, পরে তারিখ বদলে ৬ এপ্রিল হরতাল পালনের আহ্বান জানান। গান্ধিজি নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেদিন লোকে উপবাস করবে এবং দোকান ও হাট-বাজার বন্ধ রাখবে।

গান্ধিজি প্রথমে ৩০ মার্চ, পরে ৬ এপ্রিল হরতালের দিন ঘোষণা করলেও ৩০ মার্চ দিল্লিতে এবং পাঞ্জাবের কোনো কোনো স্থানে হরতাল পালিত হয়েছিল। আর সব জায়গায় ওই হরতাল নিরুপদ্রবও ছিল না। দিল্লিতে পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ৮জন নিহত ও বহুলোক আহত হয়েছিল।

কলকাতায় রৌলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতাল পালনের দিনে পুলিশের গুলিতে ৬/৭ জন নিহত ও ১০/১২ জন আহত হয়েছিল। সেদিন কলকাতায় যে শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, সেই শোভাযাত্রায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে শরৎচন্দ্রও ছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনের আগে থেকেই শরৎচন্দ্র দেশের কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

৩ কবি গিরিজাকুমার বসু।

পত্র ১০

১ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষ দিকে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাতে যোগ দেবার জন্য শরৎচন্দ্র ওই সময় গয়ায় গিয়েছিলেন।

পত্র ১১

১ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ি।
২ এঁদের একজনের কথা জানি। তিনি শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীর মেজ জা। তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বিধবা হলে তাঁর স্বামীর গচ্ছিত সমস্ত টাকা শরৎচন্দ্রের মারফত এবং শরৎচন্দ্রের নামেই অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হলে শরৎচন্দ্র নিজে ওই বিধবার সমস্ত টাকা তাঁকে দিয়েছিলেন।
৩ শরৎচন্দ্র দুঃস্থ আত্মীয়দের ছাড়া বাজে শিবপুর, সামতাবেড় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বহু অনাত্মীয়কেও গোপনে মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন।

পত্র ১২

১ এই সময় বরিশালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল।
২ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নজরুল তাঁর *ধূমকেতু* কাগজের পুজো-সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লেখেন। এতে গভর্নমেন্ট কবিতাটি রাজদ্রোহ-মূলক বলে তাঁর নামে নালিশ করে। ফলে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয়। এই সময় হুগলি জেলে থাকাকালে কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি আরও কয়েকজন সহ অনশন আরম্ভ করেন। নজরুলের মা এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁকে অনশন ত্যাগ কবতে বলেন, কিন্তু তিনি কারও কথাতেই কান দেন না। শেষে তাঁর অনশনের ৩৯তম দিনে কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর কথায় তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। নজরুল এই বিরজাসুন্দরী দেবীর কন্যাকেই বিয়ে করেছিলেন।

পত্র ১৩

১ লীলাদেবীর স্বামী কানপুর থেকে বদলি হয়ে দিল্লি যান। তারপর সেখান থেকে বদলি হয়ে আসেন নবদ্বীপে। শরৎচন্দ্র কানপুর, দিল্লি ও নবদ্বীপ সব জায়গাতেই এঁদের আমন্ত্রণে এঁদের বাড়ি গিয়েছিলেন।
শরৎচন্দ্র নবদ্বীপ যাওয়ার সময় তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু শৈলেশ বিশিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। লীলা দেবীদের দিল্লি ও নবদ্বীপের বাড়িতে যাওয়া সম্বন্ধে এই শৈলেশবাবু লিখেছেন :

> মহিলাটি (লীলাদেবী) তখন অসুস্থ। দাদা (শরৎচন্দ্র) করলেন কি, দিল্লিতে কৈ, মাগুরমাছ পাওয়া যায় না, একেবারে কলিকাতা উজাড় করে কৈ, মাগুর মাছ জালা ভরে দিল্লি চললেন। তারপরের ঘটনা। কি সূত্রে জানিনা মহিলাটির স্বামী বদলি হয়ে নবদ্বীপে এসেছেন। দাদা যাচ্ছেন সেখানে, আমি তল্পী বাহক... সন তারিখ মনে নেই। তবে জ্যৈষ্ঠ মাস মনে আছে।

২ শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই।

৩ লীলাদেবীর ভাই ছিল না। তাঁর আর এক বোন ছিল মাত্র। তাঁরা দু-বোনে তাঁদের পিতার সম্পত্তি পেয়েছিলেন।
৪ লীলাদেবীর পিতার বাড়ির কর্মচারী।
৫ ডিহিরীতে লীলাদেবীর পিতা অনেক গোরু পুষেছিলেন।

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বামী।
২ এই সময় শরৎচন্দ্রের দাড়ি ছিল। তাই তিনি নিজেকে মুসলমান বলেছেন। তাঁর গায়ের রং কিন্তু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। সাধাবণ বাঙালির গায়ের রঙেব চেয়ে তাঁর গায়ের বং বরং ফরসাই ছিল। আর শরৎচন্দ্র এই সময় বৃদ্ধও ছিলেন না। তিনি এই সময় কেন এর অনেক আগে থেকেই নিজেকে বৃদ্ধ বলে পরিচয় দিতেন।

পত্র ২

১ *শ্রীকান্ত* (প্রথম পর্ব) ইংরাজি অনুবাদের জন্য। ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন কে. সি. সেন ও মি. টমসন। এই ইংরাজি অনুবাদ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভাবসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
শবৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর আর একটিমাত্র বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর সেই বইটি হল *নিষ্কৃতি*। দিলীপকুমার রায় এর অনুবাদ করেছিলেন। ইংরাজি অনুবাদে বইটির নাম দিয়েছিলেন, *ডেলিভারেন্স*।

গিবিজাকুমার বসুকে লেখা

১ গিরিজাবাবু শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ছিলেন।
২ শরৎচন্দ্র এই সময় সপরিবারে কাশী বেড়াতে গিয়েছিলেন।
৩ শিশির পাবলিশিং হাউসের মালিক শিশিরকুমার মিত্র। ইনি শরৎচন্দ্রের *বামুনের মেয়ে* প্রকাশ করেছিলেন।
৪ কমলিনী সাহিত্য মন্দির।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেদারবাবুর পরিচয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু তাঁর *আত্মকথা*-য় লিখেছেন ·

> নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী হতে *প্রবাস-জ্যোতিঃ* নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদনা ভার আমার উপরই ন্যস্ত হয়। ... শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্তী হন সহকারী সম্পাদক।

এই সময় আমাদের প্রিয় সাহিত্য-শিল্পী লব্ধ-প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র কাশী আসেন। কাশীতেই তাঁর সহিত সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য আমার ঘটে। পরে তা বন্ধুত্বে দাঁড়ায়। প্রেমিক দরদি একবার আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে একটি চাকর সঙ্গে করে এসে উপস্থিত। পাঁচদিন থাকেন, অনেক কথাই হয়। পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠদিনে প্রত্যাবর্তন করেন।...

পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দেখা।...পরে উভয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।. শেষ দেখা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনে গিয়ে। সেই সময় একত্রে তাঁর *বিজয়া* নাটকের অভিনয় দেখে আসি। তখন বলেছিলেন, আর নয়, মাত্র দুখানি নাটক লিখে ছুটি নেব।

২ 'কালী ঘরামী' কেদারবাবুর লেখা একটি গল্প।

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্র *প্রবাস-জ্যোতিঃ* কাগজে *বাড়ির কর্তা* নামে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এক সংখ্যায় লিখে আর লেখা দিতে পারেননি। *প্রবাস-জ্যোতিঃ* উঠে গেলে এর সহকারী সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পরে *উত্তরা* নামে একটি পত্রিকা বার করেন। সুরেশবাবু তাঁর উত্তরায় পরে শরৎচন্দ্রের *প্রবাস-জ্যোতিঃ*-র ওই লেখাটি ছেপেছিলেন। সুরেশবাবু তখন ওই লেখাটিকে *রসচক্র* নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা হিসাবে ছাপেন।

পত্র ৩

১ কেদারবাবুর পুত্র ছিল না, কেবল একটি মাত্র কন্যা ছিল। এই সময় তিনি পূর্ণিয়ায় এই কন্যার বাড়িতে থাকতেন।

কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা

১ কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে মিলিত হয়ে *ধূমকেতু* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। নজরুল নিজে ছিলেন, ওই পত্রিকার সম্পাদক। কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন শান্তিপদ সিংহ, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন আফজাল-উল-হক্ এবং পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ভূপতি মজুমদার। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট।

ধূমকেতু ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা অর্থাৎ সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা। *ধূমকেতু* প্রকাশের পূর্বে নজরুল তাঁদের কাগজের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়ের কাছ থেকেই আশীর্বাণী চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র আশীর্বাণী হিসাবে নজরুলকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর আশীর্বাণীতে আট লাইনের একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

ধূমকেতু যখন প্রথম বেরোয়, তখন অসহযোগ আন্দোলনের চাপে পড়ে বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। নজরুল তাঁর *ধূমকেতু*-র মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনকে আবার জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। *ধূমকেতু*-র প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'ধূমকেতু' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীর সেজ দেওর। ইনি এঁদের বাড়ি থেকে অদূরে ওড়ফুলি গ্রামের এম. ই. স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন।
২ অনিলাদেবীর সেজ জা।
৩ অমরনাথ ভট্টাচার্য। হাওড়া জেলায় নারিট গ্রামে অমরবাবুর বাড়ি ছিল।
৪ শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
৫ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ীদেবী।

হরিদাস শাস্ত্রীকে লেখা

১ হরিদাসবাবু কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজী করতেন। শরৎচন্দ্র কাশী গেলে সেখানে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র একাধিকবার কাশী গিয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম যান। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে যান দ্বিতীয়বার। প্রথম বার তিনি সপরিবারে কাশী গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে সেখানে মাস খানেক ছিলেন। দ্বিতীয় বার গেলে সেই সময়েই হরিদাসবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলাকে লেখা

১ জনৈকা ভদ্রমহিলা। বৃদ্ধ বয়সে ইনি কাশীতে বাস করতেন। কাশীতেই এঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্র এঁকে বুড়িমা বলতেন।
২ কাশীর কবিরাজ হরিদাস শাস্ত্রী।
৩ শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দ। ইনি বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন।
৪ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রকাশবাবুর বিয়ে হয় মুঙ্গেরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা কনকলতা দেবীর সঙ্গে।
৫ হরিদাস শাস্ত্রী লিখেছেন :

> বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা (শরৎচন্দ্র) একবার লিখিয়াছিলেন—'বুড়ীমা দুঃখে পড়ে একদিন আমায় ছেলে বলেছিলেন— এখন কাশীতে আছেন.. ঠিকানায় খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন। বাল্যবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল— বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব মাল্‌পো তৈরি করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন। শেষ বয়সে চোখটা খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পড়িতে পারিতেন না।'— শরৎচন্দ্র আমার হাত দিয়া তাঁকে কিছু সাহায্য করিতেন।... চিঠিখানি ছাপানর উদ্দেশ্য—কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটা প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন, বাড়িভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্ম-গোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন আমি বুড়ীমাকে দিতাম। (*সাহানা*, ১৩৪৬)

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১ শরৎচন্দ্রের কুকুরের নাম ছিল ভেলু।

রাধারাণী দেবীকে লেখা

পত্র ১

১ নরেন্দ্র দেব। রাধারাণী দেবী নরেনবাবুর জ্যাঠামশায়ের শ্যালক-কন্যা। রাধারাণী দেবী বাল্যবিধবা ছিলেন। পরে এই নরেনবাবুর সঙ্গেই রাধারাণী দেবীর বিয়ে হয়েছিল।

পত্র ৩

১ সেকালের একজন মহিলা লেখিকা। ইনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন।

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ ও ১১ এপ্রিল তারিখে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। সাহিত্য সম্মেলন শেষ হয়ে গেলে শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। চারুবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। এখানে শরৎচন্দ্র ঢাকা থেকে ফিরে এসে পৌঁছানোর খবরের কথা বলেছেন।

২ ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রমেশবাবু মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন।

৩ রমেশবাবুর স্ত্রী। শরৎচন্দ্র পরিহাস করে 'তোমার রমেশদিদি' বলেছেন।

৪ গ্রীষ্মের ছুটিতে।

পত্র ২

১ ঋষভদেবের পুত্র রাজা ভরত বনে তপস্যা কালে একদা একটি সদ্যোজাত মাতৃহারা হরিণ শিশুকে দেখে তাকে লালন-পালন করেন। এজন্য শেষ পর্যন্ত তপস্যাই উঠে যায়। রাজা ভরত মৃত্যুকালে মায়াবশত ওই হরিণটির কথা ভাবতে ভাবতে মরেছিলেন বলে, পরজন্মে তিনি মৃগ হয়ে জন্মেছিলেন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১ উমাপ্রসাদবাবু এই সময় কাশীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২ প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রে মধ্যম ভ্রাতা। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ইনি এই সময় খুব অসুস্থ হয়ে দাদার কাছে এসেছিলেন।

সামতাবেড় ও কলকাতার চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি[১] পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেচি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি— এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে। একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয়, এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যেয় জড়ানো। মিথ্যেও বরঞ্চ টিঁকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ডু ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তর কালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ, সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বল্‌বে, লাভ নেই— এম্‌নি। মাঝে মাঝে হয়ত, অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে,— তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি,— কিন্তু তবুও মন খুসি হয় না, অথচ এরা বলে এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারি নি। শুধু একটুকুই বুঝেচি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিষ বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির পারস্পেক্টিভ এবং সাহিত্যের পারস্পেক্টিভ কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা কংক্রিট উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ

সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। সাহিত্যের দূরব্যাপী পারস্পেক্টিভ বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু-একটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা-দর্শকেরা— কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে নয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।' আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মান্‌বো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলো-মেলো— কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারি নে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন।[২] ইতি— ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া

২৯শে আশ্বিন ১৩৩৯

শ্রীচরণেষু,

আমার বিজয়ার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনি নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনেও থাকিতে পারেন নাই— এই জন্যই নিবেদন করিতে বিলম্ব করিলাম।

'কালের যাত্রা'র সঙ্গে যে আশীর্বাদ[১] আপনার পাইলাম সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।

আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই— আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন।[২] আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমাব প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল।[৩] শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয়ত এটাই ইহারা ভালোবাসে,— আমি উপলক্ষ মাত্র। কারণ, গত বৎসরের জয়ন্তী উৎসবেও[৪] ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

আমি একদিন নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সঙ্কোচে যাইতে পারি না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া যে এত বড় শারীরিক পরিশ্রম আপনি করিতে পারেন, ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ইতি—

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমল হোমকে লেখা

১

অমল,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি, অথবা এই মনে ক'রে দিই নি যে, দেখা হ'লে সমস্ত কথা জানাবো। তোমার 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য'[১] আমি সেই দিনই আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দু-একটা কথা হয়ত না বললেই হ'ত, তবে কেউ না বললেই বা বলা হয় কিরূপে? একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর একটু ছোট হ'লে একটা সুবিধে এই হ'ত যে, কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধেই একবারের বেশি বার বলবার স্থান থাকত না। তীক্ষ্ণতা একটু কম হ'ত। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এর মধ্যে টেনে না আনলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি হ'তাম। যদি বল, 'আপনাকে আনলাম কি ক'রে?' তার উত্তরে আমি বিষ্ণু শর্মার কৃষক ও শৃগালের গল্প উল্লেখ করতে পারি। শৃগাল বলেছিল—'ভাই, তুমি মুখে যেমন চুপ করেছিলে, তেমনি আঙুলটিও যদি না আমার দিকে নির্দেশ ক'রে রাখতে! ভাগ্যি, শিকারীরা তোমার আঙুলের দিকে নজর করে নি।'

তাই না অমল? 'গোর্কি, শেখব, শরৎচন্দ্র কি;—' তার পরে আর সমস্ত প্রবন্ধের ভেতর শরৎচন্দ্রের নামগন্ধ নেই! রবিবাবুর নানাবিধ উদাহরণ তোলবার পরে যদি অন্ততঃ আমার ওই রকম দু-একটা গল্প, যেমন 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি— অর্থাৎ দুর্নীতি বা অশ্লীলতা দোষ যাতে নেই,— ইঙ্গিতেও তুমি তা উল্লেখ করতে ত এটা বোঝা যেত, তুমি ঠিক এঁদের মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিতে চাও নি।

তোমার মুখ থেকে যদি না আমি নিজে আমার সাহিত্যের সম্বন্ধে তোমার মতামত বহু বার শুনে আসতাম, তবে অনেকের মতো আমারও মনে হ'ত, তুমি ইঙ্গিতে এঁদের সকলের আগে আমাকেই দাঁড় করিয়েছ। অথচ, তুমি তা করো নি এবং করবার সঙ্কল্পও ছিল না তোমার।

যাই হোক, তোমার রচনা প্রভৃতি অতি চমৎকার হয়েছে। আমার আশীর্বাদ জেনো।—
২৪-৩-২৭।

তোমাদের—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

৩০-১২-২৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার বিয়েতে থাকতে পেরে ভারি খুশি হয়ে এসেছি। তুমি জান খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার একটু বাছ-বিচার আছে, কিন্তু সেদিনের ঐ বিরাট পংক্তিভোজনেও ভারি তৃপ্তি

ক'রে খেয়েছি। নির্মল[১] আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। আর এক পাশে ছিলেন তোমাদের জে, সি, মুখার্জি।[২] ভারি অমায়িক লোকটি।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমার ও নববধূর শুভ কামনা করি। আমার সামান্য স্নেহোপহার বৌমার হাতেই দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভীড় ঠেলে তোমাদের কাছে ভিড়তেই পারলাম না। তাঁকে বোলো।

আশীর্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ— অনেক দিন পরে সেদিন বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না।

শ।

৩

৮ই অঘ্রাণ '৩৮

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা[১] পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করি নি, কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু ক'রে কাজ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না।

তোমার—শরৎদা

৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া

২৮শে পৌষ, ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি তোমাকে লিখব কিন্তু শরীরে দেয় নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানি নে,— আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশি হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে ব'লে নয়,— আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে ব'লেও নয়— যে ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,— তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ।[১] কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি— এও তেম্‌নি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,— আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি গুরু ব'লে,— আমার চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,— তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।[২] আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভ'রে তোমাকে আশীর্বাদ করি।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ি তুলছ, গাড়ী হাঁকাচ্ছ! তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি— পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলাদেশ অমল। 'সোনার বাংলা!' তবু বলতে হবে—'আমি তোমায় ভালবাসি!'

মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না— যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ি হয় নি, গাড়ীও হয় নি— যে গাড়ী চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্যন্ত। তা না হোক্—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্বাদ জানাই।

তোমার—শরৎদা

৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, হাওড়া
১০ই মাঘ, '৩৮

অমল,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হলাম। রাতদিন একটা কেদারায় কাৎ হয়ে পড়ে আছি আমার সেই বারান্দায়, আর ঢেউ গুন্‌ছি। তুমি এলে জমবে ভাল। মুখোমুখি ব'সে অনেক দিন গল্প করি নি তোমার সঙ্গে। দেখ, আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে— দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে! কিন্তু এ যে কত বড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত! মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে[১] গঙ্গার আলো হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা— আর শিবপুরে তাঁর ভাই সুরেন মৈত্রের ওখানে,[২] সেও ঐ গঙ্গার ধারে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেই ন্যাড়া ছাদে আমাদের যমুনা আপিসের আড্ডা। ফণীর[৩] ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। তুমি

আর প্রভাত[৪]। কি তার্কিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। আর কি পাকা। কতই বা তখন বয়স তোমাদের। সমানে তাল ঠুকে গিয়েছ আমাদের সঙ্গে। তারপর তোমাদের সেই ভারতীর[৫] আড্ডা। তেমনটি আর হবে না। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে কবির আড্ডাটা কেমনতরো হয় বলো দিকি। কিন্তু সে আড্ডায় হয়তো তিনিই শুধু কইবেন কথা— অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলীতে আড্ডা জমে না— শুধু সলিলোকীতে যেমন জমে না নাটক। ইতি—

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

বেহালা,

১৮ই ভাদ্র ১৩৩৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তুমি মণিকে[১] ফোন ক'রে ছবি তোলবার সময়টা ঠিক ক'রে নিও। বোর্ণ এণ্ড সেপার্ড-এর[২] টাকাটা মণিই দেবে, তোমাদের কাগজের[৩] লাগবে না।

সকালের দিকেই আমার সুবিধে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়গড়া টানার পর একটু গড়াগড়ি না দিলে বুড়ো মানুষ বাঁচব কি কোরে? আমার জয়ন্তী করতে ব'সে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে মারবার সংকল্প করোনি। রবিবাবু যে মারা পড়েন নি, সে নেহাৎ তাঁর পুণ্যে।[৪] বাসরে বুড়োকে নিয়ে তোমরা কি টানা হ্যাঁচড়াটাই না করলে। পারেনও বটে উনি, কিন্তু আমি রবি ঠাকুর নই, আমি—

শরৎ চাটুজ্যে।

৭

৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯

অমল,

উদ্যোগ পর্বে উৎসাহ ক'রে তুমি যে সভাপর্বের পূর্বেই ব্যাধি-শরশয্যা গ্রহণ করলে, এতে আর যেই দুঃখ করুক, তোমার দুঃখের কিছু নেই। তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পারনি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল[১] রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়ও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি তুমিও চেন। তারা সেবার পারেনি— এবার পেরেছে। আশ্চর্য হই নি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই, কিম্বা থেকেও ছিল না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়কে[১] লেখা

তুলু, দুটি ছেলে মুখুয্যেদের বাড়িতে পড়তে যায়[২], একটির হল নেমন্তন্ন আর অন্যটি গেল বাদ[৩]। আমার ত খাবার নেমন্তন্ন হয়েছে; আমি না হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার রিপ্রেজেনটেটিভ। ইতি— ২০শে মাঘ, ১৩৩০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১

সামতাবেড়, ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

প্রিয়বরেষু,

কেদারবাবু, কয়েক দিন হইল আপনার পোষ্টকার্ড খানি পাইলাম। চিঠিটুকু ছোট, কিন্তু স্নেহে ভরা। কিসের জন্য জানি না আমাকে আপনি এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন। যে সকল গুণে মানুষকে মানুষে ভালবাসে আমার ত তাহার কিছুই নাই। অন্ততঃ ত্রুটি এত বেশি যে তাহার পরিমাণ হয় না।

সেদিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, 'শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান ক'রে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন— তাঁর ঠিকানা জানি নে— তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে যেখানেই থাকুন সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি।'[১]

কেদারবাবু, বন্দীব্রতই নিয়েছি। সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়েই বাস করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাঁটার উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে —মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই,— বছর দেড়েক— জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।

ক নপুরে যাওয়ার[২] পূর্বের দিন অকস্মাৎ বার কয়েক বমি করিয়া সমস্ত পেটে এমন ব্যথা ধরিল যে ৫।৭ দিন চিকিৎসকের আদেশে শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিলাম। তবে সে ভাবটা আর নাই। এইবার বাস্তবিকই ভারি ইচ্ছা হইয়াছে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়। গরম যদি এত না পড়িত আমি কাশী যাইবার জন্য আপনাদের বাড়ি ভাড়া করিতে অনুরোধ করিতাম।[৩]

কিছুই আর করি না, রূপনারায়ণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,— একটা ইজি চেয়ারে দিনরাত পড়িয়া থাকি। হরিদাস ভায়ার[৪] সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ দিবেন।

তবে সম্প্রতি ভাল আছি ; জেনারেল নালিশ ছাড়া পার্টিকুলার অভিযোগ নাই। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

২২শে কার্তিক '৩৩

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেলাম, কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ির একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না তাহার বলিবার আছেই বা কি। একবার আপনাদের কাছে গিয়া বসিবার বড় ইচ্ছা করে, আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্বল ছিলাম এ কথা ত জানিতাম না। এ ব্যথা [ভ্রাতৃবিয়োগের][১] আমার সহিবে কি করিয়া !

— আপনার শরৎ

৩

সামতাবেড়। ২৩, ২, ২৭

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি ত এখনও বাঁচিয়া আছি কেদারবাবু, আমার নমস্কার জানিবেন। আপনি? আছেন ত? টিকিয়া থাকিলে একটা খবর দিবেন, না থাকিলে আর কি করিবেন? সে ক্ষেত্রে জবাব না পাইলেও আমি রাগ করিব না, বাস্তবিকই মন আমার এত বড় উদার ও ক্ষমাশীল হইয়া গেছে। গৃহিণী? আছেন না এগিয়েছেন?

— আপনার শরৎ

৪

সাম্তাবেড়। ২৯শে আশ্বিন '৩৪

প্রিয়বরেষু,

নমস্কার জানাবার সময় হ'ল। তাই। কাশী যাবো প্রায় স্থির। বাড়ির জন্যে চিঠি লিখেচি, একটা খবর পেলেই হয়।

কিন্তু আপনি? না থাক্‌লে? বাবা বিশ্বনাথ দিনকতক অনুপস্থিত থাক্‌লেও আমি আপত্তি কোরব না, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিতে ত কাশী আমার কাছে একদিনেই অচল হয়ে উঠবে। দয়া ক'রে আবেদনটিকে আমার অতিশয়োক্তির কোঠায় ফেলে যেন নিশ্চিন্ত হবেন না। আমি জানি আমাকে আপনি বোঝেন। ইতি—

আপনার শরৎ

৫

১০ জুন ১৯২৮

প্রিয়বরেষু,

কত কাল পরে আপনার হাতের লেখা চোখে দেখতে পেলাম। সকলের আগে এই কথাটাই মনে এলো যে ভালবাসা যেখানে সত্য, যেখানে অন্তরের বস্তু,— তার মধ্যে আর ভ্রম নেই।— মন স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নেয়। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে কারো ভাব্‌বার যো নেই যে আমরা কেউ কাউকে স্মরণ করি, অথচ আমার দিক দিয়ে তো জানি যখনই আপনার লেখা ছাপার অক্ষরে পড়ি তখনই মনে পড়ে কাশীর কথা। জীবনের শেষ দিকে ঐটুকুই সম্বল রয়ে গেল।

আগে প্রায়ই ইচ্ছে হোতো কাশী যাই,— এখন সে ইচ্ছেও আর হয় না আপনি নেই ব'লে। আচ্ছা কেদারবাবু, কাশীবাস কি আপনি ছেড়ে দিলেন? শেষকালে কি পূর্ণিয়ার ভাগাড়টাই সার করবেন? জানি আপনার পূর্ণিয়া ছাড়বার অনেক বাধা, তবু ও যায়গাটাতেই আছেন মনে হ'লে আমার বিশ্রী লাগে। ভাববারও যো নেই যে এই তো কাশী, ইচ্ছে হলেই গিয়ে কেদারবাবুকে দেখে আসা যায়।

এবার আমার সামতাবেড়ের আসন টল্‌লো বোধ হয়। আর ভালো লাগ্‌চে না। অথচ, কোথায় গেলে যে ঠিক ভালো লাগ্‌বে তাও ভেবে পাচ্চি নে। পূজোর পরে যা হয় কিছু একটা কোরব।

আপনি ষোড়শীর কথা শুন্‌লেন কার কাছে? শিশিরের অভিনয় দেখেচেন? কি চমৎকার করে। বইটা আমার উপন্যাস দেনা-পাওনার গল্প থেকে নেওয়া। থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও (নাটক) ছাপানো হয়েছে। পড়েচেন? বই যা হোক্, অভিনয় বড় ভালো হয়।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে ভালো ত? প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা ব'লে নয়, সত্যিকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা ব'লে পড়ি।

আমি ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছি,— কিন্তু বাঁচাটা পুরোনো হয়ে গেছে। রোজই সে খবর টের পাচ্চি।—

আপনার—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির জবাব দিতে ভুলবেন না।

৬

সাম্‌তাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া। ২৭শে আশ্বিন '৩৬

প্রিয়বরেষু,

আজ বিজয়া দশমীর সায়াহ্ন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। এ জীবনে যে কয়জনের সত্যকার স্নেহলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি আপনি তাঁদেরই একজন। কিন্তু সে স্নেহের মর্যাদা আমি

শুধু জড়তা আর আলস্যের জন্যই রাখতে পারি নি। অথচ, এমন মাস বোধ হয় একটিও কাটে না যাতে আপনাকে স্মরণ না করি। আর বাইরের অপরাধ যতই বেড়ে চলে ততই ভাবি আপনি কোনদিন আমাকে ভুল বুঝবেন না।

১লা কার্তিক

কোষ্ঠির ফলাফল আজ সকালে শেষ হ'ল। আচ্ছা, আমার মত একজন সামান্য লোককে কি ভেবে এতখানি গৌরব দিয়ে বস্‌লেন?[১] সাহিত্যিকের দল ভাব্‌বে কি বলুন ত?

চমৎকার লাগ্‌লো। দীন দুঃখী কেরাণীকে কেউ আজও এমন অন্তর দিয়ে ভিতরে পেয়ে এত মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করে নি। ব্যথায় বুকের মধ্যে যেন টন্ টন্ করতে থাকে। ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেচি। রেলের তরুণ-কবি-কর্মচারীটি যখন বলচে যে দিনের মধ্যে একবারও খাতাখানি হাতে নিয়ে বস্‌তে না পারলে দিনটাই যেন ব্যর্থ মনে হয়।[২] লিখ্‌তে পারি না পারি ভেবেচি নিজের জীবনে এই পরম সত্য বাক্যটি আজ থেকে প্রত্যহ পালন ক'রে চল্‌বো। মাসের পর মাস কেটে যায় খাতা কালি-কলমে হাত দিতেও মন চায় না— আপনার আশীর্বাদে যে ক'টা দিন বাকি আছে সে ক'টা দিন যেন প্রতিদিন এই কথাটি মনে রাখতে পারি।

বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব,— কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।

এবার কাশী কবে যাবেন? শীঘ্র যদি যান আমাকে এক ছত্র লিখে জানাবেন।

এখন থেকে চিঠির জবাব পরের দিনই দেব। এ আর অন্যথা কোরব না।

নমস্কার।— আপনার শরৎ।

পুনঃ— এইমাত্র যে চিঠিখানি বিজয়ার দিনে আমার কল্যাণ কামনা করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পাইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ।

শ

৭

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাওড়া। ২৫শে কার্তিক ১৩৩৬

প্রিয়বরেষু,

কয়েক দিন হ'ল আপনার অপরিসীম স্নেহের খবর ব'য়ে নিয়ে চিঠিখানি এসেছে। ভেবেছিলাম একটুখানি শান্ত হয়ে এর জবাব দেব, কিন্তু সে সুযোগ আর পাচ্চি নে। কিন্তু কথা দিয়েচি যে যদি এক ছত্রও হয় তবুও আপনার পত্রের উত্তর লিখবো। বহু ত্রুটি হয়ে গেছে আর অপরাধ বাড়াব না। তাই এই।

পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে— সিভিল এবং ক্রিমিন্যাল,— বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি।[১] এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেবতার আর সইল না, ঘাড়ে চাপলেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতিক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্বিষহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো,— লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পরে ফৌজদারী। যাক সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েচে। ভাবচি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের ওপর সুসহ।

কোষ্ঠির যে বিবরণ দিয়েছেন তা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়,— জ্বরের একটা নেশার ভাব আছে, ঠিক ফৌজদারী মামলার মত অতটা না হোক, তবু তারও উত্তেজনা ফেল্‌না নয়। জ্বরের ওপর লিখলেই ওই হবে। তা হোক, কিন্তু তার পরে শান্ত মনে যতটা সম্ভব সুস্থ দেহে তার বাড়তি অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে। এ কাজ নিজের,— কখনো অপরে করতে পারে আমি বিশ্বাস করি নে।

ওই বইখানির মধ্যে পরিহাসের ছলে কত গভীর এবং কতই না মধুর কথা আছে। বইখানি আমার লেখাপড়া করার ঘরে বিছানার ওপরে থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে পাতা উল্টে যায় সেখানেই দশ পনর মিনিট পড়ি।

ভাদুড়ি মশাই গল্পটা আমি পড়ি নি। বসুমতী আসামাত্রই ওপরে চলে যায়, ফিরে প্রায়ই আসে না। তবে বাড়িতেই থাকে, সংগ্রহ ক'রে নিতে কষ্ট হবে না।

পড়ার খবর আর এক দিন দেব। কিন্তু গল্প আপনার, লেখা আপনার, আমি তার জোট খুলবো কি ক'রে? সে বিদ্যে কি আছে যে আপনার ওপরেও মুরুব্বিয়ানা করলে লোকে সহ্য করবে? তবে নিতান্তই যদি হুকুম করেন তো যথাসাধ্য গল্পের সর্বনাশ করতেই হবে।

জানুয়ারী মাসে যদি কাশীতে একবার যান তো আমি লাহোরের ফিরতি[২] নেবে যাবো। নমস্কার।

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া,

৭ই পৌষ ১৩৩৭

প্রিয়বরেষু,

চিরদিন সময় বইয়ে দিযেই হোলো হুঁস, তাই এ জীবনের সকল কাম্যই এলো হাতের কাছে, কিন্তু নাগালের নীচে নাবতে আর চাইলে না। বার বার চিঠি লিখতে চাইলাম, বা বার দিন-ক্ষণ গেলো উত্তীর্ণ হয়ে। সেই চিঠি আজ লেখাও হোলো, কিন্তু তার ফলটুকু আর পেলাম

না। হাতের বাইরেই রয়ে গেলো। আমার সান্ত্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি ক'রে? ভালোবেসে খোঁজ-খবর নেবার মামলায় বিজয়ের দিকটা এ জন্মে আপনাকেই ছেড়ে দিলাম,— জন্মান্তর যদি থাকে, তখন আপিল কোরে একবার দেখবো।

কেমন আছি জানতে চান? বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজি চেয়ারে ঢাকা-বারান্দায়[১] শুয়ে আছি। বাঁ-পা খোঁড়া, ডান-কান বধির, অর্শের অজুহাতে অকেজো রক্তগুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্চে,— তন্দ্রায়, আরামে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপন দেখি, জাগি,— চোখ চাইলেই সুমুখে মস্ত নদী,[২] পালের নৌকোগুলোকে গুণি, হঠাৎ কখন চোখ বুজে আসে, যায় সব খেই হারিয়ে,— দক্ষিণের সূর্যদেব ঘুরে এসে কড়া রোদে গা দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,— বলি, কে আছিস্‌রে, তামাক দে— হয়ত দিয়েও যায়, কিন্তু টান্‌লে দেখি তেম্‌নিই ধুঁয়া নেই। বক্‌লে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজা তামাক পুড়ে গেছে। যাচাই করার শক্তি নেই, তবু গলা চড়িয়ে ধমকে বলি,— হাঁ— ঘুমুচ্ছিলাম বই কি! ব্যাটা মিথ্যেবাদী। দে বল্‌চি শীগগির সেই দিল্লী থেকে আনা বড় কল্‌কেটায়, যেন এ বেলার মতো না নেবে। তারা চ'লে গেলে মনে মনে বলি, বাবা ভগবান, যদি সত্যিই থাকো করোই না একটা আবদার মঞ্জুর, কেউ তোমাকে নিন্দে করবে না। মাথার দিব্বি রইলো, বাবা, কথাটা রাখো।

এক দিন রাখবে তা জানি, কিন্তু হয়ত আমারই মতো সময় বইয়ে দিয়ে। তখন খুশি হয়ে আর নিতে পারবো না।

কিন্তু ডাক এলো। পাথেয় উপস্থিত। ঘুমুতে-ঘুমুতে আর জাগ্‌তে-জাগ্‌তে পড়া সুরু করি। বহুদিনের অভ্যাস, বহু আফিঙ রক্ত-মাংসে জড়ানো। হেরেছি অনেকের কাছে, কিন্তু হার মানিয়েছিলাম আবগারী ব্যাটাদের। তাই ভরসা আছে, ঘুমের মধ্যেও পাথেয়র রস কস বেয়ে ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়বে না।

চিঠির ভাষা আমার চিরকালই এলোমেলো। মানুষকে কষ্ট কোরে বুঝতে হয় এই তাদের শাস্তি। আপনাকেও রেহাই দিলাম না। প্রার্থনা, মাঝে মাঝে যেমন খবর দেন তা থেকে যেন রাগ কোরে বঞ্চিত করবেন না। ইতি— *

আপনার স্নেহের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাওড়া
৫ই আষাঢ় '৩৮

১৬ই আষাঢ়। পোষ্ট করার ভুল আমার নয় চাকরের।

সুহৃদ্বরেষু,

কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারি নি। কাল আমাদের হাওড়ার জেলা কংগ্রেস ইলেক্‌সন হয়ে গেলো।[১] এবার বিরুদ্ধ দলের[২] সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠক্‌ঠকি দেখে ভেবেছিলাম

হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের বেড়া, মায় ইলেকট্রিফিকেশান সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয় নি, নির্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক প্রেসিডেণ্ট আছি, ভেস্‌টেড ইন্‌টারেষ্ট জন্মে গেছে— সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ যতই থাক, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়ো না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না ব'লেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো। যাক্, এখন একটু সময় পাওয়া গেল। দু এক মাস বই লিখতে সুরু করি। কি বলেন?

যখন কলকাতায় এসেছিলেন আমাকে একটু খবর দেন নি কেন? রাস্তাঘাট যত খারাপই হোক, কিছু একটা উপায় করতামই। কাশী যাবেন কবে? একবার দেখা হ'লে বড় ভালো হয়। খবর দেবেন।

আপনার শরৎ

১০

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।
২১ কার্তিক ১৩৪০

প্রিয়বরেষু,

আমিও অন্তরের প্রীতি নমস্কার জানাই। আপনার চেয়ে একটু দেরি ক'রে আমি সংসারে এসেছিলাম, তাই ব'লে দেরি করেই যে সংসার থেকে যেতে হবে বিধাতার এমন কোন কড়া আইন নেই। এ কথাটা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি। কে একজন কেরাণী নাকি আফিসে দেরি ক'রে আসতো। সাহেব তার উল্লেখ করায় বলেছিল, ইয়েস স্যার আই কাম লেট, বাট আই অল্‌ওয়েজ গো আর্‌লি।[১] এও ত হয় কেদারবাবু।

আপনার শরৎবাবু

হরিদাস শাস্ত্রীকে লেখা

পরম কল্যাণীয়েষু,

হরিদাস, তোমার দুখানি চিঠিই কাল পেয়েছি। তোমার দেওয়া ওষুধও অনেক বিলম্বে ভাঙা চোরা অবস্থায় আসে, দিন দুই ব্যবহারও করি, কিন্তু মনে হ'ল লোকে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তাই আর খেলাম না। ওষুধ পাইনে, পেলাম তোমার সত্যকার শ্রদ্ধা এবং স্নেহ। এখন অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু মানসিক অশান্তি না হোক, অস্থিরতার আর সীমা নেই। এখন অনুশোচনা হয়, সেই আমার বর্মার ছোট্ট চাকরিটুকুর জন্যে। মনে হয়, এ জীবনে ঐ চাকরি ছাড়া আর যদি কিছুই না করতাম।

দেনা-পাওনা যদি তুমি অনুবাদ কর ত তোমার ইচ্ছে এবং বুদ্ধি মতই কোরো। বাঙলার হিন্দী অনুবাদ হওয়াই এক বিড়ম্বনা, তারপর অক্ষর অক্ষর ছত্র ছত্র ট্রান্‌স্লেট করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যদি ভাবটুকুও যায় ত বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা। তবে এ দুঃখ থেকে বাঁচবার পথ নেই যখনই আমি হিন্দীতে অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছি।

তুমি বাঙ্‌লা ত খুব ভালই বোঝ, কিন্তু হিন্দী জানো কেমন? বস্তুতঃ অত বড় বইটার সমস্ত হিন্দী করার মত শক্ত ব্যাপার আমিত ভাবতেই পারিনে। যদি এত বড় অধ্যবসায় তোমার থাকে ত মাঝে মাঝে কেদারবাবুকে দেখিয়ো। তিনি চীন্ মুল্লুক ঘুরে এসেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

এবার একটু জলটল প'ড়ে ঠাণ্ডা হ'লেই কাশী যাব। মাস ২।৩ থাকবোই। তাতে প্রাণ থাকে আর যায়। কেদারবাবু কেমন আছেন? যদি সাক্ষাৎ হয় আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ো।

তোমার মন নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে শান্তি-স্বস্তি পাবার উপায়ও বড় হাতে নেই, এ অবস্থায় অনুবাদ করার মত অকেজো কাজে আবদ্ধ করলেও সময় কাটে। আর সংসারে কাজের মত কাজই বা কাকে বলে তাও বোঝা ভার। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো এবং আমি চিঠির উত্তর সকল সময় দিতে পারি বা না পারি মাঝে মাঝে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ দিয়ো। ইতি—১৪ই জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩।

দাদা

তুমি অনুবাদ সুরু করে দাও। আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রইল।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

ভোলার[১] মারফৎ আপনাদের বড় ও ছোট বাড়ির জন্য[২] কিছু তপস্বী মাছ[৩] পাঠাইলাম। কালরাত্রে আসাম হইতে বাড়ি ফিরিয়াছি[৪]। আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। ইতি— ১১ই আষাঢ়, ১৩৩৩

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

ভায়া, এঁদের সঙ্গে পথে দেখা। শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব[১] পড়ছিলেন। ১০৯-১১০ পাতা এবং ১১৩-১৪-র ছাপা একই বস্তু। কি করে যে এ রকম ঘটলো বোঝা যায় না। বইটা এঁরা ফিরিয়ে নেবেন। হয়ত আরও কতলোক ঠিক এমনি বিপদেই পড়েচে। ২৯শে এপ্রিল।

শরৎদা

আজ কটক[২] যাচ্ছি। সোমবার সকালে ফিরবো। জলধরদা'র চিঠি পেয়েছি। আষাঢ়ের সংখ্যা থেকে নতুন বই আরম্ভ হবে[৩]। চার পাঁচ অধ্যায় হয়েছে কিন্তু ছাপতে সুরু না করলে এগোবে না।

দাদা

৩

সামতাবেড়

ভায়া,

আমার ভারি ইচ্ছে যে বইটা শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৩৮ বার হয়।[১] সম্ভবপর হবে কি? আমার নিজের দিক থেকে লেশ মাত্র অবহেলা হবে না। ইতি-- ৫ই চৈত্র ১৩৩৭।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা ফরওয়ার্ড গোছের একটু লিখে দেবো। ছাপা ভারতবর্ষে যে সব অদল-বদল করতে হয়েছে তারি একটু কৈফিয়তের মতো[২]। আমার ৩।। পাওয়ার লম্বা ডাঁটি চশমা হয়েছে বোধ হয়? এই সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন, ভুলবেন না।

৪

সামতাবেড

কল্যাণীয়েষু,

ভায়া— এক সেট বই আমার নামে খরচ লিখে আপনার বেহাই শ্রীমান্ সতীশ ভায়াকে[১] যদি দেন বড় অনুগৃহীত হই। আমার বসুমতী গ্রন্থাবলীতে ক্রমে ক্রমে ভুল ঢুকেছে, সেইগুলো সংশোধন করার প্রয়োজন। দিন কয়েক পরেই দেখা হবে। আমার কাশী যাবার সময়। শ্রীকান্তটা একটু শীঘ্র হলেই যাওয়া হয়। পরশু ওটা (শেষের পরিচয়) পাঠাবো। ২৩।১।৩৩

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

চিঠি এবং চেক পেলাম। একটা চেক ১১৯ ফেরত পাঠালাম এই ভেবে যে হয়ত কোথাও ভুল হয়েছে। নামটা অনিল প্রকাশ বসু, আর ভুল যদি না হয়ে থাকে ত এঁর হাতেই ফেরৎ দেবেন।

আশ্বিনের লেখাটা মজুত আছে শুধু কার্তিকের অধ্যায়টা শেষ হয়ে ওঠেনি বলেই পাঠাইনি। ইচ্ছে আছে আগামী রবিবার জলধর দাদার অভিনন্দন দেবার সভায়[১] উপস্থিত ত হবোই, সেই সময়ে সঙ্গে নিয়ো যাবো।

অর্শে খুব একচোট ভুগলাম। রক্তস্রাবের যেমন বিরাম ছিল না, তার পরিমাণটাও ছিল তেমনি অতিরিক্ত। এখন হাতুড়ে কবিরাজ ওযুধ দিচ্ছে, সে বলে একেবারে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। অনেক দুঃসাধ্য রুগীরাও সেরেছে, তারা এসে সাক্ষ্য দিয়ে গেল।

আমার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, ও মাঝে মাঝে এমন আপনিই হয় সত্যি, কিন্তু এবারে যখন পূর্বেকার কোন ব্যবস্থাই খাটেনি, মনে হয়েছিল হয়ত এ যাত্রা এতেই সাঙ্গ হবে, তখন এই হাতুড়ের ওযুধে একেবারে থেমে গেছে! সে বলে বছর খানেক একেবারে রক্ত পড়বে না এবং তারই মধ্যে ভিতরের বলিগুলো শুকিয়ে যাবে। দেখা যাক্

কিন্তু ওযুধটার মস্ত দোষ যেমন কড়া তেমনি দুঃসহ তিতো। আর তার চেয়েও বড় বিপদ রাত্রে ঘুম হয় না। এইটাতেই আমাকে কিছু বেশি কাবু করেছে। কিন্তু আমার যদি সারে, ইচ্ছে আছে আপনাকেও ওটা ধরাবো। আমার সারবার বয়েস আর নেই, কিন্তু খুব আশা আপনি নিশ্চয়ই এ ওযুধে ভালো হয়ে যাবেন।

পাড়াগাঁয়ে এসে পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়েছে বললেই হয়। প্রার্থনা করি আপনারা কুশলে থাকুন। ইতি— ৬ই ভাদ্র ১৩৩৯

দাদা

৬

মতাবেড়, ২৩, ২, '৩৩

ভায়া,

১। এই চশমাটা (যেটা পাঠালাম) দূরে দেখার জন্য, সুতরাং কাঁচ দুটো বদল করতে হবে +১.২৫। কচ্ছপের খোলার মতই পরকোলা হবে।

২। সোনার চশমাটার + ৪.২৫ লাগলো না, বেশি নম্বরের হয়ে গেছে। তা যাক্ পরে কাজে লাগবে।

৩। একটা নতুন চশমা করিয়ে দিতে হবে, পাওযার হবে (+৪) অর্থাৎ পুরো চার। ডাঁটি দুটো হবে সোজা— কানের পাশ দিয়ে সোজা উপরের দিকে উঠবে। কচ্ছপের পিঠের মত পরকোলা।

এখনো হাসপাতালে যাইনি দাঁত কন্‌কনানির জ্বালায় কিন্তু যাবো নিশ্চয়ই।

শ্রীকান্তর চেহারা বেশ হয়েছে। এবার অন্যান্য পর্বগুলোও এই ধরণের অবাঁধা করলেই ভালো হবে মনে হয়।

আচ্ছা পল্লীসমাজকে একটাকা দামের করলে হয় না? অত বড় বই আট আনা থেকে বার করে আনাই উচিত। না?

— শরৎদা

৭

সামতাবেড

পরম কল্যাণবরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া কত কি মনে হইল বলিতে পারি না। বাড়ির একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারি না, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক[১] আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এত বড় থাকে এ যেন আমি জানিতাম না। কে জানিত ভিতরে ভিতরে আমি এতখানি দুর্বল ছিলাম। কত কি লিখিয়াছি— সকলই মনগড়া, কে ভাবিয়াছিল আমার জীবনেই তাহা এমন সত্য হইয়া উঠিবে। আজ আর একটা সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। তাই, বাকি জীবনটা যেন সকলেরই শুভ কামনা করিয়া শেষ করিতে পারি। ২২শে কার্তিক '৩৩।

শরৎদা

টাকা কড়ির প্রয়োজন সম্প্রতি নাই, হইলেই জানাইব।

ভায়া,

১। এই মাত্র চিঠি পেলাম। দুই একটা বানান ভুল ছাড়া যেমন সর্বাঙ্গীণ এর ণ স্থানে ন এমনি। আর কিছু বদলাবার নেই। দামটার সম্বন্ধে একটু বিবেচনা যদি করেন, কিম্বা না করেন সে আপনার ইচ্ছা, কারণ এখন ত ছাপার ওপর অনেক প্রকারের ট্যাক্স বেড়ে গেলো।

২। গালি গালাজের বহর দেখে হয়ত আপনি ভয় পেয়েও থাকতে পারেন, কিন্তু এমনিই একটা পণ্ডিত সমাজ বইটাকে[১] নির্বিচারেই ভালো ব'লে যেমন, ওরাও নির্বিচারে মন্দ বলে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না। এই অনুরোধ। সকল ব্যাপারেই দু পক্ষ থাকে। তারাই যে প্রবল পক্ষ, এ নাও হতে পারে। এবং কালের বিচারে তারাই যে সত্য এ-ও না হতে পারে।

৩। 'শেষের পরিচয়' নাম দিয়ে আর একটা লেখা আরম্ভ করে ২ চ্যাপ্‌টার লিখেছি, যদি আপত্তি না থাকে তো পাঠাই। তবে এ অ্যাসিওরেন্স এবার দিতে পারি যে এ বইটাতে পাংচুয়াল হবোই।[২] কি বলেন? আপনার লজ্জা পাবার ব্যাপার এ বইটাতে নেই।

—দাদা

৯

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

তুলুর মারফৎ কাল রাত্রে আপনার পত্র পেলাম। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিঠি লেখা তা বোঝা যায়। কিন্তু অবস্থাটা ভালো বিশ্বাস করতে পারেন নি বলেই। গত বুধবার আমার জ্বর হয়, আটদিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি, রোজ বেলা তিনটায় আসে, যায় রাত্রি দশটায়। ডাক্তারদের বিশ্বাস লিভার ঘটিত, সুতরাং আরও কদিন যে ভুগবো কোন নিশ্চয়তা নেই। ওঁরা আশা করেন আব ২।৩ দিন, কিন্তু আমার নিজের সে ভরসা নেই।

আপনি দত্তার অভিনয় স্বত্ব[১] চেয়েছিলেন, অতএব আমি খুশি হয়েই দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এতদিনে শেষাশেষি করে আনতাম।

আপনি অপরকে দিয়ে সেট লেখাতে চাইচেন কিন্তু সে কি আমার চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? ওর দেখেছি অনেক অসুবিধে আছে মাঝখানে— গ্রন্থকার নিজে না হলে সে সব স্থান পূর্ণ করে তোলা কঠিন বলেই মনে করি। এবং অভিনয়ের দিক দিয়েও সে যে বিশেষ ভালো হবে তাও ভরসা করি নে, আমার নিজের লেখা হলে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক 'বিজয়া' নাম দিয়ে ছাপাতে পারি। পরের তৈরি হলে ত পারবো না। সিনেমার ব্যাপারে[২] আমার কোন গরজই নেই।

প্রথম অঙ্ক প্রবোধ গুহ লিখতে নিয়ে আর দিলে না— কপি যেটা ছিল, সেটা অভিনয়ের উপযোগী করে লিখতে আরম্ভ করেছিলুম, এমনি সময়ে এই প্রতিবন্ধক।

অথচ, আপনাদের বিলম্ব হলে (অর্থাৎ 'বিজয়া'র আশায়) বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্ছে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারিনে। অথচ সমস্ত বইটাই এক রকম তৈরি করা আছে, শুধু একটু অদল-বদল বা অল্প-স্বল্প লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই করে তুল্‌বো। কিছুদিন পূর্বে যদি এ মৎলব করতেন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতের ভরসায়— আপনাদের টাকাটা হাতে রাখা সঙ্গত নয় মনে করি। এতদিন চেকটা পড়েই ছিল, কাল তাকে লয়েড ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছি। আজ সেইজন্যে আর একটা চেক লিখে পাঠালাম। যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করবেন।... ইতি— ৭ই আষাঢ় ৪০।

শরৎদা।

১০

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ভায়া,

ভেবেছিলাম অন্ততঃ এই বইটা নির্ভুল করবো। কিন্তু হলো না ছাপাখানার দৌরাত্ম্যে। যে ভুল চোখ এড়িয়ে যায় তাতে তবু সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু যে ভুল শুধ্‌রে দিয়েছি কিন্তু সংশোধিত হলো না, যেমন ভুল ছিল তেমনি ছাপা হয়ে গেল, সে বড় দুঃখের। শেষ ছাপা ফাইল সবটা পড়িনি কিন্তু যেটুকু পড়েচি তাতে এমন কতকগুলো ভুল রয়েছে যা কখনো থাক্‌তো না যদি এঁরা আমার শেষ প্রুফটা চোখ মেলে দেখতেন। দু একটা উদাহরণ দিই— দুর্যোগ, দুর্যোধন প্রভৃতিতে 'য' য-ফলা হতে পারে বিকল্পে, কিন্তু বাহুল্য বলে আমি দিইনে। একবার কেটেও দিয়েছি, তবু ছাপা হলো দুর্য্যোগ, দুর্য্যোধন এমনি। বৈষ্ণবী পদটা যখন সমাসান্ত বিশেষণে ব্যবহৃত হয়, তখন হয় নি, কেটেও দিলাম তবু ছাপা হলো বৈষ্ণবী-রস-চর্চা। এমন আরও কতকগুলি। এই সকল ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য যিনি দায়ী, অন্ততঃ দায়িত্ব যাঁর পরে তাঁর দণ্ড হওয়া উচিত। এ বইটা বাঁধাবার প্রয়োজন নেই। 'শেষপ্রশ্ন' বইটার ফর্ভারটা যেমন হয়েছে ঐ ধরণের কিছু একটা হলেই হবে।

—দাদা

১১

সামতাবেড়

ভায়া,

গোবিন্দবাবু আমাকে সেই অভিযুক্ত প্রুফটা পাঠিয়েছেন।[১] তাতে দেখা গেল ভুলটা আমিই কাটিয়া দিতে ভুলিয়াছি। অতএব তাঁহার দণ্ড না হওয়াই উচিত।

কাল যে চশমাটা পাঠিয়েছি সেটা ফেরৎ পাঠাবেন। তুলুকে বলেছিলাম নীচের কাঁচটা শুধু বাদ দিয়ে আনতে। শুধু উপরের +১·২৫ কাঁচটা থাকবে দূরের দৃষ্টির জন্য। কাল হাসপাতালে যাচ্ছি। ৫ই ফাল্গুন।

শরৎদা

১২

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

ভায়া,

ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসের হাঙ্গামা এসেছে। আবার রিমাইণ্ডার দিয়েছে। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট টাকাটা লিখে পাঠাবেন। দেরি না হয়। আমার নিজের তরফ থেকে দেরি হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে তিন মাস। ইতি— ২৭শে ভাদ্র ১৩৪০।

শরৎদা

১৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

প্রকাশের মুখে শুনলাম আমার 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' এই নামটি আপনার ঠিক মনোমত হয়নি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে— এ বইখানির নামকরণ এমনিই হয়।[১] শুধু অনুরোধ নয়। আমি ইংরিজি কয়েকখানা বইয়ে এই ধরণের নাম দেখেচি বলে মনে হয়।

দাদা

১৪

পরম কল্যাণীয় শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়—

পানিত্রাস

ভায়া, ইচ্ছে ছিল নিজেই যাবো কিন্তু বড়-বৌ ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়ায় শয্যাগত। তবে, ভালো হয়ে আসচেন। দুচার দিনে যাবার বিঘ্ন ঘটবে না বলেই মনে হয়।

আমার কলকাতার বাড়িটা শেষ হয়ে এলো। এ সময়ে আপনি আমাকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে আমার দুর্ভাবনা ঘোচে। যে তিন খানা নতুন বই আমার প্রায় শেষ হয়ে এলো আশা হয়— এর থেকে ওটা এক বছরেই শোধ হতে পারবে।[১] বাড়িটার এষ্টিমেট ছিল চোদ্দ হাজার টাকা, যাঁরা তৈরি করলেন তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল অর্ধেক টাকা এ বছরে দেবো, বাকি অর্ধেক পরের বছরে দেব্লো, কিন্তু পাকে চক্রে খরচ বেড়ে গেল আরও হাজার তিনেক বেশি। নইলে টাকার আবশ্যক হতো না, ধার না করেও নিজেই দিতে পারতাম।

এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত বোধ করি হাজার ষোল-সতেরো নষ্ট করলুম, কলকাতার বাড়িতেও বোধকরি হাজার তিরিশ নষ্ট হবে। এমনি কোরেই জীবন কাটলো।

অভাবে পড়লেই আপনাকে জানাই। এই অভাবটাও জানালুম।

বিজয়া শেষ হয়েও হচ্চে না— শেষটুকুতে এসেই আট্‌কেচি। একটা না একটা বাধা আসচেই। এবার যেদিন যাবো সঙ্গে নিয়ে যাবো, ভরসা হয় আপনাদের অপছন্দ হবে না। ইতি— ১৪ই চৈত্র ১৩৪০।

শুভাকাঙ্ক্ষী— দাদা

১৫

পি৫৬৬ মনোহরপুকুর
কলিকাতা
ফোন— পার্ক ৮৩৪

ভায়া,

চরিত্রহীন পাঠালাম। পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন পরে পাঠাবো। আবার জ্বরে আক্রান্ত, আবার ইন্‌জেকশান। তবে এবারে ডাক্তারেরা রোগের একটা নাম খুঁজে পেয়েছেন, সুতরাং আর চিন্তা নেই। অর্শের রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে 'বি কোলাই' রক্তের মধ্যে আসাব সুযোগ পাচ্ছে। জ্বরও সেই জন্যে। আর গোটা দুই সিলোট্রোপিন ইন্‌জেকশানের পরে অর্শের রক্ত বন্ধ করার কারবোলিক এসিড ইন্‌জেকশান দেবে। সে সময়ে যদি সব কটা ইন্‌জেকশান শেষ করা হতো, জ্বরও হয়ত আর হতো না। কপাল!

১১ই বৈশাখ ১৩৪৪। শরৎদা

১৬

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভায়া,

বাড়িতে ছেলে মেয়েরা কেউ নেই, তারা গ্রামের বাড়িতে, আছি শুধু প্রকাশ[১], আমি ও রামকৃষ্ণ[২]। দুঃখ তাঁরা কেউ ঘুষের[৩] পরিমাণটা দেখতে পেলেন না। আমরা পরমানন্দে ভোজন করবো এবং বউমাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করবো। তিনি রোগমুক্ত হোন, সকলকে নিয়ে সুখী হোন। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪।

শরৎদা

১৭

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভায়া,

জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করার জন্যে কন্যা এনেছেন দণ্ড বহুদূর মুসৌরি থেকে।[১] শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে ভবিষ্যতে না লিখলে, কাজকর্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।

যাই হোক্ লাঠিটি চমৎকার। আমার কাজে লাগবে, ঠ্যাং দুটাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।

একটা প্রার্থনা আছে, ইন্‌কাম ট্যাক্সবালারা স্টেট্‌মেন্ট দেবার তাগিদ দিয়েছেন। গত বৎসর ও এ বৎসরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ঐটে যদি কাল সকালে পাঠিয়ে দেন। আপনার হিসাবের খাতা আমার কাছে আছে বটে, কিন্তু এমন বাঁধা খোলা যায় না। নইলে আপনাকে আর কষ্ট দিতাম না— নিজেই দেখে নিতাম। ৫ই আষাঢ় ১৩৪৪।

শরৎদা

দিন দুই হঠাৎ কলিক ব্যথায় ভারি কষ্ট পেলাম।

১৮

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভায়া,

আপনার চিঠি এবং ফুল পেলাম। আমি পরশু বিকালে বাড়ি থেকে এসেছি এবং কাল ফিরে যাচ্ছি। ওখানে হঠাৎ ওঁদের সব শরীর খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ছাড়া বন্ বন্ করে সকলেরই মাথা ঘুরচে।

যমুনা এখানে আসে কিনা জানিনে। বুদ্ধি যখন অল্প ছিল তখন অনেকের অনেক প্রকারের উপকার করার চেষ্টা করেছি ; অন্ততঃ ক্ষতি করা, হীন করার আয়োজন করা এ সব মনোহর কর্ম জীবনে করেছি বলে মনে পড়ে না। আজ নিজের শক্তি কমেছে, যাবার দিন এগিয়ে এসেছে, সুতরাং নিজের দান করার সঞ্চয় যখন পাত্রের তলায় এসে ঠেকেছে, তখন এঁরা আমার কৃতকর্মের পুরস্কার দিতে আরম্ভ করেছেন।[১] আমার পার হবার পারানির কড়ি ঐগুলি। নিঃশব্দে হাত পেতেই নেবো, নালিশ জানিয়ে আর অশান্তি আনবো না, এই সঙ্কল্পই করে রেখেচি। আপনারা যাঁরা আমাকে সত্যিই ভালবাসেন মনে দুঃখ পান বুঝি, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া প্রতিকারের পথ ত নেই।

শ্রীকান্ত বাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে দেবো। নানা কারণে আজ সকাল থেকেই মনটা একটু বিচলিত হয়ে আছে।

আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি ২৫শে আষাঢ় ১৩৪৪

শরৎদা

১৯

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড

কলিকাতা

পরম কল্যাণীয়েষু,

আপনার চিঠি আজ সকালে গ্রামের বাড়িতে পাই। অতএব শ্রীকান্ত[১] দিবার জন্য নিজে আসিতেই হইল। অবহেলা করি কিরূপে? আমার স্বভাব যে কাজ করা প্রয়োজন তাহা তৎক্ষণাৎ না করিতে পারিলে কিছুতেই মনের মধ্যে শান্তি পাই না, সে ত আপনি জানেন। কেমন আছেন? দেশের বাড়িতে বড় বৌ একাকী পীড়িত।[২] সন্ধ্যার পরে মাথা ঘোরা এক নূতন ব্যাধি, ছোট বৌমা তাঁর যে যেখানে আছে সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে পিতৃগৃহে ভাইয়ের বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছেন। কবে তাঁরা ফিরিবেন শ্রীভগবান জানেন। ভাবি ভায়া বুড়োদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি কোন্ মহৎ প্রয়োজনে ' শ্রীপাদপদ্মে একটু তাড়াতাড়ি স্থান দিলে দেখিতে শুনিতে সকল দিকেই ত শোভন হয়। ৯ই শ্রাবণ ১৩৪৪

শরৎদা

২০

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

পরম কল্যাণীয়েষু,

চরিত্রহীন দু'খণ্ড পেলাম। একটাতে আমার ছোট ভূমিকাটি[১] সাঁটা আছে। অপরটায় নেই। দপ্তরি বোধ করি কাগজটা জুড়ে দিতে ভুলেছে। একটু বলে দেবেন ওটা যেন ভুল না করে।

চন্দ্রনাথ ও অরক্ষণীয়া পেলাম। শীঘ্র সংশোধন করে দেবো। গৃহদাহর জোগাড় করি।

আচ্ছা, চরিত্রহীনের দাম কমিয়ে তিন টাকা করার কি একটা প্রস্তাব হয়েছিল? আমার মনে হচ্চে যেন হয়েছিল।

কাল বাড়ি থেকে এলাম নানা প্রয়োজনে। আগামী বৃহস্পতিবারে ফিরে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শুক্রবারেই যাবো।

এত কাছে থেকেও আপনাদের, সঙ্গে দেখা হয় না এ বড় দুঃখের কথা। বোধ হয় এই ভাদ্রের শেষের দিকেই সকলে কলকাতায় আসবো। আশ্বিন মাসটা কাটিয়ে আবার কার্তিক মাসে বাড়ি যাবো।

আমি ভাল নই। এ দেহটা সত্যিই ভাঙ্‌লো— একটা না একটা লেগে আছেই। কতদিন যে এইভাবে কাট্‌বে প্রতিদিন তার মনে মনে হিসেব করি। আশা আছে দীর্ঘদিন নয়। বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল। প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৪।

শরৎদা

নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে[১] লেখা

১

সামতাবেড়। ৪. ১২. ২৫

পরম কল্যাণবরেষু,

কাল রাত্রে লোকের হাত মারফৎ তোমার চিঠি এবং মদন সাহেবের[২] কন্‌ট্রাক্ট পত্র পেলাম। সাহেবের ঔদার্য দেখে চোখে জল এল। নগদ পাঁচ শ এবং ভবিষ্যতে দু'শ— এতো সোজা টাকা নয়! ব্রাহ্মণ সন্তান যুগলের সম্পদ।[৩] আমার সমস্ত বই এখন থেকে পনেরো বৎসরের জন্য[৪] তাঁর মর্জি ও খোষ খেয়ালের উপরে নির্ভর করবে,— এ আর বেশি কথা কি?

তবে একটা জরুরি সর্ত তিনি বোধ করি তাড়াতাড়ির জন্যেই করে নিতে ভুলে গেছেন। গ্রন্থকারকে এই পনেরো বৎসর একবার সকালে ও একবার বিকালে গিয়ে কুর্নিশ করে আস্‌তে হবে। আমার মনে হয় শুধু একখানা বইয়ের জন্য ও টাকা ঢের বেশি। সুতরাং, এই 'ক্লজ'টুকু ঢুকিয়ে নিলে দেখ্‌তে শুন্‌তে সব দিকেই বেশটি হবে।

চিতু ভায়ার[৫] সাধ এবং আমিও 'পণ্ডিত মশাই'র জন্যে কথা দিয়েছি। নইলে—থাক্।

দিন ১০।১২ হ'ল আমি এ বাড়িতে আছি। পরশু বোধ করি একবার যাবো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ইতি—

দাদা

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

নির্মল, কাগজে দেখ্‌লাম আমার দেবদাস হবে নাকি ম্যাডান 'থিয়েটার'-এ।[১] এ হোলো ভালো। আমি দিলাম না ম্যাডানকে আর এরা দিতে চাচ্চে তাকে।[২] জিনিসটা আমার কাছে ভারি অপ্রীতিকর। আমার সঙ্গে এ পর্যন্ত একটা কন্‌ট্রাক্ট পর্যন্ত করলে না। নগেন কি নরেশকে একবার ডাকিয়ে বোলো ত[৩] জিনিসটা ভালো নয়। কবে মাদ্রাজ থেকে ফিরলে? ইতি— ১৬ই পৌষ ১৩৩৪

শরৎদা

দিলীপকুমার রায়কে লেখা

১

সামতাবেড়

বৈশাখ ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি এবং কবির চিঠির নকল[১] একসঙ্গে কাল পেয়েছি। এখানে চিঠি আসতে যেতে দুদিন লাগে, না হলে উত্তরটা এবার একটু শীঘ্র পেতে।

অকস্মাৎ কে যে কবিকে আমার কথা লিখে জানিয়েছে ঠাউরে পেলাম না, কিন্তু কথাটা আমি বলেছি তা সত্য। আমার ধারণা ছিল তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুর যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাই নি।[২] যাই হোক্ এখন নিশ্চয়ই জানলাম ধারণা আমার ভুল। মস্ত স্বস্তি।

এই শনিবারে তোমার ও তোমার সাগ্‌রেদদের গান-বাজনা শোনবার জন্যে হয়তো যাবো। নিজেরও একটা কাজ আছে। আমার এখানে আসবার ৩।৪ খানা গাড়ী আছে। দেউলটি রেলওয়ে স্টেশন, বি. এন, রেলওয়ে টাইম টেব্‌ল একখানা কিনে সময় দেখে নিয়ো। সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দেড়। ষ্টেশন থেকে হেঁটে আসতে হয়— আধ ঘণ্টা লাগে। যদি জানতে পারি কবে এবং কোন গাড়ীতে আস্‌বে আমি লোক পাঠিয়ে দেব তোমাকে আন্‌তে। শোবার যায়গা কোন মতে একটুখানি দিতে পারবো।

পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম, ভবানীপুর থেকে ফেরবার সময় ইচ্ছে হয়েছিল তোমাদের ওখানে যাই,[৩] কিন্তু পাছে না থাকো এই ভয়েই যাওয়া হয়নি। শরীর নেহাৎ মন্দ যাচ্ছে না।

কবিবরের চিঠি আমাকে দিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজ করেছ এ আমাকে স্বীকার কবতেই হবে। তোমাব কল্যাণ হোক্।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

পানিত্রাস পোষ্ট, গ্রাম সামতাবেড়,

হাওড়া জেলা। ২২শে ভাদ্র ১৩৩৩

মণ্টুরাম,[১]

তোমার বই[২] এবং ছোট্ট চিঠিখানি পেলাম। কাল দিনে রেতে বইখানি প'ড়ে শেষ করলাম। চমৎকার লাগ্‌লো। তবে দু'-একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হোলাম।[৩] তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতঃই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধরে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। রায় বাহাদুর মজুমদার[৪] মশায়ের রাঙা জবা মুটো মুটো মুটোর উল্লেখ কই? ওটাও চাই। কারণ তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ত্রুটির কথা, একটা মত-ভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে 'আমরা সর্বসাধারণকে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই তাদের চিঁড়ে মুড়কির বরাদ্দ করি বাইরের প্রাঙ্গণে আর সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি'[৫] ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁরও মানসিক ঔদার্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এতবড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা, সভ্যতা এবং কালচারের জন্য সন্দেশই চাই, চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াবার চেষ্টা করলে তারা পেট কামড়ানিতে সারা হয়। আর সর্বসাধারণ মানেই ছোটলোক। তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই থ্রাইভ করে। একটা কংক্রিট দৃষ্টান্ত নাও। সাধারণ মানে ছোটলোক, মা—ও ছোটলোক। এই মা—র পয়সা হওয়ায় ও তোমাদের মত দু'চার জনের প্রশ্রয় পাওয়ায় আজকাল তারা থার্ড ক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট-এ উঠতে আরম্ভ করেছে। (ফার্স্ট ক্লাস-এ সাহেবের ভয়ে ওঠে না, এই যা কতক রক্ষে) আচ্ছা, কোন কম্পার্টমেণ্ট-এ জন দুই তিন মা—কে ঘণ্টা ৩।৪ ঢুকিয়ে রাখবার পরে আর সাধ্য নাই কারও যে সে ঘর ব্যবহার করে। হাতে-মাটির জন্যে এক ঝুড়ি মাটি থেকে সুরু ক'রে ছোলাসেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, গয়ার এবং হেগে মুতে এমন কাণ্ড ক'রে রেখে বেরিয়ে যাবে যে সে দৃশ্য যে দেখেচে সে আর ভুলবে না। আসল কথা, অন্দরে শোবার ঘরে ব'সে সন্দেশ ভোজন করার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করা চাই। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার তারা জিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়লে আমরা আব বাঁচবো না। অতএব এরূপ অশ্রদ্ধেয় বাক্য আর কখনো বোলো না।[৬]

তোমার কন্‌সার্ট-এ যেতে পারি নি শরীর একটু অসুস্থ ছিল বলে। আরও একটা হেতু এই যে, মেদিনীপুরের... প্রতি বৎসরেই কোথাও-না-কোথাও বন্যা হবেই। হ'তে বাধ্য। গবর্ণমেণ্ট তার কোন উপায় করে না, করবে না। এ হয়েছে দেশের উপরে একটা স্থায়ী ট্যাক্স, এমন কোরে বছর বছর বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করার সার্থকতা কি? গবর্ণমেণ্টকে তারা একটা কথা জোর ক'রে বলবে না, এক কোদাল মাটি কেটে রেলের রাস্তা ভেঙে যে জল বার ক'রে দেবে তা দেবে না, পাছে সাহেবরা ধ'রে জেলে দেয়। তারা জানে কলকাতার ভদ্রলোকের মহাকর্তব্য হচ্চে তাদের খাওয়া পরা দেওয়া, যেহেতু তাদের ঘরে দোরে জল উঠেছে। তাছাড়া পদ্মার চরে মো—রা কেন দল বেঁধে বাস করে জানো? শুধু এই জন্যে যে বর্ষায় তাদের ঘর দোর ভেসে গেলেই পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের টাকা দিতে হবে। শুধু আউট অব্ ম্যালিস এবং স্পাইট তারা গিয়ে ঐ রকম ভয়ানক যায়গায় বাস করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোনপ্রকার মতভেদ হবার আশঙ্কা নেই! কারণ, তুমি বুদ্ধিমান, যা সত্যি কথা তা বুঝবেই।

তুমি বিলেতে যাচ্চো খবরের কাগজে দেখলাম। আশীর্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্বিঘ্নে হোক্,

উদ্দেশ্য সফল হোক্। আমার বয়স হয়েছে, ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভকামনা ক'রে গেছি। আশা করি তোমার কুশল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ— আগামী ৩১শে ভাদ্র আমার বয়স পঞ্চাশ হবে। ১লা আশ্বিন যাবো কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া। ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েযু,

মণ্টু, তোমার চিঠি এবং টিকিট দুইই পেয়েছি। কনসার্ট এ যাবার সময় ছিল না, কারণ চিঠি যখন পেলাম তখন যাবার উপায় নেই। কিন্তু ভারি ইচ্ছে ছিল বৃহস্পতিবারে তোমার বিদায়-উৎসবে যোগ দেবার[১]। কিন্তু এদিকে বি. এন, রেলওয়ে ষ্ট্রাইক, গাড়ী নেই বললেই হয়! যাও বা আছে ৭।৮ ঘণ্টার কমে হাওড়ায় পৌঁছয় না। আর নাই-ই গেলাম। চোখের দেখা-শোনার এমনিই কি দরকার? এখান থেকেই সমস্ত মন দিয়ে আশীর্বাদ করচি তোমার পথ যেন নির্বিঘ্ন হয়, তোমার যাওয়া যেন সার্থক হয়।

আমি বিশেষ ভাল নেই, দেহটা নিয়তই ক্ষীণ এবং অপটু হয়ে আস্চে। তবু আশা আছে তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। তোমার দুখানি বইই[২] বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পরশের শেষটি বড মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটা দেখতে শিখেচে তার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এ বইখানি পড়লে তা জানা যায়।

তুমি সদাই ব্যস্ত, তোমার সময় কম ; কিন্তু এবার ফিরে এসে তোমাকে লেখার দিকে একটু মন দিতে হবে। রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল— এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বল্‌তে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুঁড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙ্গে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

আমার সস্নেহ আশীর্বাদ রইল—

তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট.
জেলা হাওড়া. ১৩ই ফাল্গুন '৩৩

পরম কল্যাণবরেষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পেয়ে যে কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকে জানানো শক্ত। তুমি যে আমাকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাসো এও যদি না বুঝ্‌বো ত বুঝ্‌বো সংসারে কি?

তোমার বিদায়-অভিনন্দনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে কি কি হয়েছিল সব শুনেছি। তুমি বিদেশে যাচ্ছো, কিন্তু একটু শীঘ্র ক'রে ফিরে এসো। তুমি কাছাকাছি নেই মনে হ'লে কষ্ট হয়।

মনের পরশের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটা যে আমার কত ভাল লেগেছিল তা বল্‌তে পারি নে। সত্যকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষে যে মানুষের কত আপনার এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলি মনে হয়েছিল তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছ। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখতে হবে। তোমার বাবাকে আমি জানতাম না, তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি তাঁর মানুষের বেদনা বোঝবার অনুভূতি খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন ক'রে পূর্ণ মানুষ ক'রে তুলতে হবে। তবেই ত হবে।

বেশ, আমার চিঠির মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো। অনুমতি দিলাম। তুমি আমার অতিশয় স্নেহের জিনিস। আজ ব'লে নয়, অনেক দিন থেকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হৈ হৈ ক'রে লুচি খেয়ে যেতে, তখন থেকে।

তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্বাদ করি এ জীবনে তুমি সফল হও, নীরোগ হও, দীর্ঘজীবী হও।

আশীর্বাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাওড়া। [আষাঢ় ১৩৩৫]

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, কত দিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি। না জানি কত রাগই তুমি কোরেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার মাতুল তকু[১]। সাহেবের বাড়ি, অপেক্ষা করা রীতি-বিরুদ্ধ কি না স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন— শ্রীযুক্ত শৈলেশ বিশি, তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি বললেন, কার্ড রেখে যাওয়াই এটিকেট,— হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌লে এরা রাগ করে। কিন্তু হ'লে হবে কি— কার্ড না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তোমার 'দুধারা'র অনেক জায়গা আর একবার পড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা কোরে যেমন-তেমন ভাবে প'ড়ে যাবার জিনিস নয়, মন দিয়ে পড়বার মতই বই। কিন্তু জান ত আজকাল প্রশংসাপত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাঁদের আছে, তাঁরা নিজেরাই তার অমর্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কই নে। কিন্তু আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি, মণ্টুর এ বইখানি যেন তাঁরা

শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যোপান্ত একবার প'ড়ে দেখেন। আমার নিজের তো পেশাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্বে চিন্তা ক'রে দেখি নি।

'ভারতবর্ষে' [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫] তোমার চাকর গল্পটা পড়লাম। গল্পের দিক দিয়ে এ তেমন ভালো হয় নি, কিন্তু একটা জিনিস দেখচি তোমার চমৎকার ডেভালাপ ক'রে উঠ্‌ছে, সে তোমার ডায়ালগ। গল্প লেখবার কৌশল অথবা পদ্ধতি এবং এই ডায়ালগ-এর ধারা,— তোমার লেখায় যেদিন এ দুটোর একটা মিল হয়ে উঠ্‌বে সেদিন তুমি সত্যিই বড় সাহিত্যিক হবে। একটা কথা ভুলো না মণ্টু, লেখার মধ্যে লিখে যাওয়াও যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না-লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত। কিন্তু এ বস্তুটা কাউকে শেখানো যায় না, আপনি শিখ্‌তে হয়। আমি নিশ্চয় জানি এ শিখে নিতে তোমার বাধবে না। আজ তোমাকে যারা বিদ্রূপ করে, তারাই একদিন প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনেও এ সত্য স্বীকার করবে। আমাদের যাবার দিন নিকটবর্তী হয়ে আস্‌চে, আমরা হয়ত এ চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু তত দিন পরেও আমাকে যদি তোমার মনে থাকে তো আমার এই কথাটা তোমার স্মরণ হবে।

আশালতার[২] প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা,— এর ভাল মন্দ এখনো বিচার করবার সময় আসে নি। বয়সের সঙ্গে আড়ম্বরের আতিশয্যগুলো কেটে গেলে লেখা হয়ত এর ভালোই হবে। ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে অনেক-বই পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্থ-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখ্‌তে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর কোয়ালিফিকেশান— লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।

'শরৎচন্দ্র ও গল্‌স্‌ওয়ার্দি' প্রবন্ধ পড়লাম। গল্‌সওয়ার্দি নামটাই শুধু শুনেচি, তাঁর কোন বই আমি পড়ি নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোথায় আমার মিল, কোথায় গরমিল কিছুই জানি নে। প্রবন্ধের মধ্যে আমার সুখ্যাতি আছে আর আছে গল্‌স্‌ওয়ার্দির রাশি রাশি কোটেশন্। তার থেকে কোন অর্থই আমার আদায় হোলো না। এইটুকুই বুঝলাম আশালতা তাঁর বই পড়েচেন এবং গল্‌সওয়ার্দি ভদ্রলোক যেই হোন্ অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সে-সব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।

মেয়েটি যে জীবনে সুখী নয় এ-কথা শুনে ক্লেশ বোধ হয়।[৩] কিন্তু এ সমাজে মেয়ে-জন্মের এম্‌নি অভিশাপ যে এর থেকে নিষ্কৃতিরও পথ নেই। মেয়েটির লেখা প'ড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না-পাওয়া পর্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাক্‌তেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না। ক্রিটিক্‌ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে।

তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখ্‌তে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে যে-ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্চে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'অ্যান আউটলাইন অব্ ফিলসফি' বইখানি পড়লাম। এ বইখানি শক্ত, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না থাক্‌লে সকল কথা ভালো বোঝা যায় না, বুঝতেও পারি নি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখলে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর অশেষ করুণা। আহা! এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,— সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি এইচ, জি, ওয়েল্‌স-এর লেখা পড়লে। এর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা শুধু চালাকি আর ফক্কড়ি ক'রে মেরে দেবো। রাসেলের 'অন এডুকেশান' বইটা কিনে এনেচি। ভাবচি কাল পোড়ব। আসচে বছরে যদি বিলেতে যাই[৪] শুধু এই লোকটিকে একবার দেখে আসবার জন্যেই যাব।

মায়া[৫] কেমন আছে? এখন তুমি কোথায় আছো ঠিক না জানার দরুণ তোমার মামার বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি দিলাম। আশা করি পাবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

- শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অটোগ্রাফের খাতাটা নিজে গিয়ে এক দিন দিয়ে আসবো। হারাই নি, - আছে। মালিককে জানিয়ে দিয়ো।

৬

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাওড়া। ১৩।৬।২৯

মন্টু,

তোমার নামে তো আর ওয়ারেন্ট ছিল না যে সাধু হ'তে গেলে?[১] ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চ'লে আস্‌বে। আবার না হয় দিন কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি।[২] ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী... দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে! এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আস্‌চো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটি কথা। বারীন[৩] শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগ্‌ড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে[৪] বলে এটা সে কর্তার[৫] কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মান্‌বে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার 'আন্দামানের বাঁশীর'[৬] খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং এ-বই এত দিন যে পড়ো নি, এই ব'লে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই 'বিভূতি'টা হস্তগত ক'রে নিতে পারবে। উত্তর-ভারত বেড়াবার সময়ে এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ[৭] শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি ক'রে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আস্‌বার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,— বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,— একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ ক'রে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাব্‌তে হবে না,— অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট ক'রে থাকবারই বা দরকার কি?

অনেক কাল তোমাকে দেখি নি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আস্‌বে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ— 'বিভূতি' দুটো আদায় ক'রে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক্ শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আস্‌বে নিশ্চয় লিখো।

৭

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাওড়া। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেচো যে, বেশ বোঝা যাচ্চে যে আপনি আমার উপরে ক্রমেই অখুসি হয়ে উঠ্‌ছেন। অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি তাহ'লে উত্তরে বোল্‌বো নিশ্চয়ই না। আর অখুসির অর্থ যদি হয় গভীরভাবে ব্যথিত, তা'হলে বল্‌বো নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয়, দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এ জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবো না, তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমাদের সাধন-ভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং, এ সকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে সয়ে গেছি, এও একটা।

তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ[১] আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যাঁরা, তাঁদেরও নেবার জন্যে ব'লে দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে

আমার কাছে তুমি ঋণী,— অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেক বার বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধর-দা তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। হাস্য-রসিক কেদার বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন কিন্তু চমৎকার না-লিখ্‌তে পারেন না। তিনি সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখ্‌বার ইঙ্গিতটা যে ঠিক বুঝতে পারেন না, একি তাঁর বই পড়তে গিয়ে দেখতে পাও না? আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অন্নদাশংকর রায়ের লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,— এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্তের জন্যও ভুল্‌তে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ্‌ 'আদেক্‌লে-পণা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ— ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার 'দোলা'র ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এ' বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্বদাই মনে রেখো মণ্টু। আমি আশীর্বাদ করচি একদিন তুমি বড হবে।

অন্নদাশংকরের লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি চ্যালেঞ্জ ক'রে বলে কই দেখাও দিকি? আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বল্‌তে হবে যে এসব জিনিস এমন কোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, কালিদাস, ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর এই মনোভাবটি ধরা পড়ে,— দ্যাখো তোমরা, আমি কি বিদুষী ! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্‌নি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না— আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাককে কখনো কৃপণতা কোরব না, এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় আইডিয়া, বড় প্রকাশ এই নিয়েই চলা চাই লেখা,— জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল, আর জায়ে জায়ে ঝগড়া

আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্রভাত মুখুয্যের বর্ণনার নিপুণতা,— ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শল্‌তে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ি— এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধকরি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাঙ্‌লা দেশের বাল-বিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠ্‌বে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাঙ্‌লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক্। তোমার নিজের কথায় এক দিন আমি ভেবেছিলাম, মণ্টু যে ব্যারিষ্টার হয়ে আসে নি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চ'ড়ে বেড়ালো মটরগাড়ী, না-ই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চ'লে যাবে,— শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,— সেই আমাদের ঢের। আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্চে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘট্‌বে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না, সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর পারমিশান—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ— সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুল্‌তে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। আমার ছেলেবেলার একটা কথা চিরদিন মনে থাকবে। মামার সঙ্গে স্যার গুরুদাসের বাড়ি দুর্গাপূজোর নেমন্তন্ন খেতে গেছি।[২] গিয়ে দেখি গুরুদাসের প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার বড় বড় কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয় সে বিশ্বাস করে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌চেন যে স্নানের প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা ব'লে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয় সাত পুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ বাস করে এতে সন্দেহের অবকাশ কোন্‌খানে?[৩] কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করতে পারে! বল্‌তে বল্‌তে তিনি রাগে বাড়ির মধ্যে চ'লে গেলেন। মনে আছে সেই ছেলে বয়সেই মনে মনে বোল্‌লাম, এই গুরুদাস! সেকালের এম, এ-তে ম্যাথামেটিক্‌স- এ ফার্স্ট, বড় উকিল, বড় জুরিষ্ট, বড় জজ, ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্‌সেলার!

ধার্মিক, সত্যবাদী— তিনি ভণ্ডামি করেন নি, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে স্যার অলিভার লজ এর সঙ্গে তর্ক চলে না, আমার প্রজা গৌর মাঝির সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথার মার-প্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি ব'লে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্দে থাক্‌লে কথায়-বার্তায় রঙ্‌ চঙ্‌ লাগাতে পারে, না থাকলে সোজা কথায় সহজ কোরে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ স্যার গুরুদাস! তোমার কাছে এ-সব বলতেও ভয় হয়, কারণ সকলেই জানে যে আশ্রম-বাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গাল-মন্দ ক'রে তেড়ে মারতে আসে।...কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছু মাত্র বিদ্বয বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভূয়ো।

আশ্রম যাক্‌... আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়। গান শুন্‌তে গল্প করতে। ভারি বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আস্‌বে না একবার? আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

সামতাবেড়। ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮।

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান্‌ ক'রে দিয়েছিল।[১] পথে এক দল শেম্‌ শেম্‌ বল্‌লে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে, আবার এক দল বারো-ঘোড়ার-গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,— ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণর তীরে আবার ফিরে এসেছি। 'দি লিবারেটেড ম্যান হ্যাজ নো পারসোনাল হোপস্‌'[২] এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক্‌ কয়লার গুঁড়োর। জয় হোক্‌ বারো-ঘোড়ার-গাড়ীর!

শেষপ্রশ্ন প'ড়ে খুসি হয়েছো শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। কারণ, খুসি হবার তো তোমাদের নিয়ম নয়। প্রবর্তক সঙ্ঘ এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাকে আর ডাক্‌লে না। তারা অনুরোধ করেছিল বইয়ের মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ স্পষ্টই দেখা গেল পেরে উঠি নি। শেষপ্রশ্নে অতি আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। 'খুব কোরবো, গর্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখ্‌বো' এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক-সাহিত্যের সেন্‌ট্রাল পিভট নয়— এরই একটু নমুনা দেওয়া। কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছে— এখন তোমাদের ওপরেই রইলো এর দায়িত্ব। তোমার সমস্ত লেখাই আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ি, রবীন্দ্রনাথ তোমার সম্বন্ধে যে-কথা চিঠিতে লিখেছেন সে সত্য। দ্রুত উন্নতি স্পষ্টই চোখে পড়ে। কিন্তু সে বাইরে থেকে কারও কৃপায় নয়,— তোমার নিজেরই সত্য সাধনায়। এবং রক্তের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে

যা পেয়েছিলে তারই ফল। পণ্ডিচেরীতে না থেকে কলকাতায় ব'সেও ঠিক এমনিই হ'তে পারতো।

তুমি লিখেছিলে যে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, আমরা ইন্‌টেলেকচুয়াল যুগের সন্তান। এ খুবই সত্যি। তোমার লেখার মধ্যে এই সত্যের অনেকখানি প্রকাশ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্‌চে, কিন্তু এখনই এলো তোমার সাবধান হবার সময়। ডায়ালগ ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই,—কিছুতেই না মনে হয়, এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলেছে। এই হলো আর্টিষ্টিক ফর্ম-এর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হোলো না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশি বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়। বুঝলে তো? এই জন্যেই হয়ত কেউ কেউ বলে যে মণ্টুর লেখার মধ্যে তর্কাতর্কিটা মাঝে মাঝে প্রবল আকার ধারণ করে। যে পড়ে সে যদি ভেবে বোঝবার অবকাশ না পায় তো নিজের বুদ্ধির প্রমাণ পায় না। তখন রাগ করে। আমি কুঁড়ে মানুষ, চিঠি লিখতে ভয় পাই, কিন্তু তুমি যদি কাছাকাছি থাকতে তো তোমার লেখার এই জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে পারতুম। কতবার না তোমার লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, মণ্টু এইখানটায় এমনি করে যদি শেষ করতো।

আমার বয়েস হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়েস হোলো, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় এর পরে বাঙ্গলার উপন্যাস-সাহিত্যের স্থানটা হয়ত একটু নেমে পড়বে।

তোমার উপর আমার অনেক আশা মণ্টু। কারণ, নোঙরামিকেই যারা সাহসের পরিচয় ব'লে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে তুমি তাদের দলে নও। তোমার শিক্ষা ও কালচার এদের থেকে স্বতন্ত্র।

তোমার নতুন কবিতাগুলি মন দিয়ে পড়লাম। চমৎকার হয়েছে। আচ্ছা, অরবিন্দ কি বাঙ্‌লা পড়তে পারেন? শেষপ্রশ্ন পড়তে দিলে কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন? জানি এ-সব পড়ার সময় নেই তাঁর,— কিন্তু পড়তে বলায় কি অপমান বোধ করবেন? প্রবর্তক সঙ্ঘ রেগে গেছে দেখেই ভয় হয়, নইলে তাঁর মত গভীর পণ্ডিত মানুষের মতামত জানতে পারলে আমার লেখার ধারাটা হয়ত আর একটা পথ খোঁজে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে মানুষকে অনেক কথা শুনতে বাধ্য করা যায়, এ-কথা কি শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না? যাকে হাল্কা সাহিত্য বলে তার প্রতি কি তাঁর অত্যন্ত বিরাগ?

ষোড়শী, রমা, হরিলক্ষ্মী তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া।
৬ই ভাদ্র ১৩৩৮।

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, জবাব দিই নি ব'লে মনে কোরো না যে তুমি যা কিছু পাঠাও মন দিয়ে পড়ি নে। শ্রীঅরবিন্দর যা-কিছু ছোট ছোট মেসেজ অথবা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তুমি আমাকে যত্ন ক'রে পাঠাও তা পড়ি, চিন্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্য, বুঝতে পারি নে বেশির ভাগ তা স্বীকার করি। মাঝে মাঝে তিনি মন-চৈতন্য বা কন্‌সাসনেস-এর এত বিভিন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায় বা স্তর নির্দেশ করেন যে সে আমার বুদ্ধির অগম্য।

তাঁর কবিতার সম্বন্ধেও মতামত আমি সব সময়ে মেনে নিতে পারি নে। উদাহরণের মত বলা যায় যে, তোমারই যে কবিতাটিকে তিনি বলেছেন সবচেয়ে ভালো, আমার মনে হ'লো সেটি তোমারই অন্যান্য কবিতার চেয়ে নীচু দরের। তবে, এ-ও বলি যে সেই কয়টা কবিতাই বাস্তবিক ভালো— ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে। তাদের মধ্যে বেছে নিয়ে নম্বর দিতে গেলে কারও সঙ্গেই কারও মতের ঐক্য হবে না। না-ই বা হোলো। কিছু দিন থেকে তুমি দেখচি বেশ মন দিয়েই সাহিত্য সাধনা সুরু করেছো, ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, যা-তা যেমন-তেমন ক'রে যশের কাঙ্গালপনা নেই, এইবার তোমার সফলতা সুনিশ্চিত।

আমার জন্মতিথি উপলক্ষে যে গানটি[১] তুমি রচনা ক'রে পাঠিয়েছো তা কবিতার দিক দিয়ে এবং হৃদয়ের দিক দিয়ে চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সঙ্কোচ বোধ হয়। সেদিন এই নিয়ে নলিনী সরকারকে[২] বলেছিলাম— মণ্টু বলে তুমি যদি গাও তো বেশ হয়।— সে স্বর-লিপির জন্যে তোমাকে লিখবে বলেচে। আরও বেতার-বার্তার কর্তারা বলেন, জন্মতিথির দিনে তাঁরা এই গানটা তোমার নাম ক'রে ব্রডকাষ্ট করবেন। গাইবে নলিনী। আচ্ছা, আমার ষোড়শী প্রভৃতি বইগুলো কি তোমার কাছে হরিভায়া[৩] পাঠিয়েছেন? আমি চিঠি লিখে দিয়েচি।

আমার আর কিছু কিছু তোমাকে জানাবার ছিল কিন্তু আর সময় নেই, পোষ্টাফিস বন্ধ হয়ে যাবে।

তোমার সেই সব পুরানো কাগজ-পত্রগুলো কাল কিম্বা পরশু ফিরে পাঠাবো।

ভালো কথা,— 'পরিচয়' ব'লে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাত শ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষ-প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন।[৪] পড়েচো বোধ হয়? তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যে-হেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু 'কমল'-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যে-হেতু নীরেনের চোখ দুটো কটা সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেড়ালের মতো।[৫] দুঃখ এই যে এরাও কলম ধরে এবং তাও ছাপা হয়। কারণ নিজেদের কাগজ রয়েছে। অহঙ্কার এই যে ফরাসি জানি জার্মাণ জানি। আবার শেষের দিকে

অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে প্রার্থনাটুকু আছে—হে ভগবান্ ! রূপকার না হইয়া উপকার করেন— না এমনিই কি একটা।

কিন্তু আর সময় সেই এক মিনিটও। আশীর্বাদ রইলো।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া
বিজয়া দশমী। ৪ঠা কার্তিক ১৩৩৮

মণ্টু,— আমার বিজয়ার শুভাশীর্বাদ জেনো। অনেক দিন চিঠি দিতে পারি নি তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আছি।

প্রথমে কাজের কথাটা সেরে নিই। 'দোলার'[১] গোড়ার কয়েকটা পাতা এই সঙ্গে পাঠালাম। হলচালনার বহর দেখে হয়ত পত্রোত্তরেই জানাবে যে, 'মশাই আপনার ভিক্ষেয় কাজ নেই কুত্তা বুলিয়ে নিন। আমার বাকি কাগজগুলো ফিরিয়ে পাঠান।' সে আশঙ্কা আমার যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমার তরফ থেকেও একটুখানি কৈফিয়ৎ যে নেই তা নয়। যথা—

কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানি নে। যেমন আর্ট ফর আর্টস সেক, ধর্ম ফর ধর্মের সেক, ট্রুথ ফর ট্রুথস সেক ইত্যাদি। আর্ট-এর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ধর্ম, ট্রুথ প্রভৃতি শুধু কথাই নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এটা সর্বদা মনে রাখা চাই। গল্পের উদ্দেশ্য যদি চিত্ত-রঞ্জন করাই হয় তবুও এই ফ্যাক্টটা থাকে যে ওটা দুটো কথা। চিত্ত এবং রঞ্জন। ডাঃ জিতেন্দ্র মজুমদার এম. ডি,[২] এবং মণ্টুরামের চিত্ত ঠিক এক পদার্থ নয়। একটা চিত্ত যাতে খুসিতে ভ'রে ওঠে অপরটা হয়ত তাতে কোন আনন্দই পাবে না। একজন বহুশিক্ষিত লোককে দেখেছি দুধারার ১৫।২০ পাতার বেশি এগুতেই পারলে না, কিন্তু আমার কি ক'রে যে বইটা শেষ হয়ে গেল জানতেই পারলাম না। গল্প লেখার আইন ওতে কতখানি ভাঙা হয়েছে তা আমি জানিও নে, জানবার ইচ্ছেও হয় নি। খুসি হয়েছিলাম তৃপ্তি পেয়েছিলাম এ একটা ফ্যাক্ট অথচ যদি তর্ক করা হয় যে আর্ট যে কি সে আমি জানি নে বুঝি নে, তাহ'লে চুপ ক'রে থাকবো নিশ্চয়, কিন্তু এই ৫৬ বছর বয়সে নিজের মনকে সায় দেওয়া যাবে না কিছুতেই। সুতরাং লাঙ্গল চালাবার যুক্তি আমার ও সব নয়। যে-সকল কথা তুমি অত্যন্ত ভেবে লিখেচো তার যে দরকার নেই উপন্যাস লিখ্‌তে তা বল্‌চি নে, কিন্তু আমার মধ্যে উপন্যাস-লেখার যে ধারণা আছে তার দিক থেকে মনে হয়েছে স্বপনের চরিত্রের বিচারে ওর শেষের দিকের সঙ্গে গোড়ার দিকের লেখাটা বেশ সামঞ্জস্য পায় নি। তাছাড়া বইটা ছোট করার দরকার গোড়ার দিকে। এটা হচ্চে একটা কৌশল। পড়ার ইন্টারেস্ট গোড়ার দিকে অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। আর একটা কথা মণ্টু। লিখ্‌তে ব'সে লেখার চেয়ে না-লেখা যে ঢের শক্ত। কেদার বাড়ুয্যে সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখবার ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে পারেন না, একি তাঁর বইয়ের মধ্যে দেখতে পাও না? তাঁর বই পড়তে গিয়ে অনেক সময়ে আমার কেবল এই আপশোষই হয়েছে কেদারবাবু এই

কৌশলটা যদি জান্‌তেন। একেই বলে লেখার সংযম। বলবার বিষয়বস্তু যেন আবেগের প্রখরতায় প্রয়োজনের বেশি একপাও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারে। বরঞ্চ এক পা পেছিয়ে থাকে সেও ভালো। তুমি নিজে যদি এত বাদ দেওয়া পছন্দ না করতে পারো[৩] তোমার ওখানেই কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখিয়ে তাঁর মত নিয়ো। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে যে-সেব লেখা এখন কেটে দিয়েছি তার কিছু কিছু হয়ত আমিই আবার জুড়ে দেবো যখন বইয়ের শেষ পর্যন্ত পৌঁছব। যাই হোক তোমার অভিমত জানতে পারলে ভাল হয়। তখন খুব শীঘ্র সমস্তটা কেটে ছেঁটে বেঁড়ে ক'রে দিতে বেশি দেরি ঘট্‌বে না।

তোমার নীরেনের চিঠিগুলো খুব মন দিয়েই পড়েছিলাম।[৪] তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো, ভালোবাসো তাই তোমায় অত লেগেছে, কিন্তু তাতে কাজ তো কিছু হবে না। ওদের পর্বতপ্রমাণ দম্ভ তাতে তিলমাত্রও কমবে ব'লে বিশ্বাস করি নে। আর ঐ যে লীলাময় রায়[৫] এই মানুষটি যে কত ... তা কল্পনা করা যায় না। বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও আমার নামের সঙ্গে ওর নাম সংযুক্ত হবে মনে হলেও সমস্ত মন যেন লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এর বেশি আমি ও-লোকটার সম্বন্ধে আর বল্‌তে চাই নে। হয়ত, এক দিন তোমরাও দেখ্‌তে পাবে যে বিদেশী শাসকের হাতে যে-সব স্বদেশী মুগুর[৬] দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বড় আঘাত করে এই ছোকরাটি সেই জাতের। যাক্‌।

তকুর সঙ্গে শীঘ্রই এক দিন দেখা কোরব। বোলবো না যে তাঁর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন-কিছুই লিখেচো, কিন্তু যা-সব তুমি আমাকে জানিয়েছো তাই ভিত্তি ক'রে জেরা ক'রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা কোরব। দেখি তকু কি বলেন। শ্রী অরবিন্দ সম্বন্ধে কোথাও তো আমি ও-কথা বলি নি। তাঁকে দেশশুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে শুধু কি করি নে আমিই? তবে আশ্রমবাসীদের ওপর আমার মন বেশ সুপ্রসন্ন হয়। হেতু কতকটা তকুর কথায় আর কতকটা অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সম্বন্ধে আমার নিজের জানা-শোনায়। তাছাড়া তোমার নিজের চলে যাওয়াটা আমার অত্যন্ত বেজেছিল। যখন আই, সি, এস, কিম্বা আইন পড়লে না তখনও বেজেছিল, কিন্তু যখন গান-বাজনাকেই এবং তার সঙ্গে সাহিত্যকে আশ্রয় করলে তখন সে ক্ষোভ গিয়েছিল। ভেবেছিলাম সবাই চাকরি করবে এবং দেশের লোককে জেলে পাঠাবে হাকিম হয়েই হোক বা ব্যারিষ্টার হয়েই হোক,— তাই বা কেন? মণ্টুর খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ও যদি ভারতের কলা-শিল্পকে বিদেশীর চোখে বড় ক'রে তুলতে পারে, বুদ্ধি দিয়ে এর গতানুগতিক পথ থেকে আর এক নতুন পথে টেনে আনতে পারে, সেই কি দেশের কম লাভ, কম গৌরব? তোমার কাছেই একবার শুনেছিলাম বিদেশীর 'সিমফনি' ব'লে একটা জিনিস আছে, সেটা সত্যিই বড় জিনিস এবং তাকে তুমি দেশের সঙ্গীতকে দিতে চাও। তার পরে একদিন শুনলাম তুমি সব ছেড়ে বৈরিগী হ'তে গেছ। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার নিজেরই যেন একটা মস্ত বড় লোকসান হয়ে গেছে। এ জীবনে তোমাকে হয়ত আর দেখতেই পাবো না, একি মনে কর আমাদের সোজা দুঃখ? আর কেউ না বিশ্বাস করুক কিন্তু তুমি তো জানো। এই ব্যাপারটা যে আমাকে চিরদিনই গভীব দুঃখ দেবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

একটা মজার কথা শোন মণ্টু। সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে। ক্যাশিয়ার বাঙালী, শুন্‌তে পেলাম একজন নাম-করা জ্যোতিষী— তিনি সযত্নে আমার কাজকর্ম ক'রে দিয়ে আমার কুষ্ঠি দেখতে চাইলেন। বল্‌লাম কুষ্ঠি তো নেই কিন্তু রাশি-চক্রটা[৭] আমার নোট বইয়ে টোকা

আছে। সেটা তখুনি তিনি টুকে নিলেন, আমার হাতের রেখার একটা ছাপ নিলেন। তার পড়ে রইলো তাঁর কাজকর্ম, ডেস্ক, থেকে পাঁজি-পুথি বার ক'রে লেগে গেলেন গণনায়। বললেন কি জানো? বললেন, এক বছরের মধ্যে আপনি অন্য পথ নেবেন। জিজ্ঞেস কোরলাম অন্য পথ মানে? বল্লেন, স্পিরিচুয়াল। আমি জবাব দিলাম— কুষ্ঠির ফল ও-রকম আছে, সে কথা আমাকে কাশীর ভৃগু-বালারাও বলেছিল, কিন্তু আমি নিজে কাণাকড়ি বিশ্বেস করি নে। কারণ আধ্যাত্মিকতার 'আ' আমার মধ্যে নেই। বল্লেন, এক বছর পরে যদি আবার দেখা হয় তখন এর উত্তর দেবো। আমি বল্লাম, এক বছর পরেও ঠিক এই কথাই আমার মুখ থেকে শুন্‌বেন। তিনি শুধু ঘাড় নাড়লেন। তাঁর বিশ্বাস কুষ্ঠির ফলাফল গুণতে জানলে মিথ্যে হয় না।

মণ্টু, একটা কথা বোধ করি পূর্বেও আমার কাছে শুনে থাক্‌বে। আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী[৮] হওয়া চল্‌লো— কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। হেরিডিটি আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধবলে। সুতরাং, জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার ক'রে দিয়ে নূতন কন্‌ভার্ট পাবার আশা কেউ যেন না করেন। কিন্তু খাজাঞ্চি ভদ্রলোক একেবারে নিঃসংশয় যে আমি বৈরিগী হবোই !!

তোমাদের অনিলবরণ[৯] শুনেছি ধূলোকে চিনি করতে পারে। আশ্রমের সমস্ত চিনি নাকি তিনিই সাপ্লাই করেন,— এ কি সত্যি? আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নে, কারণ, তাহ'লে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্যে? কলকাতায় এসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।

বারীনের[১০] সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। সে বলে সে কখনো আর ও-মুখো হবে না। ত-ত ভীষণ কড়াক্কড়ির মধ্যে ওর আত্মাপুরুষ যে আজও খাঁচা ছাড়া হয় নি সে ওর বহুভাগ্য। কিন্তু তোমাদের মাদার-এর[১১] সম্বন্ধে ওর একটা গভীর ভক্তি আছে। বলে ও-রকম আশ্চর্য মানুষ দেখা যায় না। বলে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেমন খাটবার শক্তি, যেমন ডিসিপ্লিন বোধ তেমনি প্রখর বুদ্ধি। প্রত্যেক লোকের ব্যাপার তাঁর চোখের সুমুখে থাকে। তাঁর আদেশ ও উপদেশ ছাড়া কিছুই হ'তে পারে না। এই জন্যেই বাইরে থেকে যারা হঠাৎ যায় তারা তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ উল্টো পাল্টা ধারণা নিয়ে ফিরে আসে।...

দোলার কাটাকুটিগুলো একটু বিবেচনা ক'রে প'ড়ো। হঠাৎ চ'টে যেয়ো না। আবার এমনও হ'তে পারে ওর অনেক কাটাকুটিই শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই আবার বসিয়ে দেবো। সে যাই হোক্, আমাকে উৎসর্গ কোরো না। বরঞ্চ এটা কোরো রবীন্দ্রনাথকে।[১২] আমার আর একবার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ রইলো। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ— অনিলবরণের চিনি করতে পারার খবরটা নিশ্চয় দিয়ো। পারলে জাভা চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।

১১

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া
১০ই চৈত্র ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, এবার সত্যিকার কৈফিয়ৎ আছে, নিতান্ত আলস্যই নয়। বছর দুই পূর্বে ডান হাঁটুতে ট্রেনের দরজার আঘাত লাগে, এত দিন তাই নিয়ে কোনমতে চলছিলাম, কিন্তু মাস দেড়েক থেকে শয্যাগত।

কাল যাচ্ছি কলকাতায় এক্স-রে করাবার জন্যে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পরে এই মাসখানেক রাত্রে ঘুমুই নি। যন্ত্রণার সীমা নেই। দিনরাত যেন শূল বেঁধার ব্যাপার চল্‌চে। কখনো ভালো হবে কি না জানি নে,— আশা বিশেষ নেই। যাক্ এ কথা। কারণ শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ভালই হবে যদি না আর উঠতে হয়। শেষ যাত্রাটাও সম্ভবতঃ এগিয়ে আসতে পারবে এমন ভরসা করি। তোমায় চিঠি লিখি নি কিন্তু তুমি যা-কিছু পাঠাও সমস্ত সত্যিই যত্ন ক'রে মন দিয়ে পড়ি। কখনো বা মনের মধ্যে সাড়া পাই, কখনো বা পাই নে, কিন্তু তোমাদের আশা বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা আমার কত যে ভালো লাগে তা বলতে পরি নে। অথচ, কেন যে ভালো লাগে তারও হেতু খুঁজে পাই নে।

তোমার 'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ' প্রহসনটা পড়েচি। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই পাঠিয়ে দেব। বেশ হয়েছে, কিন্তু এর প্রাণটা ছোট ব'লে লেখাটাও ছোট করতে হবে। ছোট হ'লেই তবে রস জমাট হবে। এ-কথাটা তোমার শোনাই চাই।

শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করবেন? এ কথায় আস্থা না রাখাই ভালো। ফিরে এসে সব কথার জবাব দেবো। শুয়ে শুয়ে আর কলম চলে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, বহুদিন থেকে তোমাকে একখানা চিঠি লিখবো সঙ্কল্প করেচি কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। আজ কলম নিয়ে বসেছি— লিখবই!

... পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো! অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভালো হয় নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।

তবে এ সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ পর্বটা শেষ করবো এবং নানা দিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে

দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয় থাকবে শুধু ইঙ্গিত— শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানি নে তবে উপন্যাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি। কিন্তু তোমার অভিমত চাই-ই।

দ্বিতীয়— ও-আশ্রমে যাবার পরে থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা আমি বড় আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে আসচি যে ওখানে থেকে তোমার পড়া-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসারী তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য, কেন না তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যেমন বিনয়ী তেমনি শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তার লাঠি দিয়ে তুমি কাউকে প্রতিঘাত করো না। এই দিক থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা ক'রে দেখি ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুসি হই যে মণ্টু আমার দলে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীরবে সহ্য করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু মুখ ভেঙচে মানুষকে অপমান করতে আক্রমণ করতে ছোটে না। তার আর ভয় নেই, আর তার বন্ধুজনের চিন্তার কারণ নেই— এখন থেকে চিরদিন তার সত্যকার ভদ্রতা তাকে নীচে নামা থেকে রক্ষা ক'রে যাবে। মণ্টু, তাদের আমি বড় ভয় করি যারা নিজেরা সাহিত্য-সেবী হয়েও তার আপনজনদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ক'রে বেড়ায়। এই কথাটা তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত করলেই নিজের বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়ে যায় না। তার জন্যে আরও কিছু চাই। সেটা অতো সোজা রাস্তা নয়।

সেদিন 'পুষ্পপাত্র' মাসিক কাগজে তোমার লেখা পড়লাম।[১] তাতে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তুমি ক্ষুব্ধ-মনে বুদ্ধদেব বসুর নারী-বিদ্বেষের প্রতিবাদ করেছো, কারণ অনুসন্ধান করেছো। তাকে তুমি ভালোবাসো, তোমার ভালোবাসায় পাছে ঘা লাগে এর জন্যে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা এবং সঙ্কোচ আছে, তবু মনে হয় কতকটা ভিতরের কথা তোমার জানা দরকার। কে নাকি লিখেচেন, সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে স্রষ্টা থাকে সে ছোট হ'লে সৃষ্টিটাও তার বড় হ'তে বড় ব্যাঘাত পায়। এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। বুদ্ধদেব বসু লিখেচে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম।[২] কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না— সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন।[৩] পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জুন উত্তরাকে যখন নাচ গান শেখাতেন[৪] তখন তাঁর কথা শুনে এ-কথা বলা চলে না যে এ-রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচ গান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যার কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না হ'তেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা একটাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না। তুমি যে সুশীলা মিষ্টভাষিণী বাইজির উল্লেখ করেচো[৫] সে কি সবাই দেখতে পায়? তার অনেক উপকরণ, অনেক আয়োজন না হলে হয় না। হয় নিজের অনেক টাকা কিম্বা কোন রাজপুত্র-বন্ধুর বহু

টাকা খরচ না হ'লে উপরের স্তরে প্রবেশাধিকার মেলে না। শুধু রাস্তা থেকে যারা লোক ধ'রে নিয়ে খোলার ঘরে গিয়ে ঢোকে তাদের পরিচয় মেলে। গরীবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও শ্রীকান্তর টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে। এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়েলিজম ভাবে তাদের আইডিয়েলিজম ত নেই-ই রিয়েলিজমও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ... আমার অন্তরের স্নেহ ও শুভাকাঙক্ষা জেনো। সাহানাকে[৬], দেখা হ'লে বোলো তাকে আমি আশীর্বাদ করেছি।—

শরৎবাবু।

১৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
হাওড়া
১০ই ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু তোমার চিঠি পেলাম। ইতিপূর্বেই তোমার প্রেরিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ ; বোধ হয় অনেকখানি কাট ছাঁট করা আবশ্যক কিন্তু বার দুই অত্যন্ত যত্ন ক'রে পড়ার পরে আমার সন্দেহ নেই যে এ লেখার কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। আমার বইয়ের উপর লিখেছ ব'লেই আমার এত বেশি ভালো লেগেছে কি না এ-কথা আমার অনেক বার মনে হয়েছে, কিন্তু অনেক ভেবেও বলতে সঙ্কোচ নেই যে, এ আলোচনা তুমি যে-কোন বইয়ের সম্বন্ধেই করতে আমার এমনিই ভালো লাগতো। তার কারণ মুখ্যতঃ শ্রীকান্তর কথাই আছে সত্যি, কিন্তু সাহিত্য বিচারের যে ধারাটি তুমি এমন মধুর ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ তা শুধু যে সুন্দর হয়েছে তাই নয়, নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে ব'লে যে-কোন দরদী পাঠকই স্বীকার করবে। তাছাড়া সমালোচনা কথোপকথনের ছলে,— এটি চমৎকার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছো মণ্টু। এ রকম ধরণে না লিখলে এত বড় প্রবন্ধ যত ভালোই হোক লোকের পড়বার হয়ত ধৈর্য থাকতো না। যেন একটি সুন্দর গল্পের মতো পড়তে লাগে। এটা কোন একটা ভালো মাসিকপত্রে ছাপতে দেবো এবং অনুরোধ করবো এ লেখার কোথাও যেন বাদ না পড়ে। কিন্তু তোমাকে প্রুফ পাঠানো সম্ভবপর হবে কি না এখন ঠিক বলতে পারলুম না,— যদি সময় থাকে তাই হবে।

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুসি হয়েছি বলতে পরি নে,— কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার মত একটি পাঠকও শ্রীকান্তর ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাই নে। অন্ততঃ না হ'লেও দুঃখ নেই। আর মনে মনে ভেবেছিলাম কত বিভিন্ন ভাষার কত বই না তুমি এই কটা বছরে পড়েচো। তবু তার মাঝে আমাদের মতো

মূর্খ মানুষের লেখা পড়বার যে তুমি সময় পাও এ কি কম আশ্চর্য [ ] আশ্চর্য! জানি ত আমি কত তুচ্ছ কত সামান্য লেখক। না আছে বিদ্যে না আছে পড়াশুনা, পাড়াগাঁয়ের লোক যা মনে আসে লিখে যাই। তাই, আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ করে সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য। কিন্তু এর মাঝে পাই যখন তোমার মত বন্ধুর প্রশংসাবাক্য, তখন এই কথা [ ] কথাটা গর্বের সঙ্গে মনে করি, পাণ্ডিত্যে মণ্টু এদের ছোট নয়, অথচ তার ভালো লেগেছে। এই আমার মস্ত ভরসা, মস্ত সান্ত্বনা।

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়, পণ্ডিচারীতে যদি পূজোর সময়ে যাই দু-এক দিন থাকার ব্যবস্থা কি তুমি ক'রে দিতে পারো? আশ্রমে থাকার নিয়ম নেই জানি কিন্তু ওখানে কি কোন হোটেল নেই? যদি থাকে লিখে জানিও। ইতি—

তোমার নিত্যশুভানুধ্যায়ী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
হাওড়া
১৯শে মাঘ, ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, অনেক দিন হ'ল তোমাকে কিছু লিখি নি। হঠাৎ আজ সকালে কেন যে লেখার ইচ্ছে এত প্রবল হয়ে উঠলো তাই ভাবচি। বোধ হয় ফরিদপুরের সেই দীনেশবাবুর আন্তরিক কথাগুলো। দিন তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে ফিরেচি, সেখানে ছিল সাহিত্য সম্মিলনী এবং মিউনিসিপ্যাল-অ্যাড্রেস[১]। মঞ্চের উপরে যখন সুদীর্ঘ ও 'সারগর্ভ' প্রবন্ধ পড়া চলছিল, তখন নেপথ্যে চলছিল অনামীর সমালোচনা। অবশ্য বিরুদ্ধ অভিমতই ৮০%। তার মধ্যে হঠাৎ একটি ভদ্রলোক স্বীকার ক'রে বসলেন যে তিনি অনামী বইখানি আদ্যোপান্ত ৪ বার পড়েছেন এবং আরও চার বার পড়বার ইচ্ছে রাখেন।

তখন, 'বলেন কি দীনেশবাবু, আপনি যে ফরিদপুর বারের বিশিষ্ট রত্ন, প্রচণ্ড তার্কিক উকিল— এ আপনার কি (কী) দুর্বলতা!'

'দীনেশবাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'দীনেশবাবু আপনি যে দেখি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আমি চুপ করেই ছিলাম— নীরব সাক্ষীর মতো। এক সময়ে এই দীনেশবাবু আমাকে একলা পেয়ে বললেন, 'শরৎবাবু, সব বই পৃথিবীর সকলের জন্যে নয়। আমি শান্তদাস বাবাজীর শিষ্য,— বৈষ্ণব। ভগবান বিশ্বাস করি। দিলীপবাবু যে-ভাবের প্রেরণায় কবিতাগুলি লিখেছেন সংসারে তার তুলনা কম। যখনি সময় পাই মুগ্ধ হয়ে কবিতাগুলি পড়ি, কি যে ভালো লাগে পরকে বোঝাতে পারি নে।'

শুনে মনে মনে ভাবলাম মণ্টু, এর চেয়ে অকপট সত্যিকার সমালোচনা কি আছে? যে-তারে তুমি ঝঙ্কার দিয়েছ তাঁর বুকের মধ্যেকার অনুরূপ তারটি গুণগুণিয়ে বেজে উঠেছে। কিন্তু যাদের বাজলো না তারা কারো চার-চার বার পড়বার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করবে না তো করবে কি (কী!)। আর যারা শুধু বিস্ময় প্রকাশকরাটাকেই যথেষ্ট মনে করে না তারা সুরু করে গালিগালাজ। মাত্রা যতই ছাড়িয়ে চলে ততই ভাবে নিজেদের নির্ভীক ও বাহাদুর সমালোচক। এমনিই ত দেখে আসচি।

সেদিন হীরেন[১] ব'লে একটি ছেলে আমাকে চিঠি লিখেচে সে অনামীর একটা আলোচনা-সভা করতে চায় এবং আমাকে করতে চায় তার সভাপতি। আমি সেই চিঠিখানা পাবার দেড় মিনিটের মধ্যে জবাব দিলাম— রাজি। মনস্থির করা এবং দেড় মিনিটে জবাব দেওয়া। আমি বলি দীনেশবাবুর চার-চার বার অনামী পড়ার চেয়েও এ বস্তু বিস্ময়কর। আগামী সভায় এই কথাটির উল্লেখ করবো।

কিছু দিন থেকে মনে করচি তোমাকে একটা অনুরোধ করবো। সে আশালতার লেখার সম্বন্ধে। তোমাকে সে শ্রদ্ধা করে তুমি বললে শুনতেও পারে। তাকে ব'লো তার লেখায় একটু সংযত হ'তে। অবশ্য সংযম জিনিসটা হচ্চে এক প্রকারের ইন্‌স্টিংক্‌ট। ও নিজের না থাকলে পরে বুঝিয়ে দিতে পারে না। তবু ব'লো যে, এই যে অস্থানে অকারণে পরের লেখার কোটেশন এর চেয়ে অসুন্দর জিনিস আর নেই। অমুক বড় গ্রন্থকারের '—' এই কথাগুলোর সঙ্গে আমার সায় আছে, ও লোকটার '—' এই কথাগুলোর সঙ্গে আমার সায় আছে, ও লোকটার '—' এই লাইন কটা বিশ্রী, অমুক লেখক '—' এই ছত্রটা কি সুন্দর প্রকাশ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব যেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে পাঠককে বলতে চায় 'তোমরা দ্যাখো আমার এইটুকু বয়সে আমি কত বুঝেছি, কত বই পড়েচি।' মণ্টু, তোমার নিজের লেখার কোটেশনগুলো ওকে একবার মন দিয়ে পড়তে বোলো। বোলো তোমার বহুবিস্তৃত ও গভীর পড়াশুনার মধ্যে এগুলো এসে পড়েছে নিছক প্রয়োজনে। অহেতুক আসে নি, আসে নি পাণ্ডিত্য প্রকাশের দাম্ভিকতায়। আশা ছেলেমানুয এখন থেকে ওকে এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিলে ফল ভালোই হবে মনে করি। ও হয়ত জানে না যে কোটেশন ব্যাপারে তোমাকে অনুকরণ করতে পারাটা খুব সোজা কাজ নয়। ওটা খুবই কঠিন। অন্যান্য সহস্রবিধ অসংযমের কথা আর তুলবো না কারণ ওর সাহিত্যিক হিরো যদি হয়ে থাকে বুদ্ধদেব বসু তাহ'লে ওকে সামলানো যাবে না। গভীর বেদনার সঙ্গেই এই কথাগুলো বললাম।[৩] তোমাকে কতবার বলেচি মণ্টু, লেখায় সংযম সাধনার মতো শক্ত সাধনা আর নেই। যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা না-লেখা। রসজ্ঞ পাঠকের মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যখনি সে দেখতে পায় এই সংযমের চিহ্নটুকু। যাক্।

সেই যে চিঠিটা আমার স্বদেশ ও প্রচারকে বেরিয়েছিল[৪] তার সম্বন্ধে কবি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন।[৫] তার শেষের দিকে ছিল 'তুমি বার বার আমাকে তীক্ষ্ণ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করছো কিন্তু আমি কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার নিন্দে ক'রে প্রতিশোধ নিই নি। এ লেখা সেই ফর্দে আর এক সংখ্যা যোগ করলে মাত্র।'

সেদিন উমাপ্রসাদ আমাকে বলছিলেন এ চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেচি, কারণ, এর প্রতি ছত্রে বিষ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কি করবো নাচার। যা লিখে ফেলেচি সে তো আর ফেরাতে পারবো না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি

যে চিঠিটা 'স্বদেশে' লিখেচো সেটি ভারি চমৎকার হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ক্রোধ নয়। আমার ত্রুটি ঘটেছে ঐখানে। কিন্তু কি যে হলো, 'পরিচয়ে'র ঐ লেখাটা পড়ামাত্রই সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল, তখনি কাগজ কলম নিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললাম।

তোমার শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের সমালোচনা 'বিচিত্রা'য় আর একবার পড়লাম। এ যদি শ্রীকান্ত না হয়ে আর কিছু হ'তো মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বাঁচতাম। লেখাটি সত্যিই চমৎকার। যে সত্যিই পড়েছে এবং বুঝেছে তার আনন্দ প্রকাশ।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখো মণ্টু, জবাব পাও বা না পাও। এ আমার ভারি তৃপ্তি—তোমার লেখা চিঠি পাওয়া। আর একটা কথা। বন্ধু সুরেন মৈত্র (যার মাথা জোড়া টাক। প্রফেসর, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ আমরা যেতাম) তিনি শ্রীঅরবিন্দের গভীর ভক্ত। আমাকে অনুরোধ করেছেন অদ্যাবধি তুমি আমাকে তাঁর সম্বন্ধে যত লেখা পাঠিয়েছো (এবং বলা সত্ত্বেও যা আমি কোনো কালে ফেরৎ দিই নি) সেইগুলি একবার পড়তে দিতে। আমি বলেচি দেবো। কিন্তু রাগ ক'রো না যেন। সুরেন ব্রাহ্ম হ'লেও লোক ভাল। ইতি—

তোমার নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া
২০শে মাঘ, ১৩৪০

মণ্টু, এইমাত্র তোমার রেজেষ্ট্রী চিঠি পেলাম। কাজের কথাগুলো আগে ব'লে নিই। (১) রঙের পরশ পাঠিও। দু-এক পাতায় যা পারি লিখবো। কিন্তু ব'লে রাখি গল্প উপন্যাস ছাড়া আমি ত আর কিছুই লিখতে পারি নে। প্রবন্ধ ত ভাষার দৈন্যে একেবারে অপাঠ্য হয়ে ওঠে। আমার চিঠি লেখার ভাষাও ত দেখেচ। কবির সম্বন্ধে 'স্বদেশে'র চিঠিটাই কি বিশ্রীই হয়ে গেছে। তবু আমার শাদা-মাটা গেঁও ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করা শক্ত। সুতরাং লিখবই, আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(২) হীরেনের কথা ও-চিঠিটায় দিয়েছি। অনামীর আলোচনা-সভায় যোগ দেবো।

(৩) শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের ('বিচিত্রা'য় প্রকাশিত) আলোচনাটুকু যেভাবেই ছাপাও লোকে পড়বেই। তবে রঙের পরশের সঙ্গে দিলে হয়ত ভালোই হবে। বরঞ্চ আর কারও মত নিও।

একটা কথা। পথের দাবীর আলোচনা বা উল্লেখ না করাই ভালো, কারণ, আইন কানুন বর্তমানে এত কঠোর হয়েছে যে শুধু ওরই জন্যে হয়ত গবর্ণমেণ্ট, সমস্ত বইটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

যে উপন্যাসখানি তুমি লিখেচো (যা ৩।৪ মাসে শেষ হবে) সেখানি আরও ভালো হবে আমিও আশা করি। কথোপকথন (ডায়ালগ) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরো। তর্ক-বিতর্ক যেন ছোট হয় অর্থাৎ, একসঙ্গে অনেকখানি নয়। এক অধ্যায়ে একটু পরের অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু— এমনি। উপমা উদাহরণ— কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও

অসম্বদ্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে শো-কেস সাজানোর রুচি এক নয়। এ-কথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য-ভার যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে। কিন্তু আর না। বিস্তর অ্যাডভাইস বিনা-মূল্যে দিয়ে ফেলেছি। সংযমের পাঠ দিতে নিজেই দেখছি অসংযত হয়ে পড়েচি সব চেয়ে বেশি। আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা জেনো।

১৬

কলিকাতা। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

পরম কল্যাণীয়েষু, নিজের খবরটা আগে দিই। পরশু বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত মাথা ধ'রে আছে। বুদ্ধদেব ভটচার্য বসে, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি বসে— ফোন করা হচ্চে একটা ডাক্তারখানায়। এবং আমার ড্রাইভারকে বলা হচ্চে মোটর বার করার জন্যে। অর্থাৎ যাবো রক্তের চাপ দেখাতে। যদি চাপ বেশি না থাকে ভালই, থাক্‌লে শয্যাগ্রহণ ক'রে পরমানন্দে দিন কাটাবো। আমার পক্ষে এত বড় আনন্দ এবং আরামের বস্তু আর নেই। শ্রীভগবান তাই করুন। যাক্!

তোমার চিঠিগুলো বুদ্ধদেবের মারফতে অর্দ্ধেক পড়লুম। বাকি অর্দ্ধেকটা কোন ফরাসি-জানা বন্ধুর মারফতে পড়ে নেবো।

মণ্টু, এই অতি তুচ্ছ 'নিষ্কৃতি' নিয়ে সমরাঙ্গনে নেমে পড়া আর টিনের খাঁড়া নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক কথা। নিজের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাই নে। শুধু একটা কথা এই মনে করি যে তোমার গুরুদেবের আশীর্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই!

তুমি শ্রীকান্ত[২] তর্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি হয় ত তোমাকে দিয়েই হবে। ভবানীকে[৩] ডেকে ৪র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম এর যে কোন একটা অধ্যায় তর্জমা ক'রে নিয়ে এসো। আট দশ দিন পরে সে নিজে ত এলেই না, চিঠিতে জানালে তার সাহস হয় না। এবং যে ইংরিজি চিঠিটুকু পাঠালে তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় ব'লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ'লে খবরের কাগজের ভাষা হবে।

সোমনাথ মৈত্র[৪] যে সেকেণ্ড পার্ট ট্রানশ্লেশন করতে উদ্যত হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানি নে। 'বিচিত্রা'র উপেন নিজে যদি এ ব্যবস্থা করে থাকে ত সে আলাদা। খবর নোবো। আমি ত খুঁজেই পাচ্ছি নে কে এ কাজে হাত দিতে পারে তুমি ছাড়া। 'নিষ্কৃতি'র যে-তর্জমা তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে করতো? তবে, তোমাকে শ্রীকান্ত তর্জমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না, কারণ এত বড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি হবে।

'নিষ্কৃতি'র সম্বন্ধে তোমার যে-রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় কোরো। ছোট গল্পগুলোর তর্জমা এখানে করাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাই নে। আমার নিজের কাছেই রয়েছে 'পণ্ডিত মশায়ে'র তর্জমা কিন্তু সে দেখলেও তোমার হয়ত দুঃখ হবে। মায়ার সঙ্গে আমার এখানো দেখা হয় নি, আশা করি দু-এক দিনেই হবে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জোনো।

ইতি— শরৎদা

পুঃ— অন্যান্য খবর বুদ্ধদেবই তোমাকে দেবে। — শ. চ

১৭

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কলিকাতা
৩রা মাঘ ১৩৪১

পরম কল্যাণীয় মণ্টু, কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা ক'রে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—

(১) তোমার ও নিশিকান্ত'র ছবি বেশ উঠেছে। বহুকালের পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হলো। একবার সতিকার দেখা ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেচি এ জীবনে আর হলো না। না-ই হোক।

(২) টাইপরাইটারটা যে ভালো ভাবে পৌঁছেছে এ বড় তৃপ্তি। ভয় ছিল পাছে সেটা বিকলা! হয়ে তোমার আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন হীরেন এসে বল্‌লে মণ্টুদার নিজের টাইপরাইটারটা গেছে পুরনো হয়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার। বল্‌লুম একটু খেটেখুটে তাঁকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন। সে রাজি হলো, এ-সব সে-ই করেছে— আমি জড়বস্তু, কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ ক'টা টাকার চেক্ লিখে দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া ত দেওয়া নয়— পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

(৩) শ্রীঅরবিন্দর হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

(৪) 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো ব'লেই নয়, যারা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদেব স্বভাব। এ না করে তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানি নে। অন্ততঃ না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দর আশীর্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি!

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে আমি নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর সপ্রমাণ করার লোক

বিরল নয়, এ চেষ্টা তাদের আছে এবং অধ্যবসায়ও অপরিসীম। তা হোক্,— তাদের সমবেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলই। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে আর সার্থক হবে না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হ'তেই পারে না মণ্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইনট্রোডিউস ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করি নে।[২] আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ সাধলো,— আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।

(৮) হীরেন হয়ত আজকালের মধ্যেই আসবে। তাকে তোমার কাগজ পাঠিয়ে দিতে বলবো।

(৯) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর কি বলবো! চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হলো না, সে আমার অক্ষমতার জন্যে অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। এ বিশ্বাস ক'রো।

(১০) শ্রীঅরবিন্দের নববর্ষের প্রার্থনা সত্যিই বড় চমৎকার লাগলো সত্যিই খুব বড় কবি তিনি।

— শুভার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮

পি, ৫৬৬, মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই চৈত্র ১৩৪১

পরম কল্যাণবরেষু,

মণ্টু, অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয় নি। অন্যায় হয়েছে জানি, এর দণ্ড আছে তাও অবিদিত নই, কিন্তু এ-ও দেখে আসচি অক্ষম লোকদের অক্ষমতা যদি অকৃত্রিম হয় তাহ'লে সেটা পূরণ করবার মানুষও ভগবান জোগান। একেবারে রসাতলে পাঠান না। এই মানুষটি পেয়েছি আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যতে। আমার যতকিছু তোমাকে জানাবার সব জানাতে পাই আমি তার মারফতে। আবার খবরও পাই তার হাত থেকে। তোমার মতো ওরও স্নেহটা আমার প্রতি যথার্থ আন্তরিক। যথার্থই ও চায় আমার ভালো হোক,— আমার যশ আমার প্রতিষ্ঠার কোথাও যেন-না কম্‌তি থেকে যায়। সেদিন ও জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে হফ্‌ম্যানদের ক্যামেরার সামনে বসিয়ে ছবি তুলিয়ে তবে ছাড়লে। বললে দিলীপকুমারের ফরমাস আমি অবহেলা করতে পারবো না। তিঁনি যে পরিশ্রম স্বীকার করছেন আমাদের কিছুটা তাঁকে সাহায্য করা চাই। অর্থাৎ মেহন্নতের ভাগ নেওয়া দরকার। সমস্তই কি তিনি একাই করবেন? বুদ্ধদেবের বিশ্বাস আমি খুব বড় লেখক। অতএব, বড় লেখকের সম্মান আমার পাওয়াই চাই। আমি অনেক বলি যে না হে আমি অত্যন্ত ছোট লেখক, য়ুরোপ আমাকে কোন সম্মানই দেবে না।

তাই নিজের মধ্যে কোন ভরসাই পাই নে। ও বলে দিলীপবাবু তাহ'লে কখনো এত মিথ্যা শ্রম, অর্থাৎ কি না বাজে কাজ করতেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে নিশ্চয়ই আশা দিয়েছেন। আমি বলি তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দই জানেন।

সেদিন বশিষ্ঠ না বশীশ্বর সেনের[১] আমেরিকান স্ত্রী আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তোমার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ দেখবেন ব'লে। খবর পেয়েছেন তাতে শ্রীঅরবিন্দের কলমের দাগ পড়েছে, তাই প্রবল আগ্রহ। বলেন এর একটা কপি তিনি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমেরিকা নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে ছিলেন এশিয়া কাগজের[১] এডিটর, সেখানকার বহু পাব্‌লিশারের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি ভাবি এটা নিষ্কৃতি না হয়ে শ্রীকান্ত হ'লেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে নিষ্কৃতি আদর পাবে কিসের জোরে! সে যাই হোক, একটা কপি আমাকে তুমি পাঠাও মণ্টু। অন্ততঃ আমি নিজে দেখি কি রকম পড়তে হলো। বুদ্ধদেবও হয়ত এত দিনে এ-কথা তোমাকে জানিয়েছে। তুমি যা-যা জিনিসপত্র পাঠাতে বলেছিলে তাকে পাঠাতে বলেচি। খুব সম্ভব এত দিনে তোমার কাছে পৌঁচেছে। নিষ্কৃতির ফরাসী অনুবাদের কল্পনাও তোমার আছে দেখতে পেলাম এবং চেষ্টা চরিত্রও করচো দেখচি। আমার নিজের বিশ্বাস নেই, শুধু ভাবি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদে অঘটনও ঘটতে পারে। জগতে এ-ও হয়ত হয়।

তুমি ফকির মানুষ তবু আমার জন্যে অনেক কিছু তোমার খরচ হচ্ছে। এটুকু আমি পাঠিয়ে দেবো বুদ্ধদেব এবার আমার কাছে এলেই। এই বুদ্ধদেব ছেলেটি ভারি পণ্ডিত। সংস্কৃত এবং বোটানিতে চমৎকার জ্ঞান। কলেজে ও এই দুটোই পড়ায়।

মণ্টু, এবার শ্রীকান্ত ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।

সাহানা ও তোমার গানের বই পেয়েছি এবং সযত্নে আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি। সাহানাকে আমার আশীর্বাদ জানিও।

আমি চিঠির জবাব দিতে যতই কুঁড়েমি করি নে কেন যেন ভ্রমেও তার শোধ নিও না। সাত-আট দিন পরে আবার দেশের বাড়িতে সকলে যাচ্চি। যদিও যখন যাওয়া হবে তোমাকে ঠিকানা জানাবো। ইতিমধ্যে নিষ্কৃতির তর্জমার একটা কপি কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

আশা করি সকলে কুশলে আছো। আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ রইল।

ইতি— শরৎদা।

১৯

কল্যাণীয়েষু মণ্টু,

আজ তোমার পোষ্টকার্ড ও 'বহুবল্লভে'র ফর্মার পুলিন্দা পেলাম। তুমি হয়ত জানো না যে আমি ৮।৯ মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের বাড়ি থেকে এখানে আসবার পথে সান-স্ট্রোক-এর মতো হয়, সেই পর্যন্ত চোখের ও মাথার ব্যথায় কত যে পীড়িত সে আর বলবো কি। আজও সারে নি, বাকি দিন কটায় সারবে কি না তাও জানি নে। তার ওপর আছে অর্শের অজস্র রক্তস্রাব (বহু পুরাতন ব্যাধি)

এবং মাসখানেক থেকে সুরু হয়েছে মাঝে-মাঝে জ্বর। তোমাকে চিঠি লিখচি জ্বরের উপরেই। দেশের বাড়িতেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে কলকাতায় আসি। লেখা কিম্বা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ জীবনের মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে ত অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেছি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাবো কেন? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী— এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।

একদিন বুদ্ধদেব ভটচার্য এসে বলেছিল মণ্টুবাবুর 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হই নি। আমি মনে মনে জানি মণ্টুর উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রয়েছে আর্টিষ্ট হৃদয়। যেমন বৃহৎ তেমনি ভদ্র তেমনি পরদুঃখকাতর। তোমার রসজ্ঞ মনের পরিচয় ছেলেবেলাতেই তোমার সংগীতে, তোমার গুণিজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার নানা কাজে আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম। কোনো বাইরের ঘাত প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে শুভকামনা বহুদিন পূর্বে করেছিলাম আজ তা সফল হ'তে চল্‌লো এ আমার বড় আনন্দ। আবার আশীর্বাদ করি জীবনে তুমি সুখী হও, সার্থক হও।

বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখি নি। বুদ্ধদেব বসু যদি ব'লে থাকেন আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য,— পরম সত্য।

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বল্‌তেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করচি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনি ধারা মন নিযেই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোন কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

বাড়িগুলো তোমার বিক্রী ক'রে দিচ্চো? কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন আছে? এ-দেশের সকল সম্বন্ধ তুমি ছিন্ন ক'রে ফেলচো ভাবলে বড় ক্লেশ বোধ হয়।

আমার চিঠি-লেখা চিরকালই এলো-মেলো হয়, বিশেষতঃ এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ভাল যদি একটু বোধ করি তোমার দুখানা বইই মন দিয়ে পড়্‌বো। ইতি— ৩রা মাঘ, ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চল্লিশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

মান্যবরেষু,

আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বটে, কিন্তু পরিচয় একটা ত আছেই। এবার যখন ভবানীপুরের দিকে যাইব আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিব।

এই চিঠিটা যদি একটা দিনও আগে পাইতাম ত আমার একটু উপকার হইত। যে প্রবন্ধটা[১] বঙ্গবাণীতে পাঠাইয়া দিয়াছি তাহার অল্প স্বল্প বদলাইয়া দিতাম।

আপনার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব যে কিছুদিন হইতে জমা হইয়া উঠিতেছিল তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কবি যে এম্‌নি ধারা কিছু একটা লিখিয়া বসিবেন তাহা ভাবি নাই।

আমি আপনাকে 'আশ্রয়' দিব[২] কি রকম? আমার শক্তি কতটুকু? তাছাড়া আমি বিশেষ কিছু লেখাপড়া করি নাই। মূর্খ বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না,— অতি বিনয়ও[৩] হয় না। আপনার কাহারও আশ্রয়ের প্রয়োজনই নাই। আপনি যেমন দ্রুত লিখিতে পারেন, তেমনি গুছাইয়া লিখিতে পারেন,— এ আপনার পেশা— আপনাকে পরাজয় মানিতে হইবে না। দিন কতক পরে এই সব আক্রমণ, এই সব ছোট ছোট তীর কোথায় যে থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে?

আপনার অনেক লেখাই আমি পড়িয়াছি। অবশ্য মাসিকের পাতায়। অনেক জায়গায় আপনার লেখার সহিত আমার মতে অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সাহিত্যের ধর্ম বা সত্যকার প্রিন্‌সিপল্ লইয়া নয়। দেশ ও কালের উপযোগিতা লইয়াই। কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপার। এবং আমার মতই যে অভ্রান্ত এ কথা বলিবার দুঃসাহসও আমার নাই, ভাবিবার স্পর্দ্ধাও নাই। আপনার গোড়ার দিকের দুই একটা বই কিছু কঠিন হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা। কিন্তু তাহার পরের গ্রন্থগুলায় সে দোষও দেওয়া চলে না। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যের রুচিকে আপনি বিকৃত করিতেছেন এ অভিযোগ যেমন অসঙ্গত তেমনি অন্যায়; মত বিভেদও থাকে রুচিভেদও থাকে কিন্তু তাই বলিয়া আপনার সাহিত্যিক শুভবুদ্ধি ও সততার প্রতি এই ধরণের অপরাধ চাপানোর চেষ্টার মত অপরাধ অল্পই আছে।

এ বিপদ একদিন আমারও যথেষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কি? ভরসার কথা এই যে এ সকলের স্থায়িত্ব নাই।

আপনার সহিত একদিন আমি শীঘ্রই দেখা করিব। তখন অন্যান্য কথা হইবে। আমাকে বই পাঠাইবেন না, আমি আপনিই সংগ্রহ করিয়া লইব। আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি— ২৯শে ভাদ্র ১৩৩৪

বিনীত

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফরওয়ার্ডে আপনার চিঠি (রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে)[৪] পড়িয়াছি। অমল হোমের জবাবও পড়িয়াছি। এ যে কি জবাব এবং কি লেখা সে আর বলিব না, কিন্তু আপনারও ও চিঠি না লিখিলেই হইত। একটা কথা মনে রাখিবেন লজ্জিত মানুষকে লজ্জা দিতে নাই।

‘আত্মশক্তি’ পত্রিকায় সম্পাদককে লেখা

১

রস-সেবায়েৎ

শ্রীযুক্ত ‘আত্মশক্তি’-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার ৩০শে ভাদ্রের আত্মশক্তি কাগজে মুসাফির লিখিত ‘সাহিত্যের মামলা’[১] পড়িলাম। একদিন বাংলা সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতির আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের রসের আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এম্‌নিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্তে ‘সেবায়তের’ সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়। এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য কর্মে যাঁহারা নিযুক্ত আমিও তাঁহাদের একজন। ‘শনিবারের চিঠি’র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।[২]

মুসাফির-রচিত এই ‘সাহিত্যের মামলা’র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র ‘কল্লোল’ ‘কালি-কলম’ বা বাঙলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না পড়িয়াও সব বুঝি এ দাবী আমি করি না।

এ তো গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহাব মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাখ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি যুক্তি। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস ! ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের ‘বিচিত্রা’য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় ‘সীমানা বিচারে’র রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব। যেমন গভীবতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত।[৩] বাপ রে বাপ ! মানুষে এত পড়েই বা কখন, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া !

ইহার পার্শ্বে ‘লাল শালু মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্মিত ক্রীড়া গাণ্ডীব-ধারী’ নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্য সমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিং বাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁর নাম রাম-নবসিং বাবু। আরও বড় অ্যাক্টর ! যেমন দরাজ গলার হুঙ্কার তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্ত হস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিং বাবুর দাপটে আমাদের শুধু নরসিং বাবু একেবারে তৃতীয়ার

শশি-কলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি মুক্ত-হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু ! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেমনি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এমনি সতর্কতা। যেন বেড়া-জালে ঘেরিয়া রুই-কাত্‌লা হইতে শামুক-গুগ্‌লি পর্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধ-পরিকর।

হায় রে বিচার ! হায় রে সাহিত্যের রস ! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম্?

এই কিম্ টুকুই কিন্তু ঢের বেশি চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইঁহাদের ভাব বিনিময় ও প্রীতি সম্ভাষণ বুঝা যায়, কিন্তু এই সকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিরের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয় তখন তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য থামাইবে কে?

একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, 'এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত,' সেইরূপ অর্থোপার্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থ-রচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।'

এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্ব দেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভবাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি চড়া না চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এত বড় কটুক্তি [ ] কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র সমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্বতা [ ] পরিপক্কতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসের' বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।

২

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু[১]—

শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র পড়িলাম। মানুষে অত্যন্ত রাগিলে মুখ দিয়া যেমন কতক কথা বাহির হয় এবং কতক হয় না, এ চিঠিখানির রচনাও সেইরূপ। তবে এটুকু বোঝা গেল যে, হাজরা মহাশয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

প্রবাসী কাগজে তিনি রস ও রুচির প্রসঙ্গে দরিদ্র নবীন সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে।' এ কথার অর্থ আমি এই বুঝিয়া ছিলাম যে, ইহারা পেটের জ্বালায় সাহিত্য সেবার নামে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এবং পাছে কাহারও তাৎপর্য বুঝিতে ব্যাঘাত ঘটে, এই জন্য তিনি উপমা দিয়াছিলেন, যেমন আজকাল রাজনীতির চর্চায় বেকার ব্যক্তি সতত নিরত— ইত্যাদি।

ব্রজদুর্লভবাবু রিটায়ার্ড ডেপুটি— ভাগ্যবান লোক। হয়ত উপহাস করাই তাঁহার সহজ। এবং এ কথা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন যে এই বেকারের দল যখন সত্য সত্যই রাজনীতিতে হাত দেয়, তখন তাহার চেয়ে বড় রাজনীতির চর্চা আর নাই।

বেকার রাজনীতি চর্চাকারীই হোক্ বা হাঁড়ি-না-চড়া সাহিত্যিকই হোক্, কাহারও দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করা আমার কাছে সুরুচি সঙ্গত মনে হয় নাই, এবং বলিয়াছিলাম তাহাই। কেবল ভুলিয়াছিলাম যে লোকের রুচি এক নয়।

ব্রজদুর্লভবাবুর মতে তিক্তরসে পিত্তনাশ হয়। বেশ, তিনি তাহাই করিতে থাকুন, আমার বলিবার আর কিছুই নাই। শুধু ভাবি এই ব্যক্তি পেন্সন না লইয়া চাকরিতে নিযুক্ত থাকিলেই যে ছিল ভালো। ইতি— ২৪শে কার্তিক ১৩৩৪।

বিনীত

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্র দেবকে লেখা

১

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

নরেন, কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌঁছেছে। কাল রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির করে রেখেচি, যদি না আজ যাঁরা উলুবেড়েয় মামলা[১] করতে গেছেন, তাঁরা এসে তাঁদের কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিতে বারোটা বাজান।

দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ তোমার ওখানেই যাব। রাস্তাটা একটু শুখুক, পাল্‌কি যেন চলতে পারে।

এই বইটার সম্বন্ধে যা আমার সত্যিকার অভিমত তাই নিয়ে একটু আলোচনা করব ইচ্ছা আছে, তবে সে মতামতের মুল্য আজকালকার দিনে তোমরা কি দিতে পারবে? আমি তো প্রায় সাহিত্যিক দরবারে বাতিল হয়ে যাবার মতো হয়ে পড়েচি. লিখতে তো পারিই নে, লেখাও খারাপ হয়ে গেছে, নিজেও বুঝতে পারচি। তবে তোমরা এখনো ভালবাসো এই যা সম্বল। বুড়ো বয়সে সব শক্তিই ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এ অস্বাভাবিকও নয়, পরিতাপের বস্তুও নয়। আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। আজ রাধু[২]কেও একখানা চিঠি লিখলাম। সে আমার ওপর ভারি রাগ করে আছে, এবার যেদিন তোমাদের বাড়ি যাবো তার সঙ্গে দেখা করে আসবো। নইলে সে হয়ত রেগেই থাকবে, অভিমান পড়বে না।

ইতি—২রা কার্তিক ৩৬। বড়দা

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

নরেন, তোমার চিঠি এবং 'লালু'র[১] প্রুফ পেয়েছি। প্রুফের উপরে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানানের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদক কর্তৃক সংশোধিত।

কয়েকটা বানান সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে— সে বানান আমি নিতে পারবো না। যাই হোক সোমবারে যাচ্চি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। সাক্ষাতে আলোচনা হবে। শরৎ

একদিন একটা গল্প লিখেচি। লালুর নয়— নিজের,[২] কিন্তু মোটেই ভাল হ'ল না। নইলে তোমার পাঠশালার জন্য দিতে পারতাম।

রাধু একটু ভালো আছে শুনে খুসি হলাম। তাকে আমার আশীর্বাদ দিও।

ইতি— ১১ই ভাদ্র ১৩৪৪ শরৎদা

রাধারাণী দেবীকে লেখা

১

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম, এর আগের চিঠির জবাব দিইনি—হবেও বা। এ বয়সে সব কথা মনে রাখাই কি সম্ভব? তা ছাড়া জানোই ত আমার কুঁড়েমির সীমা নেই। দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপরে সমস্ত ভুলে যাই। কিছু মনে কোরো না ভাই। যে ক'টা দিন আরও বেঁচে আছি, জবাব পাও বা না পাও মাঝে মাঝে সময় পেলে নিজের খবরটা দিয়ো।

শ্রীকান্ত শেষ পর্বের 'রাজলক্ষ্মী' তোমার মনোমত হয়নি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছ বলেই রাগ কোরব এমনি বদ্‌মেজাজি আমি?— আমার মত শান্ত-শিষ্ট নিরীহ ব্যক্তি সহজে পাবে না।

তুমি যা লিখেছিলে আমি তখনই চিন্তা করে দেখেছিলাম। তবুও নিজের ভুলটা ঠিক ধরতে পারিনি। মতভেদ ত থাকবেই।

'শেষপ্রশ্নে' শেষ পর্যন্ত হয়ত অনেককেই ব্যথা দেবো, তবুও যা ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার। তার পরের কথা পরে।

ষোড়শী বইটা একবার পোড়ো। বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুসি হবে। শিশির কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেচি, সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়ে ছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।

কাশীর বুড়ীমা আমার মায়ের মত, দেখা করতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু এদিকে আমিও তাঁর চেয়ে কম বুড়ো নই। আর জলে জলে এ অঞ্চলের কাদার ভিতরের দুর্গম রাস্তাটি মনে হলে আর পা বাড়াবার ভরসা থাকে না। একটুখানি রাস্তাঘাট শুখলেই বোধ হয় যাবো। কিন্তু তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ত সোজা নয়। যার বয়স কম তার সঙ্গেও যেমন, যাঁর বয়স বেশি তাঁর সঙ্গেও তেমনি, এই কথাটা মনে হলেই মন যেন ছোট হয়ে আসে। দুর্ভাগ্য। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি— ২৩শে ভাদ্র ১৩৩৪।

তোমাদের বড়দা

২

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধে, তোমার চিঠি এবং চিঠির মারফৎ তোমার বিজয়ার প্রণাম এসে যথাস্থানে পৌঁছেচে। ষোড়শী দেখে খুসি হয়েছ শুনে আমিও খুসি হোলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে

শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।... অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।

আমার লেখা "সাহিত্যের রীতিনীতি"[১] পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি [ ] কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি— আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি— আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্যে বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বল ত? তবুও বলচি এ কথা আমার যথার্থই মনের কথা। ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে দুছত্র কবিতা পর্যন্ত মেলাতে পারিনে,— কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য। তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে— দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোঙরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে— বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে, খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—[২] "পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা'তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন 'সাহিত্যের রীতি নীতি' লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও

কোনো যায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক্, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই? তুমি একটু সারলে কি? জ্বর সারলো? ইতি—১০ই অক্টোবর ১৯২৭

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া
১১।১১।২৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। এর মধ্যে তুমি যে বিন্ধ্যাচলে[১] গিয়েছো তা ভাবিনি। বরঞ্চ আমি ভাবছিলাম সেদিন নরেনের ওখান থেকে ফিরে আসতে হ'ল সে ছিল না বলে— আর একদিন এরই মধ্যে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।

বিন্ধ্যাচলে আমাকে যেতে বলচো এ খবরে মন খুসিতে ভরে উঠলো। কিন্তু এখন আমার কোথাও যাবার এক তিল সময় নেই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাসাধ্য পুরস্কার পাওয়া গেছে। স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হয়নি [হইনি] বটে, কিন্তু দিদির এক দেবরকে[২] মূল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয়নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যো হয়েচে।

দ্বিতীয়তঃ আগামী কংগ্রেসের ভারী গোলযোগ[৩] বেধেছে। পরশু সুভায ধরেছিল যে দিন কতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে দিতে। আমি মিটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।

শরীরটার সম্বন্ধে ঠিক করেছি আর একটা কথাও বলব না। তুমি কেমন আছ? এইবারে পারো যদি ওটাকে আর একটু মজবুত করে ফিরে এসো।

মাঝে মাঝে ভাবি চোখ কান বুজে যদি একবার কোথাও নিরালায় পালাতে পারি তো বাঁচি। ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে— এ আচ্ছা হাঙ্গামায় নিজেকে জড়িয়ে তুলেচি। মনের শান্তি ও দেহের স্বস্তি দুই নষ্ট হতে বসেছে। শুধু একটা বাঁচোয়া যে নিজের কাজের ফর্দ এখনো খবরের কাগজে বার হতে পায় না। এটুকু কোনোমতে সামলে যেতে পারচি এই সৌভাগ্য।

তুমি আমার সেবার ভার নিতে যে চেয়েচো সে কেবল তুমি আমাকে চেন না বলে। এ পৃথিবীতে কেউ পারে না। দিন দুই তিন এ কাজে নিযুক্ত হও যদি তো বলবে বড়দা গেলে বাঁচি। পরীক্ষা করে নিতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যে স্নেহটুকু এখনও আছে, সে খাটুনিতে পড়লে তার লেশটুকুও আর থাকবে না। ৭।৮ বার চা'ই খাই— নিজে এতবার কি তৈরি করে দিতে পারবে? অন্য খাওয়া দাওয়ার বালাই বেশি নেই; কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটাব জ্বালায় কারো বাড়িতে কখনো থাকতে সাহস করি নে।

তোমরা কতদিন ও দেশে থাকবে? লাহোর[৪] থেকে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবার সময়ে কি ওখানে একবার তোমাকে দেখে আসবার সুবিধে পাবো?

ছেলেবয়সে একবার একজনের[৫] নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম— তোমার চিঠিটা পড়ার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। এক একটা কথা মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে না— অথচ ভোলা·ছাড়া আর কি?

যাক্ সে কথা। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

তোমার— বড়দা

৪

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, চিঠির জবাব না দেওয়ার লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখানো আমার ভার হয়ে উঠেছে। রোজ ভাবি আজই চিঠি লিখবো, অথচ রোজই পড়ে থাকে। আর ক'টা দিনইবা বাঁচবো, দাদার এই মজ্জাগত ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে নিয়েই মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। খবর পেলে মনে মনে যে কিঁ আনন্দ পাই সে তোমরা বুঝবে না। আর বুঝলেই বা কি মাপ আছে? মানুষের মন তো। তখ্‌খুনি ভেবে নেবে দাদা বড় বলেই আমাকে অবহেলা করলেন, যাক্, আমিও আর চিঠিপত্র কিছুই লিখব না। এমনি করে এ জীবনে কত পরমাত্মীয়ই না পর হয়ে গেল।

অর্শ নিয়ে প্রায়ই ভুগি, মাঝে মাঝে ভালও থাকি। তখন এক আধবার কলকাতায় যাই। আর অসুস্থ বললেও সব সময়ে রেহাই পাইনে বলেও যেতে হয়। এমনি একটা দিনেই গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে দু'চারটে কথা[১] বলেছিলাম। তুমি বোধকরি খুসি হতে পারোনি, না?

যে বিশ্রী পথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয় এ রাস্তা পার হবে কি করে? তাছাড়া এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্যন্ত না উঠলো তো আর পাড়াগাঁয়ের মর্যাদা রইলো কোথায়?

শীতের সময় একবার এসো। তখন কাদাও থাকবে না, মাঠের পথ পড়বে। বেশি হাঁটতে হবে না। পাঁচ ছ'দিন পরে ভাবচি নরেনদের ওখানে একবারে যাবো, সেই সময়ে যদি সুযোগ মেলে তো তোমাকেও দেখে আসবো। কাল নরেনের খেলার পুতুল ডাকে এসে পৌঁছল। রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি, আজ রাত্রেও পড়বো। সে বেশ লেখে। এমনি যদি কোথায় থাম্‌তে হয় এ কৌশলটাও জানতো। তোমার লেখা যেখানেই বার হোক আমার নজরে পড়ে। কারণ সব মাসিকপত্রগুলোই প্রায় বিনা পয়সায় পাই। রাধু, স্বাধীন অভিমতটা যেন কুসংস্কারে গিয়ে না দাঁড়ায়। তারও সীমানা আছে এবং আছে বলেই তার মূল্য।

এখন কেমন আছো? আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

২রা কার্তিক ১৩৩৬। বড়দা।

৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার বইখানি[১] পাবার পর থেকে প্রায়ই ভাবতাম কবিতা নিয়ে কথা কইবার অধিকার ভগবান যদিবা নাই দিয়ে থাকেন, অন্ততঃ বইখানি পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি এ খবরটাও তো দিতে পারি। তাই কেন না দিই? এমনি ভাবি আর দিন যায়। অবশেষে শিলঙ্[২] থেকে এলো চিঠি— এলো নিমন্ত্রণ। মনে মনে লজ্জার অবধি রইল না।— স্থির হ'ল এবার আর দেরি নয়— জবাব একটা দেবই দেব। কিন্তু আবার ভাবি আর দিন যায়— এমনি করে ভাবতে ভাবতে আজ দুপুর রাত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার করে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ কোরবই। কাল সকালেই যেন ডাকে দিতে পারি।

কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'জলাশয়' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।

হয়নি ত বটেই, কিন্তু হয় যে কি কোরে সেও তো বুদ্ধির অতীত, সুতরাং আমার মত সুধীব্যক্তি যত্ন করে এ বই যদি পড়েও থাকেন তাতে তোমাদের মত কবিদের আনন্দ দূরে থাক সান্ত্বনাটাই বা কি?

বুড়ি[৩] ছেলেবেলায় কবিতা লিখতো, মন্দ নয়, সে এটা বোঝে ; তাকে যদি পাঠাতে বোধ করিবা— এমনতর অযোগ্যের হাতে তুলে দেওয়ার আক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। জলধর দাদার[৪] 'অভাগী' বেরিয়েচে ; আমাদের বাড়ির ইনি[৫] পড়েন আর কাঁদেন। চোখমুখ ফুলে উঠলো, আমাকে কাছে পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বললেন, কি যে ছাইপাশ তুমি লেখো,— এমনি একখানিও যদি লিখতে পারতে!

পারিনে তা মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যাপারটা কি ওতে?

বললেন— ব্যাপার! এই দ্যাখো সতীত্বের তেজ!

দেখা গেল— অভাগী তখন কাশীতে। সেখানে দারোগা, কনষ্টেবল, বাড়িওয়ালা, পাণ্ডা, সন্ন্যাসী সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা করে হার মেনেচে। অভাগী অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পেয়ে গেছে। কেউ তার কিছুই করতে পারেনি।

কেউ যে কিছুই করতে পারবে না সে আমিও জানতাম, তবু তর্কে হারবার ভয়ে বোললাম, বইতো এখনো শেষ হয়নি, এরি মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হোয়োনা। এখনো কাশীর বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত![৬]

তখনকার মতো মান থাকলো বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবে না এও জানতাম। থাকেও নি!

সে যাক্, আমার মুখ থেকে 'লীলাকমলের' আলোচনা তোমার কাছেও হয়ত ঐ রকমই

ঠেকবে। তাছাড়া বাইরে থেকে যে একটু শিখবো তারই কি যো আছে? কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি— অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ— কে এক লীলাময়[৭] লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয়নি। এর সব খারাপ। এমন কি যতীনের[৮] ছবিটা পর্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম রাখতেন 'সূর্যমুখী'। একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।

এমনি সব সমালোচনার নমুনা। আমার নিজের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। প্রথম যেদিন তোমার বই এলো, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোন এক শিক্ষিত, ভদ্র বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে একথা মন যেন আপনি আন্দাজ করে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গি। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে— সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য— কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই। ভালো ত তুমি কখনো কাউকে সত্যিই বাসোনি রাধু! তুমি বলবে— সবাই কি সত্যিই ভালবেসেছে, আর তারপরে কবিতা লিখেছে বড়দা? আমি তার জবাবে বোলবো— যদি না বেসে থাকে সে তার দুর্ভাগ্য! তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বা কামনাকে দোষী করা যায় না। শুধু দুঃখ করে এইটুকু বলা যায়— বেচারা সংসারে বঞ্চিত হয়েছে, মানুষ পায় নি,— সে ওর দোষ নয়— ভাগ্য।

কিন্তু তোমার ত' তা নয়। সেই লীলাময় লোকটা একটা কথা সত্যি বলেছে যে রাধারাণীর যোগ্য মানুষ দুনিয়ায় নেই, মানুষের প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই 'জীবনদেবতা'কে উৎসর্গ।

কিন্তু, ও জিনিষটি কি ভাই? সত্যিই কি কিছু?...

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কঠিন তিরস্কারের মত শুধু নিরুদ্দিষ্টকেই নয় পাঠককেও আঘাত করে। সমস্ত বইয়ের উপর যেন মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মনে হয়। তাই হয়ত লীলাময়ের বোধ হয়েছে এ গ্রন্থে আনন্দ নেই, আছে শুধু অভিযোগ।

তুমি ভাবো এ জীবনে তোমার মানুষকে ভালোবাসা দুর্নীতি পাপ। তোমাকেও যে কেউ ভালোবাসবে সেও গর্হিত—অপরাধ! কেউ যদি তোমাকে বলে— বড়দা তোমাকে মনে মনে ভয়ানক ভালোবাসে। শুনলে তুমি রাগে ক্ষেপে যাবে। বলবে—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! কারণ, মনে মনে তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছো— এ দুনিয়ায় কাউকে নয়! এ সম্বন্ধে মনটা তোমার একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে। এইখানেই মস্ত তফাৎ। আর এই তফাৎটাই অতিশয়োক্তির আকারে মাঝে মাঝে ধরা দেয় তোমার কবিতায়।

রাধু, একটা কথা মনে পড়লো, যৌবনে এক কালে ফরাসি সাহিত্যের সখ ছিল। আজ প্রাচীন কালে তার কিছুই মনে নেই, সমস্তই ভুলে গেছি, শুধু দুটো ছত্র মনে পড়ে—

Ah! l'affreaux esclavaga
Qui detre a soi.

ভাবটা এই যে একান্ত স্বাধীনতার মত এত বড় দাসত্ব আর নেই!

যাক এ সব কথা। আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশি বুদ্ধি ধরো আমি মনে করি।

বইখানিতে না দেখার দোষে অনেকগুলি বানান ভুল হয়ে গেছে। শব্দের মাথায় বড় বেশি নিরর্থক কমার চিহ্ন পড়েছে— যথা বধূ'র নূতনে'র মাধবী'র এই সব। কবিরা নিরঙ্কুশ বটে, কিন্তু এই দোষগুলো না করাই ভালো, যেমন 'আলোক অমিয় ক্ষরা'। আলোক শব্দটা তো স্ত্রীলিঙ্গ নয়। রবিবাবুর কবিতায় প্রায় কোথাও এসব ভুল পাওয়া যায় না।... তবুও এসব অতি তুচ্ছ কথা বোন। আজ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমাকে মস্ত বড় দেখতে পাচ্ছি। আমার এ দেখায় ভুল হয়নি জেনো।

তুমি আমাকে শিলঙেও নিমন্ত্রণ করেছো বটে, কিন্তু যাই কি কোরে! আমার ত সাহিত্যচর্চা একপ্রকার বন্ধই হয়েছে, কিন্তু আর একটা কাজ জুটেছে যে। দেশের এই অতি হাঙ্গামার সময়ে পালাই কি বলে? হাওড়া জেলার আমি আবার কংগ্রেসের president : কিছুই করিনে তবু থাক্‌তে তো হয়। অথচ যাবার লোভও প্রবল। সাহিত্যচর্চার অভ্যাসটা আমার প্রায় ছেড়েই গেছে। তোমাদের মত সাহিত্যিকের কাছে এলে আবার যদি তার কিছু অংশও ফিরে পাই তো অনেক লাভ। আমার মত কুঁড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখন কোন কাজই আমি করতে পরিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন'[১] ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়োনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম কর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মত নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়— ঢের ত লিখেচি— আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এইদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মিয়াদের বাকি দু-চারটে বছর ভোগ করেই নিইনা কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু, আর না। রাত অনেক হল ; তোমারও অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। এদিকে টের পাচ্চি যে ঘুম চোখে যা লিখে গেলাম তার হয়ত অসঙ্গতির সীমা নেই। অথচ এ চিঠি ফিরে পড়বারও সাহস নেই—আশঙ্কা আছে তাহলে বোধ করিবা ছিঁড়ে ফেলে দেবো— আর হয়ত পাঠানোই হবে না। তাই খামের ভেতর বন্ধ করে দিচ্চি। যদি অন্যায় কোথাও কিছু লিখে ফেলে থাকি বড়দা বলে ক্ষমা করো। ইতি— ২০শে বৈশাখ ১৩৩৭।

তোমার বড়দা

৬

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি লিখেছিলুম, তোমার কবিতার বইয়ের লম্বা সমালোচনা করে। সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি ঠিক মনে পড়ছে না। রাত্রিবেলায় বসে বসে তোমার 'লীলাকমলের দলগুলি' (তোমার ভাষায়) নাড়তে চাড়তে তার সৌরভে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক কথাই লিখে ফেলেছিলুম। চিঠিখানা আদৌ পেয়েছ কিনা জানিয়ো। এখন দিনের বেলায় মনে হচ্চে, সে-চিঠি তোমাকে হয় তো দুঃখ দেবে বা ! চিঠিখানি যদি না পেয়ে থাকো, তাতে যা লিখেছিলুম তা মোটামুটি জানাচ্ছি। কারণ, তুমি হয় তো এখুনি সোজাসুজিই বলে বসবে—'ও সমস্তই বড়দার চালাকি। দীর্ঘদিন বইখানা পেয়েও নিছক কুঁড়েমি করে নিরুত্তর থাকার বাজে কৈফিয়ৎ।' অথবা বলবে— 'বুঝেচি ওটা আমার রাগের ভয়ে পরিপাটি একটি বানানো গল্প।'

সত্যি বলচি বোন্, এটা কিন্তু একটুও বানানো গল্প নয়। তবে তোমাদের রাগের ভয়টা যে আমার আজও সত্যিই আছে সেটা কবুল করচি। সংসারে যে দু'চার জায়গায় সত্যিকারের অকৃত্রিম স্নেহ ও নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা পেয়েচি বোন, আমি তার দাম জানি। তাই তাকে হারাতে আমার সত্যিই ভয়।

তুমি হয়ত এখুনি হেসে উঠবে। বলবে— 'অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা।' সে কথা সত্যি দিদি। তবুও কি জানো— অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহও সংসারের অনেক রকম কারণ অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে বা আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়। এমন কি, অনেক সময়ে সে আপনাকে আপনারই কাছে স্বীকার করতে রাজী হয় না, যদিও বা নিজের কাছে নিজেকে মানেও— অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না, বিশ্বের কাছে তো নয়ই। তারপরে আছে ভুল বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল-বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশির ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা।...

ঐ দেখ, কি লিখতে বসে কি সব বকতে সুরু করেচি। বুড়ো হওয়ার পুরোপুরি লক্ষণই হচ্চে এই বকা। বাজে বকা। ধান্ ভান্‌তে দিয়েচ কি, তান ধরবে সেই সময়ে শিবঠাকুরের গানের। দেখচ না তোমার গুরুদেবের[১] কলমের কাণ্ড ! একটা পয়েণ্টে কথা শুরু করে কোথায় কোন্‌দিকে কোন পথে যে চলে যান্ তার আর হাল্‌হদিশ্ খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই হোলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ লক্ষণ। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও[২]) তা কিছুতেই মানতে চাওনা। আমারও আজকাল ঐ দোষটা পুরো মাত্রায় এসেচে যেন অনুভব করচি। বাজে বকতে পেলে আর যেন কিছুই চাইনে।

এই দেখ, তুমি যাতে রাগ না কর আর ভুল না বোঝো বলে চিঠি লিখতে বসে তোমাকে রাগিয়েই দিলুম বুঝি বা ! দোহাই, বড়দাকে ভুল বুঝোনা ভাই, লক্ষ্মীটি।

যে চিঠিখানা লিখেও তোমাকে পাঠাইনি মনে হচ্চে, তাতে তোমার বইয়ের সমালোচনায় যা লিখেছিলুম জানাচ্চি। লিখেছিলুম— রাধু তোমার লীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তস্পর্শী, এতই emotional যে পড়তে পড়তে বার বার ভুল হয়ে যায়, এ তোমার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝিবা ! কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি। আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়। কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়কে এমন গভীর সত্যিকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক্ হচ্চি। যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক্, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই !

তোমরা— এই মেয়েরা— তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেচি রাধু ! তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেচি[৩] ; এখন মনে হয়,আমার সাহিত্যেও হয় তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধ হয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলাম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমন হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না? এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা[৪], সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্যন্ত। সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমার স্নেহাশীর্বাদ নিয়ো। ইতি— ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭

তোমার বড়দা

পুনশ্চ—

তোমার বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটী চমৎকার হয়েছে। যারা ওর নিন্দে করেছে, তারা অমনটি পারে নি বা পারে না বলেই নিন্দে করেছে। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, বরং হেসো একটু বেশি করে।

৭

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, কুমিল্লায়[১] হঠাৎ লোকে আমাকে চালান্ করে দিয়েছিলো। ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম।

'শেষপ্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙ্গলা দেশে হয়ত পাবো না ; শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখচি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন। এ হোলো একটা দিক, অপর দিকটা এখনো চোখের আড়ালে আছে, ঝড় বইতে সুরু হ'লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত, বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ— ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইলো। ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম, শব্দসম্পদ কত যে সামান্য এ সম্বাদ আর যার কাছেই লুকনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। অথচ মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো— সময় হ'ল না দিয়ে যাবার— তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষপ্রশ্নে করেচি।

তুমি চেয়োচো আমার কাছে সৎ-পরামর্শ।[২] কিন্তু চিঠির মধ্যে তো সৎ-অসৎ কোনো পরামর্শই পাঠাতে পারিনে ভাই, পারি শুধু পাঠাতে আমার অকুণ্ঠ কল্যাণ কামনা। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে— সব কথা জেনে নেবো। আজ কেবল এইটুকুই জানাবো যে, দুঃখ যারা সইতে ভয় পায় না এ পথ তাদের জন্যেই।

ইতিমধ্যে যদি ধৈর্য থাকে 'শেষপ্রশ্ন'খানা আরও একবার পড়ে দেখো। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। যে সব কথা হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে তাদেরও দেখা পাবে। কোনো বই বার দুই না পড়ে দেখলে তার সবটুকু চোখে পড়ে না।

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখবার ইচ্ছেও হয়। কবে দেখা হতে পারে যদি একটু জানাও ভাল হয়। আরও একটা কথা। বামুন মানুষ, বিশেষতঃ বুড়োমানুষ, যত্ন কোরে খাওয়ানোটা যে একটু বেশি রকম পছন্দ করি, আমার লেখার মধ্যে এ ইঙ্গিতটুকু অনেকেই আমার নিজের ব'লে অনুমান করে। ভাবে মনে হয় তোমারও আন্দাজ যেন ঐ রকম। ঠিক না?

আমার অন্তরের গভীর স্নেহাশীর্বাদ রইলো। ৩০শে বৈশাখ '৩৮।

বড়দা

৮

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্বাদ চেয়েছিলে তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করি নি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠে নি ভাই। 'এই কালই জবাব দেবো' এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো ! এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান আর জন্মালো না যে ভাবো-- 'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন— আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন— একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেচেন।[১] তোমরা পারো না?

একটা কথা লিখেচো দেখলাম যে— কমলের স্রষ্টা রমার স্রষ্টা তো নয় যে—ইত্যাদি। তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাদের বুঝতেন— তোমাকে আদর করতে পারতেন, কিন্তু কমলের কথা যিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁর কাছে আর ভরসা করবার কি আছে? এই না কি?

কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লী-সমাজের রমা পল্লী-সমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্য নিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষপ্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি কোরে?

আরও একটা কথা রাধু, লোকে লিখতে বলে— না লিখলেও দেখি চলে না— কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলো-মেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্চে— না? দেবার কথাও। আসলে আমি ত সাহিত্যিক নই দিদি। এ যেন আমার এম-এস্-সি পাস করে ওকালতি পেশা ধরা। সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাই নে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে![২] এর জন্যেই হয়ত আমি তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেলো ঠিক উল্টো। ভাবি আবার যদি কখনও জন্ম হয়, সেবার যেন না এত বড় ভুল আর ঘটে।

কেমন আছ? দেখা সাক্ষাৎ হবারও যো নেই-- যখন ফিরবে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ো। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ, '৩৮

বড়দা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। আমি শয্যাগত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। এখন ভাল হইয়াছি। পথের দাবীর শেষ অধ্যায়টা[১] যদি দেখানো প্রয়োজন জ্ঞান কর ত দেখাইয়ো। এখানে ত নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই— এতদূরে যে কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আসেন সত্যই খুসি হই।

খবরের কাগজ ত পড়ি না, তবে শুনিয়াছি, কলিকাতায় নাকি হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া-ঝাঁটি হইতেছে,— সে ত এতদিনে নিশ্চয় থামিয়া গিয়াছে।

সুধীর সরকার[২] আজও বই ছাপানো সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিল না। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।

রমাপ্রসাদ[৩] কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ো— ইতি ২৮শে চৈত্র ১৩৩২

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

উমাপ্রসাদ,

সেটা ছাপাবার বন্দোবস্ত[১] না করেই কি পুরী চলে যাবে? আমার ভারি ইচ্ছে খুব শীঘ্র বার হয়ে যায়।

প্রবন্ধ লেখা এখন বন্ধ থাক্। পলিটিক্যাল আর কিছু ঝগড়া ঝাটির মধ্যে ঢুকতে মন চায় না। ইতি ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

পানিত্রাস পোষ্ট
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠির জবাব দেওয়া ঘটেনি। পরশু কলকাতায় গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময় পেলাম না। ফিরে এসে দেখি বাড়ি ঘর-দোর ঝড়ে পড়ে গেছে। সুমুখে অর্থাৎ যেখানে কুমড়োর নৌকা ডুবেছিল একটা স্টিমার ডুবে আছে। আমি যখন রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় ফিরে এলাম তখন সব শেষ। অনেক মাল ছিল, আমি না থাকায় বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

ছাপানোর ব্যবস্থা কি সুরু হল? —

তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

১১ই আষাঢ় ১৩৩৩
সামতাবেড়, পোষ্ট পানিত্রাস

পরম কল্যাণবরেষু,

উমাপ্রসাদ, সুর্‌মা উপত্যকা কন্‌ফারেন্সে[১] যাইবার পূর্বে তোমার চিঠির জবাব দিয়া যাইতে পারি নাই, কাল রাত্রে ফিরিয়াছি।

এখন তুমি পড়াশুনা লইয়াই বোধ হয় বিব্রত আছ এবং থাকাই উচিত। তথাপি, ছাপার কিছু অগ্রসর হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য কৌতূহল হয়।

আমার আশীর্বাদ জানিবে।

---তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫

সামতাবেড়। ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

উমাপ্রসাদ, পরশু তোমার চিঠি পেলাম।... আমি কলকাতায় তারপরে আর যাইনি। এদিকে ছোট্ট পরিসরের মধ্যে যেমন ভাবে হোক দিন কাটে, কিন্তু একবার শহুরের মুখ দেখে এসে সামলাতে যায় ৫।৭ দিন।

তার মাঝে বৃষ্টি বাদল কাদায় পথ চলা কঠিন--- সে শক্তিও নেই, উদ্যমও নেই। কিছুদিন পূর্বে অন্ধকার রাতে দুটো সিঁড়িকে একটা সিঁড়ি ভেবে নামলে যা হয় তাই হয়েছিল। অবশ্য

বাইরে তার প্রকাশ নেই, কিন্তু পিঠ আর কোমরের ব্যথা আজও সম্পূর্ণ মিলোয় নি।

একজামিনটা মন দিয়ে দেওয়াই চাই। কুমুদবাবুর[১] সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো তাঁর পত্র পেয়েছি। প্রবন্ধ যে কি হ'ল আমার কোন ধারণাই নেই। সম্ভবতঃ হারিয়েছে।

তোমার বইটা আছে। শেষের চ্যাপটার ক'টা দেখে রেখেছি। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা শেষ হোক্। সবাই বলে আমাকে লিখতে। কিন্তু কি যে লিখি ঠাউরে পাই নে ; সবই অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আরও পাঁচজন গ্রন্থকারের মত নিজের মনটাকে যদি সাবেক দিনের সেই পুরানো 'সাহিত্য সেবা'র ভিতরে আর একবার টেনে নিয়ে যেতে পারতাম ত হয়ত আরও কত কি বিন্দুর ছেলে, চরিত্রহীন লিখে দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সে যে এ জীবনে আর ফিরবে এ ভরসা তো হয় না। কেবলই ভাবি কি হবে লিখে? লোক আনন্দ পায়? না-ই পেলে আনন্দ। পাবার অধিকার আগে অর্জন করুক, তারপরে অনেক লোক জন্মাবে বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি লিখে স্তূপাকার করবার।

নির্মল[২] কি এখনো ভবানীপুরে আছেন? হাত দেখা শেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

উমাপ্রসাদ, ভোলার মারফৎ তপসে মাছ কিছু পাঠালাম। সবাই ত তোমরা নিরামিষ ভোজী[১] তবে সুবিধে এই যে ঐ মাছের আঁশ্ নেই।

আমার চিঠি বোধ হয় সন্ধ্যা নাগাদ পাবে। ইতি ২৭শে আষাঢ় '৩৩

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭

রবিবার

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি ভাল হইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় জল বাদলের জন্যই পরশু রাত্রে একটু জ্বর হইয়াছিল। কাল কিছু খাই নাই, আজ ভাবিতেছি ভাত খাইয়া দেখিব কি হয়। ছাপার কতদূর কি হইল লিখিয়ো। আমি গিয়া হরিদাস ও সুধীরের দোকানে কিছু বিক্রি করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিব।

আর সকলেই বেশ এক রকম ভাল আছে, কেবল আমারই দেখিতেছি বর্ষায় এখানে দেহ সুস্থ থাকিতেছে না।

খবর লইয়া জানিলাম বছর তিনেক পূর্বের মত হাওড়া শিবপুরে এবার বেরিবেরি সুরু হইয়াছে, না হইলে কিছু দিনের জন্য হয়ত শিবপুরে গিয়া থাকিতাম।

ভবানীপুর কিম্বা কলিকাতায় যাইবার বাধা আছে। কারণ এ দিকের খরচ সমস্তই থাকিবে, উপরন্তু ২।৩ শ টাকা বেশি কাঁধে চাপিবে। হয়ত আরও বেশি। আমার এই দারুণ দুর্বৎসরে সে সাহস হয় না। ৫০ বছর নিঃশেষ না হইলে আর নূতন কিছুই করিব না।

তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

সামতাবেড়। পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাওড়া। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

উমাপ্রসাদ, কাল তোমার চিঠি পেলাম। পূর্বেও একখানা পেয়েছিলাম, কিন্তু যথারীতি জবাব দিতে পারি নি।

এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে টিংচার আইওডিন মাখিয়ে আরণিকা খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।

যাক্, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ি রূপনারাণকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হ'তে পারে এবারে ভাল করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে সে নেই। বোধ হয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপরে জল আব জল। বাঙ্‌লা দেশের ষড়ঋতুর অর্থ যে সত্য সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছর খানেক না থাকলে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।

তার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বই কি, তবে জানি ঠিক হাতেই আছে। উপায় যদি থাকে ত হবেই,— তার জন্যে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।[১] তবে শেষে যা হবে সে তো জানাই আছে। দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত বোজানো, এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে। আমার যাওয়া যে শীঘ্র হবে আশা হয় না।

ফাউনটেন পেনটা[২] পড়েই আছে। সেই টর্চ লাইটটা[৩]ও ভেঙ্গেছে। তোমার বি, এল, পাসের কি রেজাল্ট বেরিয়েছে? আমার আশীর্বাদ জেনো। দেহ নিতান্ত মন্দ নেই।—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯

সামতাবেড়। পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু[১] কাল রাত্রে তোমার চিঠি পেলাম। বোধকরি ৩১শে ভাদ্রই এই লিপিটুকু তোমার হাতে গিয়ে পড়বে—' আর সেদিন আমার জন্মদিন, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। নিশ্চয় জানতাম এর আগে আর কিছু হবে না, কিন্তু একান্ন বছরে আর বিশ্বাস নেই। বলি, ভগবান এই যেন করেন। আমাদের বংশে পঞ্চাশ কেউ পূর্ণ করে নি, আমিই প্রথম।

কলকাতা থেকে এসে পর্যন্ত এক প্রকার যেন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম। অর্শ থেকে ভয়ানক রক্ত পড়তে সুরু হয়েছিল। এমেটিন ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে, তরসু একটা আর কাল একটা— আজ দেখ্‌চি আর রক্ত পড়ে নি।

তোমাদের বাড়ির খবর কি? বেরিবেরি ভাল হ'ল কি? কবে নাগাদ কলকাতায় ফিরবে? কাল ভাবচি কলকাতায় যাবো। মণ্টু নেমন্তন্ন করেছে।

বইটার সম্বন্ধে নানা গুজব যে বাজেয়াপ্ত হবেই কিম্বা হয়েই গেছে। কিছু জানো? আমার স্নেহাশীর্বাদ রইল। ইতি— ২৯শে ভাদ্র ১৩৩৩।

দাদা

১০

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
হাওড়া জেলা। ১৮ই আশ্বিন '৩৩

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, বহুদিন তোমার চিঠিপত্র পাই নি। কোথায় যে আছো তাও ঠিক জানি নে। আমার শরীর আগেকার চেয়ে অনেক ভালো। দুটো এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌শনের বোধ করি ফল হয়েছে। ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়াটা একেবারে বন্ধ আছে। স্যানাটোজেন, ডিম, বাতাপি নেবু— এই সব নিয়মিত খাবার ফলে মাথার খালি-খালি ভাবটাও কমেছে। কিন্তু বাহিরের চেহারাটা শীর্ণ, শীর্ণতর হয়েই আসছে। আসবেও। ভারতলক্ষ্মী অর্থাৎ নূতন একখানা মাসিকের সম্পাদক হ'তে রাজী হয়েছি, অন্ততঃ শেষ পর্যন্ত হ'তে হবে। আজ একখানা চিঠি লিখে দিলাম, যদি সে সর্তে তাঁরা সম্মত হন ত সম্পাদকের ভার নিতে পারি। তার কারণ, সংসারে বহু লোকেরই যা হয় আমারও তাই হয়েছে, অর্থাৎ, সংসারে বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ আছে এবং এক পক্ষের জয় হয়। বেশি টাকা না হলেও ৫।৬ হাজার টাকার দায়ী হয়েছি। ভেবেছি এইটে শোধ কোরব ভারতলক্ষ্মীতে যোগ দিয়ে।[১] তাঁরা আমাকে সিকি অংশ দেবেন। এবার কিন্তু সংসারী বুদ্ধিমান লোকেরা যেরূপ আচরণ করে আমিও তাই কোরব। ঠকবো না। পূজোর পরেই সব 'ডিটেল'গুলো স্থির হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিক পরিচিত অপরিচিতের অনেকেই লিখচেন তাঁদের রচনা নিয়ে আগাম টাকা

যেন পাঠিয়ে দিই। হায় রে,— এ শক্তি যদি থাক্‌তো। কিন্তু এই শক্তিটারই আবার আমার বড় প্রয়োজন।...

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। তোমাদের অসুখ বিসুখ যদি আরাম হয়ে থাকে ত এবার চলে এসো না? আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

— দাদা।

১১

সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী '২৭
সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

বিজু,

তোমার চিঠি পেলাম। আমি ৪।৫ দিনের মধ্যে একবার কাশী যাবো। দিদি এবং বাড়ির সকলে অন্নকোট না কি একটা বস্তু কাশীতে দেখতে চান্‌।

এই পত্রবাহক খগেনবাবু আমার আত্মীয়।[২] আমার সমস্ত বই যখনই ছাপা হয় ইনি পেয়ে থাকেন। পথের দাবী পান নি। যদি কোন মতে একটা যোগাড় করে এঁকে দিতে পারো ত বড় খুসি হই। আমার শরীর ভাল। নির্মলের বাঁকুড়া থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে লিখেচে এখন থেকে দেহ আমার ভালই থাকবে। ইতি ৬ই কার্তিক '৩৩।

দাদা

১২

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু জবাব দিতে পারি নি।

আমার মেজ ভাই সন্ন্যাসী বেদানন্দ বর্মা ঘুরে এ বাড়িতে আসেন। গত বুধবার একদিনের অসুখে দেহত্যাগ করেন। আজও আবার বুধবার এল।

অন্যান্য খবর ভাল। তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি। ইতি—১৭ই কার্তিক ৩৩

আশীর্বাদক— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

বিজু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে করেছিলাম তোমার প্রেরিত আমার সেই কাগজগুলো পেলে জবাব দেব, কিন্তু আজও কিছু এলো না।

তুমি মধুপুরেই[১] আছো, না ভবানীপুরে ফিরেছ তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, আন্দাজে মধুপুরেই লিখলাম।

একটা কথা আছে। কাল একজন পাবলিশার এসেছিলেন, বইখানা প্রকাশ করবেন বলে[২]। তিনি বলেন ২৫% কমিশন ও খরচ বাদ তিন হাজার বইয়ের প্রাপ্য টাকা তিনি আমাকে আগাম দেবেন। আমি বলেছি বিজুকে জিজ্ঞাসা করি। তার জবাব পেলে আপনাকে জানাবো।

এই পত্রের উত্তর পেলে অন্যান্য কথা জানাবো। দিন এম্‌নি কেটে যাচ্ছে।

১৫ই অগ্রহায়ণ '৩৩ দাদা

১৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

বিজু, তোমার পত্র পাইলাম। বোধ করি অতি সাবধানতার জন্যই চিঠি তোমার এরূপ vague হইয়া পড়ে যে তাহার অনেক কথার তাৎপর্য বুঝা যায় না।

তুমি মধুপুরে, এক্‌জামিন আসন্ন, এমন সময়ে তোমাকে দিয়া এত সব পরিশ্রমের কাজ করানো সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। এই জন্যই বসুমতীর পণ্ডিত মশাই (ভাটপাড়ার)[১] যখন এই প্রস্তাব করিতে এখানে আসিলেন, তখন কতক সম্মত হইয়াও বলিলাম, তোমার মতামত জানিয়া তবে ডেফিনিট্‌ জবাব দিব।

পাবলিশার কে ঠিক জানি না, তবে আগাম প্রাপ্য টাকা যদি পাই ত অর্থের দিক দিয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, অন্ততঃ খুব কম। হ্যাঁ ৩ হাজার এবং দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র। দাম পূর্ব্ববৎ, খরচ আন্দাজ ১৩০০ টাকা (৩০০০এর জন্য) ২৫% কমিশন তাঁহারা লইবেন। যদি তাঁহারা ঠিক মত দেন ত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার টাকা পাওনা হয়।

তবে এ ক্ষেত্রে টাকাটাই সব নয়। টাকার প্রতি আমার অহেতুক মোহও নাই। শুধু সংসারী লোক বলিয়াই প্রয়োজন।

কিন্তু এমন কিছু যদি জানিয়া থাকো যে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবেই, তাহা হইলে আহাম্মক প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আমি হয়ত কিছু পাইতেও পারি, কিন্তু তাহাতে আবশ্যক নাই। সে পাওয়া আমার সহিবে না।...

আশা করি কুশলে আছো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

৪টা ডিসেম্বর '২৬। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক্‌জামিনের পড়াশুনা যেন ভাল হয়। আলস্যের জন্য মন্দ হইলে চলিবে না। বইটার সম্বন্ধে কি করা উচিত অনুচিত, স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া জানাইয়ো।

১৫

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া
৯।১২।২৬

বিজু, তোমার চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম। তোমার ওপর রাগ কোরব এ কি রকম বুদ্ধি তোমার?

বেশ, এখন সমস্ত বন্ধ রইল। লোকেরা আমাকে খেয়ে ফেলছিল বই বই বলে।[১] এখন থেকে জবাব দিতে পারবো।[২]

তোমার পড়াশুনোয় যেন অবহেলা না হয়। পাস যদি না করতে চাও সে এক কথা, কিন্তু করতেই যখন হবে তখন সেটা বরাবরের মতই হওয়া চাই। বিশেষতঃ, ভাল পাস করার প্রতি আমার কেমন একটা মোহ আছে।

তোমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করি না, তার হেতু ত পূর্বেই বলেছি। শরীর খারাপ হওয়াটা অপরাধ, অতএব অপরাধ তোমার হবে না এই আমার বিশ্বাস।

আমি এখনও বেঁচে আছি। বুড়ো বয়সে যে কটা দিন যায় তাই মহা লাভ।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

— দাদা

১৬

সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী '২৭
সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

বিজু,

এবার দেখছি ইন্‌জেকশনে কোনও সুবিধে হচ্ছে না। রক্তপাত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের মত।

হরিদাসকে[৩] লিখে দাও আমি এ সময় কোথাও যেতে পারব না। আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বোধ হয় আর এ অসুখ ভাল হবে না। স্থগিতও থাকবে না।

— দাদা

১৭

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, সজনীবাবু[১] আমার চিঠি নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছেন একখানা বই পাবার আশায়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু[২] বইখানা পড়তে চান মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় ভাল করে দেবার জন্যে। যাই হোক যদি পারো দিয়ো।

তোমার গল্পটা শেষ করতেই পারছি না। তবে চেষ্টা করছি। কাল সরস্বতী পুজোর জন্যে কিছুই পারিনি। ইন্‌জেক্‌শন ৬টা হ'ল। রক্তপাত তেমনি।

২৪শে মাঘ ১৩৩৩ দাদা

১৮

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। রক্ত বন্ধ ত হয়ই নি, বরঞ্চ যেন বেশি পড়চে। যাক্ এ প্রস! আর না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি[৩] পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল, এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতা খানেক লিখে থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারচি নে!

বি, এন, রেলওয়ের স্ট্রাইক তেমনিই চলেছে— কলকাতায় পৌঁছতে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা লাগে এবং ফেরা সুকঠিন। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ৬ই ফাল্গুন '৩৩।

দাদা

১৯

সামতাবেড়,

বিজু, তোমার পাঠানো বইখানা[১] পেয়েছি। ধন্যবাদ।

এই চিঠিখানা[২] তোমাকে পাঠালাম কারণ আত্মশক্তির বর্তমান সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই[৩]। তুমি যদি তাঁকে বলে কিম্বা উপীনকে[৪] বলে কয়ে এটা আত্মশক্তিতে ছাপানোর

ব্যবস্থা করতে পারো ত বড় ভাল হয়। আমার হাতের লেখা ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌টটা তুমি চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখো।

আর যদি ছাপাতে তাঁরা সম্মত না হন ত লেখাটা তোমার কাছেই রেখো, পরে দেখা যাবে। ৫ই আশ্বিন, '৩৪।

দাদা

২০

সামতাবেড়

বিজু, আজ তোমার চিঠি পেলাম। আমি এই রবিবারে (অর্থাৎ ৮ই) যাবো স্থির করেছি।[৫] ১৫ই যেতে পারবো কিনা বলা কঠিন। যদি তোমরা যাও ত এক সঙ্গেই যাওয়া হয়। সাড়ে ১০টার গাড়ীতে বার হয়ে সাড়ে ১২ আন্দাজ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছব।

ইতি— ২২শে বৈশাখ ১৩৩৪।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২১

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে গিরিজাবাবুর প্রতিবাদ, বিচিত্রায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তর মন্তব্য সবই পড়েছি।[১] নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেচেন পাছে আমি ততটা না পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না[২]।

তবুও এ কথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেচেন আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। প্রকাশ কোরো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। শ্যামাপ্রসাদ কেমন আছে? ইতি— ১০ই ভাদ্র, '৩৪

দাদা

২২

সামতাবেড়

পরম কল্যাণবরেষু,

সেই জন্যেই তোমার নাম বুঝি বিজু? বিজয়ার দিনে জন্ম বলে? আশীর্বাদ জেনো। ২১শে আশ্বিন '৩৪।

দাদা

পুঃ— কেউ কেউ অতিশয় দুঃখিত হয়ে জানিয়েছেন রবিবাবুকে আমার ও রকম কঠিন কথা লেখা উচিত হয়নি। আমার লেখার মধ্যে নাকি শ্লেষ পর্যন্ত আছে, তাঁর অতি ভক্তদের প্রতি হয়ত আছে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোথায়— অযথা বিদ্রূপ বা আক্রমণ আছে আমি ত আরও একবার পড়েও খুঁজে পেলাম না। তুমি পেয়েছ? মানুষগুলো কি নির্বোধ। তাই ভাবি!

২৩

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার কাছ থেকে বহুকাল পরে চিঠি পেয়ে বড় আনন্দ লাভ করেছিলাম। যাবার সময়ে যদি একবার দেখা করে যেতে কি জানি, হয়তো বা সত্যিই যাবার চেষ্টা কোরতাম। বহুদিন থেকে আমার বদরিকাশ্রম দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু হয়ে উঠ্‌লো না! এবারের মত এ ইচ্ছে স্থগিত রইল। কারণ ইচ্ছে করবার বয়সটাও পার হয়ে গেছি।

তুমি লিখেছিলে ১৬ই মের আগে চিঠির জবাব দিতে। আজ ১৫ই মে। আশা করি এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে। তোমার চিঠি পাবার পর থেকে অনেকবার মনে হয়েছে তোমার মা সঙ্গে ছিলেন, আমাদের কারও খাবার অভাবটা হোতো না। মস্ত সুযোগ বয়ে গেল।

আমার শরীর তেম্‌নিই চলচে। এ আর ভালো হোল না। আজকাল ডাক্তারেরা বলচেন, এ হয়েচে আপনার শাপে বর। প্রাচীনকালে এ একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভ। জ্বালা-যন্ত্রণা তো নেই, এখন আমিও ভাব্‌তে সুরু করেছি এ এক প্রকার সুবিধেই হয়েছে।

তুমি বাড়ি আসার পরে যদি সময় পাও একবার এদিকে এসো। তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে। শুনেচি, ওদিকে নাকি চমৎকার লাঠি পাওয়া যায়। যদি মনে থাকে একটা আমার জন্যে এনো।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। প্রার্থনা করি তোমাদের যাওয়া-আসা যেন নির্বিঘ্ন হয়। ইতি— ১৫ই মে ১৯২৮।

দাদা

২৪

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু তোমার চিঠি পেলুম। খবরের কাগজে দেখেছিলুম তুমি হিমালয় যাত্রায় বার হচ্ছো,—ভেবেছিলুম হয়ত বা চলে গেছো। যাওয়া হলো না দেখে খুসি হয়েছি।

এই শুক্রবার বোধ করি আবার চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রমে যাবো। পিঠের ব্যথায় একটু কাবু হয়ে আছি, যদি আরও বাড়ে ত যাওয়া ঘটবে না, নইলে যেতেই হবে। তুমি এই বৃহস্পতিবার পারো ত এসো। কিন্তু যে রোদ আসতে বলতে সঙ্কোচ হয়। যদি শুক্রবারে চন্দননগরে যাই ত রবিবারে বাড়ি ফিরবো। তুমি সোমবার এলে দেখা হবেই। কিম্বা এই বৃহস্পতিবার। যেটা তোমার সুবিধে।

দাদারা কেমন আছেন? তোমার মতের কোন পরিবর্তন[১] হলো কি? মায়ের কথা তোমার শোনা উচিত।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, অপূর্বর দাদা রাগ করে এসে বললেন, যা, যা করবার করে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলো, নইলে আমার ত প্রাণ যায়। রাঙা মাকাল-ফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না।

অনেক দিনের কথা। এর নিহিতার্থ তুমি বুঝবে বলে ভরসা করিনে। বোঝাবার ভার পড়েছে আমার ওপর। তাঁদের কথা দিয়েছি[২] এ চিঠির জবাব পেলেই বিজুকে গিয়ে বোঝাবো। অতএব শীঘ্র উত্তর দেবে। সম্ভবতঃ আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় তোমার ওখানো যাবো। ইতি—৭ই ফাল্গুন '৪০।

দাদা

২৬

বিজু,

তোমার চিঠি[১] পেলাম। আজ আর যাবো না। ২।৪ দিন পরে। এ সব জিনিস আমার কাছে রুচিকর নয়, এইটুকুই বলতে পারি।

দাদা

২৭

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

বিজু, আজ আমার ইচ্ছে ছিল—অর্থাৎ— যেতেই হতো। কিন্তু তুমি হয়ত থাকবে না এ একটা ভয়, আর একটা বাধা আমার সেই চিরস্থায়ী পিঠের ব্যথা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে ভারি বেড়েছে। আজ প্রকাশকে পাঠাচ্চি তোমার কাছে। এর মধ্যে একদিন এসো না এখানে? আমি বুড়ো মানুষ আমার পক্ষে এই দীর্ঘপথ যখন বাধা হয়ে যেতেই হয় তখন বাধ্য হয়ে দুঃখও পাই। ১৫ই ফাল্গুন ১৩৪০।

দাদা

২৮

কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলুম। যাত্রার আয়োজনে তুমি ব্যস্ত নইলে নিশ্চয়ই আসতে আমি জানি। মানস সরোবর দেখে তুমি কলকাতায় এলে তোমার মুখে সমস্ত গল্প শুনবো। কিন্তু মাস দুই পরে যখন বাড়ি আসবে তখন নিশ্চয় একদিন আমার সঙ্গে দেখা করা চাই।

একান্ত মনে আশীর্বাদ করি তোমার হিমালয়ের কঠিন পথ সুগম হোক, দেহ ভালো থাক এবং নির্বিঘ্নে এই প্রথম পর্ব শেষ করে আমাদের কাছে ফিরে এসো। ইতি—১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১।
নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৯

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। আমার স্নেহ এবং আশীর্বাদ জেনো। কালিয়া (যশোর) থেকে[১] পরশু রাত্রে ফিরেচি, আজ বাড়ি যাচ্ছি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজ ভাই বেদানন্দর মৃত্যুর দিন, তার সমাধির কাছে দু-পাঁচ জনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্তন করে। এই জন্যে যাওয়া। ৮।১০ দিন পরে ফিরবো।—৯ই কার্তিক ১৩৪১। তোমাদের শুভার্থী— দাদা

৩০

২৪ আশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
২রা আশ্বিন ১৩৪৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভার দিয়ে মানুষে বেশ সুস্থ হয়ে বসে ; ঠিক সেই যায়গায়। উঃ কি এর ব্যথা। নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি। বেশি দিন ওখানে থেকো না, নইলে ফিরে এসে তোমার জন্যেও হয়ত এমনি ব্যবস্থা করতে হবে। মুর্শিদাবাদে[২] যাবার দুর্বুদ্ধি যে তোমার মাথায় কে দিলে তাই ভাবি। অন্যান্য কুশল।

শুভার্থী— দাদা

৩১

কলিকাতা। ১১ই কার্তিক ১৩৪৩

কল্যাণীয়েষু,

বিজু, কাল বাড়ি থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলুম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো, তার কারণ বড় বৌ নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়— আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন ; নইলে গরীব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারব না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্বাদ করেছেন[১] অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভাল নই বটে, তবে পূর্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। জ্বরটা গেছে। তুমি আমার আশীর্বাদ নিও এবং দাদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও। শুভার্থী—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩২

'মালঞ্চ', কারস্টেয়ার্স টাউন
দেওঘর
কিম্বা
ডাঃ সত্যেন গাঙ্গুলীর মারফতে
গবর্ণমেণ্ট হাসপাতাল

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিজু, তোমার চিঠি পেলাম। প্রকাশকে জিজ্ঞেসা করেছিলাম বিজু আর খবর নেয় না কেন? সে বললে, নিশ্চয় তিনি কলকাতায় নেই, আর কোথাও গেছেন। নইলে, আমার আসার খবর নিজেই তোমাকে দিয়ে আসতাম। এখানে এসে ভালোই আছি। জ্বর নেই বোধ হয়, কারণ. থার্‌মমিটর দেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে মনে হয় না। এখানকার এই বাড়িটি[১] বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাজার প্রভৃতি দূরে নয়। অনতিকাল পূর্বে বৃষ্টি হবার জন্যে শীত আছে, ধুলো নেই। ভয় ছিল কন্‌ষ্টিপেশান হবার, অন্ততঃ উইণ্ড নিশ্চয়ই পেট ভরিয়ে রাখবে, কিন্তু এখনও সে রকম কিছু দেখিনে। যেমন কলকাতায় অল্পস্বল্প ছিল প্রায় তেমনি। বরং কম। হাতে পায়ে আগেকার মতো জোর এখনও ফেরেনি। তবে স্বচ্ছন্দেই উপর-নীচে করতে পারি। সবাই বলচেন, চেপে মাস খানেক থাকতে পারলে সব দিকেই উন্নতি হবে। হয় যদি, স্বীকার করতেই হবে বর্তমান ফাঁড়াটা কাট্‌লো। এ যাত্রায়।

মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিও। ইতি—১৯শে ফাল্গুন ১৩৪৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১

সামতাবেড়, ১৩ই কার্তিক, '৩৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

লীলা তোমার চিঠি পাইয়াছি। এমনি ধারা মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সংবাদ দিয়ো। আমার শরীর আজকাল অনেক ভাল। তবে কতদিন থাকবে জানি না।

আমার মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন বোধ করি শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিন কয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরের দিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। দিদি, আমি, বৌ ও প্রকাশ আমরাই শুধু ছিলাম।

ছেলেদের আশীর্বাদ দিয়ো ও তুমি নিজে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—

দাদা

২

সামতাবেড়, ১৪ই পৌষ, ১৩৩৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

লীলা, প্রকাশকে লেখা তোমার চিঠি দেখলাম। আমি মাসাধিক কাল বড় অসুস্থ ছিলাম, বিকালের দিকে সামান্য একটু জ্বর কিছুতে ছাড়ছিল না। কোনক্রমে হয়ত ম্যালেরিয়া হয়ে থাকবে, এই আশঙ্কায় এখানকার ডাক্তারেরা তার চিকিৎসাই করছিলেন, কিন্তু বহু পরে বোঝা গেল জ্বরটা লিভারের দরুণ। এমেটিন ইন্‌জেকশান গোটা দুই করার পরে আজ ৫।৬ দিন জ্বর ছেড়েছে। এ সমস্তই হয়েছিল সম্ভবত অর্শের অত্যধিক রক্ত পড়ায়।

২।৪ দিনের মধ্যেই কাশী যাবার কথা আছে, আমিও রাজী হয়েছি। মনে হয় আর বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। তবে প্রাচীন বয়সে ভাবনা আর কিসে নেই বলো? তবে আমার নিজের ভাবনা এতটুকু নেই। প্রার্থনা করো যেন, কতকটা শক্তি থাকতে থাকতেই যেতে পারি। ছেলেদের আশীর্বাদ দিয়ো।—

দাদা

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
৪ঠা ফাল্গুন, '৩৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

লীলা কিছুদিন পূর্বে তোমার চিঠি পাই, কিন্তু সনাতন ব্যবস্থায় উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটলো।

আমার ব্যাপার যথাপূর্বন্তথাপর। এর আর ক্ষয়-ব্যয় নড় চড় নেই। এবং এত পুরাণো হয়ে গেছে যে কৌতূহলও নেই। কাল অর্থাৎ শুক্রবার যাচ্ছি কলকাতায়— হাসপাতালে। যদি অসম্ভব না হয় তোমাকে খবর দেবো।

ছেলেদের আশীর্বাদ দিয়ো।

দাদা

৪

পি ৫৬৬ মনোহর পুকুর
কলিকাতা
ফোন পার্ক ৮৩৪

পরম কল্যাণীয়াসু,

বৌয়ের মুখে শুনলাম তোমার সঙ্গে স্টার থিয়েটারে দেখা হয়েছিল। মাথার যন্ত্রণা মাঝে একটু কমেছিল কিন্তু সারেনি। আবার সেটা বেড়েছে। কলকাতায় যে সব ডাক্তাররা খ্যাত তাঁরাই ত দেখলেন। বিধান বলেন, এ শুধু চোখের জন্যে। যতীন মৈত্র বার দুই বদলে চশমা দিলেন, তাতে কমেনি। আবার কাল বিকেলে অন্য চশমা দিয়েছেন— সেটা তৈরি হতে গেছে। ব্লাড প্রেসার ত ছেলেমানুষের মত কম, তবু কেন যে যন্ত্রণা যায় না, কিছুই ভেবে পাইনে।

কাল খবর এলো, পুকুর প্রভৃতি বানে ভেসে গেছে। আজ ২টার গাড়ীতে বাড়ি যাচ্ছি। কিছু যে উপকার হবে অর্থাৎ যা গেছে তার যে কোন প্রতিকার করতে পারবো তা নয়, তবু একবার না গেলেও মন বোঝে না। কবে ফিরবো বলতে পারি না।

প্রার্থনা করি সকলে কুশলে থাকো। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২

দাদা

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

চনু,[২] তুমি বাবা মনে করে যে আমাকে বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়েছো, এতে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আশীর্বাদ করি তোমাদের সকল বিঘ্ন[৩] দূর হউক, তোমরা দুটি ভায়ে[৪] মানুষ হয়ে ওঠো। সংসারে দুঃখ ত আছেই, তোমাদের চেয়ে বহুগুণ দুঃখের মধ্যে দিয়ে আমার ছেলেবেলা কেটেছে।[৫] এই কথাটি মনে রেখো।

তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ দিও। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—
২৯শে আশ্বিন '৩৯

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে[১] লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা— হাওড়া
২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪

পরম কল্যাণীয়েষু

অবিনাশ, তোমার চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছি না। এই জন্যে 'নবযুগ'[২] কার্যালয়ের ঠিকানায় এই পোষ্ট কার্ডখানা পাঠালাম! এই শনিবার এবং রবিবার দুই দিনই আমি শিবপুর এবং কলকাতায় থাকবো। এর পরে যে কোন দিন এলেই বোধ হয় দেখা হতে পারে। কিন্তু আমি ত কখনো কোন বইয়ের ভূমিকা লিখিনি, ও আমি জানিনে।[৩] তাছাড়া অন্য দু একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। পুজোর মধ্যে তোমাদের অনুরোধ কি করে পালন কোরব ভেবে পাইনে।

যাই হোক্ দেখা হলে কথা হবে।

আঃ
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,

'বাতায়নে'র প্রত্যেকটি সংখ্যাই[১] আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্য বা উপেক্ষায় কোনদিন দূরে ঠেলে রাখি নি।

সকল বিষয়েই যে একমত হ'তে পেরেছি তা নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হ'তে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক্, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি-বা সহা যায়, ক্রূরতা, এরূপ নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম— সর্বপ্রকারেই তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

কল্যাণীয়েষু,

লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টি লাভ করিতেছে। পূর্বেকার উপেক্ষা অবহেলার ভাব আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষে এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবলমাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্য দিয়া স্বকীয় মর্যাদা প্রতিদিন প্রমাণিত করিতে হইবে, নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে ব্যর্থতা নয় বিড়ম্বনা।

তোমাকে ছেলেবেলা হইতে জানি, তোমার আদর্শ তোমার অভিজ্ঞতা কতদিন আমার কাছে আলোচনা করিয়াছ, কনিষ্ঠের মতো উপদেশ চাহিয়া লইয়াছ। জীবনের পথে সে সমুদয় তুমি বিস্মৃত না হও এই ইচ্ছা করি।

কাগজ পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র দায়িত্বপূর্ণই নয়, নানাভাবে বিঘ্ন সঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশই সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্যাদা। অসৌজন্য ও কুকথায় তোমার মুখের বক্তব্য যেন কোনদিন কলুষিত না হয়। কাহাকেও ছোট করার জন্য নয়, বড় করার উদ্যমেই তোমার প্রবুদ্ধ শক্তি অনুক্ষণ নিয়োজিত থাক এই প্রার্থনা করি। প্রগতির পথে জয় তোমাব অপ্রতিহত হইবেই। ইতি— ৭ই শ্রাবণ ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১]কে লেখা

প্রিয়বরেষু,

অক্ষয়বাবু, আপনার গুরুপ্রসাদবাবুর[২] চিঠিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। এতদিন কথাটা আমার মনেই ছিল না। তাঁকে লিখে দেবেন যে বিলম্বের জন্য আমি অনুতপ্ত। আর জানেন তো আমার বনেদি কুঁড়েমির ব্যাপার।

আমার উপন্যাস থেকে নাটক কোরে অভিনয় করার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এইটুকু যে নাটকটা ছাপানো চলেনা কিম্বা কোন ব্যবসাদার থিয়েটারওয়ালা অভিনয় কোরে অর্থোপার্জন করতে পারবে না। তা নইলে সখ কোরে অভিনয় করা কিম্বা সেই উপলক্ষে টিকিট বিক্রি করা তাতে আমাব আপত্তি নেই। আমি 'দত্তা' বইটার একখানা নাটক অপরের কাছে পেয়েছি। নিজেই কিছু কিছু অদল বদল কোরে বিজয়া নাম দিয়ে স্টার থিয়েটারকে দেবো মৎলব করেছি। আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে নাটক তৈরি করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন কোরে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে, তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেন না। শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো আছে তাই নাড়া-চাড়া কোরেই যা হোক কিছু একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেই জন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয় না।

যাক্, এ গুরুপ্রসাদবাবুর ব্যাপার আমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

কেমন আছেন? আমি তো অর্শ নিয়ে মরে আছি। না হয় ভালো, না হয় একটা হেস্তনেস্ত। আমার ভালবাসা জানবেন। ৭ই মাঘ '৩৪

আপনার শরৎবাবু

আপনার বন্ধু আমাকে একটা চার পয়সার টিকিট পাঠাতে বলেছিলেন[৩] অথচ আপনি তাঁর অনুরোধ রাখেন নি। বোধ করি ভুলে গেছেন। কিন্তু বাইরের লোকের আমার সম্বন্ধে ধারণাটা চমৎকার। না?

চরণদাস ঘোষকে[১] লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া
৩রা কার্তিক '৩৬

পরম কল্যাণীয়েষু,

চরণ, অত করে পরিচয় না দিলেও চিনতে পারতাম। আমার স্মরণ শক্তি আজও ছেলেবেলাকার মতই আছে। চিঠির জবাব না দেওয়াটাই যেন আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই কত আত্মীয় বন্ধুই না পর হয়ে গেল। কেমন আছ?

আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মণীন্দ্রনাথ রায়[১]কে লেখা

১

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া
১লা জুন '২৭

পরম কল্যাণীয়েষু

মণীন্দ্র তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছিলাম কিন্তু কতকটা দিচ্চি দেব এবং কতকটা দেহের অবস্থা বশতঃ জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল।

তুমি আমার এখানে আসবে তাতে যে খুসি হব এ তুমি জানো। কিন্তু তোমার কষ্ট হবে। একে ত ভয়ানক গরম, তাতে মাঠের উপর দিয়ে ঠিক দুপুরে আসা বিষম ব্যাপার। একটু জলটল পড়লে আর একদিন এসো।

তাছাড়া ৩রা থেকে ৬ই পর্যন্ত আমি শিবপুরে গিয়ে থাক্‌বো। একটু কাজও আছে এবং ২।১ দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখবো।

(বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার জাট খোল বদ্‌লে শিশিরের অভিনয়ের জন্যে তৈরী করে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয়নি। যদি হয় একদিন দেখো।)

এই সময়ের মধ্যে একদিন ছুটি করে তোমার ওখানে গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা এবং পরে ব্রাহ্মণ ভোজন সমাধা করে আসবো ভারি ইচ্ছে হয়েছে। তোমাদের বাড়ির আন্তরিক যত্নের খাওয়াটার প্রতি আমার লোভ যে নেই তা নয়। অন্যান্য মঙ্গল। শুধু অর্শের অজুহাতে অত্যধিক রক্তপাতে কিছু কাহিল করেছে।

আশা করি তোমরা বেশ ভালই আছ। ভূপেনবাবু কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো

দাদা

২

সামতাবেড়, জেলা হাওড়া।
২৭, ৮, ২৭

পরম কল্যাণবরেষু,

মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় এখ্‌খুনি যাই, কিন্তু আমি ত ভাই সুস্থ নই, প্রায় দু হপ্তা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে ভারি দুর্বল ক'রে রেখেছে। তা' ছাড়া বৃষ্টি বাদলে রেল ষ্টেশনের একটি মাত্র পথ যা হয়ে আছে তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চল্‌তে বেহারা আশঙ্কা করে হয়ত পা পিছ্‌লে বাঁধ থেকে একেবারে

খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা যায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,— তাতেই দিব্যি খট্ খট্ ক'রে হেঁটে চলে,— পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি— তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

তোমার বাবার সঙ্গে যে কত কাল দেখা হয় নি মনেও করতে পারি নে। অথচ, তাঁর মিষ্টি স্বভাবটুকুর জন্যে তাঁর প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। একটু জোর পেলেই গিয়ে একবার দেখে আসবো।

যোড়শী অভিনয় আমি একবার দেখেছি, এবং তারই জের চল্‌ছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা। তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির[১] এবং চারুর[২] (জীবানন্দ—যোড়শী) অভিনয় দেখবার মত বস্তু। আমার আশীর্বাদ জেনো।

দাদা

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, বাস্তবিক এমনি কিছু-না-কিছু একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাই যে যেতেই পারচি নে। আজ তোমার হরিবাবু গিয়ে আমার দেখা পেলেন দিদির বাড়িতে। জন দুই ডাক্তারের সঙ্গে তখন আলোচনা চলচে। তুলুকে[১] মনে আছে? তার খুব মারাত্মক অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ। আর আমি ছাড়া ওদের ভরসা দেবারও কেউ নেই, আশার কথা শোনাবারও কেউ নেই। নিজেরও দরকার কলকাতায়, কিন্তু যেতে পারচি নে। শনিবার যদি যেতে পারি কাল প্রকাশকে দিয়ে খবর পাঠাবো।

মুখুয্যে মশাই[২] অম্‌নি এক রকম না ভালো না মন্দ। আমার শরীর ভালই আছে।

আমার ননী[৩] গেছে ছুটি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি, কাল শুক্রবার আসবে— যদি যেতেও হয় ওকে নইলে তো যাওয়া হবে না।

আশা করচি শনিবার যাবো।

দাদা

৪

সামতাবেড়

মণীন্দ্র, তোমার ওপর আমার স্নেহ যে কত বেশি একথা তুমিও জানো না। তবে আমি অত্যন্ত কুঁড়ে মানুষ, দূরেও আছি, এই জন্যেই আমার এত গলদ তোমার চোখে ধরা পড়ে।

কিন্তু শাস্ত্রে আছে অতি বৃদ্ধদের দোষ নিতে নেই। যেমন ছোটদের।

তোমার ছেলের পৈতার দিন আমি যাবোই। এবং এ প্রতিশ্রুতি আমি রাখবো, যদি না ইতিমধ্যে শয্যাগত হয়ে পড়ি। কলকাতায় কালেভাদ্রে [কালেভদ্রে] যাই! ব্লীডিং পাইল্‌স নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। না হয় মরণ, না হয় এটা ভালো। শুধু, এইটুকুই সৌভাগ্য যে কোন যন্ত্রণা নেই।

শিশিরবাবু[১]কে আজই চিঠি দিলাম। মঙ্গলবারে তিনি পাবেন। বুধবারে যদি দেখা করো তাহলেই হবে।

তোমার বাবাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো সরস্বতী পুজোর দিনেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ১লা মাঘ ১৩৩৪। স্নেহাশীর্বাদক—

দাদা

৫

সামতাবেড়

ডাকমোহর— ১১ই এপ্রিল '২৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। উপীন[২]কে নিয়ে তুমি দাদার কুঁড়েঘরে আস্‌তে চেয়েছো, ১লা বৈশাখে সেদিনটা আমার আনন্দে কাট্‌তো, কিন্তু অদৃষ্ট অন্যরূপ। কাল রাত্রের কিম্বা শনিবারের দুপুরের গাড়ীতে আমাকে অত্যন্ত জরুরি কাজে পাটনায় যেতে হচ্ছে, সম্ভবতঃ ১লা ২রা আমার পাটনাতেই কাটবে। বড়লোকের[৩] দরকার কি জানি তাঁর মর্জিমত হয়ত আর একটা দিনও কর্মভোগ হবে। শুধু সান্ত্বনা এই যে নিজের কাজ নয় পরের কাজের দুর্ভোগ। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

দাদা

ফিরে এসেই খবর দেবো। তখন উপীনকে নিয়ে একদিন নিশ্চয়ই এসো। মাঠে হাঁটার কষ্টটা জেনে যেয়ো।

৬

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণীন্দ্র, তুমি যে দেহে-মনে সত্যিই অতিশয় অসুস্থ, এ তোমার এই চিঠিখানা পড়লে সংশয়ের অবকাশ মাত্র থাকে না। তোমার মত সদানন্দ মানুষ যে এত বড় দুঃখের লিপি পাঠাতে পারে আমি ভাবতেও পারতাম না। কি যে ব্যাপার ঘটলো আমি ভেবেই পাচ্ছি নে। দেখা হওয়া সত্যিই দরকার।

এই রবিবারে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে শিবপুরে একজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসে আছি। তিনি আয়োজন করে আরও অনেককে বলেছেন।

এর পরের রবিবারে তোমার ওখানে যাবো। কিন্তু সকালে যাওয়ার তো ভারি অসুবিধে। এমনি রাস্তা এবং এমনি বি, এন, রেলওয়ে যে পৌঁছতেই হয়ত তিনটে চারটে বেজে যাবে। অন্ততঃ যাওয়া অসম্ভব নয়। ... খাওয়াটা গৌণ। আমি যাব এটা স্থির। আমার অন্তরের স্নেহ এবং আশীর্বাদ জেনো। যত দূরেই থাকি, দেখা সাক্ষাৎ হোক্ বা না হোক্ আমি তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ হও। ইতি—২৭শে ভাদ্র ১৩৩৫।

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণীন্দ্র, পাড়াগাঁয়ে থাকি। সহজে কোন খবর পাইনে। আজ কাগজে তোমার পিতৃদেবের লোকান্তর গমনের খবর পড়ে দুঃখে যেন অভিভূত হয়ে পড়েচি। আমার প্রতি তাঁর অন্তরের প্রীতি ও স্নেহ বার বার মনে পড়চে। তোমার মায়ের মৃত্যুর পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর কতকগুলি মুখের কথা থেকে কতবার ভেবেচি যে এঁরও ইহ জগতের বন্ধন শেষ হয়ে এসেছে। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, দিনের শেষ একদিন আসেই।

যাঁরা যান তাঁদের জন্যে শোক করতে নেই,— তবুও মন এ কথা মানতে চায় না। আশীর্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর। তোমার দাদাকে বোলো। ২৮শে কার্তিক ৩৬।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮

৮, ২, ৩২

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, তোমার চিঠি পেলাম। সেদিন তোমার অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার ছবি আমার খুবই মনে আছে। প্রায় সর্বদাই মনে পড়ে। আশীর্বাদ করি এর থেকে তুমি যেন মুক্ত হতে পারো! উপায়হীন ব্যথার মত ব্যথা সংসারে আর নেই।

সরস্বতী পূজোর সময়ে আমার বাড়ির বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্য বারে তার পরের দিন বাইরে যাই, কিন্তু এবারে শনিবারে বড়বৌয়ের[১] একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না। তাই মঙ্গলবারেই যেতে পারবো ভেবেছিলাম। আমি এই মঙ্গলবারের পরের মঙ্গলবারে বেরিয়ে পড়বো। অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী।...

আমি এক রকম আছি। লোকের আসার বিরাম নেই—দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বে-আইনি হবার দরুণ[২] যারা অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের। ইতি— দাদা

৯

১২. ৪. ৩২

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেদিন রাত্রে ফিরে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ের অবধি রইল না। বাড়িময় আলো, রাত দেড়টায় ওপরের বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির মেয়েরা— নীচেও ৫।৬ জন লোক, ভাবলাম ভয়ানক কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। দেখলাম তাই বটে, ডাক্তার এসেছিলেন, বুড়ির[১] একশো চার সাড়ে চার জ্বর, পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা, প্রায় সারা দিনই যন্ত্রণা চলচে।

কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদে সে সেরে উঠেছে। কাল থেকে জ্বর নেই, আজও জ্বর হয় নি, খেলাধূলো করে বেড়াচ্ছে। বোধ করি আর কিছু হবে না, এমনি ভালো হয়ে যাবে।

সুতরাং, যাওয়াই স্থির কোরলাম।[২] রাত্রে ৮-২৪ ট্রেণে শুক্রবারেই রওনা হবো, আশা করি তুমি যেতে আপত্তি করবে না। হাওড়া স্টেশনেই তোমাকে প্রতীক্ষা কোর্‌ব। ননী সঙ্গে যাবে, তুমি যদি শুধু একটা টিফিন পটে একটু খাদ্যবস্তু ও একটা কুঁজোতে খাবার জল নাও, বড় ভালো হয়। এখান থেকে ঐগুলো নিয়ে যাবার ভারি অসুবিধে হয়। পথ তো সোজা নয়।

বউমাকে[৩] বোলো একটা দিন মাত্র, বড় জোর তারপর দিনটাও হতে পারে, যদি একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্যে পুরীতে জগন্নাথ দেখতে যাই। কটক থেকে পুরী তো বেশি দূরে নয়। যদি যেতেই হোলো ত ওটা না দেখে আর ফিরবো না।

এদের অনেক দিনের অনুরোধ যাবার, এবার নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে যদি না ইতিমধ্যে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে। বুড়ীর অসুখের জন্যে যাত্রা তো প্রায় বন্ধ করেই দিয়েছিলাম। অন্যান্য মঙ্গল। বউমাকে ও ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ দিয়ো।

দাদা

১০

পরম কল্যাণীয়েষু,

দেহটা আবার গোল বাধিয়েছে, স্থির করেছি এ নিয়ে আর নালিশ জানাবো না—এই এ সম্বন্ধে শেষ। পায়ের ব্যথাটা যে বাত নয়, সেই পুরাতন আঘাতের জের এটাও এবারে নিঃসন্দেহে বোঝা গেছে। এখন বড়বৌয়ের চিকিৎসা সুরু হয়েছে— তিনি নাকি এই মুসব্বরের প্রলেপ দিয়ে অনেকের আঘাত-পাওয়া ব্যথা আরোগ্য করেছেন। তিন চার দিন লাগানো হচ্চে, অনেকটা ফল পাওয়া গেছে। নির্দোষ নিরাময় হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে সাময়িক একটু অব্যাহতি পেয়েছি।

তোমাদের ওখানে যাবার জন্যে মনে মনে ছট্‌ফট্ করচি, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে ভয় হচ্চে। পাছে তোমাদের বিব্রত করি।

বৌমা ও ছেলেমেয়েদের আমার স্নেহাশীর্বাদ দিয়ো। দিন ৪।৫ হোলো ছোট বৌমা[১]

বাঘাকে[২] নিয়ে বাপের বাড়ি মুঙ্গেরে গেছেন। কেবল বুড়ী রইলো, মামার বাড়িতে যেতে চাইলে না, বড়বৌও ছেড়ে দিলেন না। অন্যান্য খবর ভালো। ইতি— ২৯শে ফাল্গুন '৩৮। দাদা

পুঃ— তোমার দেওয়া ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট লেখবার কাগজগুলি চমৎকার হয়েছে। খুব আনন্দিত হয়েছি।

শরৎ

১১

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, সেই পর্যন্ত আমি অসুখ বিসুখের ঘূর্ণাবর্তে দিন কাটাচ্ছি। মুকুলের হঠাৎ হোলো লিভারের ব্যথা এবং জ্বর। বউমা ঠিক এই ভয়টা সেইদিন করেছিলেন, তাই হোল অবশেষে। তিনটে এমিটিন ইনজেক্‌শন দিয়ে এবং অন্যান্য ওষুধ খাইয়ে সে একটু আছে ভালো। তার সম্বন্ধে আর চিন্তা নেই, অন্ততঃ সম্প্রতি।

তার পরে হঠাৎ মুখুয্যে মশাই নিলেন শয্যা। আশঙ্কা হোয়েছিল এ যাত্রায় বোধকরি আর তাঁকে ধরে রাখা গেল না। রক্তের চাপ বেড়ে গেছে ২২০ তে। বয়সও হোল ৭৩, কিন্তু তা বোললে তো হয়না। তাঁর যাওয়া মানে আমাদেরও এখান থেকে যাওয়া। এখন তাঁকেই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। তবে আজ একটু আছেন ভালো। প্রস্রাব পরীক্ষা হয়ে এলো, তাতে কোন দোষ নেই— এটা ভারী আশার কথা। যাই হোক, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এতো ঠিক রায় বাড়ির ফলার নয়, এখানে শেষ পর্যন্ত ফলার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার ভয় থাকেই।

তারপরে নিজে। আনন্দ স্বামিজীকে বোলো ফেল্‌ড ! এ্যাব্‌সলিউটলি ফেল্‌ড ! ফেল্‌ড ইগ্‌নোমিনিয়াসলি ! রক্তধারা বোধকরি নায়গ্রা প্রপাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কোরতে চায়[১]।

তারপরে হোল কটকের এন্‌গেজমেন্ট, এ শুক্রবারে যেতেই হবে। তোমার ঠিকানায় আমাকে খবর দেবার কথা ছিল, বোধকরি তুমিও সম্বাদ পেয়েছো। যাওয়া চাই! ... আমি সেই ট্রেনেই হাওড়া পৌঁছব। যদি দেখো আমি নেই, নিশ্চয় জেনো খড়্গপুরে অপেক্ষা করে আছি। তবে আশা করি তা হবে না, হাওড়াতেই যাবো এবং দুজনে একত্রেই রওনা হবো। আমার এবং ননীর একটু খাবার নিয়ো ভাই।

দাদা

পুঃ— তুলু বল্‌চে আর লিখ্‌লে ট্রেন পাবেন না।

১২

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, তোমার চিঠি পেয়ে একটু আশ্চর্য হোলাম। কারণ, কাজ নেই কর্ম নেই শুধু বসে

বসে গল্প করার প্রস্তাব। অবশ্য গল্প করার আনন্দ আমার তো কম নয়! কিন্তু তুমি ছুটোছুটি করার মানুষ, কখনো স্থির হয়ে গল্প করতে জানো না। আমার গল্প জমে বৌমার সঙ্গে। তোমারই আমরা খোঁজ পাই নে। এখন যদি গল্প করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকো ত মানতেই হবে তুমি ক্রমশঃ বুদ্ধিমান হয়ে উঠ্‌চো।

বেশ, শনিবারে যদি জল না হয় তো যাবো।

মাঝে একদিন অকস্মাৎ জ্বরে পড়ে গিয়েছিলাম। জ্বর এক বেলার বেশি ছিল না, কিন্তু এ সুপ্রাচীন বয়সে একটু দুর্বল করেছিল। মেয়েদের আশীর্বাদ করি,[১] তোমরা দুজনেও আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি— ১৭ই আষাঢ় '৩৯

দাদা

ভোলানাথ রায়[১]কে লেখা

১

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা— হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

ভোলানাথ, পল্লীগ্রামে বাস করিতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ করিতেছি, এই কথাটা তোমার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়বাবু[২]কেও চিঠিতে লিখিলাম। এইবার আবার সহরে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি। লোকটা যে আমাকেই আসামি করিয়া ১০৭ ধারা চালাইবার মৎলব করে নাই এইটুকুই সৌভাগ্য।[৩]

আমার ভাগ্নে ব্রজ[৪]কে তোমার কাছে পাঠালাম। যা ভাল হয় কোরো। তোমার কাছে এর বেশি লেখা বাহুল্য। ১০ই নভেম্বর '২৯।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজর কাছে সমস্ত ঘটনাটা শুনিয়া লইও।

শ.

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা— হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

ভোলানাথ, আমার এই কাজটুকু কোরে দাও ভাই। এই লোকটি একেবারে সর্বস্বান্ত,— পাড়াগাঁয়ের সামান্য পয়সাওয়ালা বামুন কায়েতের চক্রান্তে পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়।

নানাপ্রকার ভুলচুকের মধ্যে দিয়ে অবস্থাটা একেবারে শেষ সীমায় পৌঁচেছে। হাইকোর্টে 'মোশান' নাকি করেছে, তাও আবার তাঁবাদি। হাকিম নাকি 'নোট' করে নেওয়ায় তাঁবাদিটা রক্ষে পেয়েছে।

এই লোকটিই তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবে, আমি চাই জজ সাহেব দয়া কোরে আর একটা দিন দেন তো আমি একটুখানি চেষ্টা চরিত্র পরে কোরে যদি কিছু ব্যবস্থার উপায় করতে পারি।

হাওড়ায় কে একজন অ্যাড্‌ভোকেট ধীরেন বোস দয়া পরবশ হয়ে এর বহু উপকার করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন যে, একি লোয়ার কোর্ট যে সময় নেওয়া যাবে? এ হাই কোর্ট, এখানে ওসব অজুহাত করাই চলে না। যাহোক করে এর থেকে উদ্ধার করো এই অনুরোধ। দেহটা ভাল নেই, নইলে নিজেই যেতাম। আশা করি কুশলে আছো। আমার রোগই এই বন্ধুবান্ধবদের ওপর এই রকম ব্যাপার নিয়ে অত্যাচার করা। এ আর সারবে না[১]। ২২শে কার্তিক '৩৭

আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জলধর সেনকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা— হাওড়া

দাদা,

শেষ প্রশ্নের কিছুই লিখতে পারলাম না অসুখের জন্যে। সমস্ত দিন মাথা ভার হয়ে থাকে, কোন চিন্তার কাজই করতে পারিনি। ২।৩ দিন হ'ল সেটা সেরেছে। আমার লেখার ব্যাপারে এ ত্রুটি তো ১৫ বচ্ছর দেখে আসছেন, সুতরাং খারাপ লাগলেও আশ্চর্য যে হন নি এ কথা নিশ্চয় জানি। আবার এমনি কোরেই অবশেষে একদিন বই শেষও হয়।[১]

এই ছেলেটির হাতে এঁরই লেখা একখানা বই পাঠালাম। সেবার এর কথাই আপনাকে গল্প করেছিলাম ! বইখানি পড়ে দেখলে বোধ হয় খুসি হবেন। লেখকের নাম সুধীরেন্দু, এঁর ভারি ইচ্ছে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। যদি কোথাও প্রয়োজন মনে করেন তো আমি নিজেই সংশোধন করে দেবো। সে যাই হোক্, মন দিয়ে গল্পটি একবার পড়ে দেখবেন।

৩০।৯।২৮

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শরৎ

বেণু-র কিশোর কিশোরী পাঠক পাঠিকাদের লেখা

কল্যাণীয় 'বেণু'র কিশোর কিশোরী পাঠকগণ,—

উত্তরবঙ্গের রংপুর শহর থেকে[১] তোমাদের এইখানি লিখছি। তোমরা জান বোধ হয়, বাংলা দেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে।[২] হয়ত, আজও তোমরা এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত নও, কিন্তু এক দিন এই সমিতি তোমাদের হাতে এসেই পড়বে। তোমরাই এর উত্তরাধিকারী। তাই এ সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ হয়ে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ, তবুও ছেলে মেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করে নি। কারণ বোধ করি এই যে, কেমন ক'রে যেন তারা বুঝতে পেরেছে, আমি তাদের চিনি। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানাতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভাল মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম সত্যটাকে বোঝবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরি হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম, তাদের বাধার ত আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে, সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই। এই যুক্তিটা এমনি জটিল যে, না ব'লে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, হাঁ ব'লেও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। আর এইখানেই তাদের জোর। কিন্তু এমন ক'রে এ বস্তুর মীমাংসা হয় না। হয়ও নি। সর্বদেশে, সর্বকালে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন এসেছে ;— অধিকারভেদের তর্ক উঠেছে, শেষে বয়স ছেড়ে মানুষের ছোট-বড়, উঁচু-নীচু অবস্থার দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞানের দাবী থেকেও বঞ্চিত ক'রে রেখেছে।

তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। সত্য সংবাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের ইস্কুল-কলেজের পাড়ায়, পাছে তোমাদের এক্জামিনে পাসের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টি রোধ করা হয়, এ খবর হয়ত তোমরা জানতেও পার না।

যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশী ক'রে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম তোমাদের পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সঙ্ঘ গঠন। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে

যোগ দেবার—দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।

বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোর-বয়স্কদেরও না।

এক্‌জামিনে পাস করা দরকার,— এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক্ ক'রে রাখলে যে ভাঙ্গার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই-বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

নিজেও ত দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে ব'সে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।

তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে ক'রো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যে দিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমার ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয়ত পাবে না, হয়ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্ল্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ, তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ক'রে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ ক'রে পাওয়া যায়। কালকের এই যুব-সমিতির যুবকেরা কংগ্রেসের ধরণ-ধারণ ছেলেবেলাতেই গ্রহণ করেছিল ব'লে সে রীতি-নীতি আর ত্যাগ করতে পারে নি। এটা ভয়ের কথা। রংপুর, ১৭ই চৈত্র।[৩]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১

সামতাবেড়

ভাই চারু,

কাল তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিখানি পড়েই মনে হ'ল এখনি চলে যাই। সেবার[১] তোমাদের যত্ন আদরের কথাগুলোই মনে পড়ে। সে কি আনন্দেই দিন কেটেছিল।

গত রবিবার দিন হঠাৎ বমি আর জ্বর— দিন দুই ভারি কষ্ট পেলাম। ডাক্তার এসে বললেন, ইতিমধ্যে বারাকপুর আর হুগলি জেলার নানাস্থানে ঘুরে এসেছেন, অতএব এ জ্বর ম্যালোয়ারি ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। ৬০।৭০ গ্রেণ কুইনিন ব্যবস্থা করে গেলেন। জ্বর আর হ'ল না বটে কিন্তু দেহটা এখনো ভারি বে-এক্তার হয়ে রয়েছে। তোমাদের উৎসব[২] দিন পনেরো পরে যদি হোতো আমি নিশ্চয় গিয়ে যোগ দিতাম।

আর উৎসব না-ই হোলো। গিরিজা নরেন[৩] প্রভৃতি— এঁদের একটা নিমন্ত্রণ করে পাঠাও না। আমরা এক সঙ্গে এক বাড়িতে জুটলেই তো উৎসব সুরু হবে।

চারু, তুমি তো আসতে পারো না, সুতরাং আমার পরামর্শ এঁদের একবার ঢাকায় ডাক দাও। আমি তো আছিই।

তোমার গৃহিণীর আতিথেয়তা— আড়ম্বর নেই, অথচ সমাদরের কোথাও ত্রুটি খুঁজে পাবার জো নেই— আমার সমস্ত মনে আছে। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই— বাস্তবিক লোভ হচ্ছে যাবার।

পাথেয় আমি নিই নে ভাই। ও অনুরোধটি কোরো না। আশা করি ছেলেপুলে ভালই আছে। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিয়ো। ইতি— ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৬।

তোমার— শরৎ

২

হাওড়া রেল স্টেশন
১লা এপ্রিল ১৯৩০

ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ সি, এস, পি, সি, এ,-র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে, সার্জেণ্টদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়, কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনচি ৪ জন মরেছে।

ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাওড়া সহরেও সি, এস, পি, সি, এ, আছে এবং আমি তার চেয়ারম্যান। এও একটা বড় ডিপার্টমেণ্ট। আজ হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস,

পি, কোন মতে হাওড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছেন কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই ডিপার্টমেন্টের কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। এই জন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি। কাল সকালেই আবার ফিরে আসতে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে কিন্তু এই না-যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।

একটু গোলমাল থামুক, নিজের অফিসটা সামলে নিই। তারপরে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসবো। আশা করি মার্জনা করবে।

তোমার

শরৎ

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া
৩১শে মার্চ ১৯৩২

ভাই চারু,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ওখানে গিয়ে আর একবার কাটিয়ে আসবো সে আমার মস্ত প্রলোভন, কিন্তু আমি যে ভাই শয্যাগত। কলকাতা থেকে এক্স-রে করিয়ে ফিরে আসার পরে তোমার আহ্বান-পত্র পড়লাম, তাই উত্তর লিখতে দেরি হোলো। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তখন হয়ত আমার হাঁটুর ব্যান্‌ডেজটা দেখে থাকবে, সেই ব্যথাই এখন প্রায় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো করে চলতেই পারি নে। ভাই এ যাত্রায় আমাকে তুমি ক্ষমা করো। সাধ্য থাকলে তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতাম না।

ছেলেদের আশীর্বাদ করলাম। গৃহিণীকে আমার নমস্কার দিয়ো। তাঁর সেই অতিথিদের সেবা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। সবাই হয়ে গিয়েছিলাম বাড়ির লোক। তফাৎ ছিল না বললেই হয়। একটু ভালো হই ভাই, আমি যাবোই।

তোমার

শরৎ

৪

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর রোড,
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

চারু, সেদিন বাড়ি থেকে কলকাতায় এসেছি। শুনলাম কাগজে খবর বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মহা বড়লোকদের সঙ্গে তোমাদের ঢাকা ইউনিভারসিটি আমাকেও ডি,

লিট্ উপাধি দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি আমাকে জানাতে পারো? দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় যে সহসা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌বেন এমনও কখনো ভাবিনি।

তোমাদের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন সংবাদ আজও পাইনি, তাই তোমাকেই চিঠি লিখে ঘটনাটা জানতে ইচ্ছে করলো।

কেমন আছো? আমি মোটেই ভাল নই। তবে এ বয়সে খুঁৎ খুঁৎ করাও অসঙ্গত এবং অন্যায়। গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিও। ইতি—

২০শে মাঘ ১৩৪২

তোমাদের শরৎ

৫

২৮শে মাঘ ১৩৪২

প্রিয়বরেষু,

ভাই চারু, ইতিমধ্যে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ— এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি নে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরণো বন্ধুবান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন। তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্ত[১]-র শ্রাদ্ধ সভায় যাবার আমন্ত্রণ পত্র, শিবপুরে কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বির্তক করেছি। তুমি আছো একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না চারু। কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সুমুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক্ গে এসব কথা। তোমার মন খারাপ করে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দুখানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভ'রে যায়।

ঢাকায় যদি যাওয়া হয় তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠবো। তুমি নিমন্ত্রণ ক'রে না রাখলেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো, তাঁর আহ্বান অবহেলা করবো না।

তোমাদের— শরৎ

৬

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর রোড,

ভাই চারু,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ওখানে গিয়ে থাকবো না ত বিদেশে যাই কোথায়? তোমাদের দেশে (ঢাকায়) গিয়ে— যেখানে যেখানে যে সব সভা সমিতিতে আমাকে যোগ দেবার জন্যে

আহ্বান এসেছে, আমি সকলকেই এই জবাব দিয়েছি যে সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তারিখ নির্দিষ্ট হতে পারে না। এ কথাও তাঁদের জানিয়েছি যে, আমি চারুর বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

আজ শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এসে বলছিলেন— শরৎদা, আমি আপনার সেক্রেটারী হয়ে ঢাকায় যাবো। আমাদের উপেনমামা (বিচিত্রার)[১] বলছিলেন তারও ঢাকা যাবার ইচ্ছে। উপেন শেষ পর্যন্ত হয়ত যেতে পারবে না, কিন্তু তুলসী সম্ভবত যাবে। কোথায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা যায় বল ত?

আর একটা কথা। আমাকে কি একটা গাউন তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে? জীবনে আর কখনো প্রয়োজন হবে না শুধু একটা দিনের জন্যে একি বিপদ। সঙ্গে একটা তৈরি করিয়ে নিয়ে যাবো। ইতি— ২রা শ্রাবণ, ১৩৪৩।

তোমার স্নেহার্থী— শরৎ

৭

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড

ভাই চারু, তোমার চিঠি পেলাম। তুলসীর সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হবে না। কারণ, তার ব্লাড প্রেসার এই ক'দিনের অত্যন্ত খাটাখাটিতে আবার ১৭৫°তে উঠে গেছে। পরশু বিধান আমাকে বারণ করলেন নিয়ে যেতে। আমি গিয়ে তোমার বাড়িতেই উঠবো। আজ রমেশকে[২] চিঠি দিলাম যে চারু আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তার ওখানে না থেকে আর কোথাও আমি স্বস্তি পাবো না।

তোমাকে ও বাড়ির শ্রীযুক্তা গৃহিণী দেবীকে নমস্কার জানালুম। ৮ই শ্রাবণ, ৪৩।

তোমার শরৎ

যাবার পূর্বে তার করে তোমাকে সমস্ত জানাবো।

৮

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড

প্রিয়বরেষু,

চারুচন্দ্র, আজ প্রভাতে এসে পৌঁছেছি। বরাবর রহমান সাহেব[১] আমার সকল প্রকার সুখ সুবিধার প্রতি চোখ রেখেছিলেন।

জাহাজে জ্বর হয়েছিল কিন্তু খুব বেশি নয়। তোমাদের সমস্ত খবর জানিও, বিশেষ করে দীপুর।[২] তার কথাটাই আমার সর্বদাই মনে হয় অথচ সেবা করেছে কোরক আর হীরক[৩]। বৌমাকে[৪] আমার আশীর্বাদ দিও, এবং তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের প্রীতি জেনো। অসুস্থ মানুষকে যে যত্ন তোমরা করেছো তার সবিশেষ বৃত্তান্ত সবিস্তারে দিয়েছে আমাদের সীতানাথ[৫]।

আজ জ্বর নেই, একদিন অন্তরই দেখি বেশি হয়। কনককে বোলো তার চিঠিটা আমি সর্বদাই মনে রাখবো।

ওদুদ সাহেব[৬] কাজী সাহেব[৭] তাঁরা আমার প্রীতি নমস্কার যেন জানতে পারেন। আজ আনন্দ-বাজারে দেখলাম, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ কেন অভ্যর্থনা বলো, অভিনন্দন বলো করেন নি।[৮] যাক্। ২৩শে শ্রাবণ ১৩৪৩

শরৎ

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়[১]কে লেখা

১

ভূপেন,

একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক, ক্যাচওয়ার্ড-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ-কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই গভর্ণমেন্ট-এর ফরম্ অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় ব'লে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে ক্লাস ওয়ার, বিপ্লবের মাঝে আছে সিভিল ওয়ার ঃ— আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিবপন্থী।[২] ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

ভূপেন,

নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরাণো সত্যটা আমরা বর্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হীনতার অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ-কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে একসঙ্গে মিলেছো— তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন কর নি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন ব্যতিক্রম না হয়। ১০ই চৈত্র ৩৬।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

পরম কল্যাণবরেষু,

ভূপেন, কিছুদিন পূর্বে তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু তার পরেই আমাকে কুমিল্লায় যেতে হয়, এবং ফিরে এসেই বাড়ি যাই, এই জন্যে জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে ক'রো না। কবে যে তোমরা মুক্তি পাবে এবং কবে যে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ কথা

এই নির্জন পল্লীভবনে বসে প্রায়ই ভাবি। সাহিত্য নিয়েই তোমাদের সঙ্গে পরিচয়, এবং নিজের দেশকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাস এই জানি, কিন্তু কোন্ অপরাধে যে আবদ্ধ হয়ে আছো ভেবে পাই নে। প্রার্থনা করি যেন অচিরে মুক্তি পেয়ে আবার কর্মের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারো।

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে, এতে ভারি আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানের ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়ত তোমাদের এত বড় আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হুহু ক'রে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্যে নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।

আরও একটা কথা মনে ছিল সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙ্‌রা না করেও অতি-আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, ইন্‌টেলেক্‌ট-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এরপরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্তবিনোদনের হাল্কা ভারটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।

জেলের মধ্যে আছো[১], হাতে সময় অপরিসীম, এ বৃথা যেন নষ্ট ক'রো না, এই তোমার প্রতি আদেশ। এই নির্জন বাস পরবর্তী কালে যেন তোমার কল্যাণের দ্বার মুক্ত ক'রে দিতে পারে। বহুর সাহচর্যে বহু মানবকে যেন চিন্‌তে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমসলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।

আমার শরীর বুড়ো-বয়সে যেমন থাকা উচিত তেম্‌নিই আছে। ভালো থাকো, নির্বিঘ্নে থাকো এই আশীর্বাদ করি। ইতি— ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ '৩৮

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

প্রিয়বরেষু,

আপনার কাছে আমি যে সেদিন যেতে পারি নি তার জন্যে যেমন লজ্জিত তেম্নি ব্যথিত হয়ে আছি। কলকাতায় সেদিন গিয়েছিলাম, কিন্তু মিটিং-এর বাজে কাজের তাগিদ থেকে কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে আনতে পারলাম না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যে হয়ে এলো, না পারলাম ওখানে যেতে, না পারলাম সাহিত্য পরিষদের নিমন্ত্রণ রাখতে।

এই তো গেল হেতু। তারপরে থেকে হাঁটুতে একটা ব্যথা লেগেই রয়েছে, ভালো করে চলতেই পারচি নে।

ক্ষমা চেয়ে রাখলাম—এই ত্রুটি আর একদিন সেরে নেবো ইচ্ছে আছে। এবং যত শীঘ্র পারি। আশা করি কুশলে আছেন, এবং বাজে কাজের মাত্রা কিছু মাত্র কমেনি।[১] কিন্তু মাঝে মাঝে এটাও মনে রাখবেন যে এই বিচিত্র দুনিয়ায় মানুষের সুখের মাত্রা বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না।

যখন নিজের সঙ্গে তুলনা করে ভাবি, ওরা বুঝি বড় দুঃখেই জীবন কাটাচ্ছে, তখন আর একটু খোঁজ নিলেই দেখা যায়, তারা খাশা আছে। বরঞ্চ আমাদের চেয়ে ভালোই। সংসারে যেমন কোন বস্তুই অ্যাড্ করা যায় না, তেমনি কল্যাণও অ্যাড্ করা যায়।[২] ইতি— ২৭শে শ্রাবণ '৩৮

আপনাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালিদাস রায়কে লেখা

১

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
জেলা হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারি নে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো, তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়, কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না, সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমন একটি স্নেহ-সরস বন্ধু-বৎসল ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে-কানে যেন কত-কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে— আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বল্‌তেই হয়তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুসি করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক্ এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট,— হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার দামটি ছোট নয়। এতে ট্যাঁটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে 'জয়, যতীন বাগ্‌চীকি জয় !' বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রস-চক্রের প্রীতি-সম্মিলন। কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান করে এনে বলা— 'কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দ লাভ করেছি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে, তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও, আমরা তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।' এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘটলো, আমি যেতে পারলাম না। কারণ আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগা ডেঙ্গু এসে জুটেছে। সকাল থেকে ছোট ছেলে মেয়ে দুটির চোখ্ ছল্‌ছল্ করচে, চাকর জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েচে, আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে। রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মন প্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন আভাসে ইসারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গর-হাজিরির ঢ্যারা টানতে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু

কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন ক'রে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল একি হতে চললো? নিন্দে করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের একি নির্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায়, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানা-হানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাই নে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্, কামনা করি তোমাদের রস-চক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলো-মেলো।

তা হোক্‌গে এলো-মেলো, তবু এমনি করেই বলি, তোমাদের রসচক্রের জয় হোক্, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক্ এবং যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮।—

শরৎদা

২

কালিদাস,

কুমুদবাবু[১]র কাছে সব শুনলাম। আনন্দের সঙ্গে অর্থাৎ পরমানন্দে সম্মতি দিলাম। শুধু দেখো যেন গোড়ার লেখাটার সঙ্গে মেলে। নইলে একটু বেমানান দেখাতে পারে।[২]

শরৎদা

তোমার রসচক্রে একদিন যোগ দেবার বাসনা রইলো।

শ

কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে[১] লেখা

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,

কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়োছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাই নি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিকপত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত ক'রে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোযাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত ক'রে দেয়। গল্পেই হোক্ বা যাতেই হোক্ যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসার শূন্য,—সে টিকবে না।

ইনটেলেক্চুয়াল গল্প ব'লে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখি নি কিম্বা দেখেও যদি থাকি চিনতে পারি নি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম,. শেষ ক'রে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুব্ড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশয় [প্রশ্রয়] দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষনীয়, [দূষণীয়] হৃদয়বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার[১]কে লেখা

খাঁদু,

সেই জ্বর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কাল একটা ইন্‌জেকশান হয়েছে, আজ বেলা ৯।১০টার পরে আর একটা হবে। এ অবস্থায় কেউ যেতে চায় না।

এঁরা আর একদিন গিয়ে তোমাদের বাড়িঘর ও বৌমাকে দেখে আসবেন।

তোমার বাবাকে আমার নমস্কার দিও। আমি এবার বড় পীড়িত— শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে জানি নে।

তোমাকে ও বৌমাকে আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও।

ইতি— ৫ই আষাঢ় ১৩৪০

আশীর্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজকর্ম চুকে গেলে শিবপুরে ফিরে যাবার পূর্বে যদি সময় করে উঠতে পারো একবার এসো।

'শ'

মতিলাল রায়[১]কে লেখা

১

১৯শে আশ্বিন '৪০

প্রিয়বরেষু,

শ্রীমতিবাবু, প্রথম দফা— একজন অকৃত্রিম বন্ধুর বিজয়ার সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানবেন। যদিচ আমি চলি উত্তরে আপনি চলেন দক্ষিণে।

দ্বিতীয় দফা— আপনাদের মতো ধার্মিক ব্যক্তিরাও যদি শয্যাগত হন, আমরা কোন্ ভরসায় বেঁচে থাকবো বলুন ত? সুতরাং শয্যাগত হওয়া আপনাদের অবৈধ, ওটা ত্যাগ করুন।

তৃতীয় দফা— প্রায় ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে পড়ি কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-বাদলে এ-দিকের পথঘাট এমন দুর্গম হয়েছে যে কিছুতে সাহস পাই নি।

চতুর্থ দফা— জ্বরে ভুগলুম দেড় মাস— লিভারঘটিত। তারপরে চলেছে শ্রীঅর্শের ভয়ঙ্কর রক্তপাত। থাম্‌চে না, হয়ত এই রবিবারে যাবো হাসপাতালে। যদি ফিরতে পারি আবার চিঠি দেবো নইলে— নমস্কার।

পঞ্চম দফা— পুস্তকাগারের তরফ থেকে আমন্ত্রণ করেছেন কিন্তু অসম্ভব যে !

ষষ্ঠ দফা— বলবার কথা বিস্তর জমা হয়ে উঠেচে। পরিশেষে ভগবৎস্থানে প্রার্থনা করি, আপনার চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিদারুণ ক্রোধ যেন অন্ততঃ তেইশ ঘণ্টায় দাঁড়ায়। ইতি—

আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

২৭শে বৈশাখ ১৩৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মতিবাবু, আপনার চিঠি পেলাম। কিন্তু এ এমন দেশ যে মাশুল পাঠালেও 'তার' করার যায়গা নেই, অতএব টিকিটগুলো নষ্ট না ক'রে ফিরে পাঠালাম।

আপনার সঙ্গে আমার না আছে দেখা-সাক্ষাৎ না আছে পত্র ব্যবহার, তবু এ-কথা বাস্তবিকই সত্য যে আপনাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি কর্মী বোলে, সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বোলে। কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে হে ঈশ্বর, তুমি মতিবাবুর মেজাজটা একটু মোলায়েম ক'রে দাও। চব্বিশ ঘণ্টা চ'টে থাকাটা কমিয়ে তেইশ ঘণ্টা করো যে ঐ ফাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ একটু মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে বাঁচি।

আমার কলকাতার আড্ডাটার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাবো এবং কিছু কাল অর্থাৎ বর্ষার দিনগুলো নগরেই কাটাবো। সে সময়ে আশা আছে সর্বদাই আপনার কাছে যেতে পারবো. এবং ইতিমধ্যে ভগবান যদি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ত ঐ এক

ঘণ্টা প্রত্যহ গল্প করবো। ধর্মালোচনা নয়, বুড়ো বয়সের হাসি তামাসার কথা। তখন রাজি হবেন ত?

সে যাক্। কবে আমাকে যেতে হবে? যাবো কথা দিলুম। কেমন আছেন জিজ্ঞেসা করবো না, কারণ সন্ন্যাসীর শারীরিক কুশলাদি প্রশ্ন অবান্তর। নিশ্চয় জানি ভগবান নিজের গরজে কাজের জন্যে যত দিন ভালো রাখা আবশ্যক মনে করবেন তত দিন রাখবেন। তার পরে হিসেব দাখিল করতে ডেকে পাঠাবেন।

আমার নিজের খবরটা কিন্তু দিই। কারণ আমি ত আর সন্ন্যাসী নয়— ভালো-মন্দ আছেই। সেই দিক থেকে জানাই যে সম্প্রতি পা মচ্‌কে একটু লেঙ্‌চে চলচি। সঙ্গে সঙ্গে মালিশাদিও চল্‌চে,— আশা আছে এক দিন সোজা হয়ে হাঁটবোই। ইতি—

আপনাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,

একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা সাহিত্য নিয়ে। আপনি বলতে পারেন, তবে খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে না গিয়ে আমার কাছে কেন? তারও কারণ আছে। লোকে আপনাকে ঠিক কি ব'লে জানে জানি নে, কিন্তু আমি জানি আপনাকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষ ব'লে। কর্ম নেই, অথচ কর্মকে আপনি ত্যাগ করেন নি। এ-ও তেমনি। সেই কর্মহীন কর্মই আপনার প্রবর্তকের সম্পাদনা। তাই, বহু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখাই আপনাকে লিখতে হয়। দেখি, বহু চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসে আর যায়.— চলার পথ তাদের অবারিত কিন্তু পথ জুড়ে অন্য পথচারীর পথ আগলানোর অধিকার তাদের নেই।

প্রবর্তকের সম্পাদনায় কেবলমাত্র যদি কাব্য এবং গল্প-উপন্যাস নিয়ে থাকতেন, সাহিত্যঘটিত প্রশ্ন হ'লেও এ জিজ্ঞাসা আপনাকে করতাম না। যদি নিজের কাগজের মারফতে একটা উত্তর দেন অত্যন্ত সুখী হবো। এ বিশ্বাস আছে উত্তর দিলে সত্য উত্তরই পাবো, ফাঁকির কারবার আপনার নেই।

আচার্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচি নে,— বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর— কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হ'লেও অপরাধ নেই।

অথচ, সাহিত্য-সেবায় বহু দিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে-পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য ব'লে জানি তাকে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি

সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন ক'রেও পাই নে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ-প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না ক'রেও ত পারি নে।

জিজ্ঞাসা করি সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে?[১]

ইতি— ভবদীয়

শরৎ

অতুলানন্দ রায়[1]কে লেখা

কল্যাণীয়েষু,

শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র— সাহিত্যের মাত্রা[2]— সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হ'লেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার-পাতা-জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো।

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ কর'লে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়নি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,— কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর— সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে। এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ-কথা অস্বীকার করি নে যে কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতী-ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার— ভেবেই পাই নে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হ'লেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছু দিন পূর্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন।[৩] তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তার কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না— তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ-কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিপড়ে [পিপড়ে] কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষেব ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চক্‌চক্ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্তুপিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ-কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন— তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে-মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল— জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদ্‌লে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না ! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলছেন— স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, 'উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।' কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, 'উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে' তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজির দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই ব'লে যে, 'যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।' বচনটি স্বীকার ক'রে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিনকাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে ; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হ'লে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে বল্‌তে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ ক'রে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ, ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে।

ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হ'তে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টেলেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের ! এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুৰ্দ্ধৰ্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-ওফ্‌-ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল— লেডি ডাক্তার মীমাংসা ক'রে দেবেন এক মুহূর্তে এসে। আমাদের জলধরদাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাং সা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হ'ল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইবসেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছুকাল পরে সেকি আর চোখে পড়বে?' না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও একটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে ইব্‌সেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।[৪]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১]কে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
হাওড়া

ভাই ভূপেন,

তোমার চিঠিখানি পড়ে কত কথাই না মনে পড়লো—কিন্তু সে সব তো আর চিঠিতে লেখবার নয়। আমি ত এদিকে বজ্জাতি করেই টিকে আছি—যাবার নামটী নেই। সেদিন ছিলুম আমরা যৌবনের কোঠায়, যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার নিয়ে—আর আজ নড়তে চড়তে গেলেও মনে হয় থাকগে আজ—কাল দেখা যাবে। অতএব শরৎদার উপদেশ সেদিনের সঙ্গে এদিনের মাঝে মাঝে একটু তুলনা ক'রে দেখো—আমোদ পাবে।

চিঠির জবাব দিচ্চি ব'লে আশ্চর্য হয়ো না। শতকরা নব্বুইটা চিঠিই আমার নিরুত্তরে শেষ হয়, বাকি দশটার মধ্যে যাঁরা আজও আছেন, তাদের একজন তুমি। তাই।

তোমার নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই নিতুম, কিন্তু এই রবিবার কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছি। মাসখানেক পরে হয়না ভাই? কত খুসির সাথেই যে তোমার ওখানে যেতুম তা আর বলতে পারিনে।

তোমার ছেলেটি আমাকে জ্যাঠামসাই ব'লে ডাকে এবং পিতৃব্যের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এ কথা ঠিক তোমার মতোই জানি। বলবার প্রয়োজন নেই। তাদের সকলকে আশীর্বাদ দিয়ো এবং তুমিও জেনো পুরণো বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ। ইতি ৯ই কার্তিক ১৩৪৩।

তোমাদের শরৎদা

প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা— হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

মানিক[২] তোমার চিঠি পেয়েছি। কল্যাণীয়া দুর্গা[৩] সুস্থ হয়ে উঠেছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। সেদিনই শুনে এসেছিলুম যে এ অবস্থায় ও-রকম অনেকেরই কম-বেশী হয়, তাতে ভয়ের কিছু নেই। তোমার আফিসে যে গোলযোগ ঘটেনি এটা বড় সুসংবাদ। আফিসে দৈবাৎ যাঁরা ওপরওয়ালা অর্থাৎ কিনা 'টপ্-ডগ্', মাঝে মাঝে তাঁদের ল্যাজ চুলকে দেওয়ায় অপমান নেই। তাতে সুবিধে হয়— ফাঁড়া কাটে। সংসারে বাস করতে গেলে এর প্রয়োজন আছে তা মনে রাখা চাই।

অবসর মতো তোমাদের কুশল সমাচার দিও। ইতি— ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ[১]কে লেখা

পি ৫৬৬ মনোহর পুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু,

বারীন, তোমার বিবাহের খবর লোকের মুখে মুখে আমার কানে পৌঁছয়, নইলে আনন্দবাজার পত্রিকা আমি পাইও নে পড়িও নে। আশা করি পরমানন্দে আছ।

দেশের বাড়ি ছেড়ে আমি কোন কালেই যে সহরে উঠে আসবো অর্থাৎ পল্লীবাসীর বদলে নাগরিক, তাহলে মানতেই হবে যে সে কার্য তোমার বিবাহের চেয়েও— হবে[১]। এতে আমি সহজে রাজী হবো না, তা যত উৎসাহিতই মানুষ করুক। এখান রোজ দাড়ি কামাতে হয়, এতবড় যন্ত্রণার ব্যাপার আমি কল্পনা করতে পারি নে।

মণির ব্যাপার কিছু কিছু জানি, সব জানি নে। এমন ভয়ঙ্কর ভাগ্যবিপর্যয় অতিবড় শত্রুর জন্যেও বোধ করি কেউ কামনা করতে পারে না।

তোমার সঙ্গে বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, যদি পার একদিন এসো দুপুর বেলায়। লোকজনের ভিড় তখনই একটু কম থাকে।

৪।৫ দিন আরো এখানে আছি, তারপরেই পালাবো এবং হয়ত দীর্ঘদিন আর আসবো না।

বুড়ো বয়সে শরীরং ব্যাধি মন্দিরং, এর আর তালিকা কি দেব? তোমাদেরও যখন বয়স হবে, আপনিই জানতে পারবে।

আজ শৈলেনের গান শোনার যো নেই। বিচিত্রার লেখাটা শেষ করতে বসেছি। তারাও উর্ধ্বমুখে বসে আছে।

আমার ভলোবাসা জেনো। ইতি— ২৯শে আষাঢ় ১৩৪১

তোমাদের শরৎদা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়[১]কে লেখা

তোমার প্রশ্ন আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, [নাট্যকার] এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারো নি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর সে-সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিচার করে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক্ থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলি নে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয় নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় অ্যাক্‌শন কম,— দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু— যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না— সেই ডায়ালগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে-কৌশল জানি নে, তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু-রকমের হ'তে পারে :— এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—

চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হ'তে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বচ্ছর আগে উইল্‌সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব— বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়— পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্তে প'ড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বচ্ছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হ'লে ত হবে না,— বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা— উপন্যাসের মত নাটকের ইলাস্‌টিসিটি নেই ; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,— তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্তমান র ালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করি নে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গিরিজাকুমার বসুকে লেখা

পরম কল্যাণীয়েষু,

গিরিজা, আমি শয্যাগতও নই, উপবাস করে পড়েও নেই, তবু কেন যে তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন। ইতিপূর্বেও অনেক নিরাশ করেছি, লিখবো বলেও পারিনি, বলেছি আমি অক্ষম, কিন্তু যাই কেননা বলি, খালি হাতে যাকে ফিরতে হয় আশীর্বাদ ক'রে— সে যায় না। হয়ত ভাবে, এই ত খায় দায়, এই ত ঘুরে বেড়ায়, দু'ছত্র লেখার বেলাতেই কি হয় যত অসুখ!

দোষ দিতে তাদের পারিনে। কারণ, সাধারণতঃ অসুখের যে চেহারা তাদের পরিচিত, আমাতে তা' মেলে কই? মেলে না নিজেও জানি। সুতরাং তর্ক ক'রে ওদিকে আত্মরক্ষার উপায় পাওয়া যাবে না, দণ্ড নিতেই হবে, কিন্তু তোমার কাছে অন্য কথা। এ ভরসা করি, দোষ ক্ষালনের রাস্তা যদি আর কোথাও না খোলা থাকে, তোমার কাছে আছেই। কারণ, তুমি ত শুধু কোন একটা মাসিক বা সাপ্তাহিকের সম্পাদক মাত্রই নও,— নিজেও কবি। অর্থাৎ আমাদেরই সগোত্র— জ্ঞাতি। সাহিত্য সেবার আনন্দ বেদনা তুমি জানো, সাহিত্য সেবকের দুর্দিনের খবর রাখো। তোমাকে স্মরণ করানো চলে যে, সাহিত্যিকের বাহ্য ও অভ্যন্তর— সমসূত্রে গাঁথা নয়। একের সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরের বিচার করা যায় না। এমন বিড়ম্বনাও ঘটে যখন দেহ দেখায় সুস্থ, কি সুপুষ্ট, মন হয়ত তখন একেবারে দেউলে, মাথাটা হয়ে থাকে মরুভূমি। তাকে নাড়া দিলে ভাবের বদলে অভাবের শুকনো ধূলোই বেরিয়ে আসতে চায়। সেই দুঃসময় চলচে আমার এখন। ইতি— ১১ই আশ্বিন ১৩৪১

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা

কল্যাণীয়া জাহান-আরা,

তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছো। আমার বর্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্,— এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ-কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত ! এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান্ হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্চে। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে ব'লেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান-সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন,[১] এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়. কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশিও সে নয়। যে কারণেই হোক, এতদিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য চর্চ্চা ক'রে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হ'তে পারে নি। তাই ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ-কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা যায়গায় এত বড় বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে ! স্পর্শ করে নি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন,

দৃষ্টিকে আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, এক-ই দেশে, এক-ই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, এক-ই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এম্‌নি বিচ্ছিন্ন, এম্‌নি পর হয়ে আছে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হ'লে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন, উপায় হচ্চে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান-পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু এক-ই আনন্দ এক-ই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ-কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এ-ও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন— এমনি নন্ কো-অপারেশানই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না চিরদিন চলবে না , কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে— অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।[২]
—১২ই মাঘ '৪২।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবি

হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন সভ্য।
উপবিষ্ট— বাঁদিক থেকে— নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, হরিহর শেঠ, অজরচন্দ্র সরকার। দণ্ডায়মান— মাঝখানে— সুবোধচন্দ্র রায়।

হরিহর শেঠ[1]কে লেখা

১

কল্যাণীয়েষু,

অসুখ ত আজও সারেনি, এক বৎসর সমানে চলচে। তবু আপনাদের ওখানে যেতেই ইচ্ছা করে। কাল কিম্বা পরশু আমার এখানে এলে দেখা হবেই। আশা করি আপনাদের কুশল। ১।৬।৩৬

শুভার্থী— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শুক্রবার দিন রাত্রে কলিকাতায় আসিয়াছি। আপনার ছেলের সঙ্গে আজ কথাবার্তা হইতেছিল, তাঁকে বলিয়াছি আপনাকে জানাইতে যে আগামী রবিবার যাবার দিন স্থির রহিল। ২২।৬।৩৬

ভবদীয়— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

প্রিয়বরেষু,

হরিহরবাবু আমি রবিবার বেলা ৪টার সময় কিম্বা কিছু পূর্বে চন্দননগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমার কাছে এজন্য কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না। আমার সামনের টেবিলে যাবার কথা লিখিয়া রাখিলাম। ভুল হইবে না। আমার সঙ্গে সম্ভবতঃ উপেনবাবু (বিচিত্রা সম্পাদক) যাইবেন। যাবার সময় উহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইব। ২৩।৬।৩৬। শ. চ.

গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তী[১]কে লেখা

১

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়,

তোমার রোগীর অবস্থা একটু কঠিন হয়েছে বলেই সন্দেহ হয়। কাশিটা খুব বেশি, তাছাড়া কম্প দিয়ে জ্বর হয়েছে। লিভারটা পেকেছে বলে সাধন ডাক্তারে[২]র ধারণা। কাল একবার এসো 'এস্‌পিরেট' করবার যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমার কাছে এসে তারা সবাই কাঁদাকাটা করচে, তাদের বিশ্বাস আমি ডাকলে তুমি অস্বীকার করবে না। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

ইতি— ১৫ই পৌষ ১৩৩৯। আঃ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কাছে লোক পাঠাচ্ছি, বাবাজি[১], পত্র পাওয়া মাত্র এখানে আসার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।

আমার বড় ভগিনীপতি— মুখুয্যে মশাই হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশবাবুও মনে করচেন অবস্থাটা হয়ত ক্রমশঃ মন্দের দিকেই এগুচ্চে। কাল বিকালে অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি উপলক্ষ্য করে ভয়ানক বমি সুরু হয়, মাথা ঘুরে পড়েও যান, তার পরে থেকেই 'পাল্‌স' পর্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। কোন মতে তোমার যতশীঘ্র সম্ভব আসাই চাই এই অনুরোধ।

শুভার্থী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যদি কাছে থাকে কিম্বা ওখানকার কোন দোকানে পাওয়া যায় একবাক্স 'অ্যামিলনাইট্রিক অ্যাম্‌পিউল' সঙ্গে এনো। আমাদের যেটা ছিল শেষ হয়ে গেছে। 'ব্রিদিং' এর কষ্ট খুবই আছে।

৩

কল্যাণীয়েষু,

বাবাজি, তোমাকে একবার আসতে হবে। রমেশবাবু (ডাক্তার) নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চান না। তিনি চান তুমি এসে তাঁকে একটা পরমার্শ দিয়ে যাও। যত শীঘ্র সম্ভব এসো, এই অনুরোধ। ৬ই মাঘ ১৩৪০

কাকাবাবু

৪

সামতাবেড়, পানিত্রাস

কল্যাণীয়েষু,

বাবাজি, তোমাকে শীঘ্র একবার আসতে হবে। তোমার কাকিমার অসুখটা বোধ করি ক্রমশঃ বাঁকা দিকই নিচ্চে। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪০

আঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫

পরম কল্যাণীয়েষু,

গুপী, অনেক দিন তুমি আমাকে দেখোনি, একবার এসে দেখে যাবে এখন কেমন আছি। নিজের ত মনে হয় ভাল আছি। সুতরাং আমাকে দেখাটা গৌণ। তোমার কাকিমাকে আজই একবার দেখা অতিশয় প্রয়োজন বলে বোধ হয়। কলকাতায় তিনি ভালই ছিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে সকলকে নিয়ে এ বাড়িতে আসেন, প্রথম দিকটায় কোন হাঙ্গামা ছিল না, কিন্তু দিন পনেরো থেকে খুবই শরীর খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে। মাথা ঘোরা, ঘুম ভাল না হওয়া প্রভৃতি এত বাড়ে যে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তখন আমি ছিলাম কলকাতায়, এঁরা আমাকে চিন্তিত করার আশঙ্কায় সংবাদ দেন নি। যাই হোক্, সেটা অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি স্থির করে রমেশ ডাক্তারবাবু ওযুধ দেন এবং তাতেই ভাল হয়। কিন্তু তার দিন দশেক পরে পরশু থেকে আবার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ সেই মাথা ঘোরা, মাথা ভার প্রভৃতি— আজ রমেশবাবু ওষুধ দিয়ে গেছেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। আমার আশঙ্কা পাছে ব্লাড প্রেসার হয়ে থাকে। লক্ষণ অনেকটা যেন ঐ রকম। কিন্তু রমেশবাবুর বিশ্বাস অ্যাসিডিটি, উইণ্ড প্রভৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যাই হোক্, আমার ত দুশ্চিন্তার অবধি নেই যতক্ষণ না তুমি এসে নির্ভয় করে যাও। ব্লাড প্রেসার পরিমাপ করার যন্ত্রটা এনো—তবেই নিশ্চিত বোঝা যাবে এটা কি আরম্ভ হয়েছে! তোমার আশায় রইলাম। আমার স্নেহাশীষ জেনো। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩৪৪

শুভার্থী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

সামতাবেড়, পানিত্রাস
২১শে আষাঢ় ১৩৪৪

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে রোগীদের খবর দেবার জন্যে নকুল[১]কে আজ পাঠালাম।

(১) তোমার কাকিমা মোটের উপরে বেশ ভালই আছেন। মাথা ঘোরা এবং অম্বল দুটোই নেই, কারণ খাচ্ছেন দাচ্ছেন এবং ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন। মিক্‌শচারটা কি ফুরিয়ে গেলে আবার আনাতে দেবো? ব্লাড প্রেসারটা কি কম হলো?

(২) প্রকাশ এখানে নেই, কলকাতায় আছে। সে ওষুধ খাচ্ছে।

(৩) ছোট বৌমার ওষুধ খাবার পরে থেকে অত্যন্ত গলা তেতো হয়ে থাকতো। ওষুধ খাওয়া তাই বন্ধ করেছেন। কাল গলা তেতো আর টের পান নি। ও ওষুধটা বোধ করি তাঁর সইল না।

(৪) আমি নিজে এক প্রকার ভালই আছি। অবশ্য এ বয়সে যতটা ভাল থাকা সম্ভব। আমার জন্যে 'বেন্‌জিড্রাইন'গুলো পাঠিয়ে দিও। অন্যান্য সংবাদ একই প্রকার।

শুভার্থী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কুমুদশংকর রায়[১]কে লেখা

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন
কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু,

কুমুদ, পত্রবাহক তুলুর[২] যে একটা ছবি 'ফটো' রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে নেওয়া হয়েছিল, তার রিপোর্ট নাকি তোমার কাছে ছিল। সে যাই হোক, তোমার কি মনে আছে ছবিতে কি অসুখ ধরা পড়েছে? যদি জানো একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ইলেক্‌শন ব্যাপার কেমন চলছে?[৩] ৮ই চৈত্র ১৩৪২

শরৎবাবু

রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা

১

24 Aswini Dutt Road,
Calcutta

প্রিয়বরেষু,

আপনাকে আমার মনে থাকবে না[১] এ কি রকম কথা? মনে বরাবরই আছে এবং থাকবে। চারু[২] আমার ছেলেবেলার বন্ধু ; তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতেই মন চায়।

তবে দিন কয়েক যখন থাকতেই হবে তখন প্রতিদিনই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

তুলসী গোঁসাই[৩] বলছিলেন আমার সঙ্গে যাবেন, তাই আমি লিখেছিলাম তাঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করতে, কারণ বাহ্যতঃ ওরা যত দুঃখই স্বীকার করুক ওদের অভ্যাস আলাদা, খুব গরীবের মত থাকতেও পারে কিন্তু পারা উচিত নয় মনে হয়।

পরশু রাত্রে তুলসীর বাড়ি থেকে ডাক্তার বিধান রায় আমার গাড়ীতে এ বাড়িতে এলেন—বললেন, কথা আছে তাই সঙ্গে যেতে চাই। পথে বললেন, চার মাস পূর্বে বহুকষ্টে ওকে বাঁচিয়েছি, blood pressure উঠেছিল ২৪০।। তারপরে একে নামিয়ে এনেছিলাম ১৪০'তে। কিন্তু কিছুদিন থেকে communal award নিয়ে খেটে খেটে[৪] আবার হয়েছে ১৭৫।। সুতরাং ওকে আপনি কিছুতেই নিয়ে যাবেন না। গেলে অবশ্য খুবই ভালো হতো। কারণ এই মানুষটি যেমন পণ্ডিত তেমনি সজ্জন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হতো। কিন্তু তা ঘটলো না। বোধ হয় আমাকে একলাই যেতে হবে। তাই তুলসীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই করতে হবে না।

রাধাকুমুদকে[৫] চিঠি লিখেচি লক্ষ্ণৌ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসতে, যদি রবিবারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় তাহলে সে যেতে পারে। তাকেই Secretary করে নিয়ে যাবো। অবশ্য তার কাজ হবে আলাদা। আপনাদের কারও সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যাই হোক্ রওনা হবার পূর্বে তার করে সমস্ত জানবো। জগন্নাথ হল ব্যাপারে[৬] আপনারা যা হুকুম করবেন তাই করবো। আপনাকে এবং গৃহের শ্রীযুক্তা গৃহিণীকে আমার প্রীতি ও নমস্কার জানালুম। ইতি— ৮ই শ্রাবণ '৪৩।

আপনাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

রমেশবাবু, আজ আপনাকে যে চিঠি লিখেচি সে বাতিল করতে হলো। তুলসী গোঁসাই এই মাত্র আমাকে ফোন করছিলেন তিনি বেশ ভাল আছেন, এবং ঢাকা নিশ্চয় যাবেন।[১] আমরা সোমবারে রওনা হয়ে মঙ্গলবারে গিয়ে ঢাকায় পৌঁছব। ইতি— ৮ই শ্রাবণ ১৩৪৩

আপনাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

21, Aswini Dutt Road,
Calcutta.
The Vice Chancellor Dr R C Majumder Ph D
Dacca.

ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা[১] জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে নমস্কার দিবা ও চারুর সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

'নানান্ ছাপের জম্‌লো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো
ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড়, করলে যখন অস্থি জর জর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

অতএব, দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয় অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্য সহচর ৯৯ জ্বর, তুমি আর একটু খানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরব্ধ কাজটুকু চট্‌পট্ সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি— ১১ই পৌষ ১৩৪৩।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর
কালীঘাট, কলিকাতা

প্রিয় সুরেন,

গিরীনের মৃত্যু সম্বাদ পেলাম। সান্ত্বনা এই যে আমাদেরও খুব বেশি দিন আর নেই, নিষ্কৃতির পথে এসে পৌঁছেছি। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, খোলার যা দেরি।

এই সেদিন তুমি, আমি ও গিরীন এক সঙ্গে বসে দুপুরে ভাত খেলাম— পোনের দিনও হয়নি বোধ হয়— অথচ আর সে নেই। ভাবছি আমার কবে এমনি শুভ দিন আসবে ! বেঁচে যাবো।

Nat mur আজ সকালে দিলাম। পরে জানাবো। ৫ই ভাদ্র ১৩৪১

তোমার শরৎ

তোমাকে সেদিন বলেছিলাম, গিরীন বোধ করি, এক আধ বছরের বেশি বাঁচবে না। কিন্তু এক আধ বছরও সইলো না।

শ

২

তোমাকে একখানা রেজিস্টার্ড চিঠি ৫।৬ দিন পূর্বে দিয়েছি, আজও তার জবাব পেলাম না। দেখে খুবই আশ্চর্য ও চিন্তিত হয়েছি। আমি এসে পর্যন্ত জ্বরে শয্যাগত। পত্রপাঠ উত্তর দিয়ো।

শচ

শেষের চিঠিটার পোস্টকার্ডে ঠিকানা ছিল--
The Head Master
Durga Mohan M. E. School
Bhagalpur (Behar)

৩

প্রিয় সুরেন,

প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। সেই মাথাধরা আবার সুরু হয়েছে। ঠিক তেমনি। মাঝে দিন ১০।১৫ ভাল ছিল মাত্র। তাও সম্পূর্ণ সারেনি। ডাক্তারেরা (বিধান প্রভৃতি) অনুমান করছেন চোখের জন্যে। বামাপদ[১] একজোড়া পড়ার ও এক জোড়া দূরে দেখার চশমা দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক হয়নি। কাল দুপুরে J. N. Maitra চোখ দেখে নতুন prescription করেছেন।

তিনি বলেন, বামাপদর দেওয়া চশমায় ভুল ছিল। Astigmatism দোষটা over corrected হয়ে গিয়েছিল। তাই মাথাধরা কমেনি, বরং বাড়ছিল। এবার দেখি কি হয়। বিনা চশমায় লিখছি। কাল নতুন চশমা পাব আশা করি।

উমাপ্রসাদ[২] সেদিন এসেছিলেন। তিনিই তোমাকে form এবং চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এখানকার অর্থাৎ কলকাতার ঠিকানা থাকলে পরীক্ষক হবার দিক থেকে কোন গোল থাকত না। তাই শ্যামাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করে উমাপ্রসাদই তোমাকে ভাগলপুর ও মনোহরপুকুর দুটো ঠিকানাই দিতে লিখেছিলেন। পরীক্ষক[৩] হবার দিক থেকে কোন মুস্কিল নেই, [illegible] উমাপ্রসাদ তাই বলেন।

আমি বাড়ি যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করচি। বোধ করি মেয়েরাও যাবেন। অন্যান্য খবর সেই মতো।

ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ দিও।

তোমার শরৎ

৮ই অক্টোবর, ১৯৩৫
পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর
কালীঘাট, কলিকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১

Calcutta

প্রিয় সত্য,

কাল তোমার চিঠি পেয়ে আশান্বিত হ'লাম। এদিকে নানা মতামতের ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অবস্থা শোকাবহ। এইমাত্র টেলিফোনে খবর এলো আজ রাতে আর একজন ডাক্তার আসবেন, নতুন ধরণে পেচ্ছাপ একজামিন হবে। তারপরে বোধ করি আমার চোখের জলের পরীক্ষা হবে। কাল দুপুরে একটা Emetine injection হয়ে গেছে, আজ দ্বিতীয় প্রস্থ calcium injection, হবে। ইতিপূর্বে দুই দফায় বারোটা কুইনিন ফোঁড়া হয়ে গেছে। সর্বদেহে আর স্থান নেই, এইবার বোধ হয়, তারা চোখে ফুঁড়বে। এর উপর শুভার্থীরা আছেন, কেউ বলছেন, ঐ যমদূত ব্যাটাদের দূর করে দিয়ে কোবরেজ ডাকুন, সে বাঁচাবে। কেউ বলছেন, ওরা কিছুই জানেনা— তার বদলে ভবানীপুরের সাহা ডাক্তারকে ডেকে পাঠান, তিনি ছোট্ট দুটি globules দেবেন তাতেই সাত দিনে সমস্ত আরাম হবে। পরশু বসুমতীর সতীশ মুখুজ্যে এসেছিলেন, তিনি বললেন, দাদা, আসলে আপনার হয়েছে ন্যাবা। আমি এক গাছা মালা এনে দেবো গলায় পরবেন, রোগ যেমন যেমন ভালো হবে মালা লম্বা হতে হতে পা পর্যন্ত গিয়ে আপনি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। স্থান পরিবর্তন ত অনেকে উপদেশ দিচ্ছেন।

রবিবাবুর সেই শ্লোকটা মনে পড়ে—নিজের আশে পাশে চেয়ে—'নানান্ ছাপের জম্‌লো শিশি, নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো, ব্যাধির চেয়ে আধি হলো বড়ো, ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো'। অথচ ভারি শীত কাতুরে লোক আমি, দেওঘরের কন্‌কনে বাতাস মনে পড়লে যাবার উৎসাহ নেবে zero ডিগ্রিতে এসে দাঁড়ায়। এর চেয়ে ভাবচি আমার পাড়াগাঁয়ের রমেশ ডাক্তারই ছিল ভালো। তিনি রোগ না সারাতে পারুন বিবিধ উৎপাতের সৃষ্টি করতেন না। আর একটা কথা— ৬১ বছর বয়সটা ত উপেক্ষা করবার নয়, তাকে সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় এখন মেনে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ। শেষের সে দিন মন, করো রে স্মরণ ইত্যাদি— চোখ বুজে ভক্তিভরে আবৃত্তি করে চুপ করেই থাকাই ভালো। তাতে অন্ততঃ এই শীর্ণ দেহটা দিন কয়েকের বিশ্রাম পাবে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে মনে মনে জপ করবো, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্য সাথী ৯৯° জ্বর ! তোমাকে বিচলিত করার বৃথা চেষ্টা আর আমি করবো না, তুমি কিন্তু দয়া করে একটু চট্‌পট্ তোমার কাজটা সেরে ফেলো। চিরদিনের বৈরিগী মানুষ আমি, আমার আর নালিশ কিসের? বাবা বৈদ্যনাথ ধাম বাসের সংকল্প শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা জানিনে কিন্তু টিকে যদি থাকে ত তুমি যে এখনও ওখানে আছো এ একটা মস্ত সান্ত্বনা।[১] খবর তোমাকে দেবই। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি— ৮ই পৌষ ১৩৪৩।

শরৎ

২

সামতাবেড়,

প্রিয় সত্য,

পাঁচশ টাকা পেয়েছি[২]। তুমি মুঙ্গেরে[৩] যাবার পরে ওখানেই প্রাপ্তি সংবাদ দেবো স্থির করেই চিঠি দিতে দেরি হলো। জীর্ণ গৃহে কত ভূতেই যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ইজি চেয়ারে শুয়ে সেই কথাই ভাবি আর বলি, দয়াময় দেরি কতো? তোমাদের ডাক্তারি কেতাবে এ বিড়ম্বনার কাহিনী লেখে কি সত্য? তবে জ্বরাসুরের প্রাত্যহিক মার থেকে নিস্তার পেয়েছি, এইটুকু সান্ত্বনা। সুরেনের চিঠি পেলাম ... ওখানের সজ্জনগণের বৈরিতার অবধি নেই। তাঁরা সাধু, তাঁরা নিষ্পাপ। বিধাতা তাঁদের কল্যাণ বিধান করুন। কাল পরশু কলকাতায় যাবো। ... নানা কারণে আজ মন বড় ভারাক্রান্ত। আমার ভালোবাসা জেনো। কলকাতার ঠিকানায়—২৪ অশ্বিনীদত্ত রোড—যদি পারো তোমার নতুন জায়গার একটু খবর দিও। ইতি— ২৭শে ভাদ্র '৪৪।

শরৎ

ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পি ৫৬৬ মনোহর পুকুর
কালীঘাট, কলিকাতা

প্রিয় ভূপেন,

তোমার চিঠি পেলাম। অর্শের রক্ত আমার যখন কিছুতে থামছিলো না, তখন সুরেনের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন বায়োকেমিক Fer Phos 6x এবং cal. flour 6x দিনে ৫।৬ বার খেতে দিন তিনেকের জন্যে রক্ত বন্ধ হয়েছিল। প্রায় ৬ মাস পরে আবার দিন ৪।৫ পূর্বে রক্তপড়া সুরু হয়েছে, আবার সেই ওষুধই খাচ্ছি। দেখি এবার কি হয়। তুমিও তাই করো।

দিন ২০।২৫ পূর্বে আমার বাড়ি থেকে ভয়ানক রোদের মধ্যে অতি দ্রুত বেগে ষ্টেশনে আসার ফলে Sunstroke এর মত হয়। আজও মাথাধরা থামেনি। কবে থামবে জানিনে, আজ আবার দেশের বাড়িতে যাচ্ছি।

সুরেন দিন চারেক হলো হাসপাতাল থেকে আমার এ বাড়িতে এসেছেন। ভাগলপুরে ইনসুলিন injection এর ফলে প্রায় মরমর অবস্থায় কলকাতায় পৌছান।[১] এখানকার ডাক্তারেরা তাই বলে। এখন আরোগ্যের দিকে। প্রাণের আশঙ্কা আর নেই। ঘা শুকিয়ে আসছে।

অন্যান্য খবর মন্দ নয়। তবে রবির[২] আজ influenza জ্বর হয়েছে। তোমাদের কুশল সম্বাদ দিও। তবে আমার কাছ থেকে জবাব না পেলে দুঃখ কোরো না। কারণ, আমি প্রায়ই এখানে থাকিনে। অনেক দিন পরে আবার যখন ফিরে আসি তখন আলস্যের ফলে জবাব লেখা আর ঘটে ওঠে না। তবে মনের মধ্যে তোমাদের প্রতি তেমনিই স্নেহপ্রীতি আছে। ইতি— ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

শরৎ

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কালীঘাট, কলিকাতা

প্রিয় সেজ কত্‌তা,

তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু এমনি দুর্বল যে উঠে বসে দু ছত্র জবাব দেবো সে শক্তি নেই। বিধান ডাক্তার দেখচেন— পিলে হয়েছে। আজ Dr. K. S. Roy সকালে এসেছিলেন, নানা পরীক্ষা করে বললেন, পিলে হাতে আর ঠেকে না।

একদণ্ড ইচ্ছে হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা ত কেউ ছেড়ে দেবে না।

জ্বর কাল বিকালেও ৯৯° হয়েছিল ; ঘণ্টা ৩।৪ থাকে। দেশেও ত ম্যালেরিয়া, এর ওপর যদি আবার নতুন infection জোটে ত আর সারাই শক্ত হবে। তোমার নিজের যে অসুখটা সেরেছে এতে কত যে আনন্দ পেয়েছি তা লিখে জানাবার নয়। পায়ের জুতো কিন্তু সেই রকমই পোরো। একটু বড়। যেন চলতে ফোস্কা না হয়।

রমেশ ডাক্তারকে[২] আমার নমস্কার দিয়ে বোলো যে, অসুখের সময়ে তাঁর কথা অনেক ভেবেচি। একদিন বিধানকে বলেও ছিলাম যে আমাদের রমেশের চিকিৎসা না হলে হয়ত জ্বর যাবে না।[৩]

কতদিনে যে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবো এ ভাবনা নিত্যি ভাবি সেজ কত্‌তা।

কলকাতা আমার একেবারে ভালো লাগে না। মাঝে ঢাকায় যেতে হয়েছিল[৪] হয়ত শুনে থাকবে। অসুখটা সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নমস্কার জেনো। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩৪৩

তোমাদের শরৎ

২

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা

ভাই সেজকর্তা,

তোমার চিঠি পেলাম। পারুর[১] চিঠি হোঁদলের[২] হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা[৩]র জন্যে তোমার মনের মধ্যে যে সত্যকার উদ্বেগ ছিল,[৪] আমি তা জানতাম বলেই প্রতিদিন একখানা পোষ্ট কার্ড তোমাকে পাঠাতাম। যাই হোক, সে গেছে— এখন অকারণ শোক লালন করা এবং প্রাত্যহিক জাগতিক ব্যাপ্পারে তাকে বহন করে চলা নিষ্প্রয়োজন। স্থির হওয়াই ভালো। দিদিকেও সেদিন এই কথাটাই বলে এসেছি।

আমার স্বভাবটা একটু [অদ্ভুত]। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, মরে গেলে আর বড় সে চিন্তা করিনে। কারণ, মৃত্যুটা আমার কাছে অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার।

নিরন্তর ঘটবে,— এই দুনিয়ার আইন। এ আমি মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছি।

আশার মৃত্যুকালে[৫] আত্মীয়ের মধ্যে একা আমিই উপস্থিত ছিলাম। ডাক্তার নার্স প্রভৃতি এঁরা ত ছিলেনই। গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আশা আমাকে চিনতে পারছিস রে? তার দুচোখ বেয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়লো, আমি মুছিয়ে দিলাম। সে ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না। মিনিট পাঁচ-ছয়, তারপরে প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার খোলা চোখ দুটো হাত দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করে চলে এলাম। অর্থাৎ, তাকে যেন মড়ার ঘরে পাঠানো না হয় ইত্যাদি। বেলঘরেতে[৬] এই সংবাদ লোক দিয়ে হোক, টেলিগ্রাম করে হোক দেবার জন্যেও হাসপাতালে instruction দিয়ে এলাম। তারা সেই মতোই সব কাজ করেছিল। সেই নিশীথ রাতে ডাক্তার ও নার্সদের কথা আমাকে বড় বিচলিত করেছিল। তারা দশ বারোজন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা জানিয়ে বললে, আপনি আমাদের অক্ষমতা মার্জনা করবেন, মানুষের যেটুকু সাধ্য ছিল আমরা করেছি। আমি শুধু জবাব দিলাম, সে আমি জানি। তোমাদের কাছে ওর আত্মীয়স্বজন সকলের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের শক্তি ও ইচ্ছের উপরে আরও একটা শক্তির ইচ্ছে ছিল না যে ও বাঁচে। ওর মেয়াদ ফুরিয়েছে—সে কারাগারের বদ্ধ দুয়ার রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটে খুলে দিলে, কার সাধ্য ওকে এক সেকেণ্ড বেশি ধরে রাখে।

যাক্, এসব কথা। আমার শরীর বাড়ি থেকে আসার পরে ঢের বেশি খারাপ হয়ে গেছে। আমরা সবাই পুজোর নবমীর দিনে বাড়ি যাবো। অন্যান্য খবর তেমনিই, তেমনি ভালো মন্দে জড়ানো।

ঝড়ের প্রাবল্যে সর্বত্রই বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। আমার কি কি ক্ষতি হয়েছে লক্ষ্মণকে[৭] একটু লিখে জানাতে বোলো। ইতি— ১৫ই আশ্বিন ১৩৪৪

শরৎ

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

১

'মালঞ্চ'
দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়েষু,

হোঁদল, আজ দশদিনের মধ্যে বাড়ির খবর কেবল একখানা চিঠিতে পেয়েছি। অসুস্থ দেহে সকলের জন্যে বড় চিন্তা হয়। তোমার মামীমা[২] তো চিঠি লিখতে জানেন না, সুতরাং তোমরা অনুগ্রহ করে যদি প্রত্যহ না হোক ২।১ দিন পরে পরেও এক আধটা পোষ্ট কার্ড দাও তো কতকটা নিশ্চিন্ত হই। ইতি— ২৬শে ফাল্গুন।

বড় মামা

২

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া।

পরম কল্যাণীয়েষু,

কাল রাত্রেই তোমার ও টাবুর[১] চিঠি পেয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। এতদিন কোন খবর বা তিনকড়ি প্রভৃতির চিঠি[২] দিদিকে দিই নি. কাল রাত্রেই শুধু তাঁকে সব কথা জানালাম।

তুমি যে ভাবেই হোক প্রত্যহ আমাকে একটা চিঠি লিখে পারুর খবর জানাবে। কত জ্বর, জ্বর কতক্ষণ ছাড়ে প্রভৃতি সমস্ত detail দিয়ে লিখো।

তোমাদের বড় মামীমা এখন একটু ভাল আছেন।[৩] আমি ৩।৪ দিন পরে ওখানে যাবো। কারণ, Income tax Office এ আমাকে যেতে হবে ২৬শে তারিখে।

অন্যান্য সংবাদ মন্দ নয়। ছোট বৌমা, প্রকাশ, ছেলে-মেয়েরা এখন মুঙ্গেরে আছেন। কবে আসবেন ঠিক জানিনে। ইতি—৩রা শ্রাবণ ১৩৪৪।

শুভার্থী
বড় মামা

একটা করে পোষ্ট কার্ডও লিখো।

৩

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

কালরাত্রে তেলির-মা[১] আমাকে অনেক করে বললেন, তোমাকে চিঠি লিখতে তেলির জন্যে একটা Takazy me[২] ওষুধ কিনে আনতে। সরোজ[৩] টাকা দিয়ে গেছেন, কিন্তু সে টাকা পাঠাবার সময় নেই, তুমি এখানে এলেই পাবে। অন্যান্য সংবাদ একই প্রকার।

কালীকে বলে দিও[৪] আমি বোধ করি বুধবারে কলকাতায় যাবো একবার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ইতি— ১৪ই কার্তিক '৪৪

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার বড় মামীমা বলে দিলেন, ভাল চা আনতে। এবারকার মতো গুঁড়ো চা যেন এনো না।

শচ

৪

Sarat Chandra Chatterji D. Lit.

Phone—South 81
24, Aswini Dutt Road,
Calcutta

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাওড়া।

কল্যাণীয়েষু,

হোঁদল, নকুলের হাতে ১০০ টাকার cheque পাঠালাম। ৬০ টাকা তুমি নিয়ে এদের দিও। বাকি টাকা নকুলের হাতে যদি পাঠাতে পারো ভালো হয়। না হয় আর কোন ব্যবস্থা হবে। নকুলকে বলেছি এই সব জিনিস আনতে—

কিছু মিষ্টি কমলা লেবু

কালীপদ	—	৩৫	টাকা
Telephone	—	১০	"
Electric	—	৫	"
সংসার খরচের	—	১০	"
		৬০	টাকা

Cascara Sagrada—৩ টাকা
Soda water
Olive oil—one pound
ইতি—২৪শে কার্তিক '৪৪

পুঃ— cheque বইয়ের পাতা নেই। form টা Bank-এ দিও। আমি একটু ভালো হলেই যাবো। হয়ত আরও দিন তিনেক দেরি হবে। খুবলাল মাইনে চায়। তার কত মাইনে পাওনা হয়েছে জানিনে। হিসেবের খাতা কলকাতায়। তার ৩০ টাকায় যদি আপাতত কাজ চলে দিও। নকুলের হাতে টাকা নেই, তাকে তোমার টাকা থেকে জিনিস কেনবার মতো দিও।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১

'মালঞ্চ', দেওঘর
খামে পোঃ অঃ শিলমোহর ছিল— দেওঘর ৫ । ৩৭
কালীঘাট ৬ । ৩৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

প্রকাশ, আজ তোমার চিঠি পেলাম। আমি ভুল করে লিখেছিলাম মে মাস। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই বাড়ি যাবার ইচ্ছে আছে। অর্থাৎ আর ২।৩ দিন পরেই। শরীর আমার ভালই আছে, তবে ভাগলপুরে যাতায়াত করায়[১] এবং সেখানে নানাবিধ ছুটোছুটির কাজে, রৌদ্রে, গরমে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। একদিন গঙ্গাস্নান করায় (ভাগলপুরে) ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল। কারণ, ওখানে আমরা যখন যাই তখন হঠাৎ ভারি ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল।

আমার ইচ্ছা আছে কলকাতায় বেশি দিন থাকবো না। এক সপ্তাহ আন্দাজ থেকেই বাড়ি যাবো।

মৃত্যুঞ্জয়[২] ঠাকুর জীবন[৩] প্রভৃতি সকলেই ভালো আছে। আমাকে অনেকেই বলচেন এখানে গরমের সময় আরও কিছুদিন থাকতে— কিন্তু আর একটা দিনও ভাল লাগচে না। তোমার বৌদিদিকে জানিও আমি কলকাতায় ৫।৭ দিন থেকেই বাড়ি যাবো। তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জেনো। কাল পরশু আবার চিঠি লিখবো হাওড়া ষ্টেশনে পৌছবার ঠিক সময় জানিয়ে। তোমরা সেই মতো গাড়ী পাঠিও।

শুভার্থী--- দাদা

অর্শের রক্তপড়া একেবারে বন্ধ ছিল কিন্তু ভাগলপুরে যাওয়া পর্যন্ত আবার রক্তপড়া সুরু হয়েছে। তবে বেশি নয়। বোধ করি যে অর্শগুলোতে ইনজেক্‌শান দেওয়া হয়নি। সেইগুলোই বড় হয়ে উঠেচে।

হিরণ্ময়ী দেবীকে লেখা

১

পরম কল্যাণীয়াসু,

বড় বৌ, তোমরা এইবার একটু শীঘ্র করে চলে আসার উদ্যোগ করো। বামুন ঠাকুর না হয় ওখানেই দুই এক মাস থাক, কারণ আমি ত মাঝে মাঝে আসবোই, আর তাছাড়া ঠাকুর সেবার একটা ব্যাপারও আছে। ওদের বাড়ি থেকে ছেলেরা এসে ঠাকুর পুজো করে যায় বটে, তবু ফুল তোলা ঠাকুরের অন্যান্য কাজকর্ম ত আছে। সব ভার জীবনের ওপর দেওয়া চলে না।

কুমুদশংকর ডাক্তার বলছিলেন যে এবার বৌদিদির একটা চিকিৎসা হওয়া চাই।[১] সে বলে ইলেকট্রিক ব্যবস্থা করলেই ওটা ছোট হয়ে যাবে, এমন অনেক হয়, তাহলে কাটাকুটির কোন প্রয়োজন হবে না। কাটাকুটির ইচ্ছে কুমুদের নেই। একটু বেশি দিন ধরে ইলেকট্রিক ব্যবস্থা হলেই ঠিক না সারলেও ঢের ছোট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আমার একদিন অন্তর আর এক ধরণের ইলেকট্রিক চিকিৎসা চলচে। মনে হচ্চে, সুবিধে হচ্চে। এইজন্যেই যেতে পারচি নে। জমি কেনার সম্বন্ধে প্রকাশকে বলবে যে দামটা যেন অতি সত্বর আমাকে জানানো হয়। তাছাড়া জমি যদি আর কারও কাছে বাঁধা বন্ধক থাকে ত আমার পক্ষে কেনা কঠিন। কেন না ঘরের টাকা দিয়ে শেষে মামলা মকদ্দমায় জড়াতে চাইনে। তাছাড়া এসব হাঙ্গামা করবেই বা কে? আমার বয়স হয়েছে, তাছাড়া অসুস্থ। নিজের কাজই করতে পারিনে তা আবার মামলা মকদ্দমা। ও সব যারা পারে তারাই পারে, আমার শক্তিতে কুলোবে না। যা ভাল বোঝো আমাকে কাউকে দিয়ে একটা টেলিফোন করিয়ে দিলেই চলে যাবো।

একটু সাবধানে থেকো। বর্ষা বাদলে তোমার শরীর প্রায়ই খারাপ হয়ে যায়। বুড়ুর ইস্কুল খুলতে এখনো দেরি আছে। কাল আমি সঠিক খবর নেবো।

এখানকার অন্যান্য খবর ভালো। টাকা হাতে বোধ করি নেই, একটা খবর পাঠিয়ো। আমি পাঠিয়ে দেবো। ইতি ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

আশীর্বাদক— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

'মালঞ্চ'
কারস্টেয়ার্স টাউন, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা

কল্যাণীয়াসু,

বড়বৌ কাল বেলা ৩।। টায় এখানে এসে পৌঁছেচি। ইষ্টিসানে সত্যমামা[১] ও মৃত্যুঞ্জয়[২] মোটর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পথে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। হরিদাসের এই মালঞ্চ বাড়িটি চমৎকার।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেকটা জায়গা আছে। পায়খানা নীচে কিন্তু ভালই। আজ সকালে চায়ের জন্যে ছাগল দুধ দিয়ে গেছে, তাকে বলে দিয়েছি ক্রমশঃ এক সের পর্যন্ত দুধ আমার দরকার হবে। মশা বেশ আছে। কাল রাত্তিরে মশারি খাটাই নি, ভেবেছিলাম মশা নেই কিন্তু রাত্রি ৩টা ৩।।০টার সময় মশায় খেয়ে ফেলবার উপক্রম করলে। কোন গতিকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলাম। শীত আছে তাই রক্ষা। সকলেই বলচেন ১ মাস ২ মাস থাকতে পারলে শরীর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে। দেখি কতদিন থাকতে পারি। ভাবনা আমার তোমার জন্যে, পাছে অসাবধানে অসুখ বিসুখ করে। কারণ, তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেই দিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো।

তেল ঘি এখানকার তেমন ভাল নয় বলে সত্যমামা বলেছেন এ দুটো জিনিস তিনিই আনিয়ে দেবেন। গম কিনে তাঁর বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে, জেলখানা থেকে তিনি ভাঙিয়ে দেবেন।[৩]

মনে ত হচ্ছে কষ্ট বিশেষ কিছু হবে না। বেড়াবার দরকার, মোটর চাই-ই, নইলে পায়ে হেঁটে বেড়াবার শক্তি নেই। হয়ত কালীকে গাড়ী নিয়ে এখানে আসতে হবে।[৪] ৬।৭ দিন পরে স্থির করে চিঠি লিখবো।

বুড়ি বাগা যেন অত্যাচার করে অসুখ বিসুখ না করে। দিদি বাড়ি চলে যাচ্চেন,[৫] না গেলেও তাঁর নয়, কিন্তু থাকলে তোমাদের সকলেরই সুবিধা। রাঁধবার বামুন কি পাওয়া গেল? এর জন্যে চিন্তিত হয়ে আছি। যেমন করে হোক এবং যত মাইনেই নিক শীঘ্র একটা ঠিক করো নইলে বাড়ির সকলেরই কষ্ট।

প্রকাশকে এই চিঠি দেখিয়ে বোলো যে এখন তার উপরেই সমস্ত নির্ভর। কারও অসুখ করলেই সে যেন আমাকে চিঠি লিখে জানায়।

আজ কিম্বা কাল আমাদের কুমুদশংকর ডাক্তারকে চিঠি লিখবো। প্রকাশ যেন তাঁকে আমার দেওঘরে আসার সংবাদটা দেয়।

ছোট বৌমা, ছেলেরা, হোঁদলা, প্রকাশ ও তুমি আমার আশীর্বাদ জেনো, দিদিকে আমার প্রণাম দিও।

ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩

শুভাকাঙ্ক্ষী---

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয় এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে এসে জানালে তোমাদের টেলিগ্রাম করে আমার পৌঁছন খবর দিয়েছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য[১]কে লেখা

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড,
কলিকাতা
২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৪

কল্যাণীয়েষু,

বুদ্ধদেব, কই আমার চিঠি লেখার কাগজ ত আজো এলো না। সবাই ভূলে গেছে বোধ হয়। আবার প্রচণ্ড জ্বর সুরু হয়েছিল। এবার রক্ত পরীক্ষায় যদিও কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু ওঁরা স্থিব করেছেন এ বস্তু ম্যালোরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ...যাক্ গে রোগের কাহিনী। একটা কথা। আজকাল বড় লোকদের ঘরের মেয়ের নাম প্রায়ই দেখি অঞ্জলি রাখা হয়। কিন্তু সবাই দেন দীর্ঘ ঈ। অঞ্জলিকে অঞ্জলী লিখলে কি স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে পারে বুদ্ধদেব? কি জানি। সময় মতো একবার এসো! আশীর্বাদ রইলো।

দাদা

নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলাম। আমার দেশের বাড়িতে শক্ত অসুখ চল্‌চে, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করাই আমার এবার কলকাতা আসার হেতু ছিল। তুমি দু-চার লাইন লেখা চাও, সে কাজ কঠিন ছিল না, যদি আমি কবি হতাম। দু-চার লাইনের একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যারা গদ্য সাহিত্য নিয়ে কারবার করে তাদের এ সুবিধা নেই। হয় একেবারেই না লেখা, না হয় এমন কিছু লিখে দেওয়া যা দু-চার ছত্রে কোন মতেই পর্যাপ্ত হয় না। লেখার প্রতিশ্রুতি যদি দিয়েও থাকি, বর্তমান অবস্থায় তা প্রত্যাহার করলাম। তবু মনের মধ্যে ইচ্ছে রইল, যদি লিখবার মত এই বিপদের দিনেও কিছু মনে আসে। যদি না লিখি কিছু মনে কোরো না। লেখার ব্যাপারটা এমনই ঘটনার অধীন যে কথা দেওয়ার কোন অর্থই থাকে না— যদি মন না লিখতে চায়।[১] ইতি— ২৬শে শ্রাবণ ১৩৪৪

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড
১-৫-৩৭

প্রিয়বরেষু,

জ্বর এবং অর্শের রক্তপাত সমভাবেই চলচে, বরঞ্চ একটু বেশি বললেও অন্যায় বলা হয় না।

তোমার ছেলে পায়ের ধূলো নিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করেছি।

শরৎদা

বাড়ির সকলের অত্যন্ত অমত থাকলেও প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজনের করচি। সজ্ঞানে ঐটিই শেষ কাজ।[১]

পত্র-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

পত্র ১

১ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র তাঁর *দেনা-পাওনা* উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন। নাটকে রূপান্তরিত হলে তখন *দেনা-পাওনা*-র নাম হয় *ষোড়শী*। *ষোড়শী* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র একখানি *ষোড়শী* রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ *ষোড়শী* প'ড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন .

কল্যাণীয়েষু— তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেননা, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্রচিত্র খাঁটি হয়— আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চল্‌লে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড়ো সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,— কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেণ্টিমেণ্ট্-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোনো দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে

খুসি থাক তে পারো— কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৪।

তোমার— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ শরৎচন্দ্রের এই উত্তর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আর একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানি এই :

কল্যাণীয়েষু— আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বস্‌লুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি— সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়— রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্তমনে ইচ্ছা করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্যলোকে এসেচে তাদের সংখ্যাব সীমা নেই— তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে— মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাঁখারিতে তৈরি ; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ 'উপস্থিত কালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার'। সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যেটা ক্ষণজীবীদের— মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস্ করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্চে— সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মত্ত। তোমাদের মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়— তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎকালে, বৃহৎদেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশু রায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল— কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মন-সিংহের গাথাকাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি— তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে— এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে আমার ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এত বড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে (perspective) এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লিগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা-কিছু

বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমাব নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে। যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই— যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি— যদি কোনো দিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি—১১ মার্চ ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির এই চিঠি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র কলকাতায় কবির সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি না তা জানা যায় না।

পত্র ২

১৩৩৯ সালের ৩১ ভাদ্র কলকাতায় টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তীতে পৌরোহিত্য করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ আসতে না পারায় তাঁর লিখিত আশীর্বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবির বাণীটি এই

কল্যাণীয়েষু— শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননাসভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয় নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফল শস্য- বহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম্মসাধনার অন্তিমপর্ব্বে আমি পৌঁচেছি। কর্ত্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখনো যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তন মাত্র। এই কারণেই অল্পদিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তি মাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে— তারা তোমার ; অবশেষ দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ

দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে ; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরমপ্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয়, এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই— রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি শুভানুধ্যায়ী— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বাণীটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবেও শরৎচন্দ্রকে ওইদিন আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্রটি হল .

কল্যাণীয়েষু— সম্প্রতি সাংসারিক বিশেষ দুর্যোগ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অভিনন্দন সভায় যোগ দিতুম, এমন কি শারীরিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতাও বাধা ঘটাত না।

প্রাচীনকালে আর্য্যদের ঘরে অগ্নিগৃহ থাকত। সেখানে পবিত্র অগ্নিকে যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখা হোত, নিবতে দিত না। সাহিত্যে যাঁরা কীর্তিশালী দেশের চিত্তভবনে সেই পুণ্য অগ্নি অনির্বাণ রাখার কাজ তাঁদেরই। তোমার প্রতিভার দ্বারা দেশের হৃদয়কে তুমি জয় করেচ, দেশের গভীর অন্তরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর চিত্ততন্তুতে হাসি ও অশ্রুর নবতর ও গভীরতর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত করে তুলছে। যেখানে তার মনোমন্দিরে চিরন্তনের পুণ্য বেদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যপ্রদীপ বাংলা সাহিত্যের জ্যোতিঃশিখায় দীর্ঘ আয়ুঃ সঞ্চার করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্ম্মবসানের পশ্চিমদ্বার থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। ইতি— ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯।— তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১ ভাদ্র তারিখেই টাউন হলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু একটা বিশ্রী রাজনৈতিক দলাদলির কারণে, ওইদিন সভা পণ্ড হয়ে যায়। পরে আবার এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেদিন নির্বিঘ্নেই সভার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ৩১ ভাদ্র তারিখে সভায় গণ্ডগোলের কারণটা ছিল এই যে, সেই সময় বাংলা দেশের রাজনীতিতে দুটি দল ছিল। একটি ছিল 'অ্যাড্‌ভান্সে'র দল, আর একটি ছিল 'ফরওয়ার্ডের' দল। প্রথমটির নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত ছিলেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সকল রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের এই দিনকার সম্বর্ধনা সভার যাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরওয়ার্ড দলের প্রাধান্য থাকায়, অপর পক্ষ একে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। তাই তাঁরা অন্যের এই আয়োজনকে

পণ্ড করবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। একটা সুযোগও মিলে গেল। ওইদিন ৩১ ভাদ্র হিজলী জেলে দুজন রাজনৈতিক বন্দির মৃত্যুদিবস ছিল। তাঁরা ওইদিন ওই টাউন হলেই হিজলী জেলের ওই দুজন শহিদের স্মৃতিদিবস পালন করবার ব্যবস্থা করলেন। একই সময়ে একই স্থানে দু-দলের দুটি ভিন্ন ধরনের সভার আয়োজন হওয়ায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। শরৎচন্দ্র সভার দ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। অবশেষে *'শরৎ-বন্দনা'* সভা সেদিন মুলতুবি রাখা হল।

৩ সভা ভণ্ডুলকারী সাহিত্যিক দলের অন্যতম বা অন্যতম সমর্থক ছিলেন *শনিবারের চিঠি* পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত পরে অবশ্য তাঁর এই কৃতকর্মের জন্য তাঁর *আত্ম-স্মৃতি*-তে অনুশোচনা করে গেছেন।

শরৎ-জয়ন্তীর ঠিক কয়েকদিন আগে, মহাত্মা গান্ধি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন! মহাত্মা গান্ধি এই সংকল্প করায়, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক তখন 'শরৎ-জয়ন্তী' বন্ধ করে দেবার জন্য কাগজে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। এতে শরৎচন্দ্র এঁদের উপরও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য এঁদের সকলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আবার সদ্ভাব হয়েছিল। ৩১ ভাদ্র টাউন হলে 'শরৎ-জয়ন্তী' উৎসব ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে এই পত্রটি লিখেছিলেন :

> কল্যাণীয়েষু,—তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিবরণ শুনে লজ্জাবোধ করেছি। কিন্তু একথাও নিঃসন্দেহ যে দেশের লোকের হৃদয় তুমি অধিকার করেচ— এই ভালবাসার চেয়ে মূল্যবান অর্ঘ্য আর কিছু নেই। এই ভালবাসা পেয়েছ বলেই তোমাকে আঘাত সইতে হবে। কেবলমাত্র যদি যশ পেতে, তা নিয়ে কারো মনে যদি কোনো বিরোধ না থাকত, তাহলে সে যশের গৌরব থাকত না। তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ব্যাপ্ত হ'তে থাকবে, ততই তার সঙ্গে তোমার দুঃখও বাড়বে। এজন্য মনকে শক্ত করে নিয়ো। পূজার ছুটির পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা উপলক্ষ্যে কলকাতায় একবার যেতে হবে, সেই সময়ে তোমার সঙ্গে যাতে দেখা হয়, সেই চেষ্টা করব। দেহ আমার ক্লান্ত কিন্তু ছুটি পাইনে। ৩১শে আশ্বিন ১৩৩৯।—তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪ ১৩৩৮ সালে *'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'*-র সময়েও সজনীকান্ত এবং তাঁর *শনিবারের চিঠি*-র দল বিরুদ্ধে ছিলেন। সে সম্বন্ধে সজনীকান্ত নিজেই লিখেছেন :

> দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল :
>
>> কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে।... কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে। আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।
>
> ...রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।...

পূর্বের 'সজনেফুল' ও 'মুরগী'র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ পৌষে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া। ... আমরা 'জয়ন্তী-সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া ব্যাজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। .. মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা-পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।

শনিবারের চিঠি-র মলাটে থাকত মোরগের ছবি আর 'সজনে' শব্দের সঙ্গে সজনীকান্তের নামেরও অনেকটা আক্ষরিক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবেছিলেন, কবি তাঁকেই লক্ষ্য করে ওই কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যই কবি সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর *শনিবারের চিঠি*-র দল কবিকে যেভাবে আক্রমণ করতেন, তাতে করে কবির পক্ষে ওই কথা বলা হয়তো একেবারে অসম্ভবও ছিল না।

অমল হোমকে লেখা

পত্র ১

১ ১৩৩৩ সালের মাঘ সংখ্যা *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত।

পত্র ২

১ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। কংগ্রেসের সূত্রেই নির্মলবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। নির্মলবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় একবার একটি পত্রিকাও বার করেছিলেন।

২ কলকাতা কর্পোরেশনের একজন বিশিষ্ট অফিসার ছিলেন।

পত্র ৩

১ ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রচিত মানপত্র। লেখাটি এই :

> কবিগুরু,
>
> তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।
>
> তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন ; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হৌক।
>
> বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।
>
> আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নত শিরে বারম্বার নমস্কার করি।— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১১ই পৌষ ১৩৩৮

পত্র ৪

১ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বৎসর বয়সে, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে বড়ো দিনের ছুটির সময় কলকাতায় কয়েকদিন ধরে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব হয়। এই রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে তখন যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত *মিউনিসিপ্যাল গেজেট* পত্রিকার সম্পাদক অমল হোম।
১৩৩৮ সালের ৯ পৌষ সকালে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ফোটো নিয়ে এক চিত্র-প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব আরম্ভ হয়। এই চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। ওইদিন অপরাহ্ণে টাউন হলে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র।
১১ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে টাউন হলে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সমিতি' কবিকে সম্বর্ধনা জানান। ওই সভায় কবিকে শরৎচন্দ্রের রচিত অভিনন্দন পত্রটি দেওয়া হয়। স্থির ছিল সভায় অভিনন্দন পত্রটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পাঠ করবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় কবি কামিনী রায় অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেছিলেন।

২ ১৩৪৪ সালের ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বাঙলা সাহিত্য সমিতি শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালে সেদিন অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে দেশবাসী যেন কয়েকদিন ধরে জাতীয় শোক দিবস পালন করেন।'
রবীন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের যে কতখানি শ্রদ্ধা ছিল এই কথা থেকেও তা প্রকাশ পায়।

পত্র ৫

১ দ্বিজেনবাবু মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন। দ্বিজেনবাবুর কোয়ার্টার ছিল গঙ্গার ধারে হাসপাতালের প্রকাণ্ড ছাদের উপর।
২ সুরেনবাবু শিবপুর বি. ই. কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।
৩ *যমুনা* পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।
৪ প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
৫ *ভারতী* মাসিক পত্রিকা।

পত্র ৬

১ বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়। মণিবাবু শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সময় বেহালায় এসে মণিবাবুদের বাড়িতে ছিলেন।
২ কলকাতার বিখ্যাত ফোটো তোলার দোকান। শরৎচন্দ্রের যে আবক্ষ ফোটোটি সাধারণত গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, সেই ফোটোটি শরৎ-জয়ন্তীর আগে এই দোকান থেকে তোলানো হয়েছিল।

৩ *মিউনিসিপ্যাল গেজেট*। অমলবাবু তখন এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন।
৪ ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী এবং ১৩৩৯ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথিতে শরৎ-জয়ন্তী করার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অমল হোম।

পত্র ৭

১ শরৎ-জয়ন্তী ভণ্ডুল করার কথা ইতিপূর্বে পৃ. ৩৫১ ও পৃ. ৩৫২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি। শরৎচন্দ্র সভা-ভণ্ডুলকারী সাহিত্যিকদের উপর তখন সাময়িক ভাবে ক্ষুব্ধ হলেও, পরে কিন্তু তিনি এঁদের উপরে তাঁর ক্ষোভের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। এবং এঁরা সকলেই পরে তাঁর স্নেহভাজন বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১ তুলসীবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের দিদির ছোটো ভায়ের ভাই। তুলসীবাবু তাঁর দিদির বাড়িতে থেকে কলকাতায় চাকরি করতেন।
২ শরৎচন্দ্রের দিদির সেজো দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় স্থানীয় গুড়ফুলি এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের কয়েকটি ছাত্রকে সকাল সন্ধ্যায় বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী দুটি ছেলেও পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়তে যেত।
৩ তুলসীবাবু একবার মানত হিসাবে তাঁর দিদির বাড়িতে চার বছর সরস্বতী পূজা করেছিলেন। পূজায় তিনি লোকজন খাওয়াতেন। পাঁচকড়িবাবুর কাছে যে সব ছেলে পড়তে যেত তুলসীবাবু তাদেরও নিমন্ত্রণ করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী যে দুটি ছেলে পাঁচকড়িবাবুর কাছে পড়ত, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নকুল। তুলসীবাবু এক বছর পাঁচকড়িবাবুর সকল ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করলেও, কীভাবে কেবল নকুলকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে যান। বালক নকুল নিমন্ত্রণ না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয়। শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা জানতে পেরে তুলসীবাবুকে এই চিঠিখানি লেখেন। চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটি বালকের দুঃখকেও যে কীরূপ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এই ক্ষুদ্র চিঠিখানি তারই নিদর্শন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ দিলীপবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠিটি এই

> কল্যাণীয়েষু,— এইমাত্র কোনো পত্র লেখক আমাকে জানিয়েছেন যে, শরতের বিশ্বাস আমি তাঁর উপর বিরক্ত। যাঁরা আমাকে ভাল রকম জানেন তাঁরা এত বড় ভুল করতেই পারেন না।...
> শরৎ আমার সম্বন্ধে কোন অপরাধই করেননি— বোধ করি তুমি জানো, শরৎ সম্বন্ধে আমি কখনই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিনে (সাহিত্য সম্বন্ধে), প্রথম থেকেই আমি তাঁকে প্রশংসাই করে

এসেছি। অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে, তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্য-রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না। ভাবী কালের লোকের কাছে নিজের স্থায়ী পরিচয়ের দলিল রেখে যাওয়া যদি লোভনীয় হয়, তা হলে কোনো একটা মাত্র পাকা দলিলই কি যথেষ্ট নয়? সকলেই বলে আমার চেয়ে তোমার কণ্ঠস্বর ভালো— তা নিয়ে বৃথা অশ্রুপাত না করে আমি ব'লে থাকি, মণ্টুর চেয়ে আমার হাতের অক্ষর অনেক ভালো।...ভাবী কালের দখল সম্বন্ধে আমার যদি কোনো দলিল না থাকত, এ সংসারে আমার সকল অধিকারই যদি কেবল জীবনস্বত্ব মাত্র হত তা হলেও আমি বলতুম, শরৎ চাটুজ্যে না হয় ভালো গল্প লিখতেই পারেন, আমি পারি না বলে সে গল্প আমার ভালোও লাগবে না এত বড় বোকামি যে আমার নেই সে আমার কম গৌরবের কথা নয়। সকল বিষয়েই আমার ক্ষমতা যদি সকলেরই সমান না থাকে তাই বলেই ক্ষমতাশালীদের যদি টুঁ মেরে বেড়াতে থাকি, তা হলে ভাঙা কপাল যে আরো ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। আমার দেশে যে-কেউ, যে-কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, আমি যে সেই গৌরবের শরিক। সেই শ্রেষ্ঠতাকে নামঞ্জুর করার দ্বারা নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়। আমার দেশে আমার চেয়ে নানা বিষয়েই নানা লোক বড়, এই অহঙ্কার জগতের কাছে যেন করতে পারি। শরতের এককালীন চরকা ভক্তি নিয়ে আমি তোমাদের কাছে বারবার হেসেছি, কখনো হাসতুম না, গম্ভীর হয়ে নীরব হয়ে থাকতুম যদি আমার মনের মধ্যে লেশমাত্র কাঁটার ক্ষত থাকত। কারণ, ব্যক্তিগত কারণে যার উপরে আমার বিমুখতা আছে তাকে নিন্দা করতে আমি ভারি লজ্জা বোধ করি। যাকে প্রশংসা করতে পারি নে তাকে আমি নিন্দাও করতে নারাজ। যখন আমার হাতে 'সাধনা' কাগজ ছিল, তখন আমি সাহিত্যিক স্বল্পায়ুদের ভালোও বলিনি, মন্দও বলিনি। বঙ্কিমকে দুই একবার নিন্দা করেছি, কেননা তাঁকে প্রশংসা করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃস্ব! বন্দীব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন। তাঁর ঠিকানা জানিনে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে, সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি। তিনি চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন, তাতে আমি খুশি হয়েছি এই জন্যে যে, তাঁর কলম থেকে দেশোন্নতির যে সূত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না—কিন্তু খেয়ালের বশে যদি তিনি চক্রধর হয়েই থাকেন, তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে আমি কখনই চক্রান্ত করব না।

স্নেহাসক্ত

৩রা বৈশাখ, ১৩৩৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ৩ ও ৪ এপ্রিল কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশন হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন ওই সভার নির্বাচিত সভাপতি। তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে না পারায় কবি অতুলপ্রসাদ সেন সভাপতিত্ব করেছিলেন।

৩ কেদারবাবু এই সময় কাশীতে ছিলেন।

৪ কাশীর কবিরাজ হরিদাস শাস্ত্রী।

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্রের মেজো ভাই স্বামী বেদানন্দের মৃত্যু-ব্যথা।

পত্র ৬

১ কেদারবাবু তাঁর *কোষ্ঠির ফলাফল* বইটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করায় শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন। বই-এর উৎসর্গ পত্রে কেদারবাবু লিখেছেন, 'শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে।'

২ কেদারবাবু তাঁর *কোষ্ঠির ফলাফল* বই-এ এক জায়গায় লিখেছেন :

> ছোকরাটি...অপ্রতিভভাবে—...একটা নেশা আছে,—তা যে-চাকরি— সময় তো পাই না— এই সময়ে যা দু লাইন। তাও বেরুতে কি চায় রেলের আওয়াজে মগজ ভরা। মিলের তরে মাথা খুঁড়চি...
> রোজ কি আর বেরোয়। অভ্যাস খাতা নিয়ে না বসলেও স্বস্তি নেই— তাই বসতে হয়।...
> বঙ্কিমবাবুরও ঠিক ওই নিয়ম ছিল, লেখা আসুক না-আসুক বসতেই হবে। সে-সময়ে ঘরে আগুন লাগলেও উঠতেন না।... হেমবাবুর কোন কোন রাত মাথার চুল ছিঁড়ে কেটে যেতো।

পত্র ৭

১ এই মামলায় শরৎচন্দ্র আসামি ছিলেন না বটে, তবে তাঁর দিদির সেজো দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূল আসামি। ইনি ছাড়া আরও ২৫ জন আসামি ছিলেন। এই মামলার বিস্তৃত ও পূর্ণ বিবরণ *শরৎচন্দ্র* (১ম খণ্ড) দিয়েছি।

২ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ওই সময়েই জে. এম. সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর দলাদলি শুরু হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য নির্বাহক সমিতির যে নির্বাচন হয় তাতে অল্প সংখ্যক ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র সভাপতি এবং কিরণশংকর রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। এতে বিরোধী জে. এম. সেনগুপ্ত-র দল কয়েকটি জেলার প্রতিনিধিগণের নির্বাচন সম্বন্ধে আপত্তি করেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন অবৈধ বলে তা বাতিল করার জন্য উচ্চতর আদালত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আপিল করেন।
এই বৎসর বড়দিনের ছুটিতে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য তখন বাঙলার এই বিবদমান দুই দলই প্রস্তুত হয়ে লাহোরে গিয়েছিল।
শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের দলভুক্ত। তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লাহোরে গিয়েছিলেন।

পত্র ৮

* এই চিঠির খামের উপর এই কথাগুলি লেখা আছে, 'অন্নপূর্ণা ও ধন্মা'[৩] পড়লাম। বেশ ভাল লাগলো। মন খুশি হ'ল। কিন্তু ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাসটা একটু যেন বেশি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। শেষে রবীন্দ্রনাথের দশায় না দাঁড়ায়। শুনেছি, হোমিওপ্যাথিতে এর নাকি ভাল ওষুধ আছে। ওখানে ভাল হোমিওপ্যাথ যদি থাকে কন্‌সাল্ট করলে মন্দ হ'ত না।— শঃ'

১ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িটি মাটির এবং দুতলা। দুতলার চার দিকেই বারান্দা এবং সব বারান্দার উপরেই চাল।

২ রূপনারায়ণ নদ। রূপনারায়ণের একেবারে তীরেই শরৎচন্দ্রের বাড়ি।

৩ কেদারবাবুর লেখা দুটি গল্প।

পত্র ৯

১ মিটিং হয়েছিল ৩ আষাঢ় (১৮ জুন) বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ছটায়, হাওড়ায় ১৪৩নং মধুসূদন পাল চৌধুরী লেনে।
তাই শরৎচন্দ্র *হয় পরশু* না লিখে *কাল* লিখেছিলেন। নয়তো ৪ তারিখে চিঠিটা লিখে পরদিন চিঠি পোস্ট করতে দেবার সময় চিঠির মাথায় ৫ তারিখটা লিখেছিলেন।
শরৎচন্দ্রদের দলের অর্থাৎ সুভাষী দলের কাগজ ইংরাজি *দৈনিক লিবার্টি*-তে ১৯শে জুন তারিখে এই মিটিং-এর যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায়— সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ হাজরা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ও খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র দত্ত, সহ-সম্পাদক জ্ঞানভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ গৌরমোহন রায়।
শরৎচন্দ্রদের বিরোধী দলের সংবাদ তাঁদের তখনকার সমর্থক *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় ১৯ জুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদটি ছিল এই ·

> গতকল্য বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির উপর সর্বসম্মতিক্রমে এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১৪৩নং মধুসূদন পাল চৌধুরী লেনে সভ্যদের রিকুইজিসন মিটিং হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রায় দুই হাজার কংগ্রেস সভ্য উক্ত সভাস্থলে প্রবেশাধিকার না পাইয়া সন্নিকটস্থ বেলিলিয়াস পার্কে উক্ত রিকুইজিসন সভা করিয়াছিলেন। অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে—
> শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সভাপতি,... ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী সম্পাদক...।

২ জে. এম. সেনগুপ্ত বা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর দলের। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের দলে ছিলেন।

পত্র ১০

১ কেদারবাবুর সঙ্গে তুলনায় 'পরে এসে আগে যাওয়া'— শরৎচন্দ্রের এই কথা তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ফলেছিল। কেন না— কেদারবাবু জন্মেছিলেন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। আর শরৎচন্দ্র জন্মেছিলেন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের ভৃত্য।
২ হরিদাসবাবুরা দুই ভাই ছিলেন। হরিদাসবাবু ছিলেন বড়ো, আর তাঁর ছোটো ভাই-এর নাম ছিল সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়। হরিদাসবাবুরা দুই ভাইয়ে এই সময় পৃথক অন্ন ছিলেন।
৩ তপসে মাছ। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ি ছিল একেবারে রূপনারায়ণ নদের তীরেই। জেলেরা রূপনারায়ণে তপসে মাছ ধরলে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে তপসে মাছ কিনে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

৪ শরৎচন্দ্র এই সময় আসামে 'সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মেলনে'-র ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। ১৯ জুন শনিবার ও ২০ জুন রবিবার সম্মেলন হয়। শরৎচন্দ্র প্রথম দিন যেতে পারেননি। তাই সেদিন সভায় শ্রীহট্টের এম. এল. সি. ও স্থানীয় স্বরাজ্য দলের নেতা বসন্তকুমার দাস সভাপতিত্ব করেন। রবিবার সকালে শরৎচন্দ্র গিয়ে পৌঁছলে, তিনি সে দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

পত্র ২

১ 'শ্রীকান্ত'-এ (৩য়) গ্রন্থ-হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসে।

২ শরৎচন্দ্রের এই কটক যাওয়া সম্বন্ধে বোমারু বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৩৬০ সালের *দৈনিক বসুমতী* পূজা সংখ্যায় লেখেন ·

> শরৎদা ছিলেন আমাদের একজন আরাধ্য মানুষ, বিস্ময় হতবাক্ হয়ে বসে বসে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় উপভোগ করবার সামগ্রী। বেহালার মণি রায়ের ব্যাপার উপলক্ষ করে কটকে তাঁকে নিয়ে গিয়ে আমি নিজের হাতে মাংস রেঁধে খাইয়েছিলাম। নীলগিরির রাজার বোন রাণী বসন্তমঞ্জরী (এখন উড়িষ্যার একজন মন্ত্রী) ছিলেন শরৎদার বড় স্নেহের পাত্রী।

৩ আষাঢ় সংখ্যা থেকে সম্ভব হয়নি। শ্রাবণ (১৩৩৪) মাস থেকে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় শেষপ্রশ্ন ছাপা আরম্ভ হয়।

পত্র ৩

১ শরৎচন্দ্র এখানে তাঁর *শেষপ্রশ্ন* উপন্যাসটির প্রথম পুস্তকাকারে বার হওয়ার কথা বলেছেন, *শেষপ্রশ্ন* ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল, তবে ১ বৈশাখ হয়নি। বৈশাখের মাঝামাঝিতে (২ মে ১৯৩১) প্রকাশিত হয়েছিল।

২ *শেষপ্রশ্ন* ভারতবর্ষর ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩৩৭ সালের চৈত্র এবং ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪

১ *বসুমতী সাহিত্য-মন্দির*-এর মালিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পত্র ৫

১ জলধর সেনের ৭৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন সভা। এই সভা সম্বন্ধে *পঞ্চপুষ্প* (আশ্বিন ১৩৩৯) মাসিক পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল :

> **গত ১২ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রবিবাসরের সভ্যরা প্রবীণ সাহিত্যরথ, কথা-সাহিত্যিক, ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয়কে রামমোহন লাইব্রেরী হ'লে তাঁহার ৭৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্ধিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়া ছিলেন। কলিকাতা ও ইহার উপকণ্ঠস্থিত প্রায় সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক সম্বর্ধনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন।**
>
> **সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন— আজ একটা সত্য কথা এই সভাস্থলে বলব।**

দাদা আমার লেখার জন্য যদি পীড়াপীড়ি না কবতেন, গুরু মহাশয়ের মত তাগিদের উপর তাগিদ করে বসে থেকে লেখা আদায় না করতেন, তা হলে আমার ন্যায় অলস ব্যক্তির রচনার অর্ধেক— অর্ধেক কেন বার আনাও প্রকাশ পেত না। আমার মত আরও কত সাহিত্যিকের এমন করে লেখা আদায় করতে তাঁর যে সময় নষ্ট হয়েছে, সেটার সদ্ব্যবহার করলে উনি নিজেও সাহিত্যে অনেক কিছুই দান করতে পারতেন।
সর্বশেষে তিনি জলধর দাদাকে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন— আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পেয়ে আমি ধন্য হলুম দাদা।
পরিশেষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।
পরদিন রবিবাসর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে কলিকাতা হোটেলে সান্ধ্য-বাসরে নিমন্ত্রণ করিয়া সভ্যদিগের সহিত আলাপ করিবার বন্দোবস্ত করেন। সেদিন ভোজেরও আয়োজন ছিল। রবিবাসরের সভ্য ছাড়াও শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ জনকত সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিলেন।

পত্র ৭

১. শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দের মৃত্যুশোক।

পত্র ৮

১ *শেষপ্রশ্ন*। *শেষপ্রশ্ন ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময়েই একদল পাঠক এই বইটির নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

২ শরৎচন্দ্র *ভারতবর্ষ* পত্রিকার *শেষপ্রশ্ন* ধারাবাহিক হিসাবে লিখতে আরম্ভ করলেও তিনি কিন্তু নিয়মিত প্রতি মাসে লেখা দিতে পারতেন না।
শেষের পরিচয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র এ কথা বললেও, এবারও তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে লেখা দিতে পারেননি। *শেষের পরিচয় ভারতবর্ষ* পত্রিকায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—১৩৩৯ আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪০ বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক, ফাল্গুন, ১৩৪২ বৈশাখ।
এই বৈশাখেই পনেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে বই অসমাপ্ত রেখে দেন। এরপর তিনি দু-বছর ন-মাস জীবিত ছিলেন, কিন্তু আর লেখেননি। অবশ্য ওই সময়টার বেশির ভাগ সময়ই তিনি অসুখ ও অসুস্থতার মধ্য দিয়েই কাটিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরিদাসবাবুর অনুরোধে কবি রাধারাণী দেবী আর ১১ পরিচ্ছেদ লিখে বইটি সমাপ্ত করেন।

পত্র ৯

১ হরিদাসবাবু এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধুর 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্' নামে এই সময় কলকাতায় একটা নামকরা পেশাদার থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর *দত্তা* উপন্যাসের নাট্যরূপ করে দিতে বলেছিলেন। *দত্তা* নাটকে রূপান্তরিত হলে তখন এর নাম হয় *বিজয়া*।
শরৎচন্দ্র এই সময় *বিজয়া* নাটক লিখে শেষ করে দিতে না পারায়, 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' আর এ নাটক অভিনয় করতে পারেননি। পরে ১৩৪১ সালের ৬ পৌষ তারিখে স্টার রঙ্গমঞ্চে *নব নাট্যমন্দির* (শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রতিষ্ঠিত পুরাতন 'নাট্যমন্দিরের' পরিবর্তিত নাম) প্রথম *বিজয়া*-র অভিনয় করেন।

২ *বিজয়া*-র সিনেমা করেছিলেন নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী। রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে *বিজয়া* দেখানো শুরু হলে তখন নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি'-র অনুরোধে শরৎচন্দ্র একদিন বিজয়া দেখে তাঁদের এই অভিমতটি লিখে দিয়েছিলেন :

> কাল রূপবাণীতে আমার বিজয়ার চিত্রাভিনয় দেখে এলাম। শ্রীমান্ অমর মল্লিকের রাসবিহারী অত্যন্ত ভাল লাগলো, মনে হলো বোধ করি এমনি কল্পনাই রাসবিহারী চরিত্র আঁকার সময়ে করেছিলাম। ছবিতে এঁরা বিজয়া নাটক এবং দত্তা উপন্যাস দুটিই কাজে লাগিয়েছেন। তাতে এঁদের রস-বোধের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। নীচে বহু দর্শকের সমবেত আনন্দ কলরবে এক বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেল যে বহু লোকেরেই এঁরা প্রীতি ও সমাদর লাভ করেছেন। আমার অনেক গল্পই 'নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি'-র হাতে দশের কাছে উচ্চ খ্যাতি লাভ করেছে। সুতরাং এ আশাও রাখি যে এ ছবিখানিতেও তাঁদের তেমনি আসনই অব্যাহত থাকবে।
>
> ইতি— ২০শে কার্তিক ১৩৪৩।
>
> —শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্র ১১

১ গোবিন্দপদ ভট্টাচার্য ছিলেন হরিদাসবাবুদের প্রেসের ম্যানেজার। ভুল শুধরে দেওয়া সত্ত্বেও তা সংশোধিত হয়নি বলে শরৎচন্দ্র গোবিন্দবাবুর উপর দোযারোপ করলে, গোবিন্দবাবু শরৎচন্দ্রের দেখা প্রুফটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বইটা ছিল শ্রীকান্ত-এ (৪র্থ পর্ব)।

পত্র ১৩

১ বইখানি প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে।

পত্র ১৪

১ এই সময় বিচিত্রায় প্রকাশিত *বিপ্রদাস, ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত *শেষের পরিচয়* এবং *বিজয়া* নাটকের কথাই মনে হয় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন। *বিপ্রদাস* ও *বিজয়া* শেষ করলেও তিনি *শেষের পরিচয়* শেষ করতে পারেননি। *বিজয়া* ১৩৪১ সালের পৌষ মাসে এবং *বিপ্রদাস* ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কপি রাইট দেওয়া এবং দান করা বই ছাড়া শরৎচন্দ্র নিজের অন্য সব বই নিজের খরচে হরিদাসবাবুদের প্রেসে ছেপে তাঁদেরই দোকানে বিক্রি করতে দিতেন। হরিদাসবাবুরা কমিশন পেতেন মাত্র।

পত্র ১৬

১ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
২ শরৎচন্দ্রের দিদির মেজো দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
৩ হরিদাসবাবুর স্ত্রী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিধে পাঠিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু এক চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন-- দাদা, আপনার বৌমা স্বর্গলাভের আশায় ঘুষ পাঠাচ্ছেন গ্রহণ করবেন।

পত্র ১৭

১ হরিদাসবাবুর কন্যা লাবণ্য দেবী মুসৌরী বেড়াতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের জন্য সেখান থেকে একটি লাঠি এনেছিলেন।

পত্র ১৮

১ যে *যমুনা* পত্রিকাকে শরৎচন্দ্র এক সময় লেখা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে কত সাহায্য করেছিলেন, সেই *যমুনা*-ই শেষে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখত। শরৎচন্দ্র এখানে সেই কথারই উল্লেখ করেছেন।

পত্র ১৯

১ *শ্রীকান্ত* ছাপা বই। এই সময় ছাপা বই শেষ হওয়ায় আবার ছাপার আয়োজন চলছিল। আগের সংস্করণে যে সব ছাপার ভুল ছিল, শরৎচন্দ্র সেগুলো বই-এ সংশোধন করে দিয়েছিলেন।
২ তাই বলে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে একাকি ফেলে আসেননি। সেখানে তাঁর দেখাশুনা করবার জন্য বাড়ির চাকরানি তো ছিলই, তাছাড়া প্রতিবেশীরা এবং শরৎচন্দ্রের দিদি ও দিদির বাড়ির লোকজনরাও কাছেই ছিলেন।

পত্র ২০

১ সেই ভূমিকাটি এই ·

> চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তারপরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করবার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হ'ল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না। ওই ভাবেই ওটা বয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম। গ্রন্থকার, ১৪. ৭, ৩৭

নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে লেখা

পত্র ১

১ নির্মলবাবু কর্মজীবনে একজন অ্যাটর্নি ছিলেন।
২ সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ম্যাডান থিয়েটার-এর মালিক ম্যাডান সাহেব। ইনি একজন পারসি ছিলেন।
৩ খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র নিজেকে এবং কনিষ্ঠ ভাই প্রকাশকে মনে করেই একথা বলেছেন।
৪ মনে হয় শরৎচন্দ্র তাঁর কোনো কোনো বই পনেরো বছরের সিনেমা-স্বত্বে ম্যাডান সাহেবকে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন।
৫ চিত্ত ঘোষ। ইনি ছিলেন *ফিল্ম ল্যান্ড* কাগজের সম্পাদক। চিত্তবাবু শরৎচন্দ্র এবং ম্যাডান সাহেব উভয়েরই খুব পরিচিত ছিলেন।

পত্র ২

১ এখন (১৯৬৯) কলকাতায় যেটা এলিট সিনেমা তখন এইটাই ছিল 'ম্যাডান থিয়েটার'।
২ 'ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট' নামে তখনকার একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের নির্বাক ছবি 'দেবদাস' তুলেছিলেন। এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন সতীশ মিত্র ও নগেন বোস। ছবি তোলবার টাকা দিয়েছিলেন সতীশবাবু, নগেনবাবু ছিলেন ওয়ার্কিং পার্টনার বা কাজ করার

জন্য অংশীদার। 'দেবদাস' ছবির পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট *দেবদাস* ছবিটি তুলে ম্যাডান সাহেবকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩ প্রথমত নির্মলবাবু শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয়ত অ্যাটর্নি হিসাবে তিনিই সিনেমা মালিকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বই-এর চুক্তিপত্র তৈরি করে দিতেন। এইজন্যই শরৎচন্দ্র নির্মলবাবুকে এই কথা বলেছিলেন।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা

পত্র ১

১ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের *ষোড়শী* নাটকে গান লিখে না দেওয়ায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর তখন মনে মনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এবং এই নিয়ে তিনি দু-তিন বছর কবির সঙ্গে আর যোগাযোগই রাখেননি।
শরৎচন্দ্র কবির প্রতি অভিমান বশত তখন কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন, 'কবি কত লোককে কবিতায় কত আশীর্বাণী ও উৎসাহবাণী লিখে দেন, কত প্রতিষ্ঠানের, এমনকি কত লোকের ছেলেমেয়েদেরও নামকরণ করে দেন, অথচ আমি অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমার নাটকে একটাও গান লিখে দিলেন না।'
শরৎচন্দ্র ওই সময় কারও কারও কাছে এমন কথাও বলেছিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস কবি তাঁর প্রতি বিরক্ত।
শরৎচন্দ্র যাঁদের কাছে তাঁর প্রতি কবির এই বিরক্তির কথা বলেছিলেন, তাঁদেরই কেউ একজন পত্রযোগে কবিকে শরৎচন্দ্রের এই অভিযোগের কথা জানান।
কবি ওই ব্যক্তির চিঠি পেয়ে তখন দিলীপকুমার রায়কে এই নিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ঠিক ওই সময়টায় হাওড়া শহরের বাজেশিবপুর ছেড়ে হাওড়া জেলাতেই রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড় গ্রামে বাড়ি করে সেখানে বাস করছিলেন। কবি শরৎচন্দ্রের ঠিকানা জানতেন না।
দিলীপবাবু রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি পেয়েই শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। ওই সঙ্গে তিনি কবির চিঠির নকলও শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবির সেই চিঠিটি এই বইয়ে আগেই ৩৫৫ ও ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

২ খুব সম্ভব ১ বৈশাখ শান্তি-নিকেতনে নববর্ষ উৎসবে যাবার জন্যই দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব হবে ভেবে দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে যাবার জন্য বলেছিলেন। কারণ ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হলেও ওই সময় শান্তিনিকেতনে স্কুল, কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি থাকে বলে শান্তি-নিকেতনের কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ গ্রীষ্মের ছুটির আগে ১ বৈশাখ নববর্ষ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথক ভাবে কবির জন্মোৎসবও পালন করতেন। ১৩৩৩ সালে ২৫ বৈশাখেও কবির জন্মদিন উৎসব পালিত হয়েছিল।
যাই হোক, দিলীপবাবু ওই সময় একদিকে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩ বৈশাখের চিঠিটা শরৎচন্দ্রের কাছে যেমন পাঠিয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি ওই চিঠিটা কাগজে ছাপবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমতিও চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন দিলীপবাবুকে এই চিঠিটি লিখে অনুমতি দিয়েছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,
তথাস্তু। কিন্তু দায়িত্ব তোমাদের। সাহিত্যে অনেক অনেক অস্বাস্থ্য বিস্তার করেছি। নিজের চরিত্র নিজে আলোচনা করায় যদি বায়ু দূষিত হয়, তবে এজেণ্ট প্রোভোকেটের বলে তোমাদের বদ্‌নাম করব। একটা নাটক নিয়ে ব্যস্ত আছি। ২৫শে বৈশাখ কি দেখা মিলবে? রবির প্রতাপ আরও বেড়ে যাবে, যদি সইতে পার ত খুসি হব। ইতি— ৬ই বৈশাখ ১৩৩৩
কবির এই অনুমতি পত্রে কবির জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা থাকায় দিলীপবাবু এবার শরৎচন্দ্রের মত নিয়ে কবিকে লিখেছিলেন যে, তিনি এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই ২৫শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিনে যাবেন।
দিলীপবাবুর এই চিঠি পেয়ে কবি তখন দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন,
কল্যাণীয়েষু,
আমার জন্মদিনে তুমি ও শরৎ এখানে আসবে শুনে খুসি হলুম।...ইতি—
১৪ই বৈশাখ ১৩৩৩ স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু কবির জন্মদিবস উৎসবে না দিলীপবাবু, না শরৎচন্দ্র কেউই যাননি। তাই কবি তাঁর জন্মদিনেই দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,
আজ আমার জন্মদিন। তুমি এলে খুসি হতুম, তুমিও খুসি হও এমন আয়োজন হয়ত ছিল। আমার মনে হচ্চে তুমি হয়ত এখানকার লোক সমাগমের কাল্পনিক বিভীষিকা একটা মনে মনে রচনা করে ভীরু বিহঙ্গমের মত পালিয়েচ। তুমি যে আসতে পারনি হয়ত সেটা একটা কারণে ভালোই হয়েচে— এখানে যারা আমাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান ক'রে থাকে তারা আমার অত্যন্ত কাছের লোক— এ জন্য স্বভাবতঃই বাড়াবাড়ি করে— তোমার অনভ্যস্ত চোখে সেটা হয় তো ভাল না লাগতে পারত, এমন কি হয়তো ভাবতে যে আমি এই রকম সম্মান সমাদরের ভূরিভোজ পছন্দ করি। কথাটা একেবারেই ভুল।
আমি জানতুম শরৎ আসবেন না। হয়তো সেটাও ভালো হয়েছে— কারণ হয় তো প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেননা তাঁর মন বিমুখ হয়েছে। এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকট্য ঠিক নয়— এরপরে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে— জোর করে টানাটানি করা ভুল। খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে না। আজকের দিনে তাই নিয়ে বেজোড়কে জোড়া দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই— কেননা আমার সময় অল্পই বাকি— তাই যা কিছু হয়ে উঠেছে সেইটেকেই রক্ষা করলেই যথেষ্ট, যা কিছু হতে পারত তাকে সম্ভবপর করে তোলবার মত অধ্যবসায় এখন আর জোগাতে পারব না। ইতি— ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ কলকাতায় ভবানীপুরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। আশুবাবুর পুত্ররা তাঁদের বাড়ি থেকে যে *বঙ্গবাণী* কাগজ বার করেছিলেন, তাতে ওই সময় শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* প্রকাশিত হচ্ছিল। শরৎচন্দ্র এই *পথের দাবী*-র প্রকাশ নিয়েই তখন ভবানীপুরে *বঙ্গবাণী* অফিসে এসেছিলেন।
আশুবাবুর বাড়ির অদূরেই থিয়েটার রোডে মামার বাড়িতে দিলীপবাবু থাকতেন। দিলীপবাবু অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে (দিলীপবাবুর মা আরও আগেই মারা যান) মামাদের অভিভাবকত্বে মামার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়ার শেষেও বহুদিন তিনি এখানেই ছিলেন।

পত্র ২

১ দিলীপবাবুর ডাক নাম।
২ ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা
৩ শরৎচন্দ্র নিজেও একজন ভালো গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন। শরৎচন্দ্রের গান-বাজনা সম্বন্ধে আমি *শরৎচন্দ্র*-এ (১ম খণ্ড) বিস্তৃত আলোচনা করেছি। অবশ্য শরৎচন্দ্র এখানে পরিহাস করেই তাঁর নাম দেবার কথা বলেছেন বলে মনে হয়।
৪ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইনি একজন বড়ো গায়ক ছিলেন। এঁর বিখ্যাত গাওয়া গান, 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো'। সুরেনবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রাজুর (শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ) জ্যেষ্ঠভ্রাতা।
৫ ৯.১০.২৫ তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু (পরে নেতাজি) বর্মার মান্দালয় জেল থেকে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গত আর্ট সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা বলেছিলেন।
সুভাষচন্দ্রের এই চিঠি পাওয়ার কয়েক দিন পরে দিলীপবাবু রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি দেওয়ার সময় সুভাষচন্দ্রের ওই চিঠিটির একটি নকলও রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের ওই চিঠি পেয়ে দিলীপবাবুকে তখন এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠির প্রথমেই লিখেছিলেন .

> কল্যাণীয়েষু,
> তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর— এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই।...

রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুকে লেখা তাঁর এই চিঠিতেই এক জায়গায় প্রসঙ্গত এই 'চিঁড়ে মুড়কির বরাদ্দের' কথাগুলি বলেছিলেন।

পত্র ৩

১ বিলাত যাত্রার বিদায় উৎসব।
২ মনের পরশ এবং ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা।

পত্র ৫

১ দিলীপবাবুর মেজ-মামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার।
২ আশালতা সিংহ।
৩ আশালতা দেবী যে জীবনে সুখী নন, এ কথা দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে জানিয়েদিলেন। দিলীপবাবুকে লেখা আশালতা দেবীর একটা চিঠিতেও তাঁর এই অসুখী জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। আশালতা দেবী লিখেছিলেন :

> রাসেলের কন্‌কোয়েস্ট অব্ হ্যাপিনেস— যা আপনি পাঠিয়েছিলেন ফেরত দিচ্ছি। বইটি আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু যা খুঁজছিলাম, তা পেলাম না। আপনি হয়ত বলবেন, 'কি খুঁজছিলে বলত? সুখী হবার সোজা উপায়?' তা নয়। ভাবছিলাম, তিনি যাদের পথ দেখাবার জন্যে

ভূমিকায় লিখেছেন...তাদের সমস্যা ঠিক আমার সমস্যার সঙ্গে মিলল না।... রাসেল গোড়ার দিকে এক জায়গায় লিখেছেন—সুখী হ'তে চাইলে, গোটাকতক চির অপ্রাপ্ত চির দুর্লভ বস্তুর প্রতি লোভ ছাড়তেই হবে, এবং তাদের যে পাওয়া যায় না, এইটে বেশ ভাল করে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে ভুলতে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে সুচির দিনের অপ্রাপ্ত হলেও যে কোনো কোনো বস্তু কিছুতেই ভোলা যায় না, ভুলবার যো নেই এ কি তাঁর স্মরণ ছিল না?—অনামী।

৪ শরৎচন্দ্র এই সময় বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে একবার বিলাত যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। বিলাত বলতে শুধু ইংল্যান্ডই নয়, ইউরোপের কয়েকটি দেশও ঘুর আসবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিলেত যাওয়া আর হয়নি।

৫ দিলীপবাবুর ভগ্নী।

পত্র ৬

১ দিলীপবাবু পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

২ শরৎচন্দ্র সত্যই চার চার বার সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে তিনি যে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ *শরৎচন্দ্র*-এ (১ম খণ্ড) বর্ণনা করেছি।

৩ শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

৪ বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ বারীনবাবু ও উপেনবাবু এঁরা উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় আসামি ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেও বারীনবাবু এবং উপেনবাবু উভয়েই দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। পরে এঁরা মুক্তি পেয়ে উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন। উপেনবাবু শ্রীঅরবিন্দকে কর্তা বলতেন।

৬ বারীনবাবুর এই বইটার নাম 'আন্দামানের বাঁশী' নয়, এর নাম *দ্বীপান্তরের বাঁশী*। এ বইটা সম্বন্ধে বারীনবাবু লিখেছেন, 'সেলুলার জেলে (আন্দামানে) সাধনায় মগ্ন অবস্থায় লেখা কবিতাগুলি দ্বীপান্তরের বাঁশী...।'

৭ পণ্ডিচেরী আশ্রমের অনিলবরণ রায়।

পত্র ৭

১ ওরিয়েন্ট

২ পিতৃ-বিয়োগের পর শরৎচন্দ্র চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসে তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। লালমোহনবাবু কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। শরৎচন্দ্র লালমোহনবাবুর বাড়িতে থাকার সময় তাঁর কাছে একটা চাকরিও করতেন। লালমোহনবাবু ভাগলপুর থেকে কলকাতা হাইকোর্টে যে সব আপিল কেস পেতেন, সেই সব কেসের 'পেপার বুকের' হিন্দি ইংরাজিতে অনুবাদ করা ছিল শরৎচন্দ্রের কাজ। গুরুদাসবাবুও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন এবং পরে এখানে জজও হয়েছিলেন। এই সূত্রেই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে লালমোহনবাবুর পরিচয় ছিল এবং গুরুদাসবাবু তাঁর বাড়ির দুর্গা পুজো লালমোহনবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লালমোহনবাবু নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৩ গুরুদাসবাবু একজন অত্যন্ত সনাতন-পন্থী ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাঁর গঙ্গা-ভক্তি বা গঙ্গায় বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। তিনি যখন হাইকোর্টের জজ, তখনও তিনি প্রতিদিন সকালে তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাড়ি থেকে হেঁটে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। গুরুদাসবাবু সম্বন্ধে একটা

গল্প আছে যে, তিনি যখন একদিন গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন, তখন পথিপার্শ্বস্থ কোনো বাড়ির এক বৃদ্ধা তাঁকে একজন সাধারণ পূজারী বামুন ভেবে তাঁদের বাড়ির কুলদেবতার পুজো করে দিতে বলেছিলেন। গুরুদাসবাবুও নিজের কোনো পরিচয় না দিয়ে এবং কোনো আপত্তি না করে ওই বৃদ্ধার কুলদেবতার পুজো করে এসেছিলেন।

পত্র ৮

১ এই সময় কুমিল্লা শহরে ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।
রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আগে ওই সভামণ্ডপেই ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন হয়। সেই ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রই এইরূপ ব্যবস্থা করে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় বাঙলা দেশের রাজনীতিতে দুটো দল ছিল। একটা ছিল যুগান্তর পার্টির দল, অপরটা ছিল অনুশীলন পার্টির দল। প্রথমোক্ত দলের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র, আর দ্বিতীয়োক্ত দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
যুগান্তর পার্টির ছাত্র সমিতির নাম ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশান, আর অনুশীলন পার্টির ছাত্র সমিতির নাম ছিল অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশান।
৬ মে সকালে শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, বিমল, প্রতিভা দেবী, কুস্তিগির গোবর গুহ, কিরণ দাস (শহিদ যতীন দাসের ছোটো ভাই) প্রভৃতি চিটাগং মেলে শিয়ালদহ থেকে কুমিল্লা রওনা হন।
এঁরা কুমিল্লা যাওয়ার পথে চাঁদপুরে গিয়ে পৌঁছলে সেদিন অনুশীলন পার্টির ছাত্র সমিতির কয়েকজন চাঁদপুরে স্টেশনে গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির উপর কয়লার গুঁড়ো ছুড়ে 'শেম্ শেম্' বলে চিৎকার করেছিল।
পথে এক জায়গায় এই সামান্য গণ্ডগোল ছাড়া এঁরা এঁদের যাত্রাপথের বহুস্থানেই অভিনন্দন পেয়েছিলেন। তাছাড়া খাস কুমিল্লায় এঁরা এক অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। সেই অভিনন্দন ও সভার বিস্তৃত বিবরণ তখন এঁদের দলের কাগজ *লির্বাটি*-তে সমস্তই প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে পৃ. ৪৩৩-৪৩৬-য় *লিবার্টি* থেকে তা উদ্ধৃত করে দিলাম।
এখানে বাঙলার যে রাজনৈতিক দলাদলির কথা বলছি, সেই দলাদলি মিটেছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে। এ সম্পর্কে ওই সময়কার *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত সংবাদটি এই :

> গত রবিবার (১৬ই আগস্ট, ১৯৩৬) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার কিছু পরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান হলে নূতন বিধান অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রথম সাধারণ সভা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, সহযোগী সভাপতি—শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক কিরণ শংকর রায়, কোষাধ্যক্ষ দেবেন্দ্রলাল খাঁ। বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষ রফা করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।...শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত কর্মকর্তা নিয়োগের এবং কার্য পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র উহা সমর্থন করেন।

এই সময় নতুন ভারত শাসন আইনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্তন করে ভারতের হিন্দুদের উপর, বিশেষ করে বাঙলা দেশের হিন্দুদের উপর একটা অবিচার করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এছাড়া এই সময়েই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনের আয়োজন

চলছিল। এই জন্যই কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্তর তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী সভায় (মৃত্যু ২২ জুলাই, ১৯৩৩) প্রায় সকল বক্তাই বলেছিলেন, 'এখনও যদি বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্মীগণ দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া এক না হন, তবে বাঙ্গলা কংগ্রেস ও বাঙ্গালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক।' মূলত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিপদ দেখা দেওয়াতেই তখন বাঙ্গলা কংগ্রেসের উভয় দলের মধ্যে মিলনটা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছিল। তা না হলে হয়তো আরও দেরি হত। যাই হোক, এই মিলনে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তখন শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেক নেতাই প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বহু পূর্বেই মিলন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক উপযুক্ত সময়েই এই মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল।'

২ এই কথাটা শ্রীঅরবিন্দের।

পত্র ৯

১ গানটি এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে ৪৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।
২ *বিজলী* পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার। নলিনীবাবু এই সময় কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। পরে ইনিও পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে গিয়ে বাস করেন।
৩ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
৪ নীরেনবাবুর এই সমালোচনাটি পরিশিষ্টে ৪৩৮-৪৪০ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।
৫ নীরেনবাবুর চোখ দুটো সত্যই *কটা* ছিল।

পত্র ১০

১ দিলীপবাবুর লেখা একটি উপন্যাস। দিলীপবাবু উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি দেখে দেবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে দিয়েছিলেন।
২ দিলীপবাবুর মামা।
৩ এত বাদ দেওয়া দিলীপবাবু তখন পছন্দ করতে পারেননি। বাদ দেওয়া যে উচিত, পরে তিনি বুঝেছিলেন। তাই *দোলা*-র দ্বিতীয় সংস্করণের সময় কোনো বন্ধুকে এটি উৎসর্গ করতে গিয়ে উৎসর্গ পত্রে দিলীপবাবু নিজেই লিখেছিলেন :

> 'দোলা-র দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু অদল বদল করেছি। প্রধান সংস্কার এই যে প্রথম সংস্করণে অনেক কথাই ফেনিয়ে বলার ফলে বক্তব্যের জোর কমে গিয়েছিল— এ-সংস্করণে সেগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলেছি। এতে আশা করি ফেনাটুকুই বাদ গেছে, পানীয়ের পরিমাণ কমেনি। এ-সংস্করণে প্রায় চারশো পাতা বাদ পড়েছে।

৪. *পরিচয়* পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের *শেষপ্রশ্ন*-এর উপর নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সমালোচনা পড়ে দিলীপবাবু তখন বন্ধু নীরেন্দ্রনাথকে এক পত্রে তাঁর ওই প্রবন্ধের জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। নীরেনবাবু দিলীপবাবুর চিঠি পেয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে দিলীপবাবুকে একটা উত্তর দিয়েছিলেন। এই নিয়ে তখন এঁদের মধ্যে কয়েকটা পত্র-বিনিময় হয়েছিল। দিলীপবাবু তাঁকে লেখা নীরেনবাবুর ওই চিঠিগুলো পড়বার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
৫ অন্নদাশংকর রায়। এঁর ছদ্মনাম লীলাময় রায়। ইনি এই সময় *স্বদেশ* মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পড়েই শরৎচন্দ্র তাঁর উপর রেগে গিয়েছিলেন। লীলাময় রায়ের ওই প্রবন্ধের তখন কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছিলেন। সেই বাদ-প্রতিবাদের কিছু এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে পৃ. ৪৪১-৪৪৮ -য় দ্রষ্টব্য।

৬ অন্নদাশংকর রায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বলে শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন।

৭ ১৩৪৪ সালের *শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা* বাতায়ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভাংশু গুপ্তর প্রবন্ধ 'শরৎচন্দ্রের রাশিচক্র বিচার' (রাশিচক্র সহ) পরিশিষ্টে পৃ. ৪৪৯-৪৫৩-য় দিয়েছি দেখুন।

৮ 'অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া' চলেছিল কি না জানি না। তবে এঁদের বংশের কেউ কেউ সন্ন্যাসী এবং গৃহত্যাগীও হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজেও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। আর শরৎচন্দ্র 'একেবারে ঘোরতর নাস্তিক' মোটেই ছিলেন না। রীতিমতো আস্তিকই ছিলেন।

৯ শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম শিষ্য অনিলবরণ রায়। ইনি ওই সময় পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমেই থাকতেন। শরৎচন্দ্র অনিলবরণের ধুলোকে চিনি করতে পারায় যে কথা বলেছেন, তা অবশ্য নিছক পরিহাস।

১০ শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

১১ শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য-শিষ্যাদের 'শ্রীমা'। ইনি একজন ফরাসি মহিলা।

১২ দিলীপবাবু তাঁর *দোলা* উপন্যাসের ১ম সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র কাউকেই উৎসর্গ করেননি। *দোলা*-র ১ম সংস্করণ তেমন ভালো হয়নি বলেই হয়তো দিলীপবাবু রবীন্দ্রনাথকে এই বই উৎসর্গ করেননি। ১৩৬২ সালে *দোলা*-র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হলে, তখন দিলীপবাবু এই বইটি তাঁর বন্ধু শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশিব কুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেছিলেন। দিলীপবাবু পরে তাঁর *অনামী* বইটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৩৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে দিলীপবাবু যে গানটি রচনা করেছিলেন, *অনামী*-র উৎসর্গ পত্রে তিনি সেই গানটিই দিয়ে, গানের মাথায় 'বাংলার কথা-সাহিত্যের মুকুটমণি শরৎচন্দ্রকে' এবং গানটির শেষে '*স্নেহধন্য দিলীপ*' এই কথা দুটি লিখেছিলেন। *অনামী*-র ২য় সংস্করণের সময় দিলীপবাবু উৎসর্গ পত্রের ২০লাইনের এই গানটিকে আবার অদল বদল করে ১৬ লাইন করে, উৎসর্গ পত্রে দিয়েছিলেন। এবং গানের মাথায়, 'বাংলার কথা-সাহিত্যিক' থেকে 'বাংলার' শব্দটা বাদ দিয়েছিলেন।

পত্র ১২

১ ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *পুষ্পপাত্র* পত্রিকায় প্রকাশিত দিলীপকুমার রায়ের প্রবন্ধ 'বুদ্ধদেব বসু : বাস্তবতা ও প্রসঙ্গত'। দিলীপবাবুর এই প্রবন্ধটি আশালতা সিংহকে পত্রাকারে লেখা। দিলীপবাবু এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন

> ভাই আশা, তোমাব ও বুদ্ধদেবের চিঠি প্রায় এক সঙ্গে পেলাম— তাঁর 'যবনিকা পতন' উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে। ফলে মনে খেয়াল চাপল এ বইখানি নিয়ে প্রসঙ্গত তোমাকে একটা খোলা চিঠি লিখিই না কেন?...আমি জানি অনেক নারীই তাঁর (বুদ্ধদেবের) সম্বন্ধে ভাবেন যা শ্রীমতী অঞ্জলি বসু লিখেছেন—'যবনিকা পতনে আপনার লেখা সমস্ত নারী জাতির অপমান।' আমি ফের বলি নারী জাতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের ব্যঙ্গ আমার ভাল লাগে না, শুধু সেটা একদেশদর্শী বলেই না— আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ নারীর চেয়ে একতিলও কম অবলা নন বলেও ! বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের প্রতি যে অত্যাচার আমরা বহুদিন ধরে করে এসেছি আধুনিক যুগে তার জোড়া মেলা ভার, এহেন আমরা কোন্ লজ্জায় নারী নিন্দা করি?
>
> আমার মন ঘোর আপত্তি করে বুদ্ধদেবের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে— তার বিদ্রূপী ভঙ্গীর জন্যে নয়, করে জ্বালার জন্যে, বিশেষ করে যেখানে তাঁর নায়করা অকারণে মেয়েদের নানারকম সুন্দর প্রবৃত্তিকে আঘাত দিতে চান, শুধু নিজেদের নিষ্ঠুরতার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে।

২ দিলীপবাবু তাঁর ওই 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গত' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটা চিঠির কিয়দংশও উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই চিঠিতে বুদ্ধদেব বসু দিলীপবাবুকে লিখেছিলেন :

> আই অ্যাম্ অল ফর রিয়েলিজম্। কোনো কুৎসিৎ জিনিষ যদি দেখাতেই চাই, তার চরম দেখিয়ে ছাড়বো। সেখানে লেখকের যদি দয়া থাকে তবে সেটাই হবে তার দুর্বলতা। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যে কি দেখতে পাই? একটা কথা যদি বলি তো কিছু মনে করবেন না, শরৎবাবুর আঁকা বেশ্যার চরিত্র আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। কলকাতার কোনো মেসে সাবিত্রীর মত ঝি যদি থাকতো তবে আমরা সবাই বাড়ি ভুলে মেসে পড়ে থাকতুম। মেসের ঝি-রা যে-ভাষায় কথা কয় তার একটা লাইন তুলে দিলে আপনি কানে আঙুল দেবেন। শরৎবাবুকে আমার সব চেয়ে ভাল লাগে যখন তিনি রেঙ্গুনের বাড়িউলিকে আঁকছেন 'চোদ্দ বছর একত্তর ঘর করেছি, কেউ বলতে পারে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি কখনো?'...কি গৃহদাহের রামবাবুকে কি পল্লি-সমাজের গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ওসব জায়গায় তিনি প্রকাণ্ড আর্টিস্ট— সেখানে তিনি সত্য কথা বলেছেন।'

৩ সে কাহিনিটি এই :

> নারায়ণ একদিন লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্পরথে মর্ত্যভ্রমণে এসেছিলেন। মর্ত্যে এসে একটি ফুটন্ত তিলফুলের খেত দেখে সেই তিলফুলে সাজবার জন্য লক্ষ্মীর বড়ো ইচ্ছা হয়। নারায়ণের নিষেধ সত্ত্বেও লক্ষ্মী সেই খেতের তিলফুল নিয়ে অঙ্গে পরেন। ঠিক সেই সময় ওই খেতের মালিক তার খেত দেখতে আসে। খেতের মালিকের একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, যে তার খেতের ফুল তুলবে তাকে তার বাড়িতে বার বছর দাসী হয়ে থাকতে হবে। এই হিসাবে লক্ষ্মীদেবীকে ওই ক্ষেতের মালিকের বাড়িতে রাঁধুনি হিসাবে বারো বছর থাকতে হয়েছিল।

৪ দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব যখন বিরাট রাজার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন, সেই সময় অর্জুন নিজেকে ক্লীব এবং নিজের নাম বৃহন্নলা বলে পরিচয় দিয়ে বিরাট রাজার বাড়িতে নৃত্যগীতের শিক্ষক হয়েছিলেন।

৫ দিলীপবাবু লিখেছিলেন :

> ...কাজেই শরৎবাবুর সৃষ্ট বেশ্যা চরিত্র চন্দ্রমুখী ঠিক বেশ্যার মতন হয়নি— যেহেতু সোনাগাছির গণিকা সম্প্রদায় ভিন্ন প্রকৃতির, ও কথা বললে রসানন্দী শুনবেন না। বলবেন— নাই বা হ'ল চন্দ্রমুখী সোনাগাছির টাইপ, সে যে বেঁচেছে, কাজেই তাকে না-মঞ্জুর করার এক্তিয়ার কার?... কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করি না ফ্যাক্ট হিসেবেও। কোন লেখক যে কয়জন গণিকা দেখেছেন, তা থেকে তিনি এভাবে জেনারেলাইজ করতে পারেন না বলেই আমার মনে হয়— যে সব-গণিকাই ঐ একই রকম। আমি নিজে এমন একজন বাইজীকে জানি যিনি অতি সুশীলা, অতি উচ্চ শ্রেণীর গায়িকা, অতি মধুর চরিত্রা ও আলাপে মুগ্ধকারী। শরৎবাবুর চন্দ্রমুখীর মতন কোন গণিকাকে কেউ কখনো দেখেনি একথা বলা হবে দুঃসাহসিক। কিন্তু বলেছি, চন্দ্রমুখীর বিচারে এ প্রশ্ন অবান্তর।

৬ দিলীপবাবুর সংগীত-শিষ্যা।

পত্র ১৪

১ ১৩৪০ সালের ১৩ মাঘ ফরিদপুরে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে প্রধান সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র।

২ হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি *শরৎচন্দ্রের পরিচিত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এই ভূপেনবাবুই প্রথম শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বৌ* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

৩ দিলীপবাবু পরে আশালতা দেবীকে শরৎচন্দ্রর এই কথাগুলো জানিয়েছিলেন। এতে আশালতা দেবী একটু ভরসা পেয়ে তাঁর লেখা একটা বই শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ১৩.৪.৩৪ তারিখে শরৎচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন .

শ্রীচরণেষু,
আমার প্রথম উপন্যাসখানি আপনার ঠিকানায় পাঠালুম। যদি আপনার অসীম কাজের মাঝে কোন একটুখানি সময়ে গল্পটা পড়ে ভালোমন্দের কথা গুটি পাঁচ ছয় লাইন লেখেন খুব খুসি হব। আপনার কাছে সাহস করে হয়তো কখনই লিখতে পারতুম না। কিন্তু মণ্টুদার মুখে আপনার কথা এত মধুর করে এতবার শুনেচি যে সে ভয় ভাঙ্গতেও বেশি দেরি হয় নাই। আমার বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীতা— আশালতা

৪ ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের *পরিচয়* পত্রিকায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রটি প্রকাশিত হ'লে তখন *প্রচারক* পত্রিকার সম্পাদক অতুলানন্দ রায় রবীন্দ্রনাথের ওই পত্রটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কী মত তা শরৎচন্দ্রের কাছে জানতে চান। অতুলানন্দবাবু অনেক দিন ধরেই তাঁর *প্রচারক* পত্রিকার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছেও একটা লেখা চেয়ে আসছিলেন।

শরৎচন্দ্র এবার অতুলানন্দবাবুর কথায় তাঁর *প্রচারক* কাগজের জন্য রবীন্দ্রনাথের ওই 'সাহিত্যের মাত্রা'র উপরে চিঠির আকারে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখেন।

শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধাকারের চিঠিটি যে দিন লেখেন ঠিক সেই দিনই *স্বদেশ* পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে যান *স্বদেশ* পত্রিকার জন্য শরৎচন্দ্রের একটা লেখা চাইতে। তিনিও অনেক দিন ধরেই তাঁর কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রের একটা লেখা চেয়ে আসছিলেন।

কৃষ্ণেন্দুবাবু গিয়ে লেখার কথা বললে, শরৎচন্দ্র বললেন, 'প্রচারকের জন্য এই যে চিঠিটা লিখেছি, তুমি এরই একটা নকল করে নাও, এবং তুমিও এটা তোমার কাগজে ছাপাও গে।' কৃষ্ণেন্দুবাবু নকল করে এনে তাঁর *স্বদেশ*-এ তখন প্রকাশ করেছিলেন। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের ওই চিঠিটা তখন *প্রচারক* ও *স্বদেশ* পত্রিকায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বইয়েই পরে অতুলানন্দ রায়কে লেখা বলে শরৎচন্দ্রের যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে, সেইটিই *প্রচারক* ও *স্বদেশ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

৫ কবির সেই চিঠিটি এই :

কল্যাণীয়েষু,
শরৎ, কোনো পত্রিকায় দেখলুম তোমার বিশ্বাস যে, উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যেই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্বুদ্ধিতা হোতে পারে কিন্তু সেটা আমার অপরাধ

নয়। কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোনো লেখার উদ্দেশ্য হয় তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি, সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেচ—আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলিনি। এবারেও সেই ফর্দে আর একটি সংখ্যা বাড়ল। আমার বিজয়ার অভিবাদন। ইতি— ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ১৬

১ কানাইবাবু এই সময়ে শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ির ঠিক সামনেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।
এই কানাইবাবু সম্বন্ধে শৈলেশ বিশী ও অবিনাশ ঘোষাল লিখেছেন, 'কানাইবাবু ইটালী ভাষায় শ্রীকান্তের অনুবাদ করেছিলেন।' কিন্তু কানাইবাবুর স্ত্রীর কাছে আমি যা শুনেছি তার মর্মার্থ এই .

> কানাইবাবু দীর্ঘদিন জার্মানীতে থাকায় জার্মান ভাষা তাঁর মাতৃভাষার মতই হয়ে গিয়েছিল। তিনি ইটালী ভাষাও কিছু জানতেন বটে, তবে তত ভাল জানতেন না। কানাইবাবু ইটালী ভাষায় শ্রীকান্তের অনুবাদ করেন নি। তবে তিনি শ্রীকান্তের জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং সেখানে একজন প্রকাশকও ঠিক করেছিলেন। প্রকাশক বইয়ের প্রয়োজনেই নাকি শরৎচন্দ্রকে একবার জার্মানীতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু হিটলারের রাজত্বে সেখানে আফিং পাওয়া যাবে না বা আফিং নিয়ে যাওয়া যাবে না বলে আফিংসেবী শরৎচন্দ্রের আর জার্মানী যাওয়া হয়নি এবং সে বইও আব প্রকাশিত হয়নি। কানাইবাবুর স্ত্রী ঐ সময় জার্মানীতে তাঁর স্বামীব কাছে ছিলেন।

২ শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব ইতিপূর্বে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে হাইকোর্টের জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও থিয়োডোসিয়া টমসন কর্তৃক অনূদিত হয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই মনে হয় শরৎচন্দ্র এখানে অন্যান্য খণ্ড *শ্রীকান্ত*-এর অনুবাদের কথাই চিন্তা করেছিলেন।
৩ ভবাণী ভট্টাচার্য। পরে ইনি ইংরাজিতেই লিখে বিখ্যাত হন।
৪ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন।

পত্র ১৭

১ নিশিকান্ত রায়। ইনিও শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য ছিলেন।
২ শরৎচন্দ্র এ কথা বললেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু *নিষ্কৃতি*-ব ইংরাজি অনুবাদ ডেলিভারেন্স বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিকাটি পরিশিষ্টে ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দিয়েছি দ্রষ্টব্য।

পত্র ১৮

১ ডক্টর বশীশ্বর সেন। ইনি বিজ্ঞানে ডক্টর এবং জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে বহুকাল যুক্ত ছিলেন।
২ *এশিয়া* ছিল আমেরিকার একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে লেখা

১ সাহিত্যের রীতি ও নীতি।

২ পরিশিষ্টে ৪৫৫-৪৬২ পৃষ্ঠায় 'নবেশ সেনগুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা ও তৎকালীন একটি সাহিত্যিক দন্দ্ব' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি দেখুন।

৩ শরৎচন্দ্রের এটা বিনয়ই। কেননা তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে 'পরিশিষ্টে' ৪৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন, 'আসল যা সলিড্ লিটারেচার তাতে তাঁর মত আপ-টু-ডেট্ স্কলার ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ।'

শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড) 'রেঙ্গুনে পড়াশুনা ও সাহিত্য সাধনা' অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমিও কিছুটা আলোচনা করেছি।

৪ পরিশিষ্টে ৪৬৩-৪৭৫ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আত্মশক্তি পত্রিকায় সম্পাদককে লেখা

পত্র ১

১ *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদ যেমন বিচিত্রা ও বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি ৩০ ভাদ্র তারিখের সাপ্তাহিক *আত্মশক্তি* কাগজেও 'মুসাফির' লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' নামে একটি প্রতিবাদ বেরিয়েছিল। মুসাফির তাঁর 'সাহিত্যের মামলা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> ..শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলেছেন যে, নবীন লেখকেরা সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন বলেই তাদের সাহিত্য হয়ে উঠছে কুৎসিৎ।
>
> দু জনার মাঝে কেউ যে নবীন লেখকদের লেখা পড়বার সময় ও সুবিধা পান, তা আমার মনে হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখে আব শরৎচন্দ্র মুখে বলে যে দণ্ডাদেশ দিয়েছেন, তা সঙ্গতও হয়নি, শোভনও হয়নি।
>
> ...রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে 'কল্লোল' বা 'কালি কলম' নিয়মিত পড়েন, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। ... কিন্তু না পড়লেও ওই সব লেখার কথা তাঁরা শুনলেন কাদের কাছে? যারা স্থানে-অস্থানে কারণে-অকারণে ঐ সব লেখার নিন্দা প্রচার করে তাদেরই মুখে নিশ্চিত। সুতরাং 'সাহিত্য ধর্ম' বা রূপনারায়ণের তীরের আশ্রমে কথিত 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' আবদারের ফলে প্রস্তুতও হতে পারে।
>
> ...তারপর সাহিত্যে যৌন-সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ওটা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হওয়া সঙ্গত নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঐ সম্বন্ধীয় আলোচনা অত বেশী করে স্থান পেয়েছে বিজ্ঞানের দাবীতে, এমনি একটা কথা বলে তিনি আমাদের এই বিজ্ঞান-বিহীন দেশে ও আলোচনা যে অপ্রাসঙ্গিক সে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি।
>
> কিন্তু ও দেশের বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য ছাড়া কথা-সাহিত্যেও যে যৌন-সম্বন্ধ বিষয়ক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা যে বিজ্ঞান পিপাসুদের তৃপ্ত করবার জন্যই হয়েছে, তা মনে করবার তেমন কোন কারণ নেই।

নবীন লেখকদের লেখার সঙ্গে নিজের লেখার তুলনা করে শরৎচন্দ্র বলেছেন যে, অশ্লীল কিছু তিনি লেখেন নি এবং পাপকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

... পাপকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, এ কথা তাঁর মত বাঙ্গলার অনেক সাহিত্যিকই বলতে পারেন। ...এ সম্বন্ধে নবীন না হলেও নতুন একজন লেখক অনেকখানি সাহস দেখিয়েছেন,পাপকে প্রশ্রয় তিনিও দেন নি। তিনি পাপকে পাপের পাঁকেই ফেলে না রেখে, তাকে নিষ্পাপ করবার চেষ্টা করেছেন...নতুন যে সাহসিক লেখক এই পরম শুভকর কাজটি করেছেন, তিনি হচ্ছেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, আর অনেকটা তাঁরই প্রকাশিত পথে যাঁরা এগিয়ে চলেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন 'কল্লোল' আর 'কালি-কলমে'র জনকতক লেখক।

২ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত বলে, ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় সজনীকান্ত দাস যা লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র এখানে তারই ইঙ্গিত করেছেন।

৩ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী তাঁর সাড়ে উনিশ পাতা ব্যাপী 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক কথাই লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'ব্যাকরণের অধিকরণ কারক' নিয়ে লিখেছিলেন

প্রথমে 'সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া' ব্যাপারটা দেখা যাক্। রবীন্দ্রনাথ তো দেখছি 'সম্প্রতি আমাদেব সাহিত্যে' এইটুকু মাত্র লিখেছেন। বাহির হতে হাওয়ায় উড়ে আসার যখন সম্ভাবনা মাত্র নেই, তখন নরেশবাবুর নিজের মগজ হতেই 'সমগ্র' 'বেষ্টন করিয়া' প্রভৃতি কথা এসেছে, একথা মানতেই হবে। ...নরেশবাবুর স্মৃতি বিভ্রম ঘটেছে। ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। বাল্যকালে নিশ্চয়ই নরেশবাবু বাঙ্গলা ব্যাকরণে অধিকরণ কারকের অধ্যায়ে অধিকরণ কারকে 'এ' কার বিভক্তি এবং সামীপ্য, একদেশ, বিষয়, ব্যাপ্তি এই সকল অর্থে অধিকরণ কারক হওয়ার কথা উদাহরণ সমেত পড়েছিলেন। এতদিন পরে আর সব ধুয়ে মুছে গিয়ে কেবল এইটুকু মনে আছে যে, অধিকরণে 'এ' কার বিভক্তি হয় এবং ব্যাপ্তি অর্থে অধিকরণ কারক হয়— যেমন, তিলে তৈল আছে অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ 'তিলে তৈল আছে' এই উদাহরণ খাটিয়ে 'সমগ্র আধুনিক সাহিত্য বেষ্টন করিয়া' করে বসেছেন।

দ্বিজেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে কালিদাস বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং উজ্জ্বল নীলমণি সম্বন্ধে লিখেছেন :

'*ঋতু সংহারে*' ঋতুর বর্ণনাটাই কাব্য হিসাবে সার্থক— সম্ভোগ-মিলনের ছবিটা নয়। বড় কবির রচিত কাব্যের সকল অংশই যে কাব্য হিসাবে সার্থক একথা তিনি কি করে জানলেন? বিদ্যাপতির নামে কতক সম্ভোগ মিলনের পদ প্রচলিত আছে সন্দেহ নেই ; তার সকলগুলিই যে বিদ্যাপতির রচিত সে-কথাও জোর করে বলা যায় না। আর বৈষ্ণব কবিদের রচিত সম্ভোগ মিলনের পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে একটু সন্তর্পণে করাই উচিত। কোনও প্রকৃত রসিক বৈষ্ণব যে, সকল ব্যাপারকে প্রাকৃত জীবের দেহ সম্বন্ধীয় লীলা বলে মনে করেন না, শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীলমণি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান কবে দিয়েছেন।...নিছক সম্ভোগ মিলনে যে নিত্য রস থাকতে পারে না, রসজ্ঞ সমালোচক স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি কথায় তা সুন্দর ব্যক্ত করেছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন—'গীতগোবিন্দ কাব্যে গীত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ নাই।'

আর চণ্ডীদাসের নামের সহিত সম্ভোগ মিলনের ভাব এক সঙ্গে মনে আসাই যাকে ইংরেজিতে বলে 'লেসক্রিলেজ' বৈষ্ণবেরা যাকে বলে থাকেন, 'সেবাপরাধ' তাই— এখানে অবশ্য সাহিত্য-সেবাপরাধ।...'

৪ দ্বিজেনবাবু তাঁর সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার প্রবন্ধের আরম্ভেই লিখেছিলেন :

কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণ বধের পর অর্জুন শোক, বিষাদ ও আত্মগ্লানিতে নিতান্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে সাব্যস্ত করতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের বঙ্গ সাহিত্য রণক্ষেত্রের স্বয়ং নির্বাচিত গাণ্ডীবী বৃদ্ধ সাহিত্যগুরুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে, সেরূপ বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন কিনা জানিনে। যদি হয়ে থাকেন, তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারি, তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তাঁর হাতের গাণ্ডীব টঙ্কারে তাঁর নিজের কানে তালা ও শিশুদর্শকদের চমক লাগলেও তা বস্তুত লালশালু মণ্ডিত বংশখণ্ড নির্মিত ক্রীড়াগাণ্ডীব মাত্র। বৃদ্ধ রণগুরুর সুশুভ্র কেশরাশি বা সুশুভ্রতর যশোরাশি তাঁর বাণ নিক্ষেপে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

পত্র ২

১ ব্রজদুর্লভবাবু আত্মশক্তি পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের পত্রাকারে লেখা 'রস-সেবায়েৎ' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। এবং ওই প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য থাকায় তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে আত্মশক্তিতে এক চিঠি দিয়েছিলেন। ব্রজদুর্লভবাবুর সেই চিঠিটি এই .

'রস-সেবায়েৎ'

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার গত ১৩ই আশ্বিন তারিখের কাগজে আমার নামে প্রবাসীর রামানন্দবাবুর নিকট একটা মামলা দায়ের হইয়াছে দেখিতেছি। আমার দুটা কথা নিবেদন করিবার আছে।...

এই 'রস-সেবায়েৎ' না 'সাহিত্য-সেবক' না 'সাহিত্য-সেবী' শরৎচন্দ্রের পরিচয় আমি বিশেষ জানি না, তবে অনুমান হয়, তিনি তন্নামখ্যাত উপন্যাস প্রদেশের সম্রাট, আর তিনি 'ঠাকুর ঘরের' ভিতরেই আছেন, সাড়া দিতেছেন।

তিনি আধুনিক 'সাহিত্য-সেবীর' উপর কুবাক্য-বর্ষণ করার পুণ্যকর্মে নিযুক্ত একজন। তিনি তাঁহার 'জোরাল রীতিতে' ও 'ক্ষুরধার দৃষ্টিতে' 'মনের ভিতর ব্যথার' ন্যায় 'বাহিরের লোকের তাণ্ডব নৃত্য' যেখানে সেখানে দেখেন, 'তিক্তরসে' পিত্তনাশ না করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়েন, 'ঠাসবুনা' খোলের মধ্যে 'তুলো ধুনিয়া' ভরিয়া বেপথু বা প্রহার ব্যথা প্রতিষেধের চেষ্টা করেন, 'রুই কাতলা শামুক' সকলই চিনেন। তাঁহার বিষয় আমার বলিবার কি অধিকার? 'বাপরে বাপ !' আমি ঘটিচুরি, মুড়িচুরির বিচারই কাঁচাপাকা সকল অবস্থাতেই করিয়াছি। ডেপুটির অধিকার ওই পর্যন্তই। গৃহদাহাদি বিষম ব্যাপারের বিচার দায়রার বড় বড় জজ বাহাদুরগণই করেন—তাও জুরির সহযোগে। তবে চরিত্রহীন সামান্য চোরের ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া শুনিয়াও সাহিত্যের রত্নচোর চিনিবার শক্তি হারাই নাই। সে শক্তি যে...চট্টোপাধ্যায় মহাশয় না জানিতে পারেন—মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি-নিহিত ; ডেপুটির পক্কতা বা উপন্যাস প্রণেতার প্রতিষ্ঠা-প্রসূত নয়।

আর একটি নিবেদন। সকল কালে ও সকল দেশেই দারিদ্র্য পীড়িত ব্যক্তিই সাহিত্যের সেবা করিয়া মানব মনের অসীম উন্নতিসাধন করিয়াছেন, এই খবরটা শরৎবাবু না দিলেও পারিতেন। দারিদ্র্য যে অপরাধ একথা উপন্যাসমত্ত ব্যক্তি ভিন্ন কে কল্পনা করিতে পারে? দারিদ্র্য যে অপরাধ আমার প্রবন্ধে কোথায় আছে শরৎকালের কলঙ্কিত চন্দ্রালোকে বা প্রখর রবির রৌদ্রে কেহ যদি দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি স্বয়ং 'রস সেবায়েৎ' বা তাঁহার 'মানিত' রস বিচারকের প্রদত্ত যে কোনও দণ্ড সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট হইব। 'ব্যস' !

বিনীত

শ্রীব্রজদুর্লভ হাজরা

আত্মশক্তি সম্পাদক ব্রজদুর্লভবাবুর এই চিঠি পেয়ে চিঠিটি শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ব্রজদুর্লভবাবুর চিঠি পড়ে *আত্মশক্তি* সম্পাদককে ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিঠিটি লিখে ব্রজদুর্লভবাবুর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। ব্রজদুর্লভবাবুর এই চিঠি ও শরৎচন্দ্রের চিঠি তখন আত্মশক্তি পত্রিকায় পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল। চিঠি দুটির শেষে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল, 'এ সম্বন্ধে আর কোনও বাদানুবাদ আত্মশক্তিতে প্রকাশিত হইবে না।'

নরেন্দ্র দেবকে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহ উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত। উলুবেড়িয়ার কোর্টে এই মামলার কথা ২০৭-০৮ পৃষ্ঠায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতেও আছে।

২ রাধারাণী দেবী। পরে তাঁর সঙ্গে নরেনবাবুর বিয়ে হয়।

পত্র ২

১ 'লালু' শরৎচন্দ্রের লেখা একটি গল্প। শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প' নামক পুস্তকে এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। গল্পটি প্রথমে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'সোনার কাঠি' নামক ছোটদের একটি বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়।

২ এই গল্পটির নাম 'বছর পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী'। এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের *ছেলেবেলার গল্প* নামক পুস্তকের মধ্যে আছে। গল্পটি নরেনবাবুর আগ্রহে তাঁর সম্পাদিত *পাঠশালা* পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

রাধারাণী দেবীকে লেখা

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক প্রবন্ধ যা লিখেছিলেন, তার কিছুটা এইরূপ :

> প্রিয় পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না ধনুর্বাণ নয়, গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি আধুনিক সাহিত্যিক পল্লির দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে। কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হৌক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?... গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানোকে আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাংলা দেশের একজনও অতি আধুনিক সাহিত্যসেবী একথা বলিবে না।
>
> বিশ্বকবির এই 'সাহিত্য ধর্মের' শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে তিনি আমার প্রতি বিরূপ, আমার কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই

নিবেদন করিতেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় [যাঁহারা] তাঁহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।

২ কবির সেই চিঠিটি এই .

কল্যাণীয়েষু, তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে— কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম— আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম— একমাত্র ইংরেজ গবর্মেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্মেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র— তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর— অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি, নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি— ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হ'তই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে— শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে, সেখানে এমনিই ঘটেচে— রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেচে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত— কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই— অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,— আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।
ইতি— ২৭ মাঘ ১৩৩৩। তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ৩

১ এই সময় রাধারাণী দেবী তাঁর পিতার সহিত বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজো দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়।
৩ ৩৫৭ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক পত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।
৪ ৩৫৭ পৃষ্ঠায় ২ সংখ্যক পত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।
৫ শরৎচন্দ্র এখানে ইঙ্গিতে নিরুপমা দেবীর কথা বলেছেন।

পত্র ৪

১ ১৩৩৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দনের উত্তর।

পত্র ৫

১ *লীলাকমল* নামক কাব্যগ্রন্থ।
২ রাধারাণী দেবী এই সময় তাঁর পিতার সঙ্গে শিলং বেড়াতে গিয়েছিলেন।
৩ নিরুপমা দেবী।
৪ *ভারতবর্ষ* পত্রিকা সম্পাদক জলধর সেন।
৫ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী।
৬ এ নিয়ে শরৎচন্দ্রের একটা পরিহাস আছে। সেটা এই ·

> জলধর সেনের 'অভাগী' যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সময় একদিন কলকাতায় কাশী-প্রবাসী সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেখা হয়। কেদারবাবুকে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন— কেদারবাবু সাবধান ! এবার আপনার পালা। কেদারবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন— তার মানে?
> —দেখছেন না, জলধরদা একে একে কাশীর কত লোককে দিয়ে অভাগীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করাচ্ছেন।
> কেদারবাবু শরৎচন্দ্রের পরিহাস বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন।

৭ লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়)।
৮ চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।
৯ নিরুপমা দেবীকে মনে করেই শরৎচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন। এ সম্বন্ধে *শরৎচন্দ্র*-এ (১ম খণ্ড) জীবনী গ্রন্থে 'একটি হৃদয় দৌর্বল্যের কাহিনী' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

পত্র ৬

১ রবীন্দ্রনাথ।
২ রবীন্দ্রনাথ।
৩ শরৎচন্দ্র এখানে নিরুপমা দেবীর কথা বলেছেন। *শরৎচন্দ্র*-এ (১ম খণ্ড) 'একটি হৃদয় দৌর্বল্যের কাহিনী' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।
৪ শরৎচন্দ্র এখানেও নিরুপমা দেবীর কথাই বলেছেন।

পত্র ৭

১ এই ৩০শে (১৩৩৮) তারিখেই শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কেও এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল।' (২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে, অথচ কাউকে চিঠি লেখবার সময় এই কুমিল্লা যাওয়াটাকে তিনি কী হালকা করেই না বলেছেন।

শরৎচন্দ্র কুমিল্লায় গিয়েও সভার বাইরে সেখানকার লোকের সঙ্গে এমনকী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গেও এইরূপ হালকাভাবে ও পরিহাসভাবে অনেক কথাই বলেছিলেন। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি .

> দলবল সহ শরৎচন্দ্র গিয়ে উঠেছিলেন কুমিল্লার কামিনী কুমার দত্তর বাড়িতে। সেখানে এঁদের দেখাশুনা করবার জন্য এবং এঁদের ফাইফরমাস খাটবার জন্য স্থানীয় ঈশ্বর পাঠশালা নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র নিযুক্ত ছিল।
>
> মিটিং-এর দিন দুপুরে শরৎচন্দ্র তখন সবে স্নান শেষ করেছেন। আহারে বসবার তখনও ডাক আসেনি। একটু দেরি হচ্ছে। এমন সময় অমিয়কুমার সেন নামক একজন স্বেচ্ছাসেবককে (এই অমিয়বাবু বর্তমানে এই কাহিনি লেখার সময়-- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক) দেখতে পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন, ওহে, বাড়ির ভিতরে গিয়ে একবার দেখ ত খেতে দিতে আর কত দেরি! উপোস করে থাকা বাপু আমার আদৌ সয় না, তবে এ উপোস করে থাকতে পারে, এ হচ্ছে যতীন দাসের ভাই।— এই বলে শরৎচন্দ্র তাঁর পাশে উপবিষ্ট শহিদ যতীন দাসের ছোটো ভাই কিবণ দাসকে দেখিয়ে দিলেন। কিরণবাবুও সেবার শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন।
>
> অমিয়কুমার তখন ফোর্থ ক্লাসের (বর্তমানের ক্লাস সেভেনের) ছাত্র হলেও দেশের মুক্তিযোদ্ধা যতীন দাসের ৬৩ দিন অনাহারে থেকে আত্মবলিদানের কাহিনি জানত। কেননা কিছুদিন আগেই যতীন দাসের মৃত্যু—(১৩, ৯, ২৯) নিয়ে সারা দেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই অমিয়কুমার কিরণ দাসকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের ওই পরিহাস করাটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বাড়ির ভিতরে খাওয়ার খোঁজ নিতে গেল।

২ রাধারাণী দেবী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যাপার নিয়েই শরৎচন্দ্রের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর বিবাহের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আর শুধু সমর্থন জানানো বা পরামর্শ দেওয়াই নয়, শরৎচন্দ্র এঁদের বিবাহের বাক্‌ দানের দিন নিজে উপস্থিত থেকে উভয়কে আশীর্বাদও করেছিলেন।

পত্র ৮

১ শরৎচন্দ্র এখানেও নিরুপমা দেবীর কথাই ইঙ্গিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনে এই যে একটা গোপন বেদনা ছিল, এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাস পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাসই ব্যক্ত হয়েছে।

২ 'সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে—' একথা শরৎচন্দ্রের নিছক রসিকতা মাত্র। অবশ্য বিজ্ঞানেও যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন এ কথাও ঠিক। কারণ তিনি এক সময় বহু বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশি পড়াশুনা করেছিলেন যে একবার তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত 'জড়-জগৎ' নামক একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করে তাঁর দিদির নাম দিয়ে একটা প্রতিবাদ লিখতে চেয়েছিলেন। তাই তখন তিনি *ভারতবর্ষ* পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী, তাঁর বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন থেকে ২৫.১২.১৫ তারিখে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ এই সময় উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়ি থেকে *বঙ্গবাণী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার হত। এই *বঙ্গবাণী* পত্রিকাতেই শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

২ কলকাতার এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স নামক পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। ইনি প্রথমে *পথের দাবী* পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে রাজদ্রোহিতার ভয়ে প্রকাশ করতে রাজি হননি। শেষে উমাপ্রসাদবাবুই *পথের দাবী* উপন্যাসের প্রকাশক হয়েছিলেন।

৩ উমাপ্রসাদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পত্র ৪

১ *পথের দাবী* পুস্তকাকারে ছাপাবার বন্দোবস্ত।

২ আসামের সুরমা নদীর উপত্যকা অঞ্চল নিয়ে সুরমা উপত্যকা। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা নিয়েই এই সুরমা উপত্যকা।

সেবার সুরমা উপত্যকায় কন্‌ফারেন্স হয়েছিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ও ২০ জুন কাছাড়ের সদর শহর শিলচরে। শরৎচন্দ্র প্রথম দিন পৌঁছতে না পারায়, কেবল দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। আসামের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এবং অনেকে সম্মেলনে যোগদান করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে উদ্যোক্তাদের কাছে চিঠি ও তার পাঠিয়েছিলেন। এই সময় ২৫ তারিখের ইংরেজি *ফরওয়ার্ড* কাগজে এই সম্মেলন সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিছুটা এই—

SURMA VALLEY STUDENTS'
CONFERENCE

The third session of the Surma Valley Students' Conference commenced on Saturday, the 19th June at 5-30 P.M. in the Reading and Dramatic Institution Hall, which was tastefully decorated. Mr. Basanta Kumar Das M.L.C. of Sylhet the Swarajist leader was elected president for the day only. The President-elect having wired 'arriving tomorow.

STUDENTS' DUTIES

Sjt. Sarat Chandra Chatterjee the President-elect arrived on Sunday morning and was given an enthusiastic reception at the railway station

by the members of the Reception Committee amidst cries of 'Bande-Mataram' In course of an extempore speech the president said—Students were fittest to carry out the most difficult duties

পত্র ৫

১ *বঙ্গবাণী*-র সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

২ উমাপ্রসাদবাবুর সহপাঠী বন্ধু নির্মল মুখোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি ছিল বাঁকুড়া শহরে। ইনি হাত দেখতে জানতেন। শরৎচন্দ্রকে না জেনে ইনি উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়িতে একদিন শরৎচন্দ্রের হাত দেখেছিলেন। সেই মজার কাহিনিটি 'হাত দেখা' নামে *শরৎচন্দ্র*-এ (২য় খণ্ড) দিয়েছি।

পত্র ৬

১ রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও বামাপ্রসাদ— চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদবাবুই কখনো মাছ খেতেন, আবার কখনো মাছ খাওয়া ছেড়ে দিতেন।

পত্র ৭

১ *পথের দাবী* প্রকাশ করা নিয়ে।

২ *পথের দাবী* লেখার সময় রমাপ্রসাদবাবু এটা শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন।

৩ পল্লিবাসী শরৎচন্দ্রকে উমাপ্রসাদবাবু এটা উপহার দিয়েছিলেন।

পত্র ৯

১ উমাপ্রসাদবাবুর ডাকনাম।

পত্র ১০ ও ১১

১ শেষ পর্যন্ত ভারতলক্ষ্মীর সম্পাদক হননি।

২ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগ্নীপতি। অর্থাৎ সম্পর্কে ইনি শরৎচন্দ্রের মেসোমশায় হতেন। এঁর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলায় মাকড়দহ গ্রামে।

পত্র ১৩

১ মধুপুরে উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়ি আছে।

২ *পথের দাবী*-র ২য় সংস্করণ।

পত্র ১৪

১ *বসুমতী*-র গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের কর্মী সতীপতি বিদ্যাভূষণ।

পত্র ১৫

১ *পথের দাবী* প্রথম সংস্করণের ৫ হাজার বই বেরবার সঙ্গে সঙ্গে ক-দিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়।

পত্র ১৬

১ শরৎচন্দ্র এখানে *পথের দাবী* বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন।
২ রাজনীতিক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদবাবু শরৎচন্দ্রকে নদীয়া জেলার একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন।

পত্র ১৭ ও ১৮

১ সজনীকান্ত দাস। এই সময় ইনি প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন।
২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩ ইংরেজ গভর্নমেন্ট *পথের দাবী* বাজেয়াপ্ত করলে তখন শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন।

পত্র ১৯ ও ২০

১ শরৎচন্দ্র ফরাসি ভাষা কিছু কিছু জানতেন। তাই তিনি পড়বার জন্য মূল ফরাসি ভাষায় লেখা মোঁপাসার *লে কুঁজে দলা করনেল* (The cousins of the colonelle) এবং *বেলামি* (Bel-Ami) বই দুখানি কিনে পাঠিয়ে দেবার জন্য উমাপ্রসাদবাবুকে বলেছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু তখন মোঁপাসার *লে কুঁজে দলা করনেল* বইখানি পাননি। *বেলামি* বইখানি পেয়েছিলেন, এবং এই বইখানিই তিনি সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
২ *আত্মশক্তি* পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি। ২৫০-৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
৩ *আত্মশক্তি*-র সম্পাদক ছিলেন গোপাললাল সান্যাল। গোপালবাবু তাঁর পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক লেখা ছাপার জন্য ওই সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাই অন্য একজন তখন সম্পাদক হয়েছিলেন।
৪ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৫ চন্দননগর প্রবর্তক সংঘে। উমাপ্রসাদবাবু গিয়েছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র সেদিন যেতে পারেননি।

পত্র ২১

১ *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে ধর্ম' প্রবন্ধ নিয়ে বাদানুবাদ। এ সম্পর্কে পরিশিষ্টে 'নরেশ সেনগুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা ও তৎকালীন একটি সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব' প্রবন্ধটি দেখুন।

২ রবীন্দ্রনাথ *পথের দাবী* পড়ে শরৎচন্দ্রকে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি ৩৭৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

পত্র ২৪

১ উমাপ্রসাদবাবু বিবাহ করবেন না বলে মত করেছিলেন। তিনি পরেও তাঁর এ মত পরিবর্তন করেননি।

পত্র ২৫

১ উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন জেনে কয়েক ব্যক্তি তাঁদের পাত্রীর জন্য উমাপ্রসাদবাবুকে পাত্র হিসাবে ঠিক ক'রে দিতে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন।

পত্র ২৬

১ উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের ৭ই ফাল্গুনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন। সেটি এই—

২০শে ফেব্রুয়ারি '৩৪

আপনার চিঠির জবাব এ নয়। বৃহস্পতিবার আপনার দেখা পাবার আশা রাখি— তাই শুধু জানালাম। তবে একটা কথা এখন বলে রাখা বোধ করি ভাল ; অন্ততঃ আমাদের সেদিনকার আলাপটা (?) হয়ত তাতে সহজ হয়ে উঠতে পারে।

আপনার যে কোনও অনুরোধই হোক্ না কেন, রাখতে না পারলে মনে সত্যই ব্যথা পাই। তাই একান্ত আশা করি সে-ব্যথা দেবার অবকাশ যেন না কখনও আপনি নিজের হাতে টেনে আনেন।

বোঝাবার ভার আপনি নিয়েছেন। নিতান্ত প্রয়োজন যদি মনেই করেন ত বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আমি শান্ত হয়ে শুনব, কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা আমি করতে পারব না।

পত্র ২৯

১ *শরৎচন্দ্র*-এ (২য় খণ্ড) 'কালিয়ায় বাণী মন্দিরে' অধ্যায়টি দেখুন।

পত্র ৩০

১ মুর্শিদাবাদে উমাপ্রসাদবাবুর আত্মীয় বাড়ি।

পত্র ৩১

১ বেলেঘাটায় এক বাগানবাড়িতে রবিবাসর নামক সাহিত্যিক সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায়। কবির আশীর্বাণীটি এই ·

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র, তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশন পাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই ভ্রূকুটি করতে কুণ্ঠিত হয় না। পূর্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দান কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তা হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির প্রমাণ ভরা-পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে, নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, স্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে, তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশি, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে সর্বদা নিজেকে জানান না দিলে পুরোনো ফটোগ্রাফের মতো জানার রেখা হলদে হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল, তারপরে তেল ফুরিয়েছে— অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বালাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাঝ-বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমন ধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে মানুষটা এক-ফস্‌লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে, তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ—এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্তা যে সৃজন করেছেন; সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জান্‌ব প্রশংসার দাম বেশি নয় ! আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ংকর ভক্ত যেমন রাবণ। জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ , নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন

বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানাতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন। আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন— তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,— চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়,— মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ৩২

১ শরৎচন্দ্র বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘব গিয়ে সেখানে তাঁর গ্রন্থের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়দের 'মালঞ্চ' নামক বাড়িতে ছিলেন।

অমিয়কুমাব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১ লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র।
২ অমিয়বাবুর ডাক নাম।
৩ অমিয়বাবুর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এই সময় তাঁর মা অভিভাবিকা হয়ে তাঁদের লালন-পালন করছিলেন। এই সময় তাঁরা তাঁদের হুগলি জেলায় শ্রীরামপুরের বাড়িতে থাকতেন।
৪ অমিয়বাবুর ভায়ের নাম অশোককুমার। ডাকনাম মনু।
৫ ২৮০ পৃষ্ঠায় অমিয়বাবুর মা-কে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্রের এই দুঃখের কথা ছাপা হয়েছে।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লেখা

১ *বাতায়ন* পত্রিকায় সম্পাদক। ইনি শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।
২ 'হিমানী' নামক প্রসাধন দ্রব্যের উদ্ভাবক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাহিত্যরসিক মানুষও ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত *নিরুপমা বর্ষস্মৃতি* ও সাপ্তাহিক *নবযুগ* সেকালের সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। অবিনাশবাবু এই সময় এই দুটি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্রের এ কথা ঠিক নয়। কেননা, ইতিপূর্বে ১৩২৬ সালের ৬ ফাল্গুন তারিখে তিনি 'কর মজুমদার অ্যান্ড কোং' কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁদের প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

পত্র ২

১ *বাতায়ন* ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা

১ শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরের প্রতিবেশী বন্ধু।
২ ঢাকার গুরুট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক।
৩ শরৎচন্দ্র যাতে চিঠির উত্তর দেন, এইজন্য গুরুপ্রসাদবাবু অক্ষয়বাবুকে বলেছিলেন, তাঁর চিঠির সঙ্গে টিকিট পাঠিয়ে দিতে।

চরণদাস ঘোষকে লেখা

১ *নিরক্ষর* প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক। চরণদাসবাবুও হাওড়া শহরে থাকতেন। শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজেশিবপুরে থাকতেন, তখন চরণদাসবাবু মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন।

মণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা

১ কলকাতায় বেহালার জমিদার। ইনি শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। কলকাতায় নিজের বাড়ি হওয়ার আগে শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলে অনেক সময় এঁদের বেহালার বাড়িতে থাকতেন।

পত্র ২

১ শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
২ তখনকার বিখ্যাত অভিনেত্রী চারুশীলা দেবী।

পত্র ৩

১ শরৎচন্দ্রের দিদির ছোটো জায়ের ভাই তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়। তুলসীবাবু বোনের বাড়িতে থেকে কলকাতায় চাকরি করতেন এবং প্রত্যহ ট্রেনে যাতায়াত করতেন। কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র কখনো-কখনো তুলসীবাবু আসার সময় নিয়ে আসতেন।

২ শরৎচন্দ্রের ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
৩ শরৎচন্দ্রের ভৃত্য।

পত্র ৪

১ শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

পত্র ৫

১ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
২ দেশবন্ধুর কনিষ্ঠভ্রাতা খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. আর. দাস।

পত্র ৮

১ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর।
২ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধির আহ্বানে সারা ভারত জুড়ে প্রবল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে ভারতের তৎকালীন ইংরেজ গভর্নমেন্ট কংগ্রেস নেতাদের ও বহু কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল।
শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাই বিশেষ করে এই সময় কংগ্রেসকর্মীরা প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন। এঁদের কেউ কেউ গিয়ে দিনের পর দিন, এমনকী মাসের পর মাসও সেখানে থাকতেন।
শবৎচন্দ্রের সঙ্গে বরাবরই বিপ্লবীদেরও একটা যোগাযোগ ছিল। এঁদের অনেকেই গোপনে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে যেতেন। গিয়ে সেখানে আহার সমাধা করে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য ও উপদেশ নিয়ে আসতেন।

পত্র ৯

১ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধায়ের কন্যা মুকুলমালা। ছেলেবেলায় এঁর ডাক-নাম ছিল বুড়ি।
২ শরৎচন্দ্র এই সময় কটক থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাওয়া স্থির করেছিলেন।
৩ মণিবাবুর স্ত্রী।

পত্র ১০

১ শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা প্রকাশবাবুর স্ত্রী।
২ প্রকাশবাবুর পুত্র শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছেলেবেলায় এঁর ডাকনাম ছিল বাঘা।

পত্র ১১

১ শরৎচন্দ্রের অর্শের রোগ ছিল। এই সময় আনন্দ স্বামী নামে এক সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের অর্শ সারিয়ে দেবেন বলে তাঁকে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওষুধে কিছুই কাজ হয়নি। তাই শরৎচন্দ্র এখানে স্বামীজীর ওষুধের ব্যর্থতা এবং ওই সঙ্গে পরিহাস করে নিজের অর্শের রক্তপাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

পত্র ১২

১ এই বছরই মণিবাবুর কন্যা মানসীর বিয়েতে শরৎচন্দ্র যে আশীর্বাণী দিয়েছিলেন, তা এই :

মানসি !
সংসারের যাত্রাপথে আজ একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি
আর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষের প্রতীক্ষায় তোমার
এই বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই। আশীর্বাদ করি এই সুদীর্ঘ পথ
যেন তোমার সুগম হয়, সুন্দর হয়, সহজ হয়।

৮ই মাঘ ১৩৩৯
সামতাবেড়, পানিত্রাস

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভোলানাথ রায়কে লেখা

পত্র ১

১ ভোলানাথবাবু হাওড়ায় শিবপুরে তখন থাকতেন। ইনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন।

২ কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

৩ যারা মামলা প্রথম শুরু করেছিল, তারা উলুবেড়িয়ার কোর্টে এবং হাওড়ার কোর্টে পর পর দু-বার হেরে, শেষে হাইকোর্টে আপিল করেছিল। শরৎচন্দ্রের সমর্থিতদের পক্ষে উকিল ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও ভোলানাথবাবু। ফরিয়াদি পক্ষের সমর্থক মোহিনী ঘোষাল শেষে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে মামলা মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

৪ শরৎচন্দ্রের দিদির সেজো দেওর পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজদুর্লভ।

পত্র ২

দরিদ্র, অবহেলিত ও হিন্দুসমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের দ্বারা নির্যাতিত মানুষদের প্রতি শরৎচন্দ্রের জীবনভোর যে কী দরদ ছিল, এই চিঠিটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জলধর সেনকে লেখা

১ সাহিত্য-রচনায় শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট কুঁড়েমি ছিল। তিনি যখন রেঙ্গুন থেকে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় লিখতেন, তখন চিঠির পর চিঠি দিয়ে তাগাদা করে লেখা আদায় করতে হত। তারপর রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যখন নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে *ভারতবর্ষ*-এ লিখতে লাগলেন, তখনও *ভারতবর্ষ*-সম্পাদক জলধর সেনকে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে একরূপ রীতিমতো ধরনা দিয়েই তবে *ভারতবর্ষ* পত্রিকার জন্য লেখা আদায় করে আনতে হত।

বেণু-র কিশোর কিশোরী পাঠক পাঠিকাদের লেখা

১ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে রংপুর শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। এই যুব-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাই তখন তিনি রংপুর গিয়েছিলেন।

২ যুব সমিতির জন্ম ইতিহাসের হেতু সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই রংপুর অভিভাষণে বলেছিলেন :

> কংগ্রেস অনেক দিনের, আমারই মত সে বৃদ্ধ, কিন্তু যুবসংঘ সেদিনের, তার শিরার রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা আইনজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদগণের আশ্রয় কেন্দ্র কিন্তু যুবসংঘ কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরি। একটাকে চালনা করে কূট বিষয়বুদ্ধি, কিন্তু অন্যটাকে নিয়োজিত করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম,— তাই নানা প্ররোচনা ও উত্তেজনার পর মাদ্রাজ কংগ্রেস যখন পাস করেছিল দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, তখন সে বস্তু টেঁকলো না— একটা বৎসর গত না হতেই কলিকাতার কংগ্রেসে সে মত নাকচ হয়ে গেল। স্বাধীনতার পরিবর্তে তাঁরা ফিরে চাইলেন 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' কিন্তু দেশের তরুণ দল সে নির্ধারণে কান দিল না। উভয় প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য। পুরাতনের বিধি নিষেধের বেড়াজালে প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠে, যুব-সমিতির জন্ম ইতিহাসের এই হেতু।

৩ শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি তখনকার *বেণু* পত্রিকায়, (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্র মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন সেরে যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন।
২ ঢাকা হলের সাহিত্য অনুষ্ঠান।
৩ গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব।

পত্র ৫

১ *পুরাতন প্রসঙ্গ* ১ম ও ২য় পর্যায় এবং *বিচিত্র প্রসঙ্গ* ১ম ও ২য় পর্যায় এই চারখানি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। ইনি কলকাতায় রিপন কলেজের (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইতিহাসের

বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে কলকাতা ছেড়ে হাওড়া শহরের রামকৃষ্ণপুরে কৈলাস বসু লেনে বাড়ি কিনে বাস করেছিলেন। বিপিনবাবুর বাড়ির নিকটেই ছিল শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরের বাসা বাড়ি। তাই এই সময়েই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল। রামকৃষ্ণপুরে বিপিনবাবুর মৃত্যু হয়েছিল ১৩৪২ সালের ১৯ মাঘ ৬১ বৎসর বয়সে।

পত্র ৬

১ শেষ পর্যন্ত উপেনবাবু কি তুলসীবাবু কেউই যেতে পারেননি।

পত্র ৭

১ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

পত্র ৮

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এ. এফ. রহমান। ইনিও ওই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় আসছিলেন।
২ চারুবাবুর পুত্র দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩ কোরক ও হীরক চারুবাবুর অপর দুই পুত্র।
৪ চারুবাবুর পুত্র অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।
৫ শরৎচন্দ্রের অন্যতম সঙ্গী। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে ডি. লিট্. উপাধি নেবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর খুব জ্বর হয়।
৬ কাজী আবদুল ওদুদ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন।
৭ কাজী মোতাহার হোসেন। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।
৮ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র সংঘ, শরৎচন্দ্র 'রাজনীতিক' অতএব তাঁকে সংবর্ধনা করা যেতে পারে না, এই বলে আপত্তি করেছিল। এ সম্বন্ধে *শরৎচন্দ্র*-এ (২য় খণ্ড) 'ঢাকায়' প্রবন্ধটি দেখুন।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লেখা

পত্র ১

১ *বেণু* পত্রিকার সম্পাদক।
২ ভূপেনবাবু, তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি তখন বেণু পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি প্রকাশিত হলে ওই সময় সাপ্তাহিক *নবশক্তি* কাগজে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের এই চিঠির সমালোচনা করেছিলেন।
উপেনবাবু লিখেছিলেন :

> আমার কিন্তু মনে হয় যে সিভিল ওয়ার, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অভদ্র জিনিষগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যে গজায় তা নয়, খাঁটি বিদ্রোহের মধ্যেও তাদের অভাব হয় না।

'আপনাদের মাসতুতো ভাই' ছদ্মনামে আর একজন লিখেছিলেন :

> নব্য বাঙ্গলার নব যৌবনের প্রতীক শরৎচন্দ্র রঙ্গপুরে সেদিন বলে এসেছেন— ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা—এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লবপন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। ...স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা।— রংপুর থেকে ফিরে এসেই তিনি বেণুতে লিখলেন, কোথাও দেখেছো কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে?... বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। ইত্যাদি— ব্যাপারটা কি বলতে পারেন?... রাজনৈতিক গবেষণা শুধু সাহিত্য স্রষ্টার অহংকার দিয়েই হয় না। রাজনৈতিক, বিশেষতঃ বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংক্রান্ত রাজনৈতিক জ্ঞান তিলে তিলে জীবনের রক্তক্ষয় করে শিখতে হয়। শিক্ষকের আসনে বসবার আগে শিক্ষানবিশী করতে হয়।

শরৎচন্দ্রের রংপুর অভিভাষণে ছিল যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। কিন্তু অভিভাষণটি যখন যে স্বাধীনতা কাগজে ছাপা হয়, তখন তারা ভুল করে ছাপে স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা।

(এই বইয়ের শেষ ভাগে 'না-পাঠানো চিঠি'র অধ্যায়ে *আত্মশক্তি* সম্পাদককে লেখা চিঠিটি দেখুন।)

শরৎচন্দ্রকে এইভাবে তখন আক্রমণ করলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু কোনো উত্তর দেননি।

পত্র ৩

১ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঢাকার নদী পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. বার্ড অসুস্থ হয়ে তখন ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে আছেন। সেই সময় ২৯ আগস্ট তারিখে ঢাকার আই. জি. মিঃ লোম্যান এবং এস. পি. মিঃ হাড্‌সন হাসপাতালে মিঃ বার্ডকে দেখতে যান।

সেই সুযোগে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র বিনয় বোস লোম্যান ও হাড্‌সনকে লক্ষ করে পর পর রিভালবারের গুলি ছুড়লেন। গুলির আঘাতে লোম্যান সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হলেন, আর হাড্‌সন আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বিনয় পালিয়ে গেলেন, ধরা পড়লেন না।

ভূপেনবাবু ছিলেন বিনয়দের দলেরই একজন। তিনি তখন কলকাতায়। ভূপেনবাবু কলকাতায় বিনয়ের লোম্যান হত্যার কাহিনি জানতে পেরে দু-একজন বন্ধু সহ ৩১ তারিখে শরৎচন্দ্রকে খবরটা দেবার জন্য সামতাবেড়েয় যান।

ভূপেনবাবু বলেন যে, শরৎচন্দ্র বিনয়ের লোম্যান হত্যার কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং অনেক আলোচনা করলেন।

ভূপেনবাবু শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে সেদিন ফিরে এলে, সেইদিনই ভোর রাত্রে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন, এবং গ্রেপ্তার হয়ে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে, তারপর কোচবিহারে বক্সার জেলে যান।

এই সময়ে শরৎচন্দ্রের *শেষপ্রশ্ন* প্রকাশিত হয়। ভূপেনবাবু জেলে *শেষপ্রশ্ন* পড়ে ভালো লাগায় তা শরৎচন্দ্রকে জানান। ভূপেনবাবুর চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র তখন ভূপেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা

১ শরৎচন্দ্র এখানে দ্বিজেনবাবুদের 'বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলী'র কথা ইঙ্গিত করেছেন।
২ মনে হয় এটা শরৎচন্দ্রের মনের কথা নয়। তিনি হয়তো কতকটা ব্যঙ্গ করেই বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই কথাটা বলেছিলেন।

কালিদাস রায়কে লেখা

পত্র ১

১ 'রসচক্র' সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে ১৩৩৮ সালের ৬ ভাদ্র বেলঘরিয়ায় এক উদ্যান সম্মিলনীতে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সংবর্ধনা করার ব্যবস্থা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক জলধর সেন। শরৎচন্দ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পেরে 'রসচক্র'র সম্পাদক কবিশেখর কালিদাস রায়কে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।
অথচ এর একবছর পরে ১৩৩৯ সালের ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দেশের জনসাধারণ ও সাহিত্যিকগণ যখন কলকাতার টাউন হলে শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন যতীনবাবু তাঁর দলের কয়েকজন কবি সহ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'মহাত্মা গান্ধী অনশন করবেন কথা হচ্ছে, অতএব শরৎচন্দ্রের অভিনন্দন সভা বন্ধ করা হোক। বিবৃতিদানে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কালিদাসবাবুও ছিলেন।
এঁদের এই বিবৃতিতে শরৎচন্দ্র তখন বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।
কালিদাসবাবু বলেন, 'আমি তখন যতীন বাগচীর পাল্লায় পড়ে বিবৃতিতে সই করে ভুল করেছিলাম।'
পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কালিদাসবাবুর আবার স্বাভাবিক সৌহার্দ ফিরে এলেও, যতীনবাবু কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে যেতে সংকোচ বোধ করতেন। (এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র-এ (২য় খণ্ড) 'আশুতোষ কলেজে সাহিত্য সম্মেলনে' প্রবন্ধটি দেখুন।)

পত্র ২

১ আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র চৌধুরী।
২ কয়েকজন লেখক একটা উপন্যাসের পৃথক পৃথক ভাবে কিছু কিছু লিখে উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণ করলে তাকে বারোয়ারি উপন্যাস বলে। শরৎচন্দ্র লেখকদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ তিনখানি বারোয়ারি উপন্যাসে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই তিনখানি উপন্যাস হল, (১) বারোয়ারি উপন্যাস (২) রসচক্র (৩) ভালোমন্দ। প্রথমটি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ২১-২২শ অধ্যায় শরৎচন্দ্রের লেখা।
রসচক্র উপন্যাসটি ১৩৪৩ সালের বৈশাখ মাসে *রসচক্র* থেকে প্রকাশিত হয়। *রসচক্র* পত্রিকার সম্পাদক কালিদাস রায় এই বইটি সম্পাদনা করেছিলেন। সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। এই বইয়ের পৃ. ৩-১৩ ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের রচনা। এই লেখাটি প্রথমে কাশী থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *প্রবাস জ্যোতি* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৭) *বাড়ির কর্তা* নামে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা *উত্তরায়* একটি বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনারূপে প্রকাশিত হয়।

ভালোমন্দ উপন্যাসে পৃ. ১—৯ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখা। এই লেখাটি ১৩৪৪ সালের ১৫ আশ্বিন *বাতায়নে* প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৫৯ সালে।

কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লেখা

১ *স্বদেশ* পত্রিকার সম্পাদক।

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লেখা

১ অমরবাবু শরৎচন্দ্রের বাজেশিবপুরে প্রতিবেশী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ন্যায় অমরবাবুরাও বাজে-শিবপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। অমরবাবুর বাড়ি ছিল শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির অদূরেই।
অমরবাবুর বিয়েতে শরৎচন্দ্রের বাড়ির সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অমরবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র বউ-ভাতের দিন গিয়েছিলেন। গিয়ে সেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কথায় কথায় নানা গল্প বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেদিনের বলা একটা গল্প *শরৎচন্দ্র* (২য় খণ্ড) বৈঠকি গল্প অধ্যায়ে 'যাত্রা' নামে দিয়েছি।

মতিলাল রায়কে লেখা

পত্র ১

১ চন্দননগরের *'প্রবর্তক সংঘ'*-র প্রতিষ্ঠাতা মতিবাবুর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে শরৎচন্দ্র ১৯৩০, ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মোট তিনবার 'প্রবর্তক সংঘ'-র অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।
এ ছাড়া তিনি মতিবাবুর আমন্ত্রণে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখে 'প্রবর্তক সংঘ'র সাহিত্য বৈঠকে এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর 'প্রবর্তক সংঘ'র ৫ম বার্ষিক হিন্দু সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যও চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে গিয়েছিলেন। আর কলকাতায় 'প্রবর্তক সংঘ'র অর্থ প্রতিষ্ঠানের ৩য় বাৎসরিক উৎসবেও আমন্ত্রিত হয়ে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

পত্র ৩

১ এই চিঠিটি সম্বন্ধে পরিশিষ্টে ৪৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অতুলানন্দ রায়কে লেখা

১ *প্রচারক* পত্রিকার সম্পাদক।
২ পরিশিষ্টে পৃ. ৪৭৬-৪৮০ দ্রষ্টব্য।
৩ সেই চিঠিটি এই ·

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

...প্রবাদ আছে 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না,' তেমনি কথার কৌশলে অসম্মান অপ্রমাণ হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। বিড়াল ইঁদুর খায়, উচ্ছিষ্ট খেয়ে আসে, আচমন করে না, তদবস্থায় ব্রাহ্মণীর কোলে এসে বসলে গৃহকর্ম অশুচি হয় না। মাছ নানা মলিন দ্রব্য খেয়ে থাকে, সেই মাছকে উদরস্থ করেন বাঙালী ব্রাহ্মণ, তাতে দেহে দোষ স্পর্শ হয় না। মেথরের বৃত্তিতে যে মলিনতা, সে মলিনতা প্রতিক্ষণ আমাদের দেহে। মা করে থাকেন মেথরের কাজ, তার দ্বারা তাঁর প্রতি ভক্তিব সঞ্চার হয়। পঙ্কের মধ্যে নেমে মেছুনী মাছ ধরে, তাই বলে সকল অবস্থাতেই সে পঙ্কিল, এমন কথা বলা চলে না। পঙ্ক যেই সে ধৌত করে আসে, অমনি অন্যের সঙ্গে তার পার্থক্য নেই। যাকে আমরা হীন বৃত্তি বলি, সে আমাদের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত আবশ্যকতা অনুসারে সেই সকল কাজ আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত ছিল, আমাদের হয়ে যারা সেই দায় গ্রহণ করে, তাদের ঘৃণা করার মত ঘৃণ্যতা আর নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ যেসব দুষ্কৃতি করে থাকে, তার দ্বারা তাদের চরিত্র কলুষিত হলেও দেব-মন্দিরে তাদের অবাধ প্রবেশ এবং যদি ধনী হয় পদস্থ হয়, তবে তাদের সঙ্গ ও প্রসাদ আমরা আগ্রহের সহিত কামনা করি। দেহের কলুষ জলে ধুয়ে যায়। মনের কলুষ কোনো বাহ্য স্নানে দূর হয় মনে করা মূঢ়তা। এই রকমের কলুষিত স্পর্শ আমাদের ঘরে-বাইরে। দেহের কলুষকেই সমাজে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত যদি মনে করা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, মলিন রোগে রক্তদূষিত ব্রাহ্মণকে কি সমাজ থেকে ও মন্দির থেকে নির্বাসিত করবার বিধি আছে? যদি থাকে সে বিধি কি পালিত হয়? তারা তো চরিত্রের মলিনতা আপন দূষিত দেহেই বহন ক'রে থাকে। দেহ বা চরিত্র যার কলুষিত, ঘৃণা ক'রে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষকে দূরে বর্জন করলে দোষ দিতে পারি নে, কিন্তু কোনো সমগ্র জাতকে অবজ্ঞা করবার স্পর্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না, ভারতবর্ষকে তিনি ক্ষমা করেন নি। জন্মগত অধিকারকে যদি আমরা স্বীকার করি, তবে ইংরেজ যদি মনে করে, জন্মগত শ্রেষ্ঠতাবশতঃই ভারতশাসনে তাদের শাশ্বত অধিকার এবং জন্মগত নিকৃষ্টতা বশতঃই তাদের দাসত্ব নতশিরে চিরদিন আমাদের স্বীকার্য, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকাই আমাদের শ্রেয়ঃ হয়। কোনো জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, এ কথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি। খৃষ্টান-শাস্ত্রে চির নরক বাসের কল্পনা যেমন গর্হিত কোন জাতিকে সমাজে চির-নারকী করে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়।

৪ শরৎচন্দ্রের এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১ এই ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের সর্বপ্রথম নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'বিরাজ বৌ' নাট্যরূপ দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভূপেনবাবুর পরিচয় হয়।

প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১ হাওড়া শহরের শিবপুরে এঁর বাড়ি। ইনি শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন।
২ প্রতুলবাবুর ডাক নাম।
৩ বিধবা দুর্গার সঙ্গে প্রতুলবাবুর ভালোবাসার কথা জানতে পেরে, শরৎচন্দ্র এঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছিল, কলকাতায় হিন্দুমিশন আশ্রমে। ওই বিয়ের পর প্রতুলবাবুর

আত্মীয়রা তাঁকে ত্যাগ করলে, তখন শরৎচন্দ্র দুর্গাকে কন্যার মতো করে নিজের সামতাবেড়ের বাড়িতে কিছুদিন রেখেওছিলেন। আর ওই সময় তিনি নিজে দুর্গাকে লেখাপড়াও শোখাতেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা

১ বারীনবাবু ৫৩ বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং পাত্রী ছিলেন কয়েকটি সন্তানের জননী এক বিধবা মহিলা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১ *নাচঘর* পত্রিকার অন্যতম কর্মকর্তা।

জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা

১ ওই সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান দাবি তুলেছিলেন, বাংলা দেশের শতকরা ৫৫জন মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে বাংলা ভাষায় ৫৫টি আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ চালু করতে হবে। বাংলা ভাষায় ওই হারে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দ আনলে, বাংলা ভাষার চেহারাটা কী হবে তা দেখিয়ে মোহিতমোহন ঘোষ নামে একব্যক্তি তখন একটি কাহিনি লিখেছিলেন। তাঁর সেই লেখার কিছুটা এই :

> ... নবাবর্ষি জনক চারপায়োপবেশনে উজু করিতেছেন। তাঁহার সামনে বশিষ্ঠ মৌলভী দুনিয়া-দোস্ত (বিশ্বামিত্র) মোল্লা গৌ চুরি করিয়াছে বলিয়া নালিশের আরজি পেশ করিতেছেন। এমন সময় 'হরিনাম হক্, হরিনাম হক' বলিতে বলিতে নারদ মোল্লা আসিয়া হাজির— ইয়া আজানু লম্বিত নুর, হাতে অলাবুর বদনা। জনক তখনই ল্যুঙ্গ-গর্দান (গলবস্ত্র) হইয়া আজমীন সেলাম করিলেন।

২ শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি *বর্ষবাণী*-র ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হরিহর শেঠকে লেখা

পত্র ১

১ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে হুগলি জেলার কয়েকজন সাহিত্যসেবী 'হুগলি জেলা সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠন করেছিলেন। হুগলির এই সাহিত্যসেবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দননগরের বিখ্যাত ধনী ও দানী হরিহর শেঠ। শরৎচন্দ্র হুগলি জেলায় জন্মেছিলেন বলে এঁরা শরৎচন্দ্রকে এঁদের পরিষদের সভাপতি করেছিলেন। হুগলি জেলা সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ২৩।৩।৩৬ তারিখে হরিহরবাবুর বাড়িতে। দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পর্কে হরিহরবাবু আবার শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন এবং নিজের ছেলেকেও শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। হরিহরবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিগুলি সেই সময়কার।

গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্র নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জানতেন। গ্রামের গরিব দুঃখীদের অসুখে বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন।
শরৎচন্দ্র নিজের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় না পারলে, তখন সাধারণত স্থানীয় পানিত্রাসের এল. এম. এফ. ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ডাকতেন। রমেশবাবু এসে চিকিৎসা করতেন। আবার রমেশবাবু যখন কোনো রোগীর অবস্থা জটিল দেখে, তার চিকিৎসার ভার নিতে সাহস করতেন না, বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাইতেন, তখন শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে প্রায় ৯ মাইল দূরে হাওড়া জেলারই নুন্‌টের হার্টের ডাক্তার এই গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে ডাকতেন। শরৎচন্দ্র গ্রামের যাদের চিকিৎসার জন্য রমেশবাবু বা গোপীবাবুকে ডাকতেন তাঁদেরও ফি'র টাকা নিজেই দিতেন।
এ সম্বন্ধে গোপীবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন .

> সামতাবেড় অঞ্চলে গেলে আমি তখন ৮ টাকা করে ফি নিতাম। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের বাড়িতে বা তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে আমাকে ডাকলে ৮ টাকা করেই ফি দিতেন। তিনি অপরের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাকলেও তিনিই আমার ফি দিতেন। অবশ্য টাকাটা তিনি রোগীর হাত দিয়েই দেওয়াতেন। আমি সবই জানতে পারতাম।

২ মেল্লকের সাধন ঘোষাল। রোগী ছিল গোবিন্দপুরের হরিচরণ পাখিরা।

পত্র ২

১ শরৎচন্দ্র গোপীবাবুর নিকট বা দূর কোনো সম্পর্কেরই আত্মীয় ছিলেন না। গোপীবাবু নিজেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে শরৎচন্দ্রকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রও গোপীবাবুকে বাবাজি বলতেন।

পত্র ৬

১ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির পাশের বাড়িব ছেলে নকুলচন্দ্র পতি। ২০৩ পৃষ্ঠায় তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে এঁর কথা আছে। শরৎচন্দ্র এঁকে পরে কলকাতায় এনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অপরকে বলে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে এঁর একটা চাকরিও করে দিয়েছিলেন।

কুমুদশংকর রায়কে লেখা

১ কুমুদবাবু ছিলেন, সেকালের কলকাতার একজন বিখ্যাত যক্ষ্মারোগ চিকিৎসক। ইনি শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। কারও অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র যেমন কুমুদবাবুর সাহায্য

নিতেন, কুমুদবাবুও তেমনি প্রয়োজনবোধে শরৎচন্দ্রের সাহায্য নিতেন। এরূপ একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর কাছে একদিন শুনেছিলাম— যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল করার সময় (কুমুদবাবুর মৃত্যুর পর এই হাসপাতাল তাঁর নামে হয়েছে) কুমুদবাবু ওই হাসপাতালের জন্য বিনামূল্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে একদিন রাজশেখর বাবুর কাছে গিয়েছিলেন এবং যন্ত্রপাতি এনেওছিলেন।

কুমুদবাবুর পুত্র ডা. করুণশংকর রায়ের কাছে শুনেছি— যক্ষ্মা হাসপাতালের রোগীরা এক সময় হাতে-লেখা একটি মাসিক পত্রিকা বার করলে শরৎচন্দ্র সেই পত্রিকার নামকরণ করে দিয়েছিলেন—'নবজীবন' এবং পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় একটা আশীর্বাণীও লিখে দিয়েছিলেন।

২ তুলসীবাবু শিয়ালদহে রেলওয়ে অফিসে চাকরি করতেন।

৩ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে কুমুদবাবু একজন প্রার্থী ছিলেন এবং জয়ীও হয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা

পত্র ১

১ ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র, আর ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই রমেশচন্দ্র মজুমদার। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রমেশবাবুর প্রথম পরিচয় হয়। সম্মেলনের শেষে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে ঢাকায় তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করলে শরৎচন্দ্র সেই সময় ঢাকায় গিয়ে রমেশবাবুর বাড়িতে দু-একদিন থেকে এসেছিলেন।
১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে যে ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়, সেই উপাধি দেওয়ার ব্যাপারে রমেশবাবু বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তখন ওখানকার ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস্ চ্যান্সেলার ডা. এ. এফ. রহমানের সংগেও তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। (এই রহমান সাহেবের পরই রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়েছিলেন।) তাই শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. দেওয়ানোর ব্যাপারে রমেশবাবু ডা. রহমানের উপর তাঁর নিজের যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. দেওয়ার ব্যবস্থা হলে শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে যাতে রমেশবাবুর বাড়িতে ওঠেন, সেইজন্য রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের কথা স্মরণ আছে কি না লেখায় শরৎচন্দ্র একথা লেখেন।

২ ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।

৩ শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জমিদার এবং বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক।

৪ এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রও তুলসীবাবুর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। কারণ এই সময়েই তিনি তুলসীবাবু এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কলকাতায় টাউন হলের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সভার জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি স্থির করে এসেছিলেন।

৫ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ইনি তখন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রাধাকুমুদবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকায় যেতে পারেননি।

৬ ঢাকা ইউনিভারসিটিতে তখন তিনটি হল বা ছাত্রাবাস ছিল— জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই এই তিনটি হলের যে-কোনো একটি হলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। তিনটি হলে তিনটি ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত ইউনিভারসিটির ছাত্রদেরও একটি ইউনিয়ন ছিল। তার নাম— ঢাকা ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে এই চারটি ইউনিয়ন থেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। রমেশবাবু ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন— এই দুটির সভাপতি ছিলেন। তাই তিনি এই দুটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই শরৎচন্দ্রকে দুটি পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন। অপর দুটি ইউনিয়ন থেকে আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র গিয়েছিল। রমেশবাবু জগন্নাথ হল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, জগন্নাথ হলে আপনি মামুলি কিছু না বলে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আর ছেলেরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎও করবে।' শরৎচন্দ্র এখানে রমেশবাবুর চিঠির সেই কথাই উল্লেখ করেছেন।

পত্র ২

১ শেষ পর্যন্ত তুলসীবাবু যেতে পারেননি।

পত্র ৩

১ রমেশবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ৩

১ কলকাতার জনৈক চশমা ব্যবসায়ী।
২ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলার পরীক্ষক।

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ সত্যেনবাবু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাই। সুরেনবাবুরা ছিলেন ছয় ভাই। যথা— মণীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ। সত্যেনবাবু এই সময় দেওঘরে গভর্নমেন্ট হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন ছিলেন।

পত্র ২

১ সত্যেনবাবুর বড়দা মণিবাবুর পুত্র সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন— আমার এক জ্ঞাতি কাকা তাঁর মেয়ের বিয়ের সময় সত্যেনকাকার মারফত শরৎদার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন। শরৎদা এখানে সেই টাকাটা ফেরত পাওয়ার কথাই বলেছেন।

২ সত্যেনবাবু দেওঘর থেকে মুঙ্গেরে বদলি হন।
৩ এই সময় সুরেনবাবুর স্কুলের পরিচালক সমিতির সঙ্গে সুরেনবাবুর মনোমালিন্য চলছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১ সুরেনবাবু পিঠে কার-বঙ্কল হওয়ায় ভুগছিলেন।
২ সুরেনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি এই সময় এঁর পিতার দেখাশুনা করবার জন্য পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন।

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর সেজো দেওর।
২ শরৎচন্দ্রের গ্রামের ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল. এম. এফ.
৩ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথা বলে শরৎচন্দ্র পরিহাস রেছিলেন।
৪ ডি. লিট্. উপাধি নেওয়ার জন্য।

পত্র ২

১ অনিলা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা।
২ অনিলা দেবীর মেজো দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণবাবু এই সময় কলকাতায় শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থাকতেন। পারুর বিয়ে হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুরে। পাঁচকড়িবাবু শরৎচন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের ঠিকানায় পারুকেও একটা চিঠি দেন। রামকৃষ্ণবাবু সেই চিঠি পারুর বাড়িতে দিয়ে আসেন।
৩ অনিলা দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা।
৪ আগে মেজদা এবং পরে বড়দার মৃত্যুর পর পাঁচকড়িবাবুই তখন তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারের অভিভাবক ছিলেন।
৫ আশার মৃত্যু হয়েছিল কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে।
৬ আশার শ্বশুরবাড়ি।
৭ অনিলা দেবীর জ্ঞাতি ভাসুরপো।

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

পত্র ১

১ শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজো দেওরের ছেলে। ইনি কলকাতায় শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থাকতেন এবং ছুটির দিনে বাড়ি যেতেন। শরৎচন্দ্র হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির তৎকালীন

সর্বময় কর্তা নলিনীরঞ্জন সরকারকে বলে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে এঁর একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন।

২ শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। হিরণ্ময়ী দেবী চিঠি লিখতে পারতেন না বটে, তবে তিনি নিজের নাম সই করতে পারতেন, তা দেখেছি। শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তার ফলে তিনি চিঠি পড়তে এবং বই পড়তে পারতেন।

পত্র ২

১ অনিলা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা পারুর স্বামী তেজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি কলকাতায় ভবানীপুরে। শরৎচন্দ্র নলিনীরঞ্জন সরকারকে বলে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিতে এঁরও একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন।

২ তিনকড়ি অনিলা দেবীর ছোটো দেওর। ইনি কলকাতায় ডেড লেটার অফিসে কাজ করতেন এবং বাড়ি থেকে যাতায়াত করতেন। টাবু, পারুর অসুখের খবর জানিয়ে এঁর হাতে যে চিঠি দিতেন।

৩ এই সময় হিরণ্ময়ী দেবী মাথা ঘোরা রোগে ভুগছিলেন। এই চিঠি লেখার দু-এক দিন আগে একদিন সন্ধ্যার পর দোতলায় উঠতে গিয়ে হিরণ্ময়ী দেবী মাথা ঘুরে সিঁড়িতে পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

পত্র ৩

১ রামকৃষ্ণবাবুর ছোটো বোন মনোরমার ডাক নাম ছিল তেলি। সেই হিসাবে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী রামকৃষ্ণবাবুর মাকে তেলির-মা বলে ডাকতেন। শরৎচন্দ্রও তাঁকে কখনও তেলির মা কখনও মেজদি বলতেন।

২ অম্ল রোগের ওষুধ।

৩ মনোরমার স্বামী সরোজ শোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর বাড়ি গোবিন্দপুরের অল্প দূরে বাগনানে।

৪ শরৎচন্দ্র এই সময় রোদ ওঠবার আগে অতি প্রত্যুষেই সামতাবেড় থেকে রওনা হয়ে কলকাতায় আসতেন, কালী এটা জানত। সেই হিসাবে শরৎচন্দ্র কলকাতায় আসবেন শুনলে সে সকালেই হাওড়া স্টেশনে মোটর নিয়ে যেত।

প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১ শরৎচন্দ্র দেওঘরে থাকার সময় একবার ভাগলপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের একজন স্নেহভাজন ছিলেন।

৩ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈমাত্রেয় দাদা।

হিরণ্ময়ী দেবীকে লেখা

পত্র ১

১ হিরণ্ময়ী দেবী পেটে উদরী রোগে ভুগছিলেন।

পত্র ২

১ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র দেওঘরে যাওয়ার দু-এক দিন আগেই ইনি দেওঘরে গিয়েছিলেন। গিয়ে শরৎচন্দ্রের থাকার ঘরদোর পরিষ্কার করে এবং হাটবাজার করে রেখেছিলেন।

৩ সত্যেনবাবু দেওঘর গভর্নমেন্ট হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন ছিলেন বলে দেওঘর সাব জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং মেডিকেল অফিসার ছিলেন। জেলখানায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিরা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হলে তাদের ঘানিটানা, জাঁতায় গম ভাঙা প্রভৃতি কাজ করতে হয়। এদের কিছু পয়সা দিলে, অনেক সময় আবার বিনা পারিশ্রমিকেও এরা জেলখানার অফিসারদের বাড়ির গম ভেঙে দেয়। সেই হিসাবে সত্যেনবাবু জেল থেকে শরৎচন্দ্রের জন্য গম ভাঙিয়ে দিতেন। জেলের ঘানির তেলের মতো জাঁতায় ভাঙা গমও ভেজালহীন ও পুষ্টিকর।

৪ কালী শরৎচন্দ্রের ড্রাইভার। কালীকে মোটর নিয়ে যেতে হয়নি। কারণ সত্যেনবাবুর মোটর ছিল, শরৎচন্দ্র প্রয়োজন হলে তাঁর মোটরেই বেড়াতেন। সত্যেনবাবুর বাসা নিকটে থাকায় শরৎচন্দ্র একরূপ রোজই তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন।

এ সম্বন্ধে সত্যেনবাবুর পুত্র শরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায় দেওঘর থেকে একবার এক পত্রে আমাকে লিখেছিলেন :

> দেওঘরে সেবার শরৎদা আমার বাবার চিকিৎসায় প্রায় মাস তিনেক ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং বাবার সঙ্গে গল্প-গুজব করে বেশ রাত করেই ফিরে যেতেন। যেদিন তিনি আসতেন না, সেদিন বাবা তাঁর কাছে যেতেন।
>
> এমনি একদিন বিকালে বাবা তাঁকে নিয়ে এক গ্রামে (রোহিণী) নিজের মোটরে করে বেড়াতে নিয়ে যান। বাবা একটি রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে আমরা তিন ভাইও (আমার দাদা শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, আমি এবং আমার ছোট ভাই শিশিরেন্দু) ছিলাম।
>
> বাবা রোগীর বাড়িতে ঢুকলে আমরা সবাই গাড়ী থেকে নেমে সামনের একটা ফাঁকা মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় একটি বিহারী ভিখারী এসে শরৎদার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। শরৎদা তখন মণিব্যাগ বার করে একটা টাকা নিয়ে ভিখারীটির হাতে দিলেন।
>
> একেবারে একটা গোটা টাকা পেয়ে ভিখারীটি হতভম্ব হয়ে গেল।
>
> শরৎদা হিন্দীতে বললেন— কুছ্ ঘুমানে নেহি হোগা। যাও, রুপিয়া তুমকো দে দিয়া। ঠিক হ্যায় তো?
>
> ভিখারীটি ঘাবড়ে গিয়ে কোনো কথা না বলে তখন চোঁ চোঁ দৌড় লাগাল।
>
> শরৎদার দরাজ দিলের পরিচয় পেয়ে আমরাও সেদিন বেশ অবাক হয়েছিলাম। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক টাকার কি দাম ছিল, আজ বুঝতে পারছি।

৫ শরৎচন্দ্র কলকাতা থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে হাওয়া বদলের জন্য বাইরে যাচ্ছেন শুনে অনিলা দেবী ভাইকে দেখবার জন্য তখন তাঁর গোবিন্দপুরের বাড়ি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লেখা

১ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

বুদ্ধদেববাবু শরৎচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। দিলীপকুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটি চিঠিতে এই বুদ্ধদেববাবুর কথা আছে। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকায় অন্নদাশংকর রায় তাঁর ছদ্মনাম লীলাময় রায় নাম দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও শেষপ্রশ্নে-র তীব্র বিরূপ সমালোচনা করলে, তখন এই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই 'শেষপ্রশ্ন ও লীলাময়' নামে প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বুদ্ধদেববাবুর সেই প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে ১৮-২৪ পাতায় আছে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা

১ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেন ·

> হয় সুধা সেন সম্পাদিত 'কিশোরী' বার্ষিকী কাগজের জন্য, নয় ত আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অগ্রগতি' সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য আমি শরৎচন্দ্রের কাছে একটা লেখা চেয়েছিলাম। কার কাগজের জন্য চেয়েছিলাম, তা আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে যার কাগজের জন্যই চাই, তার বিশেষ আগ্রহেই আমি একদিন একটা লেখা দেবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলাম। শরৎচন্দ্র তখন সম্ভব হলে লেখা দেবেন বলেছিলেন। শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন শুনে, তাঁর ওই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, একটা চিঠি লিখে তাঁর কাছে লেখা চেয়েছিলাম। তারই উত্তরে তখন শরৎচন্দ্র এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে লেখা

এই চিঠিটি লিখবার কয়েকদিন পরেই শরৎচন্দ্র রসচক্রের পক্ষ থেকে অসমঞ্জবাবুকে এক সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন রসচক্রের সভাপতি। এই সময় শরৎচন্দ্রের শরীরও ভালো যাচ্ছিল না।

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে চিঠিটি পাওয়া সম্বন্ধে অসমঞ্জবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' বইয়ে লিখেছেন—

'এই সময় একদিন তাঁর শরীরের অবস্থা জানবার জন্যে আমার এক ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ছেলের হাত দিয়ে তিনি একখানা চিঠি পাঠালেন।'

অসমঞ্জবাবু তাঁর বইয়ে এই চিঠিটির প্রতিলিপি ছেপে নীচে লিখেছেন—'গত ভাদ্র মাসে সম্ভবত তিনি প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করিয়া সজ্ঞানে তাঁহার শেষ কাজ সম্পন্ন করেন।' অসমঞ্জবাবু এ বিষয়ে সঠিক জানতেন না বলেই এইরূপ লিখেছেন। কেননা, বাড়ির সকলের অমতের জন্য শরৎচন্দ্র 'প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের আয়োজন' করতে পারেননি। আর একটা কথা, অসমঞ্জবাবু শরৎচন্দ্রের চিঠির মাথায় ১।৫।৩৭ তারিখ দেখে মাসের '৫' টাকে ভুল করে ইংরেজি মাস না ধরে বাংলা মাস হিসাবে ভাদ্র মাস লিখেছেন, বলেই মনে হয়।

ইংরাজি চিঠি

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়[১]কে লেখা

বাজে শিবপুর
১১।১২।১৯

My dear Saroj,

You will please understand that I do not want Lila to read this letter. Otherwise I should have done what I always do. But I hope this would be the last of its kind— I would not be [obliged] to commit this sin any further.

You have not written much about your wife, but I am afraid I have gathered more about her than you suppose. Oedema, i.e. swelling of feet and hand and passing of more urine during night than normal, indicate presence of albumen in urine. It might be Diabetes Insipidus, it might be something more serious. But one thing is quite certain that it is not due to cold season as you have imagined.[২]

It requires a careful treatment and at once. My idea is, the Kaviraji would be the best suitable and that before any further mischief is made.

But in the meantime you should write more more particulars about her, an accurate and [exhaustive] list of complaints and symptoms for the medical man who ever might take up the case.

You have cancelled the orders for my shoe?[৩] all right I am sorry that the goldsmith[৪] friend is giving you so much trouble. My friend you say? might be. But you discovered him for me all the same.

'Har' from calcutta would be despatched by to-morrow possibly, and so far I do understand about the business the quality and the making are sound.

Tell Lila that I am all right, but between ourselves I am keeping only an indifferent health now, rather leaning towards bad.

This evening I am again going out to Gobindapur (my sister's place) and will be back in a day or two.

My assis to everyone, yourself including.

affectionately
Yours
Sarat

উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসককে লেখা[১]

Baje Sibpur
Howrah
12.4 23

Dear Mr. Das Gupta,

I am in receipt of your letter No. 83 G. of the 11th instant and gratefully appreciate your consideration in giving me a sort of warning before taking any legal steps in the matter.

I have been building a house in Gobindapur a village probably under the jurisdiction of Kalyanpur Union Board ;[২] but the house is still under construction and as no one lives there, I had not had the least suspicion I could have been fixed a rate against an incomplete house or the Board could have suffered me to fall into arrears for so long a time.

However, I have no objection in paying any kind of Tax provided it is usual and just, but certainly they should have given me some kind of opportunity at least, either to protest or to pay before going to the extent of.. [3] the S. D. O. for the issue of a distress warrant.

But I am not quite surprised. And fortunate that the Govt. did not leave on there local presidents to issue warrants themselves.

I am arranging to send Rs. (3·9·0 + 3·1·0) = 6·10·0 to the union within a week as desired in your letter.

Yours Sincerely
Sarat Chandra Chatterji

গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা

My dear Gopikrishna,

Your patient (Mukherji Mahasay)[১] has been feeling weaker and weaker every day. His blood pressure may be lower than usual but it seems general debility is very great. Please come as early as possible—say this Sunday or Monday I shall be obliged if you can manage this.

Sarat Chandra Chatterji
25.3.33

গারট্রুড সেন[১]কে লেখা

P 566, Monoharpukur
Kalighat, Cal
2.4.35

Dear Mrs. Sen,

I am sending my car and a copy of Srikanta in English. This was the only copy available from the publishers as the edition has been completely exhausted.

I did not want much to give it you as I thought the translation was done really very badly, however.

As you go home and Boshi to his father-in-law's my best wishes or rather 'Ashirvad' to you both Please write to me sometimes if you find time

Yours Sincerely
Sarat C Chatterji

I have a hope that by the time you come back to India, I would though very old, be still alive.

শচ

?[১]

Sarat Chandra Chatterji

P 566, Monoharpukur
Calcutta,
Phone . Park 834
19 3. 36

Dear Sir,

With ref. to your letter and its subsequent reminders asking me to clear up the bill, I had, the other day, sent my brother to your office to say what reply I had to give in the matter. I believe he has seen Mr. Subodh mittra[২] and told him everything.

As to your letter : You claim more money. Isn't it necessary to prove the work actually done by you is equivalent to your demand? I have been repeatedly asking Mr. Subodh Mittra to do this. Please send your Engineer, I will send for mine and let them agree as to the value of work done and the money still to be paid to you. I shall pay the balance at once. Isn't it fair proposal? Dont you agree that no one likes to pay for what he has not received?

I shall show your engineer the quality of work done— the innumerable cracks in the wall I shall show him that water poured on the floor comes drop by drop over the furniture below. He will see for himself in the drawing room several feet of cement-Bali plasters peeling off the wall exposing the brick work. I shall show him the sanitary works done, the quality of doors and windows supplied, the beautiful flooring executed, the Bali work all round and many other things that will gladden and Engineer's heart. And the house has not been built two years. What will be its value after ten? Big and small all sorts of people come here and I have not heard a single man saying a good thing about the work done. To them I say it is my luck. Sheer luck that I believed Haren Ghosh[৩] and had the house entrusted to your firm.

Whatever that be please send your Engineer. Believe me I am not less anxious to have things finished with you. Because I shall have to undertake repair soon— I have to pull out many things and do them once again.

Yours faithfully,
S.C.

রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা

24 Aswini Dutt Road
Kalighat, Calcutta

Dear Sir,

With ref to your letter on behalf of Dacca University Students' Union,[1] I am glad to inform you that I have no objection to accept the address which your union so kindly offers to present me when I go to Dacca during the University Convocation

I intend to stay there for 3-4 days. We will fix the date when we meet.

Yours Sincerely
Sarat Chandra Chatterji

শচীন্দ্রনাথ বারিক[১]কে লেখা

১

P 566 Monoharpukur Road,
Dated the 19th Aug 1936

Mr S N Barick
122, Upper Circular Road,
Calcutta

Dear Sir,

I have no objection to your producing the Talkie Versions of CHANDRANATH and exhibiting same in public upon your getting the rights of Mr B. N Sircar, New Theatres Ltd., and you will have then the sole and permanent rights of producing and exhibiting the same

Yours faithfully,
Sarat Chandra Chatterji

২

171, Dhurrumtolla Street,
Calcutta, 22nd August, 1336

S N. Barick Esq
108, Manicktolla Street
Calcutta

Dear Sir,

In consideration of the sum of Rs. 1,500/- paid to us, as per memo noted below, this day, we hereby give up, relinquish and release all our right, title and interest in the novel 'Chandranath' of Sarat Chandra Chatterjee under the agreement dated 16th January, 1935 between Sarat Chandra Chatterjee and New Theatres Ltd. in favour of yourself.

Yours faithfully,
for The New Theatres Ltd.
B. N. Sircar
Managing Director

Memo.

By cheque No. 43A/17972 dated 21st August 1936 drawn on the Imperial Bank of India by M/s. S. K. Ganguli & Co. in favour of Mr. S. N. Barick and endorsed by him in favour of Messrs. New Theatres Ltd... Rs. 1,500/-

The New Theatres Ltd
B N Sircar
[Managing Director]

পত্র-পরিচিতি

সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

১ ২৪।১১।১৯ তারিখে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, '... তোমার ও সরোজের চিঠি পেলাম। তার পত্র ইংরাজিতে...।' সরোজবাবুর সেই ইংরাজি চিঠির উত্তরেই মনে হয় শরৎচন্দ্র ইংরাজিতে এই চিঠিটা লিখেছিলেন।
চিঠির মাথায় নিজের ঠিকানা ও তারিখ বাঙলায় লেখা দেখে মনে হয় শরৎচন্দ্র বাঙলাতেই চিঠিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর হয়তো সরোজবাবুর ইংরেজি চিঠির কথা মনে করে ইংরেজিতেই চিঠিটা লেখেন।

২ ডাক্তারিতেও যে শরৎচন্দ্রের রীতিমতো জ্ঞান ছিল, এই চিঠিটা পড়লে তা বেশ বুঝা যায়।

৩ ২২৪ পাতায় ২-সংখ্যক পাদটীকা দেখুন।

৪ শরৎচন্দ্র, সরোজবাবু ও লীলাদেবীর আমন্ত্রণে তাঁদের কানপুরের বাড়িতে বেড়াতে গেলে, লীলাদেবী তখন তাঁর গলার হার প্রভৃতি দু-একটা সোনার গয়না শরৎচন্দ্র মারফত কলকাতায় গড়াতে দিয়েছিলেন। ১১৫ পাতায় লীলাদেবীকে লেখা চিঠিতেও স্যাকরার কথা আছে।

উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসককে লেখা

১ শরৎচন্দ্রকে কিছু না জানিয়েই স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, শরৎচন্দ্র ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায় দেন নি, এই বলে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ার কোর্টে নালিশ করেছিলেন। মনে হয়, প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য ছিল শরৎচন্দ্রকে অপদস্থ করা। তিনি শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রোকি পরোয়ানা জারি করবার জন্য এস. ডি. ও.-র কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।
এস. ডি. ও. শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বলে জানতে পেরে পরোয়ানা জারি করবার আগে ব্যাপারটা জানবার জন্য শরৎচন্দ্রকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিরই উত্তরে শরৎচন্দ্র এস. ডি. ও.-কে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। উলুবেড়িয়া কোর্টের বিখ্যাত মোক্তার (পরে অ্যাড্‌ভোকেট) অশ্বিনীকুমার দাস বলেন— ওই মামলায় শরৎচন্দ্রের পক্ষে তিনিই মোক্তার ছিলেন এবং ওই সময় যিনি এস. ডি. ও. ছিলেন, তাঁর নাম ছিল শান্তনু দাশগুপ্ত। এস. ডি. ও.-কে লেখা শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি সামতাবেড়ের সংলগ্ন পানিত্রাস গ্রামে অবস্থিত শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারে আছে। মনে হয়, শরৎচন্দ্র এস. ডি. ও.-কে যে চিঠিটা লিখেছিলেন তারই একটা নকল নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং পাঠাগারে অবস্থিত চিঠিটি সেই নকল।

২ শরৎচন্দ্রের দিদির সেজ দেওরের মেজো ছেলে নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় বলেন—বড়ো মামা (শরৎচন্দ্র) আমাদের এজমালির পাশাপাশি দুই দাগে দুইটি জায়গা কিনেছিলেন। ওই দুই

দাগের দুইটি জমির মধ্যে বড়োটি ছিল সামতা গ্রামে, আর ছোটোটি ছিল গোবিন্দপুর গ্রামে। সামতা মেল্লক ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত আর গোবিন্দপুর কল্যাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত।
দুই গ্রামের দুই প্রান্তে দুইটি পৃথক জায়গা নিয়ে বাড়ি করে ঠিকানা কোন্ গ্রামের নামে দেবেন এই ভেবে, বড়োমামা বড়ো জায়গাটা সামতার প্রান্তে বা বেড়ে ছিল বলে, তাঁর বাড়ির গ্রাম হিসাবে ঠিকানা করেছিলেন সামতাবেড়। তা নাহ'লে সামতাবেড় বলে কোনো গ্রাম নেই। আসলে ওটা এখন সবটাই সামতারই অন্তর্গত।

৩ প্রাপ্ত চিঠির এই অংশটি ছিন্ন।

গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে লেখা

১ শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে থাকার সময় একটা খাতার মলাটের ভিতর পিঠে কয়েকটা মৃত্যু সংবাদ লিখে রেখেছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁর বড় ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের (মুখুজ্যে মহাশয়ের) মৃত্যু সংবাদও লিখে রেখেছিলেন। সেই লেখাটি এই

মুখুজ্যে মশাই মারা গেলেন।
১০ই অঘ্রাণ, ১৩৪০, রবিবার রাত্রি ৩।।০
একটা বছর তিনি একান্ত মনে মৃত্যুকে ডাকছিলেন।
আজ প্রার্থনা তাঁর মঞ্জুর হোলো।
কি জানি আমার আবেদন কবে গ্রাহ্য হবে।

গারট্রুড সেনকে লেখা

১ বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেনের স্ত্রী। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতেও এঁর উল্লেখ আছে। বশী সেনের সঙ্গে এঁর বিয়ে হবার আগে এঁর নাম ছিল গারট্রুড ইমারসন। শুনেছি আমেরিকার বিখ্যাত কবি, প্রবন্ধকার ও দার্শনিক রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো ইমারসনের পৌত্রী ইনি।
শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের (১ম পর্ব) অনুবাদ করেছিলেন, বোম্বে হাইকোর্টের জজ ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। ক্ষিতীশবাবু বলেন, 'আমার অনুবাদ শরৎচন্দ্রের তেমন পছন্দ না হওয়ায় তিনি একজন ইংরাজ মহিলাকে আমার অনুবাদটা দেখতে দিয়েছিলেন। ঐ মহিলা আমার লেখা কিছু কিছু সংশোধন করেছিলেন বলে দুজনের নামেই তখন বইটা বেরিয়েছিল।'

১ শরৎচন্দ্র তাঁর কলকাতার বাড়ি করবার সময়, দেখাশুনা করবার লোকের অভাবের জন্যই একজন কন্‌ট্রাকটরের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। ১৯।৩।৩৬ তারিখে তিনি কন্‌ট্রাকটরকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার একটা নকল নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এখানে মুদ্রিত চিঠিটা সেই নকল থেকে নেওয়া।

২ জনৈক কন্‌ট্রাকটর।

৩ কলকাতার বিখ্যাত ইম্‌প্রেসারিও বা নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাপক হরেন ঘোষ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হরেনবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা

১ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্. উপাধি নেবার জন্য শরৎচন্দ্র ঢাকায় যাবেন স্থির হলে তখন ঢাকা ইউনিভারসিটির স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ওই ইউনিয়নের সভাপতি— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক--- ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁদের ইউনিয়নের সভায় কিছু বলতে হবে এ কথাও শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন। রমেশবাবুর সেই আমন্ত্রণ পত্রের উত্তরেই শরৎচন্দ্র এই চিঠিটি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সভায় যে মৌখিক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, সেটি *শরৎচন্দ্র* ২ খণ্ডে 'মৌখিক অভিভাষণ' অধ্যায়ে 'ঢাকায়' নামক প্রবন্ধে দিয়ে।

শচীন্দ্রনাথ বারিককে লেখা

১ কলকাতায় 'ছায়া' সিনেমা হাউসের অন্যতম মালিক। ২২১ পৃষ্ঠায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে লেখা চিঠিটির মধ্যে যে নগেন বসুর কথা আছে, সেই নগেন বসু শচীনবাবুদের বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন। নগেন বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় আছে জেনে শচীনবাবু শরৎচন্দ্রকে দিয়ে তাঁদের ছায়া সিনেমা হাউসের উদ্‌বোধন করাবার জন্য একদিন নগেনবাবুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করতে যান। শরৎচন্দ্র এই অনুরোধে সম্মতি দিয়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে ছায়া সিনেমা হাউসের উদ্‌বোধন করেছিলেন।
এইভাবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শচীনবাবুর পরিচয় হলে শচীনবাবু তখন সিনেমা করবার জন্য শরৎচন্দ্রের একটা বই চান। নিউ থিয়েটার্স ছবি তুলবার জন্য ওই সময় শরৎচন্দ্রের কয়েকটা বই কিনে রেখেছিলেন, তাঁরা শরৎচন্দ্রের কাছে শচীনবাবুর বই চাওয়ার কথা শুনে তাঁদের কেনা শরৎচন্দ্রের *চন্দ্রনাথ* বইটা শচীনবাবুদের দিতে চান। এই সব প্রসঙ্গ নিয়েই শরৎচন্দ্র তখন শচীনবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। এইসঙ্গে শচীনবাবুকে লেখা নিউ থিয়েটার্স কোম্পানির চিঠি এবং শচীনবাবুর অ্যাটর্নি এস. কে. গাঙ্গুলী মারফত নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীর টাকা পাওয়ার রসিদও দেওয়া গেল। টাকা পাওয়ার মূল রসিদে বি. এন. সরকারের স্বাক্ষর অবশ্য রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর ছিল।

না-পাঠানো চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা[১]

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
জেলা— হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠ্‌বারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা ক'রতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হ'ত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙ্‌লা ভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে— তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই *প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা* হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা

সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিম্বা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্চে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজ-শক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্‌টিফিকেশান যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাস্‌টিফিকেশানও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি। আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাক্‌তো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। ইতি—২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

সেবক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আত্মশক্তি-সম্পাদককে লেখা

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বাঙ্‌লার যুব-সমিতির বিগত অধিবেশনে[১] পঠিত আমার অভিভাষণটির সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং এই লেখাটি আপনার 'আত্মশক্তি' কাগজে ছাপাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

স্বাভাবিক আলস্য বশতঃ অভিভাষণটি লেখা হইয়াছিল শেষ দিকে। নিজে ছাপাইয়া সঙ্গে লইবার সময় পাই নাই। লেখায় কাটাকুটি ছিল বিস্তর। অতএব ১ম বর্ষ ১৮ সংখ্যার 'স্বাধীনতা' কাগজে অভিভাষণটি যখন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখন ছাপার ভুলও রহিয়া গেল বিস্তর। কয়েকটা স্থলে অর্থ বুঝিতে বিঘ্ন ঘটে, কোথাও বা উল্টা মানে হইয়া গিয়াছে। যেমন এক জায়গায় লেখা ছিল—'স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়।' সেখানে ছাপা হইয়াছে—'স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা'। 'নয়' কথাটি উঠিয়া গিয়াছে। বিপ্লব বস্তুটিকে নিজে ভয় করি বলিয়া ইহার উল্লেখ করিতেছি না। বর্তমান প্রবন্ধে অর্থ-সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

আর একস্থানে লেখা ছিল, সহসা একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ-অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো খদ্দর ও চরকার দড়িতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুদ্রিত অভিভাষণে 'রইলো' শব্দটি ছাপা হয় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাহারও বুঝিতে ক্লেশ হয় না যে, এই টিকিটি 'অদ্রোহ-অসহযোগেরই', 'মহাত্মা'র নয়।[২]

বরদাপ্রসন্ন পাইন[১]কে লেখা

(১) এই সাবেক বাঁধ (গভর্ণমেণ্ট) সরকার হইতে বাতিল হইবার পরে ইহার অধিকাংশই নদীগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে।[২]

(২) বাঁধ 'এ্যাবান্‌ডান্‌ড' হইবার পর সাধারণ প্রজার সম্পত্তিভুক্ত হইয়াছে। এই ভাবে গ্রামের উত্তর দিকের হানা দফাদার শ্রীনিবারণ ঘোষালের সম্পত্তি। অতএব আমি ইচ্ছা করিলেও এই স্থান কাটাইতে পারি না। নিবারণ ঘোষাল মহাশয় তাহাতে আপত্তি করিতেন। তিনি বাদীদিগের [দলভুক্ত] না থাকায় ইহা মিথ্যা।

(৩) এই গ্রামের মধ্যে আমার জমি বাদীদিগের অপেক্ষা বেশি, সুতরাং নদীর জল প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকার ক্ষতিকর কার্য করিলে, আমার নিজের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। সুতরাং এরূপ কার্য আমি কোন মতেই করিতে পারি না।

(৪) বাদীদিগের কতকগুলি স্বাক্ষরকারী এ গ্রামের লোক নহে। গ্রামের ক্ষতিবৃদ্ধিতে তাহাদের কোন লাভ লোকসান নেই। এবং কতকগুলি লোক একই বাড়িরই লোক। সুতরাং দুই একজন লোক বিদ্বেষবশতঃ অনেকগুলি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই আবেদন করিয়াছে। আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরর্থক কষ্ট দিবার জন্য।

(৫) এই বাঁধ পরিত্যক্ত হইবার পরে ৬০ ৭০ বৎসর সরকার হইতে ইহার মেরামত হয় নাই। নদীর প্রবল স্রোত ও ঢেউয়ের জন্য অপরাপর স্থানে স্থানে যেমন ভাঙিয়া গিয়াছে, এই দুই স্থানে তেমনি ভাঙিয়াছে। আমার কোন প্রকার অপরাধের জন্য নহে।

(৬) এই দুই হানার নিকটেই অধুনা শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[৩] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটী। তিনি ও প্রধান শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত[৪] মহাশয় সমস্ত গ্রামের ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র। ইঁহারা মধ্যস্থ হইয়া যেরূপ বিচার করিয়া দিবেন— ইত্যাদি।

প্রিয় বরদাবাবু,

তাড়াতাড়িতে আর লেখা হইল না। মুখুজ্যে মশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। বোধ হয় সালিশী মানাই ঠিক। ফকিরবাবু ত আজকাল গ্রামেই বাস করিতেছেন। দাশ মশাইকে ছাড়িবেন না। মহারাজ বর্ধমান প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ।[৫]

আপনার

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আপনি ২ ১ টা পয়েণ্ট যা হয় অ্যাড্ করে দিন। আপনার সংস্রব আছে জানলেও[৬]

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

ভায়া, ব্যাঙ্ক বন্ধ, রোগের যন্ত্রণায় ভাবি নি যে যে-টাকা হাতে আছে তাতে হবে না। মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার গৃহে নগদ অর্থের অভাব নেই, একটা একশ টাকার চেক্ পাঠালাম, যদি অনুগ্রহ করে এই টাকাটা পত্র বাহকের হাতে দেন ত বিপদ কাটে।[১]

শরৎদা

২৪শে আশ্বিন ৪৪

ভরসা করি চন্দ্রনাথ[২] আপনারই হাতে পৌঁছেছে। খুবলাল[৩] আর কারও হাতে দেয় নি।

শচ

?[১]

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোস্ট
জেলা হাওড়া

শ্রীচরণ কমলেষু,

এ বাড়িতে এসে আজ আপনার পত্র পেলাম। কলকাতার ঠিকানায় আপনার পূর্বের পত্র যখন আসে তখন আমি পেটের কলিক ব্যথায় শয্যাগত। শুয়ে ব'সে কোন অবস্থাতেই চিঠির জবাব দেবার সাধ্য ছিল না, তাই প্রকাশকে আপনার চিঠির উত্তর দিতে বলি। কলকাতার বাড়িতে এখন চাকর বামুন ছাড়া কেউ নেই। বাড়ির সকলে এখানেই আছেন তাই কোন মতে এ বাড়িতেই চলে এলাম।

আমি প্রায় বছর দুয়েক ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগ্‌ছিলাম তেমন গ্রাহ্য করিনি কিন্তু গত কার্তিক মাস থেকে অধিকাংশ দিনই শয্যাগত। ম্যালেরিয়া পুরণো হলে কিছুতে সারতে চায় না এবং আনুষঙ্গিক নানা রোগ এসে দেহ আশ্রয় করে। মাঝে এক সময়ে সকলেরই মনে হয়েছিল বেশি দেরি নেই।

পত্র-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা

১ ভারতের তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* বাজেয়াপ্ত করলে শরৎচন্দ্র তখন একখানা *পথের দাবী* পড়বার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং বইটি পড়ে ইংরাজ সরকারের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিটি এই গ্রন্থে ৩৭৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির একটি উত্তর লিখেছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা নিষেধ করায় চিঠিখানি আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়নি। শরৎচন্দ্রের সেই রবীন্দ্রনাথকে লেখা অথচ না পাঠানো চিঠিই এটি।

আত্মশক্তি-সম্পাদককে লেখা

১ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীতে।

২ সাপ্তাহিক *আত্মশক্তি* শরৎচন্দ্রের ওই অভিভাষণটি স্বাধীনতা কাগজ থেকে উদ্ধৃত করে তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। *আত্মশক্তি* পত্রিকায় অভিভাষণটি আবার প্রকাশিত হওয়ায়, শরৎচন্দ্র তখন অভিভাষণটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা *আত্মশক্তি* পত্রিকাতেই বলবার জন্য এই চিঠিটি লিখছিলেন। কিন্তু *আত্মশক্তি*-তে অভিভাষণটি প্রকাশের এক সপ্তাহ পরেই *আত্মশক্তি* উঠে যায়। তাই লেখাটি শেষ করে আর পাঠানো হয় নি। এ সম্বন্ধে 'পরিশিষ্ট' ৭৫—৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

বরদাপ্রসন্ন পাইনকে লেখা

১ হাওড়ার ফৌজদারি কোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন।

২ একটা বাঁধ কাটিয়ে দিয়ে মাঠের ধানের ক্ষতি করেছেন বলে, কয়েক ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের নামে একটা মিথ্যা মামলা রুজু করেছিল। এর বিস্তৃত বিবরণ *শরৎচন্দ্র* ১ম খণ্ডে 'একঘরে' প্রবন্ধে দিয়েছি।

৩ ফকিরবাবু সামতাবেড়ের পার্শ্ববর্তী পানিত্রাস গ্রামের অধিবাসী। এক সময় ইনি হাওড়া সদর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

৪ প্রিয়নাথবাবু পানিত্রাস গ্রামের একজন প্রধান ছিলেন।

৫ চিঠিতে কোনো তারিখ নেই। মনে হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ঠিক আগে কোনো এক সময়ের লেখা ! কারণ বরদাবাবু ওই সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে একজন প্রার্থী ছিলেন। আর দাশ মশাই বলতে দেশবন্ধুই মনে হয়। যদিও দেশবন্ধুর তখন মৃত্যু হয়েছে, তাঁর স্বরাজ্য পার্টিকে লক্ষ্য করেই হয়তো শরৎচন্দ্র এ কথা বলেছিলেন।

৬ এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র বরদাবাবুর কাছে পাঠাবার জন্য তাঁর ভাগ্নে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়েছিলেন, কিন্তু সালিশীতে মিটমাট হওয়ায় মনে হয় আর পাঠান নি। চিঠিটি ব্রজবাবুর পুত্র বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

১ খামে নাম লেখা আছে— শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল কিনা জানা যায় না। মনে হয়, অন্যত্র টাকার ব্যবস্থা করায় বা শেষ পর্যন্ত সেদিন টাকার প্রয়োজন না হওয়ায় চিঠিটি লিখেও আর পাঠানো হয় নি। চিঠিটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি। তিনি এটি শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

২ এই সময় *চন্দ্রনাথ* উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হতে থাকলে শরৎচন্দ্র আগের ছাপা বইয়ে ছাপার ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

৩ শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ির ভৃত্য।

১ চিঠিটি কাকে লেখা ঠিক জানা যায় না। শরৎচন্দ্রের লেখা এই অসমাপ্ত চিঠিটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি।
মনে হয়, শরৎচন্দ্র এই চিঠিটি তাঁর আপন ছোটো মামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ি করলে, বিপ্রদাসবাবু তখন মাঝে মাঝে কলকাতায় ভাগ্নের বাড়িতে আসতেন।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্রের সাড়ে বত্রিশ টাকার জুতা কেনার কাহিনি

১৭৯ পৃষ্ঠায় পত্র ৮-এর ২ নং পত্রপরিচিতি-তে এই কাহিনিটির উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্রের সেদিনের এই জুতো কিনতে যাওয়ার সঙ্গী ছিলেন তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সময় উপেনবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়িতে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চৌরঙ্গীতে জুতো কিন্‌তে এসেছিলেন। উপেনবাবু তাঁর স্মৃতি-কথা গ্রন্থে এই জুতো কেনার কাহিনিটি এইভাবে লিখে গেছেন :

> হোয়াইটওয়ের রেক্স-শুর মতো মূল্যবান এবং অভিজাত জুতো কলিকাতার বাজারে খুব বেশী ছিল না। তখনকার দিনে একজোড়া রেক্স-শুর মূল্য ছিল সাড়ে বত্রিশ টাকা। ....
>
> —"চল ষ্টীমারে যাওয়া যাক, শীঘ্র হবে।"
>
> বললাম —"চল।"
>
> পথে বেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি গল্প করতে করতে ষ্টীমার ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম। শরতের পায়ে একজোড়া ছিন্ন মলিন চটিজুতো। যৌবনকালে তার রঙ কালো ছিল অথবা বাদামি, তা সহজে ঠাহর করা যায় না। কোনো জায়গা দেখলে মনে হয় কালো, কোনো জায়গায় বাদামি। শুনলাম জুতোজোড়া পায়খানা যাবার সময়ে শরতের কাজে লাগে।
>
> ষ্টীমার ঘাটের কাছ বরাবর পোয়াটাক পথের মত অত ধূলিবহুল পথ ওই শহরে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ...
>
> পথের ধূলায় স্বল্পক্ষণের মধ্যেই শরতের চটি ধূলিতে ধূসর বর্ণের হয়ে গেল। সেই ধূলিকণাসমূহ শুধু তার জুতোর অবস্থান্তর ঘটিয়ে ক্ষান্ত হল না, ক্রমশ তার দু পায়ে একজোড়া ধূসর বর্ণের স্টকিং পরিয়ে দিল।
>
> গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে হাইকোর্ট ঘাটে উঠে ... দুজনে মাঠ উত্তীর্ণ হয়ে হোয়াইটওয়ের দোকানের সামনের ফুটপাথে উঠলাম। শরৎকে বললাম, "শরৎ তোমার পায়ের আর জুতোর যা অবস্থা, অত দামি রেক্স-q তোমাকে দেখাবেই না।"
>
> "বল কি উপীন।" বলে একটু উদ্বিগ্ন মুখে শরৎ কোঁচা দিয়ে পা আর জুতো দু-চারবার ঝাড়লে। তার দ্বারা ধূলি হয়তো খানিকটা অপসৃত হল কিন্তু জুতোর অবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করল না।

বললাম, "আগের অবস্থা বরং ভাল ছিল, এ আরও খারাপ হল শরৎ।"
মাথা নেড়ে শরৎ বললে: "হোকগে। চল তো ঢুকি, না দেখাতে চায়, সঙ্গে টাকা তো আছে, মুখের কাছে নেড়ে বলব—হিয়ার ইজ দি মানি।"
গুটি গুটি দুজনে যেখানে ঢুকলাম, সৌভাগ্যক্রমে তার পাশেই জুতো বিভাগ। অদূরে একজন শপ্-অ্যাসিষ্ট্যান্ট দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ জেন্টেলমেন?...
শরৎ বলল, "আমি একজোড়া রেক্স-শু কিনতে চাই।"
আমাদের দুজনকে একটা শোফায় বসিয়ে ঘাড় এঁকিয়ে বেঁকিয়ে শরতের পায়ের আকারটা ভাল করে দেখে নিয়ে শপ্-অ্যাসিষ্ট্যান্ট জুতো আনতে গেল।
জাত বণিক এই ইংরেজরা। পায়ের ধূলা অথবা ছিন্ন চটিজুতো এদের কি বিভ্রান্ত করতে পারে? ... নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ ধূলা আর ঐ ছিন্ন চটি নিয়ে তখনকার দিনে চাঁদনির কোনো জুতোওয়ালার দোকানে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ টাকা মূল্যের জুতো কিনতে চাইলে দেখাত না তো বটেই, অধিকন্তু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলত, "আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।" চাঁদনির দোকানে জুতোর দর করতে গিয়ে বহুবার এমন কথা শুনাও হয়েছে, "ও দামে এক জোড়া হবে না, একপাটি হবে।"....
আট দশ জোড়া জুতোর বাক্স দুই বগলে চেপে ধরে শপ্-অ্যাসিষ্ট্যান্ট এসে হাজির হল ; তারপর হাঁটু মুড়ে শরতের সামনে বসে পড়ে এক এক জোড়া পরিয়ে পরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। কিছুতেই তার মন আর সন্তুষ্ট হয় না। পুনরায় চার পাঁচ জোড়া নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল। .... অবশেষে একজোড়া পরিয়ে খুসি হয়ে মাথা নাড়লে ; তারপর ভাল করে লেস বেঁধে দিয়ে বললে, "একটু চলে ফিরে দেখুন তো! আমার মনে হচ্ছে, এই জোড়া ঠিক ফিট করেছে।"
ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে শরতের মুখে খুসি হওয়ার হাসি ফুটে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম— "কেমন লাগছে?"
শরৎ বললে, "চমৎকার ! জুতো পরেছি বলে মনেই হচ্ছে না।" মণিব্যাগ থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বার করে সে শপ-অ্যাসিষ্ট্যান্টের হাতে দিলে।
সারে বত্রিশ টাকার ক্যাসমেমো ও বাকি সাড়ে সাত টাকা নিয়ে .... আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে শরৎ বললে,—"চল।"
নতুন জুতো থেকে পা খোলবার কোন লক্ষণ নেই দেখে শপ-অ্যাসিষ্ট্যান্ট বললে—"আপনার শ্লিপারটা জুতোর বাক্সে দিয়ে দোব?"
"না ওর আর দরকার নেই।" বলে শরৎ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুতো আর নতুন বাক্স উভয়েই নাথ-হীন হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দোকানে পড়ে রইল। এখন বুঝতে পারলাম, জুতোর বাক্স বহন করার কদর্যতা হতে অব্যাহতি লাভের জন্যেই শরৎ ঐ পায়খানার জুতো জোড়া পরে এসেছিল।
পথে বেরিয়ে শরৎ উত্তর দিকে চলতে লাগল।
ধর্মতলার মোড়ের মাথায় পৌঁছে শরতের দিকে তাকিয়ে বললাম, "শরৎ, ছ পয়সা ক্ষইল।"
আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে শরৎ বললে,—"তার মানে?"
"তার মানে, অত দামি জুতো, হোয়াইটওয়ে থেকে এ পর্যন্ত আসতে যেটুকু চামড়া ক্ষয়েছে, তার দাম ছ পয়সা নিশ্চয় হবে।"
কোন কথা না বলে আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শরৎ ধর্মতলা ষ্ট্রীট পার হয়ে অপর

দিকের ফুটপাথে উঠল। তারপর ডানদিকে মসজিদ রেখে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ গিয়ে বললাম—"শরৎ তিন আনা ক্ষইল।"

কোন মন্তব্য না করে যেমন চলছিল, হন্ হন করে তেমনি চলতে লাগল। সম্ভবত সে আরামদায়ক মূল্যবান জুতো পরে পথ চলার সখ মেটাচ্ছিল। আরও খানিকটা গিয়ে বললাম—"শরৎ, সাড়ে চার আনা ক্ষইল।"

এবার শরৎ গতিরোধ করে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, "আরে তুমি তো ভারি পেছনে লাগলে দেখছি!" তারপর অদূরে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে ডান হাত তুলে উর্ধ্বস্বরে ডাকতে লাগল—"এই ট্যাক্সি! ট্যাক্সি।"

ট্যাক্সি চালকের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সবেগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দরজা খুলে দিলে।

আমার প্রতি ইঙ্গিত করে শরৎ বললে—"নাও ওঠ।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় চলেছ শরৎ?"

শরৎ বললে—"হরিদাসের দোকানে।"

হরিদাসের দোকান অর্থে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকান—গুরুদাস লাইব্রেরী।...

মাস ছয়েক পরে .... সকালে শরতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমাকে দেখামাত্র শরৎ উর্ধ্বস্বরে হাঁক দিলে—"ওরে ভোলা, মামা এসেছে, আমার জুতোজোড়া নিয়ে আয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম—"আমার প্রতি এ কি রকম অভ্যর্থনা—তা তো বুঝলাম না।"

কোনো উত্তর না দিয়ে শরৎ শুধু মুচকে একটা হাসল ...

রেক্স-শু নিয়ে ভোলা উপস্থিত হলে কথাটা বুঝতে পারলাম।

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে উল্টে ধরে তলাটা দেখিয়ে শরৎ বললে, "যেদিন জুতো জোড়া কিনি তুমি বলেছিলে—তিন আনা ক্ষইল, সাড়ে চার আনা ক্ষইল। নরম আর হালকা বলে মাস ছয়েক ধরে এই জুতো জোড়াই সমানে ব্যবহার করছি। আচ্ছা, ভাল করে দেখে বল তো উপীন, আজ পর্যন্ত ক আনা ক্ষয়েছে? চার আনাও বোধ হয় নয়?"

বললাম,— "নিশ্চয় নয়, দু আনাও বোধ হয় নয়।"

খুসি হয়ে শরৎ বললে, "ঠিক বলেছ। লোহার সোল হলে এত দিনে ক্ষয়ে যেত। কিন্তু এমন অদ্ভুত পেটা চামড়া যে, ক্ষইতে জানে না। দাম ওরা নেয় বটে, কিন্তু তার বদলেও দেয়।"

শরৎ-বন্দনা

চির দরদি ও গো! উজাড়ি' পদে কেমনে দিব ভকতি?
লহ দরদে বুঝি' প্রাণের পূজা—প্রকাশে কোথা শকতি?
ভবে বাণীর বরে জনমে কভু—প্রেমিক, কবি, স্বপনী ;
রহে অবনী সদা তাহারি তরে তৃষিত দিবারজনী।

যবে রিক্ত দুখে চিত্ত লুটে—হারাই সব রাধনা :
তব স্পর্শমণি স্বর্ণ করে মৌন ব্যথা-সাধনা ;
কবি! তোমারি কাছে শিখিনু—হেথা কিছুই বৃথা নহে গো
যবে সুরেলা গুণী বাজায় বীণা বেসুর কবে রহে গো?

তব ইন্দ্রজালে সুপ্ত দ্যুতি মরমে, তোলো জাগায়ে,
দাও রূপ-অলকনন্দাধারে দৈন্য যত ভাসায়ে ;
হের' লাঞ্ছিতেও দেবতা—তাই কারে না করো অপমান,
ওগো জন্ম-নীলকণ্ঠ! লভ' গরলে সুধা-বরদান।

আলো আবিলে যবে সমীপ-ধুমে গুণ্ঠি' দূর স্বপনে—
তুমি ব্যাপ্তি-পটভূমিকা 'পরে রাখো জীবনে মরণে ;—
পড়ে বেদন মায়া অমনি খসি'—লভি নয়ন তৃতীয়ে,
দেখি নিরর্থকে অর্থ, শুনি ঝন্‌ঝনায় গীতি হে।

গুরু! শিখালে তুমি কেমনে ম্লান পরাণতরুমূলে গো,
যত পঙ্ক মাটি প্রবাহে রস, ধরণী ধূলি ভুলে গা ;—
তুমি শরত-মধুচন্দ্র—ঝরে অমৃত তব যেখানে—
উঠে তুচ্ছতম জীবনকণা দীপিয়া মর ধেয়ানে।

স্নেহধন্য—
দিলীপ

১৩৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দিলীপকুমার রায় এই গানটি রচনা করেছিলেন।

ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ও ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরে যে ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ও ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন হয়েছিল, সেই দুই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র।

ওই সময় ইংরেজি দৈনিক *লিবার্টি* পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্য থেকে নেতৃবৃন্দের কুমিল্লা যাত্রা, চাঁদপুর ও কুমিল্লায় তাঁদের সম্বর্ধনা এবং ছাত্র সম্মেলনের সংবাদটিই প্রধানত এখানে দেওয়া গেল।

৭ মে বৃহস্পতিবারের *লিবার্টি*-তে প্রকাশিত হয়েছিল :

Sj Subhas Bose and Sj Sarat Chatterjee Start For Comilla

Sj Subhas Chandra Bose, President-elect, Tippera District Political Workers' Conference, left for Comilla on Wednesday morning by the Chittagong Mail, accompanied by Sj Sarat Chandra Chatterjee, President-elect, District Students' Conference, Sj Bipin Bihari Ganguly, Captain Narendranath Dutt, Sj. Hari Kumar Chakravarty, Sj. Aswini Kumar Ganguly and Sjta Bimal Prativa Devi

A pretty large number of Congress workers were present at the Sealdah Station, including Sj Pareshlal Shome, Sj Jnan Ranjan Majumdar, Sj Kiran Sankar Roy, Sj Satya Ranjan Bakshi, Sj Sailendranath Ghosal, Moulvi Shamshuddin Ahmed and Moulvi Syed Jalaluddin Hashemy, to see off him off.

Unique Reception : Imposing Scene at Chandpur Station

(From our correspondent)

Chandpur, May 6

Sj. Sarat Chandra Chatterjee and Subhas Chandra Bose, Gobar Babu, Srijukta Bimal Prativa Devi, Sj Bipin Bihari Ganguly, Sj Hari Kumar Chakravarty, Aswini Ganguly, Kiran Das, Abinash Bhattacharjee of B.P.S.A. and others were received at Naihati, Kustia and Bajbati by Congressmen, Students, youths and ladies.

At Tarpasa a few thousand of men and women were anxiously waiting to have a sight of Sj. Bose. Long before the steamer reached the ghat people began to shout 'Bande Mataram' and 'Subhas Babu-ki-Jay'. When the steamer reached the ghat people rushed in with garlands and shouting 'Subhas Babu-Ki-Joy.' Sj Bose, Sj Chatterjee and Bipin Bihari Ganguly

were profusely garlanded After a few minutes the steamer steamed off amidst shouts of Mahatma-Ki-Joy and Subhas Babu-Ki-Joy
At Bahar tremendous reception was given by the ladies and gentlemen coming from distant villages The leaders were profusely garlanded The scene was a unique one

Tremendous Ovation

Long before the arrival of the steamer Chandpur Station was crowded with more than twenty thousand people A rousing and tremendous reception was given to Sjs Subhas Bose, Sarat Chatterjee, Bipin Ganguly, Srijukta Bimal Prativa Devi, Sjs Harikumar Chakravarty, Aswini Ganguly, Gobar Babu, Kiran Das, Abinash Bhattacharjee and others The Chandpur people have never seen such a scene Moulvi Asrafuddin Chowdhury, Sj Basanta Majumdar, Dr M Khan and Moulvi Abdul Gofur garlanded the guests on behalf of the Tippera people Many prominent leaders of Comilla and Chandpur including merchants were present at the ghat Special feature of the reception was that a very large number of Musalmans of all sections were present at the station
The Chandpur Muslim Jubak Samity presented an address of welcome to Sj Subhas Bose in the train.
A few boys of the A B S A tried to strike discordant note but the chorus of twenty thousands voices drowned all their efforts to mar the proceedings

৮ই মে তারিখের *লিবার্টি*-তে প্রকাশিত হয়েছিল

Comilla, May 7

Srijuts Sarat Chandra Chatterjee, Subhas Chandra Bose, Bipin Bihari Ganguly, Hari Kumar Chakravarty, Srijukta Bimal Prativa Devi and other leaders arrived here last night. On the way they received an enthusiastic welcome at Laksam where people had come from different places like Noakhali to greet Sj Bose and party
At Comillia all the station approaches and roads upto a distance of one mile were crowded with enthusiastic crowds eager to welcome the leaders The whole station yard was a seething mass of humanity and thousands thronged there before the scheduled time for the arrival of the train

Hearty Reception

The chairman and members of the Comilla Municipality were the first to receive Sjt. Bose and party. It was a long time before the party could move because of the huge crowd and rush of eager spectators.
The party was then taken in a 'Landau carriage' drown by 12 horses amidst deafening shouts of 'Bande Mataram and 'Subhas Babu-Ki-Joy.' Fifty one crackers were fired when the train steamed in

Huge Procession

The procession was led by six caparisoned elephants, volunteers on horse back and two hundred lady volunteers. These were followed by one thousand congress volunteers in uniform and five thousand Krishan and two hundred Sramik volunteers with flag and banners. The whole route along which the procession passed was lined on both sides with expectant crowds. The original intention of the organisers was to make the procession pass through the whole town but owing to great rush and length of the procession it was found that even as late as at one O'clock in the morning they had travelled only a part of the distance. As the guests were all tired, it was decided to cut short the route and drive straight to the house of Sjt. Kaminikumar Dutta. A large number of students including girls with Sjt. Narendra Choudhury the Chairman of the Reception Committee, were present in the procession. The Moslem community headed by Moulvi Asrafuddin Choudhury turned out in full strength. Comilla never witnessed a more imposing procession of welcome. Owing to the eleventh hour decision to cut short the route the public could not be informed, with the result that from 1 A.m. to 4 A.m. people remained standing in expectation on both sides of the route and were greatly disappointed when they heard of this decision. Owing to heavy and incessant rains all morning engagements have been cancelled to-day.

Sjt. Bose and party will meet the members of the Bar Libraries this noon on invitation.

৯ মে তারিখের *লিবার্টি*-তে প্রকাশিত হয়েছিল .

Sarat Chandra's Message of Freedom
Comilla Students' Conference opened in Ashit Nagar

Comilla, May 8

'What message I had for my countrymen, I have already delivered through my writings. That message was a message of Freedom. I pray with all my heart that the cause of the students and youths of Bengal might prosper and that through service and suffering they might help India to fulfill her destiny. My only regret is that I would not live long to witness the fulfilment of the new movement'.. with these moving words uttered with a pathatic ring in his voice and breathing utmost solicitude for the young hopefuls of the country did Sj. Sarat Chandra Chatterjee concluded his short inaugural address at the District Students' conference held last evening at 'Ashit Nagar' under the presidency of Sj. Harikumar Chakravarty. Owing to inclemency of weather all engagements arranged in the morning for the leaders had to be cancelled. Sj Subhas Bose was, however, busy meeting prominent gentlemen of the Town. Deputation from both groups of congress workers demanded his attention in the afternoon.

Towards evening, the weather having cleared up, the District students' conference commenced its sitting Sj. Sarat Chandra Chatterjee, Sj. Subhas Chandra Bose, Sj. Harikumar Chakravarty, Srijukta Bimal Prativa Devi and SJ Bipin Bihari Ganguly were taken to the pandal in a procession.

Flag Hoisting Ceremony

The flag hoisting ceremony came off first. Volunteers formed a hollow square in the centre of which was the National Flag Srijukta Bimal Prativa Devi in a neat little speech explained the significance of the National Flag and exhorted the audience to keep its honour in tact all costs, Volunteers then presented arms after which she hoisted the flag.

The conference pandal, named 'Ashit Nagar' was formerly opened by Sj Subhas Chandra Bose, who reffered to the life of the brave and patriotic boy and said it was in the finess of things that the youths of Tippera should honour the memory of the late Ashit Gupta by naming the conference pandal as 'Ashit Nagar'. The interior of the pandal was packed to overflowing with a vast crowd which included about 1000 ladies. Prominent gentlemen and about 400 student delegates from all parts of Tippera also attended.

After the opening song was over Sj Subhas Chandra Bose appealed to the House to maintain pin-drop silence as Sj. Sarat Chandra Chatterjee was weak and unwell Continuing Sj. Bose said it was a rare privilege to have Sj. Sarat Chandra Chatterjee in the conference and he congratulated the students of Tippera on their good luck in having Sj Chatterjee in their midst.

The Message of Freedom

Sj. Chatterjee in opening the students' conference said he was too ill to undergo the strain and unable to go through the strain of conducting the entire proceedings. He would therefore ask Sj Harikumar Chakravarty to perform the functions of the President. Proceeding Sj. Chatterjee said he was full of sympathy with the cause of the students. He loved them and left deeply for them. He had no new message to give, what message he had for his countrymen was already delivered through his writings That message was one of Freedom Since yesterday he had been overwhelmed with delights at the right royal reception given him by the people of Comilla. He was deeply impressed with the volunteers' organisatioin by the local youths. His only regret was that he would not live long to see the fruition of the new movement. He prayed with all his heart that the cause of students and youths of Bengal might prosper and that through service and suffering they might help India to fulfil her destiny.

শরৎচন্দ্র কুমিল্লায় গিয়ে কুমিল্লার কামিনীকুমার দত্তের বাড়িতে ছিলেন। ছাত্র-সম্মেলনের পরের দিন কুমিল্লাবাসী সঞ্জয় ভট্টচার্য (পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও *পূর্বাশা* পত্রিকার সম্পাদক) কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনা করতে যান। সেদিন সঞ্জয়বাবুদের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে শরৎচন্দ্রের যে আলোচনা হয়েছিল, সঞ্জয়বাবু 'শরৎপ্রসঙ্গ' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে তখনকার *নবশক্তি* কাগজে তা প্রকাশ করেছিলেন।

শেষপ্রশ্ন

(ত্রৈমাসিক *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের *শেষপ্রশ্ন*-র উপর লেখা নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সমালোচনা।)

'শেষপ্রশ্ন' শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্নটি করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে। কোন এক ওস্তাদের গান শুনিতে অনুরুদ্ধ হইয়া গুড়গুড়ির নল ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'গায় ত ভাল, কিন্তু থামে ত?' শরৎচন্দ্র যে কতবড় শিল্পী তা এই ছোট্ট টিপ্পনী হইতে বোঝা যায়। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে—শিল্পকলার যে কোন প্রকারেরই হোক্ না,—শুধু ভাল গাইলেই চলে না, থামিতে জানা চাই। শিল্পী মাত্রেই জানেন, বলার চেয়ে, এমন কি ভাল বলার চেয়েও না-বলা কত কঠিন। বলার একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, একবার বলিতে আরম্ভ করিলে থামিতে ইচ্ছা করে না। ক্রমাগতই বলিয়া যাইতে লোভ হয়, সে সূক্ষ্ম সীমারেখায় আসিয়া কলমকে নির্মমভাবে চাপিয়া ধরিতে হয়, তাহা কখন পার হইয়া যায় খেয়াল থাকে না। ফলে এত সাধের রূপসৃষ্টি শ্রীহীন বিকারে পরিণত হয়। একমাত্র শিল্পীই জানেন, কত প্রলোভনকে, কত অবান্তর আকর্ষণকে জোর করিয়া প্রত্যাখান তাহাকে করিতে হয়—এ বিষয়ে তাঁহার সংযম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংযমের চেয়ে কম নয়। শরৎচন্দ্রের লেখায়, এই সাধন-সুকঠিন সংযমের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পদের সুমিত-প্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়, চিত্রিত চরিত্রের সুনির্দিষ্ট স্পষ্টতায় তাঁর রচনা বাঙ্গলা কথা-সাহিত্যের একদিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল—শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন? তিনি ভুলিয়া গেলেন শিল্প সৃষ্টি হয় শুধু সৃজনের তাড়নায়, অন্য যে কোন উদ্দেশ্য সৃজনের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়? কারণ 'শেষপ্রশ্ন'-এ তাঁর সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নেই, যাহা তাঁহার শিল্পী-মনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ঘটনা তো সংক্ষেপে এই যে, আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে কমলের তথাকথিত স্বামী শিবনাথ ভুলাইয়া লইলেন, আর মনোরমার দয়িত অজিতকে শিবনাথের 'শিবানী' ছিনাইয়া লইলেন—একান্ত বিশেষত্ব বর্জিত সুপরিচিত অদল-বদলের কাহিনী। আশুবাবু, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন, অজিত, সতীশ, রাজেন, মনোরমা, নীলিমা, বেলা ইত্যাদি আর যে সকল চরিত্র এই গল্পে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অনুরূপ চরিত্র আমরা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থে বহুবার পাইয়াছি। কমলকে 'চরিত্র' বলা কোনক্রমেই চলে না—সে কতকগুলি কথার সমষ্টি মাত্র, যে কথাগুলির মধ্যে পূর্বাপর চরিত্রগত সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এই কমলই হইতেছে 'শেষপ্রশ্নে'র মুকুটিত কীর্তি—অথবা অপকীর্তি। সমস্ত আখ্যায়িকাটি তাহারই চারিপাশে ঘুরিতেছে—আগ্রার প্রবাসী-বাঙ্গালী পতঙ্গের দল তাহার বিজাতীয় রূপবহ্নির চারিপাশে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাগুলি ঘটান হইতেছে এমনভাবে যাহাতে কমলের সুযোগ হয়, হয় কড়া কড়া কথা বলিবার, না হয় অভাবিত চমকপ্রদ কোন কিছু করিবার। অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক, অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত

প্রভাব সমস্ত গল্পটিকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। গল্পটি প্রথমতঃ মাসিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্যভাবে বাহির হইয়াছিল। মনে হয়, যেন লোকপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু 'শক্' দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। একই দেহে বিভিন্ন অবয়বের মত, একই গল্পে বিভিন্ন ঘটনা, প্রত্যেকে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে—ইহাই হইল কথাশিল্পীর আদর্শ। সে আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।

কথা উঠিবে, গল্প রচনার এই কি একমাত্র আদর্শ? অন্য আদর্শ কি নাই? রোঁলা কি বলেন নাই, মানুষের জীবন নদীর মত নিজের পথ কাটিয়া চলে, আর গল্প-সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ, তাহাও কোন সুনির্দিষ্ট পন্থায় আবদ্ধ নয়, তাহাও পথ কাটিয়া চলে? জয়েস্ প্রভৃতি এঁরা কি কোন প্লট মানিয়া চলেন? আকস্মিকতার ছড়াছড়ি কি তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না?

কথাগুলি নিছক সত্য—কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। চেতনার ধারা বহিয়া যে নূতন ধরনের উপন্যাস ইউরোপে লিখিত হইতেছে, শরৎচন্দ্র সে পথের পথিক নন। 'শ্রীকান্ত'কে অবশ্য রোঁলা বর্ণিত নদীর সহিত তুলনা করা যায় —এবং কোন রসিক পাঠকই তাহাতে প্লটের বাঁধুনি খোঁজে না। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন' ত সে শ্রেণীর উপন্যাস নয়। সনাতন আরিস্টোটল-এর সূত্র অনুযায়ী এ গল্পের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। কাজেই ইহাতে ঘটনা-গ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও চরিত্র চিত্রণ সুসঙ্গত হওয়া দরকার। বাঁদর গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ হয় না, কিন্তু শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ না দিয়া চলে কি?

শোনা যায় শরৎচন্দ্র নাকি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ষাটবার অথবা একশ ষাটবার(?) পড়িয়াছেন। শুনিবার প্রয়োজন হয় না, 'শেষপ্রশ্ন'র প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু কমলের জন্মবৃত্তান্ত নয়—'গোরা'র প্রভাব ধরা যায়। দুটি বইতেই দেশের ও জাতির—তথা মানব-জাতির—নানা সমস্যাকে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। দুজনেই শক্তিমান লেখক—অথচ কি বিরাট পার্থক্য। গোরার বিতর্কগুলি কাঁটার মত উঁচাইয়া নাই, লতা-পাতা-ফুলের সহিত মিশিয়া একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। তর্কের জন্য গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার প্রধান কারণ তাহার তর্কের পাত্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কাজেই তাহাদের বক্তব্য শুধু তর্ককেই জটিল করিয়া তোলে না, তাহাদের চরিত্রকেও স্ফুট করিয়া দেয়। আমাদের মস্তিষ্কও যেমন তুষ্ট হয়, রসবোধও তেমনিই তৃপ্ত হয়। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে' কমলের সহিত যাহারা তর্ক করে তাহাদের যেন কোন আন্তরিক স্বকীয় বিশ্বাস নাই, তাহারা কথা কয় শুধু কমলকে কথা কহাইবার জন্য—কমলের বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতার প্রাচুর্যকে জাহির করিবার জন্য। সাহিত্যেই হোক্ বা জীবনেই হোক্ জাহির করিবার প্রয়াস সর্বদাই অশোভন আর এই অশোভনতাই 'শেষপ্রশ্ন'র প্রধান কলঙ্ক।

অনেকের মতে আধুনিক উপন্যাসে এ-দোষ দোষই নয়। আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য লঘু নয়, গুরু; চিত্তরঞ্জন নয়, সত্যানুসন্ধান। কাজেই কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনুধাবনে গল্পের গতি নিরুদ্ধ হইলেও আপত্তি করা ছেলেমানুষ গল্প-প্রিয়তার পরিচায়ক। হয়ত কথাটা সত্য, হয়ত আমাদের মর্মের নিভৃত কন্দরে যে শিশুমন নিরন্তর গল্প শুনিবার জন্য বায়না করে, তাহাকে তর্কের চড় মারিয়া শিক্ষা দেওয়াই কর্তব্য। তবু মনে হয়, ইহাকে কি বলা চলে না—রুটির বদলে পাথর দেওয়া? একথা নিশ্চিত যে, গভীর সত্যের মধ্যে যে-রস আছে, গল্পপ্রিয় শিশুমন সে রস উপভোগের উপযুক্ত অধিকারী নয়। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন'-এ যে সকল তথ্যকে বড়

গলায় প্রচার করা হইয়াছে, তাহা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল। এইভাবে হাটের দলাদলিই কি তবে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব? পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক, উপন্যাস-কারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করা যায়, দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাই কি তাঁহার শ্রেষ্ঠ পন্থা? সংযত মিতভাষী 'অভয়া'র পাঁচটি কথায় যে তেজ, যে দীপ্তি, যে শক্তি আছে, বক্তৃতায় কমলের বাগাড়ম্বরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় কি? চতুরঙ্গের মধ্যে তর্কের অংশ কতটুকু, অথচ বিশ্বসাহিত্যে কটা বই আছে, যা তার চেয়ে বেশি করিয়া মানুষকে ভাবিতে শেখায়?

আসল কথা, আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে—'শেষপ্রশ্ন' এই পীড়নের তীব্র প্রতিঘাত ; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় ইহা রচিত নহে। তাই শরৎচন্দ্রের দেশপ্রীতিকে শ্রদ্ধা করিয়াও বলা যায়, যে-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্রষ্টা না হইয়া সংস্কারক হইয়া ওঠেন, সৃজনের অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে বড় করিয়া দেখেন, রূপকারের বৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া উপকারে প্রবৃত্ত হন, হে ভগবান সে-সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখিও।

শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৩৮, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

অন্নদাশংকর রায় কর্তৃক শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনা এব
এ সম্পর্কে বাদানুবাদ

১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা *স্বদেশ* পত্রিকায় অন্নদাশংকর রায় তাঁর ছদ্মনাম লীলাময় রায় নাম দিয়ে শরৎচন্দ্রের *শেষপ্রশ্ন* ও *পথের দাবী-র* তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ওই সংখ্যা *স্বদেশ* কোথাও এমনকী *স্বদেশ*-সম্পাদকের কাছেও পেলাম না। তবে ওই নিয়ে তখন যে বাদানুবাদ চলেছিল, তার কিছু কিছু সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেইগুলিই এখানে দিলাম।

স্বদেশ পত্রিকায় অন্নদাশংকর বাবুর সমালোচনা প্রকাশিত হলে তখন বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৩৩৮ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখের সাপ্তাহিক *নবশক্তি* পত্রিকায় এর একটি প্রতিবাদ করেছিলেন। বুদ্ধদেববাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন অত্যন্ত স্নেহভাজন বন্ধু। তাই অনুমান করা যেতে পারে—বুদ্ধদেববাবু ওই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি লিখে ছাপতে দেবার আগে হয়তো একবার শরৎচন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রও হয়তো বুদ্ধদেববাবুর লেখাটি দেখে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, তাহলে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাই বুদ্ধদেববাবুর লেখা এই প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

শেষ প্রশ্ন ও লীলাময়
শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আশ্বিনের *স্বদেশ*-এ শ্রীলীলাময় রায় শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্নের একটি সমালোচনা বার করেছেন। ঠিক সমালোচনা বললে ভুল হবে। সমালোচনার ছলে শরৎচন্দ্রকে যা ইচ্ছে তাই কতকগুলো অর্থহীন শ্লেষ ও কটুক্তি করেছেন।

তিনি বইখানি ভাল করে পড়েন নি, নয় পড়েও কিছু বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে সমালোচনা করবার মত দুঃসাহসের অভাবও তাঁর হয়নি। আমরা নীচে তাঁর দুই চারটি কথা তুলে দেখাবার চেষ্টা করবো। তিনি শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে নিজেই কত বড় অপদস্থ হয়েছেন।

প্রথমেই দেখা যাক্, তিনি কমলকে কেমনভাবে বুঝেছেন। তিনি লিখেছেন : 'সে(কমল) যেন বিলেত থেকে আমদানী এক বাণ্ডিল তর্ক। সে চিন্তা করে না, প্রশ্ন করে না, কামনা করে না, দৌড়ায় না, ঝাঁপায় না, কলরব করে না।' কিন্তু কমলের সত্যকার রূপ কি এই? তর্ক সে করে, তার মতামতও কিছু মৌলিক, কতকটা বিলিতি ঘেঁষাও বটে, কিন্তু তবুও কি সে শুধুই এক বাণ্ডিল তর্ক? আর কিছুই নয়? সে কি পরিপূর্ণ জীবন্ত নারী নয়? তার সমস্ত ভালবাসার মৌনতা, তার ক্ষণিকের মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় তার সমস্ত জীবনবাপী tragedy সে কি কিছুই নয়? শুধু তার তীক্ষ্ণতা আর তর্কটাই হলো সব, সে যে সমস্ত জীবন ধরে শিবনাথকে এত গভীরভাবে ভালবেসে গেল, কিন্তু এতটুকু প্রকাশ পর্যন্ত করলে না, তার সমস্ত নারী হৃদয়ের

আহত অভিমান নীরবে সহ্য করে গেল, তাতেও কি তার চরিত্রকে এতটুকু সার্থক করে তুলতে পারলে না? সে কি শুধু একটা তর্ক করবার যন্ত্র মাত্র? শিবনাথ যখন তাকে অত্যন্ত কাপুরুষের মত ছেড়ে চলে গেল, তখন সে তার সমস্ত অভিমান নিষ্পেষিত করে, তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ক্ষমা করবার শক্তি পেল কোথা থেকে? নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়ে তোলবার স্পৃহাই বা তার হলো কি করে? সে কি তার বিচার করে বোঝা বুদ্ধির জোরে? আর যখন সেই অতি ভালমানুষ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির কাছে তার সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চোখের পাতা চক্‌চকিয়ে ওঠে সেই কি শুধু তার করুণার জন্যে? শিবনাথের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার অন্ত নেই, এ কথা মনে করতেই তাকে চোখের জল লুকাবার জন্য পিছন ফিরতে হয়, সেও কি শুধু একটা অকারণ ছল? আর সেই সমস্ত দিনের অনাহারের পর ঘর ঝাড়তে বসা, তাকেও কি একটা অর্থহীন খেয়াল বলতে হবে?

সমস্ত সতেরোর পরিচ্ছেদটা আগাগোড়া পড়েও কি লেখক একটু বুঝতে পারেন নি যে কমল শেষ পর্যন্ত শিবনাথকে কতখানি ভালবাসতো। কমলের theory আর কমল যে এক বস্তু নয়, এও কি বলে দিতে হবে? আমাদের ত মনে হয় লেখক কমলের তর্কজাল কাটিয়ে তার আসল হৃদয়টি চিনতে পারেন নি, কেবল বাইরে বাইরে হাতড়েই বেড়িয়েছেন, ভিতরে ঢুকবার চাবি খুঁজে পান নি।

কমলের চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর আর একটি অভিযোগ এই যে, এটি নাকি যথেষ্ট মৌলিক নয়,—এটি 'বিলাতি উপন্যাসের অনুকৃত।' কিন্তু কোন্ উপন্যাসের তা বলে দেন নি, সুতরাং তা নিয়ে কথা বলা চলে না।

আরও একটি কথা। কমলের চরিত্রে heridity-র লীলা না পেয়ে বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন, 'তার (কমলের) দেহে দুই দেশের রক্ত, তার মনে দুই দেশের সংস্কার অনর্থ বাধায় না। তাই আমাদের সন্দেহ হয়, সে কি সত্যিই অর্ধেক ইউরোপীয়। কই তার মধ্যে ইউরোপীয় প্রকৃতির সামান্যতম ছিটে ফোঁটা? দুটো সভ্যতার উত্তরাধিকারীর রূপ কি এই?' Genetics বই যদি তাঁর আর একটু বেশি পড়া থাকতো, তাহলে তিনি জানতেন যে পিতামাতা দুই পক্ষের character সন্তানে সমভাবে বর্তায় অতি অল্প ক্ষেত্রেই। .... তাই যদি বা হবে, তো আমাদের দেশের সমস্ত Anglo-Indian গুলোই তো heridity-র লীলার চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তো ; কিন্তু তাদরে নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রা দেখে তো মনে হয় না যে দুটো বিপরীত দেশের রক্ত তাদের মধ্যে অনর্থ বাধাচ্ছে।

আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ভুল ধরতে যাওয়া লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অনধিকার চর্চা।

আবার এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি কমলের একটা নূতন genealogy দিয়ে দিয়েছেন—অনেকটা Milton-এর mythology-র মত।

এই বইখানা প্রকাশিত হবার অনেক আগে শরৎচন্দ্র একবার আমাদের বলেছিলেন, 'এইবার একটা বই লিখছি—ভারি শক্ত, দু-চার বার না পড়লে হয়ত অনেকে বুঝতেই পারবেন না। মেয়েদের কাছে ত এইবার আমার পসার মাটি হল।' এখন দেখছি, শুধু মেয়েদের কাছেই নয় অনেক লেখাপড়া জানা 'মডার্ণ' পুরুষের কাছেও তাঁর পসার মাটি হচ্ছে।

লেখকের মতে শিবনাথ বিশেষত্বহীন, কিন্তু কেন তা বলেন নি। আমরা কিন্তু শিবনাথের মত অমন সুন্দর বিশেষত্বপূর্ণ চরিত্র খুব কমই দেখছি।

অনেকে আছেন যাঁরা দুটো চরিত্রের মধ্যে মোটা মোটা দুই একটা গুণ এক রকমের দেখলেই মনে করেন ও দুটো চরিত্র এক রকমের। তাঁরা Hamlet যে Falstaff নয়, আর, Asta আর Sylvia যে দুটো আলাদা লোক, এ কথা বেশ বোঝেন, কিন্তু রমেশ, সতীশ, সুরেশ প্রভৃতি এদের চরিত্র বুঝতে গেলেই যত গোলে পড়েন—সব একাকার করে ফেলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়— সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির অভাব। তাঁরা চরিত্র সৃষ্টির image-এর দিকটাই দেখেন, কিন্তু depth এর দিকটা দেখতে পান না। দুটো চরিত্র বাইরে থেকে দেখতে মোটামুটি এক রকমের হোলেও, তাদের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিক দিয়ে যে তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন লোক হতে পারে, এ তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারেন না। কিন্তু এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করাই হচ্ছে আর্টের দিক থেকে শক্ত কাজ। Shakespeare-এর মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের বড় বড় চরিত্র সৃষ্টি করা যে কিছুই নয় তা বলছিনে, কিন্তু তাতে চরিত্রকে যতটা সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুললে চলে, তার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে। অবশ্য তাতে বড় দরের genius দরকার করে।

শ্রীলীলাময়ের বুদ্ধিটাও এই ধরনের একটু ঘোলা। আর তাঁর আপত্তিটাও হচ্ছে ঠিক এই রকমের। তিনি বলেন, 'নীলিমা, রাজন ও সতীশকে শরৎবাবুর ঝুলিতে অনেকবার দেখা গেছে। অক্ষয়টি রবিবাবুর বই থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।' যদি তাঁর একটুও literary appreciation-এর ক্ষমতা থাকে তো তিনি আগেকার সেই সব চরিত্রকে এদের স্থানে বসালেই দেখতে পাবেন যে এদের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রভেদ কত বড়।

লেখক আরও লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্রের নাটকেযেমন একটি মাতাল, একটি বেশ্যা ও একটি সন্ন্যাসী থাকবেই, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তেমনি একটি সেবাপরয়ণা বিধবা, একটি সৃষ্টি ছাড়া, খেয়ালী অথচ পরোপকার সর্বস্ব যুবক এবং একটি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী কোন না কোন ছদ্মবেশে থাকতে বাধ্য।'

প্রথমতঃ কথাটা মিথ্যা। শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক বইয়ে এ ধরনের কোন না কোন চরিত্র নেই। তা ছাড়া তাঁর groupingটাও হয়েছে এত ব্যাপক যে তার কোন মানে হয় না। আর সেবাপরায়ণা বিধবা বা খেয়ালী অথচ পরোপকার সর্বস্ব যুবক থাকলেই যে তাদের চরিত্র পরস্পরের অনুকরণ হবে, তার কোন মানে নেই। সাবিত্রী সেবাপরায়ণা বিধবা, রাজলক্ষ্মীও তাই, নীলিমাও তাই, কিন্তু তাই বলে তারা পরস্পরের অনুকরণ একথা বোধ হয় শ্রীলীলাময়ও স্বীকার করবেন না। তাছাড়া, নারী-চরিত্র আঁকতে গেলে তা হবে হয় সধবা, নয় বিধবা, আর হয় সেবাপরায়ণা, না হয় তো তার উল্টো। সুতরাং সেবাপরায়ণা বিধবা বলতে গেলে প্রায় সমস্ত নারী চরিত্রের একচতুর্থাংশকেই বুঝায়, তাই যাঁরা অনেক নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের উপন্যাসে সেবাপরায়ণা বিধবার আনাগোনা একাধিকবার হতেই পারে, এবং তা কিছু অন্যায়ও নয়—যদি তারা বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একদিন শরৎচন্দ্র আমাদের বলেছিলেন, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমি সবচেয়ে বোকা।

আমরা ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন?

তিনি বললেন, সবাই যেমন অবলীলাক্রমে আমার বইয়ের সমালোচনা লেখে তাই দেখে আমি রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে, কত ভেবে ভেবে, যে বইটা লিখলাম, তাই ওরা ভাত খেয়ে উঠে, পান চিবোতে চিবোতে একবার মাত্র পড়েই বলে দিলে, অমুক চরিত্রটা অস্বাভাবিক,

অমুকের চরিত্র এ রকম হতেই পারে না, এমনি কত কি! আমি যেটা এত ভেবে এতবার করে পড়েও বুঝতে পারলাম না, ওরা তাই এক নিমিষেই বুঝে নিলে। তাতেই দেখ আমি? সব চেয়ে বোকা নয় কি?

Comment নিষ্প্রয়োজন।

আর একটি কথা লেখক গোড়া থেকেই ভুল করেছেন—তিনি ধরে নিয়েছেন যে শরৎচন্দ্র কোনও কিছু প্রমাণ করবার জন্যে এই বই লিখেছেন। এবং সে প্রমাণের বিষয় হচ্ছে 'প্রাচীন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য থাকবে না যাবে।'

কিন্তু শরৎচন্দ্র কোন কিছু প্রমাণ করবার জন্য কোন বই লেখেন না, এখানিও সেজন্য লেখা নয়। তিনি শুধু দুটি set চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যাদের মধ্যে ঐ নিয়ে কিছু তর্ক বিতর্ক হয়েছে। হঠাৎ পড়লে অবশ্য মনে হয়, কমলই শরৎচন্দ্রের favoured type; কিন্তু তাও যদি হয়, তবুও কমলের প্রত্যেকটি কথা শরৎচন্দ্রের বলে ধরে নিলে ভুল হবে। এ কথা শরৎচন্দ্র নিজে আমাদের বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রকে 'জানা কথা স্বতঃসিদ্ধ কথা তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করতে দেখে' লেখকের 'সুকুমার রায়ের ছড়া বিশেষ মনে পড়ে' গেছে বটে, কিন্তু তবুও তিনি এটুকু ভেবে দেখেন নি যে, কথাটা প্রমাণ করেছেন শরৎচন্দ্র নয় কমল, আর তাদের কাজেও নয় যারা 'কার্ল মার্কসকে নিয়ে ক্ষেপেছে' কিন্তু গুটিকতক শান্ত শিষ্ট প্রাচীন-পন্থী সৃষ্ট চরিত্রের কাছে। তাতে রসসৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তাহলেই হল, নূতন কিছু তথ্য না হয় নাই দিলেন।

কোনও কিছু মত প্রচার করবার জন্য বই লেখা—Ibsen-এর পর থেকে—পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের যেন একটা mania হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তার ফলে অনেক শক্তিমান লেখকও কতকগুলো বাজে বই লিখছেন—তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং Bernard Show। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই ধরনের সাহিত্যিক নন।

...লেখক শুধু 'শেষপ্রশ্ন'র সমালোচনা (?) করেই ক্ষান্ত হননি, দত্তা, গৃহদাহ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিকেও আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে শরৎচন্দ্রের ঐ দুখানি বই লেখা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ, 'দত্তার বিজয়া, গৃহদাহের অচলা যে সমাজের মানুষ সে সমাজে তাঁর প্রবেশ নেই। শিক্ষিতা তরুণীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই।' 'কুক্ষণে তিনি মডার্ণ হবার জন্য অনধিকার চর্চা শুরু করলেন।' কিন্তু শরৎচন্দ্রের যে শিক্ষিতা তরুণী সমাজে প্রবেশ নেই, একথা তিনি জানলেন কি করে? যেখান থেকেই জানুন, তিনি মিথ্যা জেনেছেন। এ কথা আশা করি তিনি ছাড়া আর সকলেই জানেন।

তিনি আরও লিখেছেন—'এর পরে তিনি (শরৎচন্দ্র) আরও দুঃসাহসিক হয়ে, আরেক ডিগ্রী অনধিকার চর্চা করলেন। লিখলেন—পথের দাবী। ... ভাগ্যক্রমে বইখানা বাজেয়াপ্ত হল।'

আমরা প্রথমে ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ যাই হোক্। এমন কথা যে কেউ বাংলাদেশে জন্মে লিখতে পারে,এ আমাদের ধারণায় ছিল না।

কিন্তু লেখকের স্পর্ধার সীমা এইখানেই শেষ হয়নি। শেষের দিকে তিনি লিখেছেন—'গল্পের বায়না নিয়ে তিনি (শরৎচন্দ্র) আসরে নেমেছেন। গল্প বলতে পারেন না ভুলে গেছেন, সে ক্ষমতা আর নেই, তবে চুপ করে থাকুন ! চিরদিন কারুর সমান যায় না।'

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, বাংলা সাহিত্যের তরফ থেকে এ কথা বলবার অধিকার তাঁকে দিলে কে? তিনি কি মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের সত্যিই এত অবনতি হয়েছে

যে তাঁর 'সত্যাসত্যে'র মত trash উপন্যাস পেয়ে, তারা শরৎচন্দ্রকেও ভুলে যাবে। তবে এ দুশ্চেষ্টা কেন?

তিনি আরও লিখেছেন, 'চুলচেরা তর্কের ক্ষমতা ভগবান তাঁকে দেন নি, তাঁর পড়াশুনাও যথেষ্ট আধুনিক নয়, ইতিমধ্যে যুগপরিবর্তন হয়েছে তাও তিনি জানেন না।'

এ সকল কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না, তবে এইটুকু শুধু লেখককে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে শরৎচন্দ্র হয়ত তাঁদের মত Hamilton আর Oliphant এর গল্প পড়ে আধুনিক হতে যাননি, তবে আসল যা solid literature তাতে তাঁর মত up-to-date schloar ভারতবর্ষে আছে কিনা সন্দেহ। আরও একটা কথা এই সঙ্গে লেখককে জানিয়ে দেওয়া উচিত। লোকে যাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে এমন কোনও লোককে বেপরোয়াভাবে কতকগুলো চোখা চোখা কটূক্তি করতে পারলেই 'মডার্ণ' হওয়া যায় না। 'মডার্ণ' হওয়া অত সোজা নয়—সেটা Bernard Shawর যুগে চলতো এখন চলে না। (—*নবশক্তি*, ৩য় বর্ষ, ২৮ সংখ্যা—১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ২৭ শে নভেম্বর ১৯৩১)

অন্নদাশংকর রায় এবং তাঁর স্ত্রী লীলা রায়, এঁরা উভয়েই দিলীপ কুমার রায়ের পরিচিত ছিলেন। *স্বদেশ* পত্রিকায় অন্নদাশংকরবাবুর লেখা পড়ে দিলীপবাবু তখন ওই লেখা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিযোগ করে লীলাদেবীকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

অন্নদাশংকর লীলাদেবীকে লেখা দিলীপবাবুর চিঠি পড়ে তখন দিলীপবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন :

দিলীপদা,

লীলাকে তুমি লিখেছ আমি নাকি শরৎবাবু সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করেছি যে 'Sarat Chandra is not well read' . আসলে কিন্তু আমি বলেছি—'শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা যথেষ্ট আধুনিক নয়।' তোমার ইংরেজির সঙ্গে আমার বাংলা মিলিয়ে পড়লে তোমার অর্ধেক রাগ পড়ে যাবে।

'শেষপ্রশ্ন'র নায়িকা কমল যদি শুধু মাত্র বাঙ্গালীর মেয়ে হতো তবে তাকে নিয়ে তার স্রষ্টা যা খুশি করতে পারতেন। কিন্তু সে অর্ধেক ইউরোপীয়, তার শিক্ষাদীক্ষা তার পিতার কাছে। সুতরাং ইউরোপীয় কিংবা ইউরোপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত পাঠকের কাছে শরৎবাবুর জবাব দিহির দায় আছে। আমার উজ্জয়িনী বৈষ্ণব শাস্ত্র চর্চা করছে দেখে তুমি আমাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বিশেষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছ। শরৎবাবুকে যদি কেউ সেই জাতীয় উপদেশ দেয়, তবে তার ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় না। ডক্টর জনসন আবিসিনীয়ার গল্প ইংলণ্ডে বসে লিখেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ও সেই জাতীয় কাজ করে থাকেন। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রধানতঃ কল্পনার লেখা।

প্রশ্ন করিতে পারো উপন্যাসে কল্পনার স্থান কি একেবারেই নেই? এর উত্তর আছে বৈকি? কিন্তু 'আরব্য উপন্যাস'ও কাল্পনিক উপন্যাস 'নৌকাডুবি'ও কাল্পনিক উপন্যাস। নৌকাডুবির রচয়িতা একটি কাল্পনিক অবস্থার সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সেই অবস্থায় যাদেরকে ফেললেন, তারা আমাদের জানাশুনা লোক এবং কোন্ অবস্থায় কে কি ব্যবহার করে থাকে না করতে পারে তাও আমাদের জানা। আরব্য উপন্যাস রচয়িতার কল্পনা সত্যাশ্রয়ী নয়। তা বলে যে কেউ আরব্য উপন্যাস পড়ে এসেছে ও পড়তে থাকবে। যাদের সাহস কম, শক্তি আপিসের খাটুনিতে শেষ, গতি

ফুটবলের মাঠ অবধি ও স্বপ্ন রাতারাতি দেশের নবরূপ ধারণ, তারা 'পথের দাবী'কে সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে বিচার করবে না। আর যারা সত্যই বিপ্লবী তারা সাহিত্য না পড়ে 'গীতা' এবং জীবন চরিত পড়বে।

'শেষ প্রশ্ন'-ও অন্তঃপুরে বিশেষ সমাদর পাবে। চায়ের আড্ডায়। নারীবর্জিত মেস-এ কিংবা মাঠে। যাদের সুযোগ এবং সাহস অল্প অথচ সাধ এবং সখ বেশি তাদের কাছে 'শেষ প্রশ্ন' নির্বিচার শ্রদ্ধা লাভ করবে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রেরও জন কতক বাঁধা ভক্ত আছেন, এঁরা লেখকের খাতিরে লেখার দর যাচাই করতে নারাজ। আবার একটি mutual admiration সংঘও আছে। যেহেতু শরৎচন্দ্র এঁদের সুখ্যাতি করেছেন, সেহেতু এঁরা শরৎচন্দ্রের সুখ্যাতি করবেনই।

শেষ প্রশ্ন-র নায়িকা অর্ধেক ইউরোপীয়। শুধু তাই নয়। *শেষ প্রশ্ন* আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক আদর্শ, আধুনিক চিন্তা সম্বন্ধে একখানি থিসিস বললেও চলে। শরৎচন্দ্র তার স্থানে স্থানে আধুনিক বিদেশী গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করেছেন। বইখানা যদি তিনি শুধু বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের জন্যেই লিখতেন এবং তার মাত্র এক কপি প্রকাশ করতেন, তাহলে আমি একটি কথাও কইতুম না। কিন্তু তিনি ওখানা আমার জন্যেও লিখেছেন। ওখানার একদিন অনুবাদ হতেও পারে। কাজেই ওখানা তিনি বিদেশী পাঠকদের জন্যেই লিখেচেন। ধরে নিতে পারা যায় যে ওখানা তিনি তোমার আইরিন মিনা আশা ইত্যাদির জন্যেও লিখেছেন। ঐ সব আন্তর্জাতিক ও আধুনিক পাঠক-পাঠিকা যদি দেখেন যে শরৎচন্দ্র যা লিখেছেন তা তিনি ইউরোপে বসে মহাযুদ্ধের আগে লিখলেও পারতেন, তবে ও কথা তাঁরা খুব মোলায়েম কথায় বললে সেটা দাঁড়াবে এই রকম যে শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা যথেষ্ট আধুনিক নয়। পড়াশুনার পরিচয় ঐ পুস্তকে আছে বলেই পড়াশুনার প্রসঙ্গ তোলা। না থাকলে একেবারে চুপ করে থাকা যেতো।

এখন তোমাকে আমার এই অনুরোধ যে আমার এই চিঠিখানা তুমি 'নবশক্তি'তে ছাপতে দিয়ো।

অন্নদাশংকরবাবুর অনুরোধে দিলীপবাবু এই চিঠিটি *নবশক্তিতে* ছাপতে দিলে *নবশক্তি*-সম্পাদক *শেষ প্রশ্ন*-র কথায় হেডিং দিয়ে শ্রীলীলাময় রায়ের লেখা বলে চিঠিটিকে প্রবন্ধাকারে ১৩৩৮ সালের ১১ই অগ্রহায়ণের *নবশক্তি* পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

স্বদেশ পত্রিকায় অন্নদাশংকরবাবুর প্রবন্ধটি পড়ে আশালতা সিংহ সেই সময় দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

সেদিন 'স্বদেশ' মাসিকে অন্নদাশংকরের শরৎচন্দ্রের ওপর গোটা কতক কথা পড়লাম। কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো? এই সেদিন তাঁর 'তারুণ্য'-এ পড়লাম—শরৎচন্দ্র কী শিল্পী, কী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি! কথাগুলো আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে নেই, কিন্তু তার ভাবটা প্রাঞ্জল ক'রে এই যে কমল যে খাঁটি ভারতীয় নারী হতে পারে না, ব্রাহ্ম সমাজেরও নয় তার চরিত্র যে নিঃসন্দেহ-রূপে নিরন্তর ইউরোপের কূলের দিকে হাতছানি দিচ্ছে এ শরৎবাবু দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন বলেই তার বাবাকে করেছেন ইউরোপীয়, নইলে কলম যে সব দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়ে যেত। হঠাৎ এর মধ্যে হোল কি?

তাঁর সমালোচনার মধ্যে একটা জিনিষ আমাকে আঘাত করেছে ... তাঁর এ সমালোচনায় এতটুকু

সংযম নেই, শ্রদ্ধা নেই, তাঁর তীক্ষ্ণ কথাগুলি যেন 'অক্ষয়ের বক্তৃতার ছাঁদে—'গায়ে পড়া দুঃসহ বিরুদ্ধতা।' বেশ তো মতামত সকলের এক হয় না, সত্য কথাটা সোজা করে বলাই উচিত, এ-ও না হয় মানলুম, কিন্তু সত্য কথা বলার মধ্যে এ অহেতুক আঘাত দেবার উগ্রতা পদে পদে আত্মপ্রকাশ করচে কেন? তাছাড়া তাঁর গোটা কতক কথাও আমার খাপছাড়া বলে মন বলছে। ... 'পথের দাবী' 'ভাগ্যক্রমে বাজেয়াপ্ত হল নইলে শরৎচন্দ্রের কলঙ্ক তাঁকে আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনীয় করতো'—এই কথাটি পড়েই মনে হ'ল পৃথিবীতে কত যে 'ভিন্নরুচির লোক' সে কথা কালিদাস কত দিন আগেই না—কি সুমিষ্ট করে বলে গেছেন।.. আজ সত্য কথা প্রাঞ্জল করে বলার অহমিকায় কেবল নিজের মত, নিজের রুচি সাজিয়ে বলবার এ কী বিশ্রী কুরূপতা বলুন তো! 'পথের দাবী'র বিপ্লবের অংশ বাদ দিলেও অপূর্ব ভাবতীয় সমস্যাটির নানান্ সম্পর্কের কাহিনী মধুরতম হয়ে তাঁর এ-সৃষ্টিকে কত সুন্দরই না করেছে! একে যদি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহ'লে আমি বলব এ সমালোচনার নামে দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অন্নদাশংকর আরও বলেন *শরৎবাবুর অচলা এবং দত্তা বাস্তব দিক থেকে সত্য নয়—যেমন সত্য অভয়া কিম্বা সাবিত্রী। কারণ কি? না, শরৎবাবু ব্রাহ্মসমাজের তরুণীদের সঙ্গে মেশেননি, অতএব না মিশেও এ চরিত্র সৃষ্টি করা তাঁর কিছু পরিমাণে অনধিকাব চর্চা হয়েছে—কেবল অদৃষ্টক্রমে তিনি কেবলমাত্র শিল্পী বলেই অচলা ও দত্তাকে কোন রকমে টেনে তুলেছেন—যদিও তাতে করে ওঁরা মাত্র কল্পনাব দিক থেকেই সত্য রয়ে গেছেন—বাস্তব দিক থেকে সত্য হতে পারেন নি।*

এ ধরনের কথাগুলো ভারি ঝাপ্‌সা মন্টুদা, নয়? অন্ততঃ আমি তো কল্পনার দিক থেকে সত্য কাকে বলে এবং বাস্তব দিক থেকে সত্যই বা কাকে বলে তার হদিস অনেক ভেবেও পরিষ্কার করে বুঝতে পারলাম না। কারণ কল্পনা আর সত্য যাচাই করবার মোটা দিকটা তুলনা করলে আমি যা দেখতে পাই সেটা এই যে শরৎবাবুর দৃষ্টিতে এরা একেবারে এক হয়ে মিলে আছে, সাধ্য কি যে অতি নির্দিষ্ট করে নির্দেশ করে দিই কতটুকু বা এর কল্পনার দিক থেকে সত্য এবং কতটুকু বাস্তব দিক থেকে। ধরুন, সাবিত্রীর মতন দাসী কি সাধারণ মেসে খুঁজলেই পাওয়া যায়? অভয়াকেই বা কে কতবার প্রত্যক্ষ করেচে বলতে পারেন? আসলে এই বাস্তব দিক থেকে কে কতদূর সত্য সে-প্রশ্ন একেবারেই অনাবশ্যক। এবং দত্তা ও অচলাকে সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র ক' ডিগ্রী অনধিকার চর্চা করেছেন সেটা মাপবেই বা কে? আর যে সব অতি আধুনিকরা অহরহ এই সব তরুণীর সঙ্গে মেলামেশা করছেন তাঁদের চরিত্র-চিত্রণ তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন কেন এমনই অসার প্রাণহীন, অবাস্তব মনে হয়? ...এঁদের লেখা পড়ে আমার ত প্রায়ই মনে হয় এঁরা নারীকে বোঝবার চেষ্টা করেন নি—হাজার মেলামেশা সত্ত্বেও। কেবলই নিজের একটা মনগড়া attitude-এর ছাপ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করতে ছুটেছেন। হাল আমলের তরুণ হলেই কি হাল আমলের তরুণীর মর্মলোকের স্নান আপনা আপনি উন্মুক্ত হয়ে যাবে? যৌবনের স্বভাবতই উচ্ছৃল অমিতাচারকে সংহত করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হ'লে নবজাগ্রত প্রকৃতির চারদিকে একটি নির্জন তপস্যার মণ্ডল চাই—হাল আমলের তরুণরা তা আমলে আনছেন কই? তাছাড়া আপনার কি মনে হয় কোনো একটা বস্তুর নিরতিশয় নিকটে থাকলেই তাকে সর্বতোভাবে বোঝা যায়? কোন্ বহু সন্তানবর্তী সন্তান-বৎসলা নারী শরৎবাবুর মতন বাৎসল্য রসের সন্ধান পেয়েছেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ছিলি আমার পুতুল খেলায়
ভোরে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।

তাঁর আগে কোন মা তাঁর নিভৃত জননী হৃদয়ের এ গভীর বাণীটিকে এত মধুর, এত সত্য করে বলতে পেরেছেন? খুব কাছাকাছি থাকলেই খুব বড় করে খুব ভালো করে দেখা হয় কি মন্টুদা? আমার তো বারবারই মনে হয়েছে—তরুণদের লেখা পড়ার সময়ে—যে সত্য করে জানবার ও বুঝবার, কামনার ভিতর যে একটা দুঃসহ নির্জন এবং একমাত্র তপস্যা আছে তা এঁরা কখনো জানেন নি—বোঝেন নি। তাই তাঁদের লেখার ভিতর রাত্রিকালের নিগূঢ় শক্তি একান্ত হয়ে আড়ালে থেকে কাজ করচে না। সত্যকার প্রশান্তি এতটুকু ফুটছে না, অহরহ ঠিকরে পড়ছে কেবল অস্বাভাবিক আলোর উগ্র কৃত্রিমতা।

আশালতা দেবীর এই চিঠি পেয়ে দিলীপবাবু ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *পুষ্পপাত্র* পত্রিকায় আশালতা দেবীকে পত্রাকারে লেখা 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গতঃ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

... তুমি উল্লিখিত পত্রে লিখেছিলে যে অন্নদাশংকরের ও কথাগুলো ভারি ঝাপসা যেখানে তিনি লিখেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের অচলা বা বিজয়া 'বাস্তব দিক থেকে তেমন সত্য নয়, যেমন সত্য তাঁর অভয়া কিম্বা সাবিত্রী তাছাড়া অন্নদাশংকর গায়ের জোরে সেই তার্কিক ভুলটি করে বসেছিলেন, যাকে ইংরাজীতে বলে Begging the question অথবা to take for granted what one sets out to prove —অর্থাৎ শরৎবাবু ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের সঙ্গে মেশেন নি। বিশেষতঃ যেখানে গালি গালাজ করতে হবে, সেখানে এ ধরনের লেখা বড়ই অসমীচীন।— যাকে সমর্থন করবার কোন উপায়ই নেই। অন্নদাশংকর শরৎবাবুকে চেনেন না, অন্ততঃ যখন এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তখন চিনতেন না, এ আমি জানি—কাজেই কেমন করে টের পেলেন শরৎবাবু ব্রাহ্ম সমাজের খবর রাখেন কি না রাখেন? তাছাড়া ব্রাহ্ম মেয়েও কি বিলাতের শীতের আকাশের মতন—এক রকম—ধূসর ধূমল? ওরাও নানা রকমের হয় যে। তাই অন্নদাশংকর যদি দত্তা ও অচলার মত মেয়ে ব্রাহ্ম সমাজে না দেখে থাকেন, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না, কিন্তু বাস্তববাদীদের তর্কের উত্তরে যথাস্থানে আমি দেখাবার চেষ্টা করব এ রকম মেয়ে ব্রাহ্ম সমাজে চোখে না পড়লে সাহিত্যে তাদের কল্পনা করতে বাধা নেই।

অন্নদাশংকরবাবু শরৎচন্দ্রকে চিনতেন না বলেই লিখেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের সঙ্গে মেশেন নি।

বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—শরৎচন্দ্রের অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু ছিলেন এবং শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে ভালোরূপ মিশেওছিলেন।

শরৎচন্দ্রের রাশিচক্র বিচার

রাশিচক্র

শরৎচন্দ্রের জন্মপত্রিকার সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটি কয়েকটি সহজবোধ্য কথা বলে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো। এই থেকে পাঠক-পাঠিকারা হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎকর্ষ প্রণিধান করতে পারবেন।

শরৎচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন...রাশিচক্রে শাস্ত্র অনুযায়ী তার প্রমাণ প্রবলভাবে বর্তমান। যে স্থানে লং (লগ্ন) লেখা আছে, সেই স্থান প্রথম ঘর ধ'রে বাঁ দিক দিয়ে এক, দুই, তিন করে গুণে পাঁচের ঘর দেখতে হবে। পাঁচের ঘর হল কর্কটের... তার অধিপতি হল—সেই চন্দ্র—সেই চন্দ্র শরৎচন্দ্রের রাশিচক্রে স্বক্ষেত্রগত—অর্থাৎ নিজের ঘরে। এই চন্দ্রের ওপর বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি পড়ায় ও শুক্র চন্দ্রের সঙ্গে থাকায় বুদ্ধিযোগ প্রবল।

প্রমাণ :

সৌম্যে তু বুদ্ধিভাবস্থে গুরু শুক্র নিরীক্ষিতে, তাদৃশে বুদ্ধিনাথে বা সর্বেষাং বুদ্ধিদো ভবেৎ।

পঞ্চমস্থ পঞ্চমপতি অথবা বুধের উপর গুরু ও শুক্রের প্রভাব থাকলে জাতক সকলের

বুদ্ধিদাতা অর্থাৎ অতিশয় বুদ্ধিমান হন। লগ্ন থেকে পঞ্চমে শুভগ্রহ চন্দ্র ও শুক্র বর্তমান—পঞ্চমে শুভগ্রহ থাকলে জাতক বুদ্ধিমান, ইঙ্গিতজ্ঞ, কার্যদক্ষ, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রত, দেবতায় ভক্তিমান্ এবং সুশীল হন। প্রমাণ :

ধীস্থৈঃ সৎখেচরৈঃ প্রপঞ্চরচকো দক্ষোহতিগূঢ় সুধীঃ
সম্মন্ত্রামর-সেবনেষু নিরতো নুনং সুশীলঃ সদা।

শরৎচন্দ্রের রাশিচক্রে তিনটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে—কর্কটে চন্দ্র, কন্যায় বুধ ও কুম্ভে শনি।

কুল তুল্যঃ কুল শ্রেষ্ঠো বন্ধু মান্যো ধনী সুধী, ক্রমান্নৃপসমো ভূপ একাদৌ স্বগৃহেস্থিতে।

উপরন্তু বুধ তুঙ্গী—ও কেন্দ্রী (লগ্ন থেকে সপ্তমে ... সপ্তম স্থান কেন্দ্র) ফল—

স্বোচ্চরাশিগতশ্চান্দ্রী কেন্দ্র-কোণসমন্বিতঃ
বিদ্যাবাহন সম্পত্তিং করোতি বিপুলং ধনম্।

কন্যা রাশিতে বুধের অবস্থান হেতু ফল—সুবচনানুরতশ্চতুরো নরো লিখনকর্মপরোহি বরোন্নতিঃ।

শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ বর্তমান। দশম ঘর ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি রাশি চক্রে নবমে (ত্রিকোণে) অবস্থিত। ফল :

দশম ভবননাথঃ কেন্দ্র-কোণে ধনে বা বলবতি যদি জাতঃ ক্ষেত্রসিংহাসনে বা সঃ ভবতি নরনাথো বিশ্ববিখ্যাত কীর্তি...

শরৎচন্দ্রের অর্থ-ভাগ্য :

লগ্ন ও দশমের অধিপতি একগ্রহ কিম্বা উভয় স্থানের অধিপতি এক রাশিতে থাকলে জাতক ন্যায় পথে উপার্জিত নিজ অর্থে পুণ্যকর্ম সাধনে সক্ষম হন। শরৎচন্দ্রের রাশিচক্রে লগ্ন ও দশমের অধিপতি একগ্রহ (বৃহস্পতি) সুতরাং :

একস্থৌ তনুকর্মপৌ যদি তয়োরেকাধিপত্যে তু বা
জাতঃ স্বার্জিত-সদ্ধনেন কুরুতে যজ্ঞাদি কর্মোৎসবম্।

রাশিচক্রে নবমস্থান অর্থাৎ ধর্মস্থান ও ভাগ্যস্থানে দেবগুরু বা বৃহস্পতি অবস্থিত। ভাগ্যস্থ বৃহস্পতির ফল :

ভবেদ্ভাগ্যযুক্তো নরঃ শ্রেষ্ঠশক্ত
স্তথা তীর্থ পণ্যাদি বার্তাসু সক্তঃ।
ভবেদ্বান্ধবৈঃ সেবকৈঃ সম্প্রযুক্তো
সদা দেবপূজ্যো ধ্রুবং পুণ্যযাতঃ।।

অর্থাৎ বৃহস্পতি ধর্মভাবগত হলে জাতক সেবক ও সদ্বান্ধবযুক্ত, ভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠশক্তি সম্পন্ন, তীর্থ পরায়ণ ও ধর্মকথা শ্রবণে আসক্ত হন।

ধর্মভাবগত বৃহস্পতির অপর ফল :

চতুর্ভূমিকং তদ্গৃহং তস্য ভূমি
পতের্বল্লভো বল্লভা ভূমিদেবাঃ
গুরৌ ধর্মগে বান্ধবাঃ স্যুর্বিনীতা।

সদালস্যাতো ধর্মবৈগুণ্যকারী।

অর্থাৎ জাতকের বাসস্থান চকবন্দি হয়। সেই ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রিয় হন। বন্ধুবর্গ তাঁর নিকট বিনীত থাকেন কিন্তু তিনি আলস্যবশত ধর্মকার্যে উপেক্ষা করে থাকেন।

শরৎচন্দ্রের সৌভাগ্য :

ভাগ্যপতি অথবা ভাগ্যস্থানে শুভগ্রহ থাকলে বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কিম্বা ভাগ্যপতি ভাগ্যস্থ বা ভাগ্যস্থান নিরীক্ষণ করলে জাতক ভাগ্যবান, পুণ্যকীর্তি ও ধনবান হন। শরৎচন্দ্রের রাশিচক্রে ভাগ্যস্থানে (নবমে) শুভগ্রহের রাজা দেবগুরু বৃহস্পতি বর্তমান—অর্থাৎ বৃহস্পতি ভাগ্যস্থ-ভাগ্যরাশি বৃশ্চিক—বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল—অর্থাৎ ভাগ্যপতি মঙ্গল—এই মঙ্গল রাশিচক্রে নিজের ঘর থেকে চতুর্থে—বৃহস্পতির ওপর পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন—ফলে শরৎচন্দ্র অতিশয় ভাগ্যবান। প্রমাণ :

ভাগ্যাধিপে শুভযুতে শুভগ্রহ নিরীক্ষিতে তদ্ভাবে শুভ সম্বন্ধে সৎকীর্তি ধনভাগ্যবান্।

শরৎচন্দ্রের যশ-ভাগ্য :

ষষ্ঠ ঘরের অধিপতি রবি রাশিচক্রে সপ্তমে অবস্থিত ; ফল :

ষষ্ঠেশে সপ্তমে লাভে যশস্বী ধনবান ভবেৎ।

রাশিচক্রে শুক্র ও চন্দ্রের পূর্ণদৃষ্টি একাদশ স্থান বা লাভ স্থানে বর্তমান—ফলে শরৎচন্দ্রের আয় হয়েছে 'স্ত্রীজন-কাব্য-নাটক-কলাসঙ্গীত বিদ্যাদিভিঃ' প্রভৃতি থেকে।

লাভস্থানে চন্দ্রের দৃষ্টিফল :

বহুতর সুখভাগী লাভসংস্থে শশাঙ্কে, প্রচুর সুখসমেতো দার ভৃত্যাদিযুক্ত।

লাভ-স্থানে শুক্রের দৃষ্টিফল :

ভৃগুর্লোভগো লাভদো যস্য [illegible]
সুরূপং মহীপঞ্চ কুর্যাচ্চ সম্যক্।
লস্যকীর্তি-সত্যানুরাগং গুণাঢ্যং
মহাভোগমৈশ্বর্যযুক্তং সুশীলম্।
সদা গীত নৃত্যং ধনং তস্য গেহে
সুকর্মা সুধর্মাগমে তস্য বিত্তম।
দৃঢ়ং বিদ্যয়া ঈশ্বরস্তস্য বিত্তং
যদা ভর্গবো লাভভাবং প্রয়াতঃ।

অর্থাৎ বলবান শুক্র লাভস্থানে থাকলে জাতক গুণবান, রূপবান, কীর্তিশালী, সত্যানুরাগী, সজ্জন, সদ্ভোগী ও বহু বিদ্যা দ্বারা শ্রেষ্ঠ হন। নৃত্য, গীত, উৎসব তাঁর গৃহে প্রায়ই হয় এবং তাঁর উপার্জন ন্যায়পথে হয়ে থাকে।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপ্রণেতৃ যোগ :

শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে যে বুধ বিদ্যা, রচনা, শিল্প প্রভৃতির কারক। রাশিচক্রে চতুর্থ স্থানের (বিদ্যা ও বন্ধুস্থান) অধিপতি (এই ক্ষেত্রে মিথুন রাশি) বুধ কন্যা রাশিতে, স্বক্ষেত্রী, তুঙ্গী ও

কেন্দ্রী। অর্থাৎ বুধ অত্যন্ত বলবান—ফলে জাতক প্রসিদ্ধ লেখক হয়েছেন। আবার এই বুধের সঙ্গে রবি থাকায় (বুধের ক্ষেত্রে—কন্যা রাশিতে) জাতকের বুধাদিত্য যোগ প্রবল অর্থাৎ বুধ অত্যন্ত শুভ।

লগ্নাধিপতি (মীনের অধিপতি) বৃহস্পতি রাশিচক্র লগ্ন ও পঞ্চমস্থ এবং স্বক্ষেত্রস্থ চন্দ্রকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ায় বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণেতৃ যোগ প্রবলভাবে বর্তমান। প্রমাণ :

চন্দ্রেজ্যৌ কারকাংশে চ লগ্নে বা নব পঞ্চমে, গ্রন্থকর্তা ভবেন্নুনং সর্ববিদ্যা বিশারদ।

এ ছাড়া চন্দ্রের সহিত শুক্রের যোগ থাকায় শরৎচন্দ্র প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। প্রমাণ :

শুক্রেন কাব্যকর্তা চ প্রাকৃতগ্রন্থ তৎপরঃ।

শরৎচন্দ্রের সম্মান যোগ :

শরৎচন্দ্রের জন্মকালীন লগ্নাধিপতি ও কর্মাধিপতি (দশম স্থানের অধিপতি—ধনু রাশি) বৃহস্পতির প্রতি সর্বগ্রহের গণিতা-গত দৃষ্টি হেতু—বিশিষ্ট সম্ভ্রম যোগ সূচিত হয়েছে। প্রমাণ :

সর্বগ্রহৈঃ সুর গুরু যদি দৃষ্টি মূর্তি
ভূর্গ্বতি গর্গ কথিতো নৃপযোগ এবঃ।

রাশিচক্রে লাভ স্থান (একাদশ) শনির ক্ষেত্র হওয়ায় ও লাভাধিপতি শনি রাহু সহ দুঃস্থানে অর্থাৎ দ্বাদশে থাকায় ৩৬ বৎসর পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের ভাগ্য খারাপই গিয়েছিল। তারপর দ্বাদশস্থ বা ব্যয়স্থ শনির পূর্ণদৃষ্টি ধনস্থানে (মঙ্গলের ক্ষেত্র—শত্রু ঘরে) অর্থাৎ মেষ রাশিতে ও ভাগ্যস্থ বৃহস্পতির ওপর (বৃশ্চিক রাশিতে—মঙ্গলের ক্ষেত্র—শনির শত্রু ঘরে) থাকার অশুভ প্রভাবে ৩৬ বৎসরের পূর্বে শরৎচন্দ্রের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। অশুভ রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি চতুর্থ ঘরে (বিদ্যাস্থানে) থাকায় শরৎচন্দ্রের উচ্চ শিক্ষার বাধা পড়েছিল। এই রাহুর লগ্নে দৃষ্টি থাকায় শরৎচন্দ্র শারীরিক বলিষ্ঠ ছিলেন না।

মোট কথা শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনে বিদেশে চাকরি, অর্থাভাব, কর্ম বৈকল্য, দুঃখ, কষ্ট, শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী অশুভ শনি ও রাহু।

শরৎচন্দ্রের মধ্যায়ুর্যোগ :

পরাশর মতে আয়ুর্যোগ তিন প্রকার ; অল্প, মধ্য ও দীর্ঘ। ৩২ বা ৩৬ পর্যন্ত অল্পায়ু, ৬৪ বা ৭২ পর্যন্ত মধ্যায়ু, তদূর্ধ্বে দীর্ঘায়ু।

কেন্দ্র-কোণে শুভগ্রহ, শনি স্বক্ষেত্রে (কুম্ভে) এবং ষষ্ঠে পাপগ্রহ (মঙ্গল ও কেতু) ও নিধন স্থানে অর্থাৎ অষ্টম পাপগ্রহ রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি হেতু শরৎচন্দ্রের মধ্যায়ুর্যোগ। প্রমাণ :

শুভে কেন্দ্রত্রিকোণস্থে শনৌ বলসমন্বিতে
ষষ্ঠেবাপ্যষ্টমে পাপে মধ্যমায়ুরুদাহৃতম্।

শরৎচন্দ্রের তীর্থ মৃত্যু যোগ :

বুধাদিত্য যোগ থাকায় ফল :

বুধাদিত্য সমাযোগো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি, চিরকালং সুখং ভুক্তা ম্রিয়তে জাহ্নবী জলে।

দুই একস্থানে অবিকল শ্লোক অনুযায়ী ফল না মিলতে পারে ... যেমন এক জায়গায় আছে পঞ্চমস্থ শুক্রের ফলে 'সদা গীত নৃত্যং ধনং তস্য গেহে'... এর অর্থ সাধারণভাবে না ধরে এখানে মনে করতে হবে জাতকের গৃহ বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সমাগমে ও গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে।

প্রভাংশু গুপ্ত

Deliverance গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকা

দিলীপকুমার রায় *ডেলিভারেন্স* নাম দিয়ে শরৎচন্দ্রের *নিষ্কৃতি* বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ করেন।

দিলীপবাবুর গুরু শ্রীঅরবিন্দ এই ইংরাজি অনুবাদটি দেখে দিয়েছিলেন এবং দিলীপবাবুর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই ইংরাজি গ্রন্থের একটি মুখবন্ধও লিখে দিয়েছিলেন।

দিলীপবাবু যখন রবীন্দ্রনাথকে ওই মুখবন্ধটি লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন শরৎচন্দ্র সন্দেহ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হয়তো লিখে দেবেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সে সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণিত করে রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুর *ডেলিভারেন্স* গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই লেখার শেষাংশটা এই ·

> .The latest of the leaders who through this path of liberation, has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Saratchandra Chatterjee He has imparted a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the too familiar region of Bengal's heart revealing the living significance of the obscure trifles in people's personality He has achieved the best reward of novelist he has completely won the hearts of Bengali readers

নরেশ সেনগুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা ও তৎকালীন একটি সাহিত্যিক-দ্বন্দ্ব

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বড়োদিনের ছুটিতে প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিল্লি শহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অমল হোম 'অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন :

> ... গল্পের পর গল্প পড়িয়া যাই—মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। একি কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া-কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল।
>
> ইহাই কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য?
>
> পশ্চিমের বাস্তব সাহিত্যে যৌন সম্বন্ধের যে রূপ চিত্রণ অতি ঔৎসুক্যে আমাদের কথা-সাহিত্যে আমরা অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহা কি শুধু আমরা সৃষ্টির আনন্দেই করিতেছি? তাহাব অন্তরালে কি ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই এবং তাহার কলুষ কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে না? তাহা যদি না হইবে তবে হঠাৎ 'রজনী' যখন তখন 'উতলা' হইয়া উঠিবে কেন, অথবা দেহের জন্য দেহ এমন করিয়া আকুল হইয়া ছুটিবে কেন?
>
> আজ না হয় পশ্চিম সমুদ্রের উদগীর্ণ ফেন রাশিকে 'প্রাণরসের ফোয়ারা' বলিয়া আমরা আনন্দে অভিনন্দিত করিতেছি ; কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন সত্যই চারিদিক হইতে স্বচ্ছ, অনাবিল জলস্রোত আসিয়া আমাদের আবদ্ধ পঙ্কিল অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্য ধারার খাতে নূতন ধারা বহাইয়া তাহাকে রসে অভিষিক্ত, সৌন্দর্যে রূপায়িত ও শক্তিতে সঞ্জীবিত করিবে। আমাদের বর্তমান 'তরুণ' সাহিত্যিকরা নন—ভবিষ্যতে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়া যাঁহারা আসিতেছেন, যাঁহারা শুদ্ধশুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিক পত্রিকার সহজ সম্মানে লুব্ধ হইবেন না, যাঁহাদের সাহিত্য-দৃষ্টিতে শুধু রক্ত মাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ দেখা যাইবে না, যাঁহারা মানুষের জীবনকে আর্টের পূজা-বেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিবেন—আমরা তাঁহাদের আগমন-আশায় অপেক্ষা করিতেছি। বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তাঁহাদের আমরা পূর্বাহ্নে *অভিনন্দিত করি, তাঁহারা আসিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যকে ক্লেদ পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করুন,* তাঁহাদের স্পর্শে সমস্ত প্রগল্‌ভ কল্লোল নীরব হউক, ঝরণার পঙ্কিল আবর্তন স্তব্ধ হউক, কালিকলমের কলঙ্ক-কালিমা শুভ্রশুচি শুচিতায় স্নিগ্ধ হউক।

এই প্রবন্ধে অমল বাবু সেই সময়কার 'তরুণ' সাহিত্যিকদের নাম বা তাঁদের রচনা যে

সব পত্রিকায় প্রকাশিত হত, সে সব পত্রিকার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিতে তা বলেছেন। যেমন—'রজনী হ'ল উতলা' গল্পের লেখক বুদ্ধদেব বসু এবং 'কল্লোল' 'ঝরণা' ও 'কালিকলম' পত্রিকার কথা ইঙ্গিতে বলেছেন।

অমলবাবুর এই 'অতি আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' প্রবন্ধটি ১৩৩৩ সালের মাঘ সংখ্যা *ভারতবর্ষে* প্রকাশিত হয়েছিল।

এই মাঘ মাসেই শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও মোহিতলাল মজুমদার একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যে নোংরামি দেখা দিয়েছিল, সে কথা তাঁকে জানানো এবং সে সম্বন্ধে তাঁব মতামত জানা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সজনীবাবু লিখেছেন :

> গত ২০শে মাঘ তারিখে আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলা সাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতি বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালিকলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন ও কাজি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন—তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এই বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন—শিক্ষা-দীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে চায় না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মত পণ্ডিতজন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে।
>
> অন্যান্য আরও অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছা-ক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে আসার মাসখানেক পরে ২৩শে ফাল্গুন (১৩৩৩) তারিখে সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যে এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকেও অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে সজনীবাবু তাঁর *আত্ম-স্মৃতি* ১ম খণ্ডে লিখেছেন :

> তখনকার বাংলা সাহিত্যে আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল, আমি সে সকলের উল্লেখ কবিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই আগেকার সাহিত্য সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম—

পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে, তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কথা নাই। ... কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে।

সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

শ্রীচরণেষু,

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে ! এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। ...

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, কল্লোলে, প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালিকলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আপনি এ সব লেখার দু একটা পড়ে থাকবেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট করে আসছেন, তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যজস্তুতি না সত্যকার প্রশংসা বুঝতে পারি না। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা বলে মনে করি। বাংলা সাহিত্য যথার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরনের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্য আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা দরকার।...

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী করতে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে থাকি, তাহলে এই ভেবে ক্ষমা করবেন যে, আমি একা নই—আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি-বাইশজন সাহিত্যিকের মনোভাব ব্যক্ত করেছি।

প্রণত

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সজনীবাবুর এই চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ উত্তরে সজনীবাবুকে লিখেছিলেন :

কল্যাণীয়েষু,
কঠিন আঘাতে একটা আঙ্গুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।
আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল ক'রো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্র দৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যাব ধুলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে, তখন আমার যা বলবার বলব।

ইতি—২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩ শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ সজনীবাবুকে এই চিঠি দেওয়ার কয়েক মাস পরে, পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণে বেরুবার ঠিক আগে ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে বাংলার তৎকালীন নব্যসাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ করে 'সাহিত্য ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ওই আষাঢ় মাসেই মহা আড়ম্বরে *বিচিত্রা* মাসিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয়। *বিচিত্রা*-র প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। *বিচিত্রা*-র দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই *'সাহিত্য ধর্ম'* প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ তখন মালয়ে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণকালে জাভা থেকে বালি যাবার পথে প্লান সিউজ জাহাজে *'যাত্রীর ডায়েরি'* আকারে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসেব প্রবাসীতে *'সাহিত্যে নবত্ব'* নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি *'সাহিত্য ধর্ম'* প্রবন্ধের পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথের *'সাহিত্য ধর্ম'* ও *'সাহিত্যে নবত্ব'* এই দুটি প্রবন্ধই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলি*-র ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে বাংলার তৎকালীন কোন সাহিত্যিকেরই নাম করেন নি। কিন্তু তা হলেও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের লেখার সুর থেকে বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া নরেশবাবু জানতেন, শনিবারের চিঠির দল তাঁকেই নব্যসাহিত্যিক দলের অগ্রণী বলে থাকেন এবং তিনি সাহিত্যিক পরম্পরায় এও শুনেছিলেন যে, সজনীবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে দরবার করেছিলেন। তারই ফলে নাকি রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধ। তাই নরেশবাবু তরুণ সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখে বিচিত্রায় পাঠিয়ে দিলেন। বিচিত্রার ভাদ্র সংখ্যায় নরেশবাবুর ওই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল।

এদিকে সজনীবাবু শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ দেখে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আবেদন সার্থক হয়েছে। এই ভেবে তিনি তাঁর ভাদ্র মাসের শনিবারের

চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আবেদন করা পত্রটি এবং সেই পত্রের উত্তরে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, দুইই এক সঙ্গে প্রকাশ করলেন। আর ওই সঙ্গে সজনীবাবু ২০ মাঘ তারিখে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর ও মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে আলোচনা হয়েছিল তাও প্রকাশ করলেন।

বিচিত্রা-য় নরেশবাবু যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন, ভাদ্র মাসের *বঙ্গবাণী*-তে তেমনি গিরিজাশংকর রায় চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ লিখেছিলেন।

বঙ্গবাণী-র অন্যতম পরিচালক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন। উমাপ্রসাদবাবু ওই সময় শরৎচন্দ্রকে লেখা এক পত্রে *বঙ্গবাণী*-তে প্রকাশিত গিরিজাবাবুর ওই প্রবন্ধের উল্লেখ করেছিলেন এবং 'সাহিত্য ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর কী মত তা নিয়ে *বঙ্গবাণী*-তে কিছু লিখতে বলেছিলেন।

উমাপ্রসাদবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র তখন উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন :

> একথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ এই 'শনিবারের চিঠি'র পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেছেন, আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে। কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটি অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ করো।

গিরিজাবাবু *বঙ্গবাণী*-র লেখক ছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে *বঙ্গবাণী* অফিসে যেতেন। ভাদ্র সংখ্যা *বঙ্গবাণী*-তে তাঁর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ বেরুবার পর তিনি প্রায় রোজই *বঙ্গবাণী* অফিসে যেতেন। গিয়ে খোঁজ নিতেন কেউ তাঁর লেখার প্রতিবাদ করল কি না। এই সময় একদিন *বঙ্গবাণী* অফিসে গিয়ে গিরিজাবাবু উমাপ্রসাদবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের ওই চিঠির কথা শোনেন, এবং এও শোনেন যে, *শনিবারের চিঠি*-তে শরৎচন্দ্রের অভিমত বলে সজনীবাবু যা লিখেছেন, তা সব ঠিক নয়। শরৎচন্দ্র শীঘ্রই সজনীবাবুর ওই লেখার এবং রবীন্দ্রনাথের *'সাহিত্য ধর্ম'* প্রবন্ধেরও একটি প্রতিবাদ লিখে *বঙ্গবাণী*-তে পাঠাবেন।

গিরিজাবাবু এই সংবাদ পেয়ে তখনই নরেশবাবুর কাছে যান। এবং গিয়ে বলেন যে শরৎচন্দ্রকেও তাঁদের দলে পাওয়া যাবে। সজনীবাবু শরৎচন্দ্রের অভিমত বলে যা লিখেছেন, তা ঠিক নয়।

নরেশবাবু এই সংবাদ শুনে একটু ভরসা পান এবং *শনিবারের চিঠি*-র আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি এক চিঠি লিখে শরৎচন্দ্রের আশ্রয় চান।

নরেশবাবুর চিঠি পেয়ে তখন শরৎচন্দ্র নরেশবাবুকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনাকে আশ্রয় দিব কি রকম? আমার শক্তি কতটুকু।...'

এদিকে শরৎচন্দ্র নিজের অভিমত লিখে পাঠিয়ে দেবেন বলে উমাপ্রসাদবাবুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি অনুযায়ী তিনি 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেন। শরৎচন্দ্রের ওই প্রবন্ধ *বঙ্গবাণী*র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভাদ্র মাসের বিচিত্রায় নরেশবাবুর প্রবন্ধ 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' প্রকাশিত হলে, তা দেখে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী নরেশবাবুর প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ লেখেন। দ্বিজেনবাবুর এই প্রতিবাদ

প্রবন্ধটি বিচিত্রার পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । বিচিত্রায় সাড়ে উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিজেনবাবুর ওই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার।'

দ্বিজেনবাবুর এই 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার' পড়ে নরেশবাবু এর আবার একটা উত্তর দেন। সেটা 'কৈফিয়ৎ' নামে বিচিত্রার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিচিত্রার অগ্রহায়ণ সংখ্যা বেরোবার কয়েকদিন আগে দ্বিজেনবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পেয়ে নরেশবাবু বিচিত্রার ওই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শেষ দিকে ছাপাবার জন্য একটা নিবেদন লিখে দিয়েছিলেন। 'নিবেদন'টি এই :

> আমার প্রবন্ধটি ছাপা হইবার পর গত ২৭শে কার্তিক তারিখে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশিত হইল তাঁহার দেহান্তরের পরে। অনেক কথাই আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি, যাহা এখন লিখিলে বলিতাম না। আশা করি তাঁহার পরিতপ্ত পরিজন ও বন্ধুবর্গ মৃতের প্রতি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অমর্যাদা মার্জনা করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি নিয়ে *বিচিত্রা* ও *বঙ্গবাণী*-তে যেমন আলোচনা চলেছিল, তেমনি ওই সময় *প্রবাসী*-তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজদুর্লভ হাজরা এবং *আত্মশক্তি*-তে মুসাফিরও এই নিয়ে আলোচনায় নেমেছিলেন। মুসাফির *আত্মশক্তি*-তে তাঁর 'সাহিত্যের মামলা' নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রেরও কথা বললে, তখন শরৎচন্দ্র এই নিয়ে *আত্মশক্তি*-তে একটা লেখা দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ওই লেখায় প্রবাসীর লেখক ব্রজদুর্লভ হাজরার লেখারও প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্রজদুর্লভবাবু *আত্মশক্তি*-তে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে তার একটা প্রতিবাদ করেন। আবার শরৎচন্দ্রও সংক্ষেপে এর একটা উত্তর দেন। এগুলি সবই তখনকার *আত্মশক্তি*-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ নিয়ে সাহিত্যিক মহলে এইভাবে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ায়, সেই সময় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র তারিখে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে দুদিন এই সভা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দুদিনই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি 'সাহিত্য রূপ' নামে একটি লেখা এবং দ্বিতীয় দিন 'সাহিত্য সমালোচনা' নামে আর একটি লেখা পড়েছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকজনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছিলেন। তাঁর ওই লেখা দুটি (শেষেরটিতে কয়েক জনের প্রশ্নের উত্তরসহ) তাঁর *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ওই আলোচনা সভায় প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে অমল হোম, সজনীকান্ত দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এঁরাও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এঁরা কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিনের সভায় তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেছিলেন :

> আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে, এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনা করব ; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক

সময় আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই ; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়। তখন কোনো প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে জিনিষটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দু পক্ষেরই দরদের জিনিষ, সেটা বাংলা সাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে ; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।'

আর দ্বিতীয় দিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের প্রথম দিকে বলেছিলেন :

ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নেই। এমন কথা নয় যে আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর এক পক্ষে আছে। এ রকমভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব।--- এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল, যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম বিগর্হিত মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধেই তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। অথচ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে ওলট-পালট লিখেছেন। অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন

সব চেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস। *শনিবারের চিঠি-*র হয়তো ধারণা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ নন—তাঁরই প্রশংসার আশ্রয়ে তাঁরা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রা ভবনে যে বিচার সভা বসে তা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের গতি ও রীতি নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, তার মীমাংসা নিয়েই সে সভা। মীমাংসা আর কি রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাই শোনা !... অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি 'সাহিত্য ধর্ম' নামে ছাপা হল প্রবাসীতে। রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্য ধর্ম নিয়েও তর্ক ওঠে। শরৎচন্দ্র লেখেন 'বঙ্গবাণী'তে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন। শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র তো প্রকাশ্যভাবেই আধুনিকতার স্বপক্ষে। শনিবারের চিঠি মনে করল, রবীন্দ্রনাথ যেন প্রচ্ছন্নরূপে আশীর্বাদময়।

যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধ পড়ে শরৎচন্দ্র তখন তৎকালীন নব্য-সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে দু একটা কাগজে যা লিখেছিলেন, এক বৎসর পরে কিন্তু তাঁর সে মত বদলে যায়।

তাই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রের ৫৪ তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন জানালে অভিনন্দনের উত্তর দান কালে প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন :

অনেক দিন পূর্বে, বোধ হয় আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ করে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কিনা? তারপর থেকে দু'একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই,

তখন নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরোচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।

এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় ২০।২৫ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন—'দুঃখের ব্যাপার এই, আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়ত মনে করে, এসব জিনিস আমরা খুব ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়, তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে, তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেই জন্য সব সহ্য করে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন।'

আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন তাঁর কথা আমার না বললেও হ'ত। মনে হয়েছিল সত্য ছিল না, কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে। (*মাসিক বসুমতী* ফাল্গুন, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে আগস্ট তারিখের ইংরাজি দৈনিক *ফরওয়ার্ড*-এ বড়ো বড়ো হেডিং দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মালয় ভ্রমণকালের একটি অপ্রিয় সংবাদ, প্রায় পৃষ্ঠাব্যাপী আকারে প্রকাশিত হয়। সেদিন ওই হেডিং ও হেডিং-এর ঠিক নীচেই প্রকাশিত সমস্ত সংবাদটির যে সারাংশটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল এই :

The poet in trouble
Fierce attack by Malayan press
for views on China
Denies statement
Opinions expressed for Sake of humanity
& not for political end

Never was poet Rabindranath landed in such a difficulty for his views, after the 'Mussolini muddle', as he has been during his tour in Malay The whole jingo press of Malay was down on him for the views he expressed about the British expidition in China, particularly sending of Indian troops, to a representative of 'Forward' in February last year and which were reproduced in the 'Chicago unity' and thereafter in the 'Shanghai Times'
Bitter were the articles which appeared in the Malayan Press, and it was suggested that "a man who expressed the shameful invectives should not receive one atom of further support in this or any other British Country " And further, "And this is the philosopher, the poet, the guest of England, the honoured guest of His Majesty's representative in Malay who preaches here the fellowship of man and taken from us 'immoral' British earned money, for the support of an institution which must be permeated with his influence and his ideas "
The poet at first refused to enter into this controversy, but fiercer articles appeared in the press, and he was obliged to send a disclaimer in these words :
'Rabindranath Tagore repudiates the statement alleged to have been uttred by him that Asia prepares her weapons in her armouries for a target which is bound to be the heart of Europe,' etc. The protest which is uttered while in India against the sending of India troops to China has

been totally misinterpreted by the mischievous propaganda against his mission.

The press was not satisfied with this and ultimately the poet was obliged to explain himself and say ; "In India I have my relations with the government officials inspite of my difference of opinions. Lord Lytton himself came to see me and I am often invited to government house and have had succesive governors as my guests They know my opinions I am not a politician. Whatever opinions I may express about deeds done are said for sake of humanity and not because I belong to any political party

এখানে এই উদ্ধৃত সারাংশটির মধ্যে 'February last year' কথাটি মনে হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হবে না। এটা হবে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি। এখানে ভুলক্রমে 'Last year' লেখা হয়েছে। কেননা, মূল যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এক জায়গায় দেখছি :

This in fact is the substance of the interview which the poet gave to a Forward representative after return from his last Europian tour in February 1925 and the 'Shanghai times' reproduced it verbatim from the Chiago Unity.

যাই হোক, ওই ২৮শে আগস্ট তারিখের *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি পড়ে সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তখন এ সম্পর্কে একটি চিঠি লিখে *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি ১লা সেপ্টেম্বরের *ফরওয়ার্ড*-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নরেশবাবুর সেই চিঠিটি এই :

To the editor 'Forward'

Sir,

Every admirer of Dr Rabindranath Tagore, among whom I have the honour to count myself, will feel a sense of deep humiliation at the attitude taken up by him in response to the wild and insulting campain started against him by the Malayan press.

I do not doubt for one moment the truths and sincerity of his statement. But the question is whethr he consulted his self-respect, with which was intimately associated the honour of his countrymen whom he represents in that country for the time being in making it at the time and the place.

I could have understood the statement if the Malayan press had been

asking him in all sincerity to explain the reports that they had against him But the extracts from the papers show that the attitude of the press there was different. They did not question him as to his deeds and words—they took them for granted, and in terms which were neither polite nor dignified, they were abusing him and crying for his expulsion from the hospitality of the settlement The only dignified course in answer to all this for the poet was to remove forthwith from the Government House to the humblest Chinese dwelling if need were, and from there to spurn their hospitality and their abuse alike The time for explanation was not then and there With all his honesty and sincerity of purpose I shall be surprised if the poet escapes, after this, the taunt that he was making scholastic differences between Tweedledum and Tweedledee, to save his skin and to retain for himself the comfort and the honour of the government hospitality

As reguards the statement itself, it is after all an essay in distinctions with which lawyers are very familiar where the difference is slender to the verge of non-existence And after all, was there any reason, any occation or justification for his being apologetic for his attitude towards the Chinese problem, or to disavow all political pretensions and seek shelter behind the vacuous shadow of 'humanity'?

I am afried that his countrymen will not forgive him this gignatic lapse in the same manner as they have forgiven his landation of Mussolini in Italy And the country will be right

Yours etc

Naresh Ch. Sengupta

A Reply to Dr. Sengupta

To

The Editor, 'FORWARD'

Sir,

So Dr. Naresh Chandra Sengupta is on the warpath. From law which has the reputation of being a jealous mistress, to erotic novels was not perhaps a very big jump; in any case there was the reward of indiscriminate admiration from thoughtles youngsters delighting in the musk of sex-literature. But to suddenly discover himself as an 'admirer' of Rabindranath Tagore and then to rush to the press with a 'wild and insulting' letter against the poet is a surpassing extraordinary adroitness displayed by Dr. Sengupta in diving deep into the Psycho-analytical absurdities of Freud and jiing.

Nareshbabu is fiercely indignant over the repudiation of the false statement alleged to have been made by the poet that 'Asia prepares her weapons in her armouries for a target which is bound to be the heart of Europe.' A statement so palpably absurd, so opposed to all the ideals of international peace and good will that the poet stands for so mischievous, particularly when emanating from the quarters it was alleged to have done—certainly called for a repudiation from Rabindranath to whom it was ascribed. The poet would have been false to himself, false to all that he has preached since his memorable utterance on 'Nationalism' in Japan, if he had not repudiated the statement with as much emphasis as he had condemned the sending of Indian troops to China.

Babu Naresh Chandra Sengupta does not 'doubt for one moment the truths (Sic) and sincerity of the poet's statement.' But nevertheless he taunts him with 'making scholastic differences between Tweedledum and Tweedledee to save his skin and retain for himself the comfort and honour of government hospitality.' An admirer of the poet indeed! The meanness of attributing such motives to the poet would have been really astounding had I no known the psychology behind it. I need not do more than refer to the snubbing that Babu Naresh Chandra Sengupta's demagogic declamations received at the hand of the poet on the International Co-operators' Day recently celebrated at Albert Hall and to the reply Nareshbabu has essayed in the current issue of the new Bengali monthly 'Vichitra' to Rabindranath's discussions of 'Sahitya Dharma' or the principle of Literature—in the same review, where the poet incidentally but none-the-less strongly condemns the tendency in certain Bengali Novels to overstep the bounds of decency in certain Bengali Novels to overstep the bounds of decency and every reader of modern Bengali fiction will have no difficulty in recognising the cap which has unfortunately filled Nareshbaba's head to a T. Nareshbabu is angry and no wonder!

But who told Nareshbabu that Rabindranath was enjoying 'Government hospitality' when he repudiated the statement alleged to have been made by him? It was at Singapore that Rabindranath was the guest of the governor, Sir Hugh Clifford and the disclaimer to the press was sent while he was at Kuala Lampur where he was staying at a private residence. That Rabindranath Tagore, who never had a moment's hesitation in flinging his knighthood back to the face of an irate bureaucracy persuing an insane career of brutal terrorism, made the protest in Malaya 'to save

the skin' is a statement I treat with the content it deserves and as for 'the comfort and the honour' of government hospitality in British Malaya, need I say at all that they can not have any attraction for one whom the crowned heads of Europe have delighted to honour by extending their princely hospitality? I need not go for to seek the mentality of Nareshbabu falling faul of the poet; it is the same that prompts a species of feathered bipeds to faul its own nest

I am afraid, I can not follow Nareshbabu in his presumption to speak in the name of his countrymen I do not pretend to know if they will or not 'forgive' the poet for his repudiation of a maliciously false statement put into the month by a set of uncrupulous British Journalist too anxious to get hold of any sensation likely to give a fillip to the circulation to their news-sheets. But I may perhaps be allowed to speak in the name of the admirers of the poet among whom I have the honour to count myself that they will never forgive Dr Naresh Chandra Sengupta the insult he has chosen to gratutously to offer to the beloved poet And they will be right

Yours etc

Amal Home

ইতিপূর্বে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের প্রথমেই শ্রাবণ সংখ্যা বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ কারও নাম উল্লেখ না করেই তৎকালীন কয়েক জন নব্য-সাহিত্যিকের আদিরসাত্মক লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

শ্রাবণ সংখ্যা *বিচিত্রা* রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, ভাদ্র সংখ্যা *শনিবারের চিঠি* তে সজনীকান্ত দাস দুটি চিঠি প্রকাশ করেন। একটি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা সজনীবাবুর চিঠি, অপরটি সজনীবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর। সজনীবাবু তাঁর চিঠিতে তৎকালীন নব্য সাহিত্যিকদের বিশেষ করে নরেশ সেনগুপ্তর আদি রসাত্মক লেখার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুবোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যে বে-আব্রুতার কথা সম্পর্কে সজনীবাবুকে লিখেছিলেন, 'পরে এ সম্বন্ধে আমার যা বলবার তা বলব।'

এই ভাদ্র সংখ্যা *শনিবারের চিঠি* প্রকাশিত হয়েছিল, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। এই সংখ্যা *শনিবারের চিঠি* পড়ে নরেশবাবুর পক্ষে এটা বোঝা খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন, হয়তো বা 'অগ্রণী'ই। তাই মনে হয় তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের উপর ক্ষোভের বশেই মালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় ওই চিঠিটি লিখেছিলেন।

এখন মালয়ের সংবাদপত্র সমূহ কেন রবীন্দ্রনাথকে তখন আক্রমণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার ভ্রমণসঙ্গী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কী বলেছেন দেখা যাক। সুনীতিবাবু তাঁর *রবীন্দ্র সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ* গ্রন্থে লিখেছেন :

বুধবার, ৩রা আগষ্ট ১৯২৭

২০শে জুলাই আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছেচি। এ পর্যন্ত এই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সকল জাতির লোকে উচ্ছ্বসিত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে সম্বর্ধনা করেছে, কোন জায়গায় একটুও বিরোধ-ভাবের আভাস বা প্রকাশ পায়নি। সাধারণ ইউরোপীয়েরা কিন্তু এ-দেশের ভারতবাসীদের অতি হীন চোখে দেখে থাকে, কুলির জাত বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতের লোক হয়ে এদেশে এসে রাজাধিরাজের চেয়েও বেশি সম্মান পাচ্ছেন, সকলেই ভক্তি আর ভালবাসার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করছে—এই ব্যাপারটি কিন্তু আমাদের সুপরিচিত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান মনোবৃত্তির অধিকারী অনেক শ্বেতচর্মের কাছে বড্ড একটা অস্বস্তির কথা হয়ে উঠেছিল। মালয় দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর ভ্রমণ যে একটি বিরাট triumphal progress হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এটা অনেকের ভাল লাগছিল না। এই অস্বস্তি আর বিদ্রূপ-ভাবকে প্রকাশ করলে সিঙ্গাপুরের 'মালায়া ট্রিবিউন' কাগজ। ... ২রা আগষ্টের 'মালায়া ট্রিবিউন'-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল—Dr. Tagore's politics রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ imperialism-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন, তিনি 'শাঙহাই টাইম্‌স্' সংবাদপত্রে ইংরেজদের চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ জাতের রাজনৈতিক কীর্তিকলাপকে কঠোর কশাঘাত করেছেন, ইংরেজদের বহু নিন্দাবাদ করেছেন, আরও ইঙ্গিত করে হুম্‌কি দেখিয়েছেন যে, এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এইরূপ বহু কথা বলে তাঁর কাছে, এই সংবাদপত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় যে, তিনি বৃটিশ শাসিত মালাই দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্বত্র সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারীর সহানুভূতি আর সহযোগিতা পাচ্ছেন, বাইরে সত্যিই সেই বৃটিশ জাতির নিন্দা তিনি করে বেড়াচ্ছেন কিনা। ঐ দিনের কাগজেই 'শাঙহাই টাইম্‌স্' এর প্রবন্ধ বলে খানিকটা লেখা তুলে দেওয়া হয়।

এখন রবীন্দ্রনাথ 'শাঙহাই টাইম্‌স্' এ কোনও পত্র লেখেন নি। হয়েছিল কি, ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ শাঙহাইয়ে চীনাদের উপরে ইংরেজ কর্তৃক আনীত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়ালার অত্যাচার দেখে বড়োই ব্যথিত হন, আর এই ব্যাপার নিয়ে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি 'শূদ্র ধর্ম' নামে ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে বা'র হয়। এই প্রবন্ধ ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজি প্রবন্ধ 'মডার্ণ রিভিউ' থেকে নানা কাগজে উদ্ধৃত হয়ে ঘুরে ফিরে শেষে 'শাঙহাই টাইম্‌স্' কাগজে ওঠে, আর তা থেকে 'মালায়া ট্রিবিউন' এই প্রবন্ধের বিকৃত অংশবিশেষ নিয়ে কবির বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করে।...

'মালায়া ট্রিবিউনে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা কবির কানে উঠতে, তাঁর নামে যে প্রবন্ধ চালানো হয়েছে, তাতে দুচারটে কথা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে, আর কবির নিজের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী করে ছাপানো দেখে, তিনি সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে, বিশেষ করে সেই অংশের প্রতিবাদ করে এক তার পাঠিয়ে দিতে বললেন। 'মালায়া ট্রিবিউন'কে গ্রাহ্যই করা হল না। কিন্তু তা বলে 'মালায়া ট্রিবিউন' ছাড়লে না, দিন তিনেক ধরে খুব আন্দোলন করলে। ইংরেজদের দু-একখানা কাগজও এই ঘোঁটে যোগ দিলে।...

এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, কবি মালয় দেশের ইংরেজ কর্মচারী বা বেনিয়া কাগজওয়ালাদের ভয়ে বা খাতিরে তাঁর 'মডার্ণ রিভিউ' তে প্রকাশিত প্রবন্ধ, যা নিয়ে কতকটা জল ঘোলাবার চেষ্টা হল, তার জন্য একটুও কিন্তু-কিন্তু হন নি। এ সম্বন্ধে তাঁর হয়ে আরিয়ম্

৭ই আগষ্ট তারিখে মালাই দেশের সমস্ত খবরের কাগজে যে চিঠি লেখেন সে চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বলে শেষ কথা বলেন—কোনও গভর্ণমেন্টের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যায়বুদ্ধির অনুমোদিত উক্তিকে প্রত্যাহার করতে পারেন না,—আর এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটাও চুকে যায়। কুয়ালা-লুম্পুরের 'মালায় মেল'-এর লোক এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর রাজনৈতিক মত যাই হোক্ না কেন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কী রকম? তখন তিনি বলেন যে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আর অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুভাব আছে, লর্ড লিটন স্বয়ং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তাঁকে লাটবাড়িতে আমন্ত্রণ করা হয়, বাঙলার লাটেরা তাঁরও আতিথ্য স্বীকার করেছেন।

ব্যাপারটা তো সহজেই মিটল মালাই দেশে, কিন্তু ভারতে তার ঢেউ এসে পৌঁছল।... ভারতের তথা রবীন্দ্রনাথের পরম হিতৈষীরা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে মালাই দেশের এই সব ভারতীয়দের বিরোধী ইংরেজদের খবরের কাগজের মন্তব্য পাঠিয়ে দেয়। তা থেকে জাতীয়তার উদ্বোধক এই দেশী কাগজগুলিতে মোটা হরফের শিরোলিখন দিয়ে এইরূপ ইঙ্গিত করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, মালয় দেশে গিয়ে সেখানকার ইংরেজদের খুসি রাখবার জন্য তিনি নিজের সেই উক্তির প্রত্যাহার করেছেন। ...অমনি বাঙলার আধুনিক সাহিত্যের একজন দিগ্‌গজ মোড়ল যিনি নিজের সম্বন্ধে নাকি ছাপায় উক্তি করেছেন যে, সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচই নেচেছেন, সম্প্রতি অবসর নিতে চাইছেন, তিনি কাগজে চিঠি লিখে তাঁর righteous indignation বা ন্যায্য ক্রোধ প্রকাশ করলেন যে লাটবাড়ির ভোজের আর আরামের লোভে বুড়ো বয়সে রবীন্দ্রনাথ সাহসের অভাব দেখিয়ে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে নিজের উক্তিগুলি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন।...

যিনি নিজের আর নিজের দেশের মর্যাদার কথা, আর জগতের শ্রেষ্ঠ জনগণের মধ্যে নিজের আসন কোথায়, তা বিলক্ষণ বোঝেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের গেঁয়ো ঘোঁট-মঙ্গলের পাণ্ডা নূতন পরকীয়া তত্ত্বের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে, শিষ্টজনোচিত ভদ্রভাষা প্রয়োগ করে বলেছেন—to save his skin and to retain for himself the comfort and the honour of the Government hospitality ইত্যাদি : আগষ্টের ৩রা তারিখে 'মালায়া ট্রিবিউন' কবির বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করলে, আর তার দিন ১৩।১৪ আগে কবি কেন এই আক্রমণ প্রতিবাদ করবার জন্য ২০শে-২২শে জুলাই যখন তিনি সিঙ্গাপুরে লাটের অতিথি ছিলেন, তখন লাটবাড়ি ত্যাগ করে humblest chinese dwelling এ গেলেন না—এটা কবির অমার্জনীয় অপরাধ, তাঁর কাপুরুষতা। জাবর psycho-analyst, সেইজন্য তারিখের আর ঘটনার ক্রমের সম্বন্ধে একটু 'ব্যাভ্রোম' হয়। সেই যে গল্পে আছে, মিঞা সাহেব স্বপ্ন দেখলেন, বিবির পর উঠেছে ; পর উঠেছে তো চিঁড়িয়া, আর চিঁড়িয়া তো এক্কেবারে মুরগী—অমনি নিদ্রিত অবস্থায় ছুরি দিয়ে বিস্‌মিল্লা বলেই গলায় আড়াই প্যাঁচ।

অপ্রিয় কথার আলোচনা যাক্। ব্যাপারটা নিয়ে দেশ উদ্ধারের Sole-agency প্রাপ্ত মোসাহেবি মার্কা স্বাধীনতার জন কতক অগ্রদূত (যারা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ ছিলেন, ফিরিঙ্গি পর্তুগীস, এই অপূর্ব তথ্য একাধিকবার প্রকাশ করে, নূতন গবেষণার পুলকে আত্মহারা হয়ে গড়াগড়ি দিয়াছিল) রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ইতর ঘোঁট তুলেছিল বলেই কথাটার অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথের সাথী হিসাবে যা ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে দেশবাসীর কাছে সংক্ষেপে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখলুম।

সুনীতিবাবু যে লিখেছেন, 'সাহিত্য রঙ্গমঞ্চের আসরে তিনি অনেক নাচই নেচেছেন', তার কাহিনিটা হচ্ছে এই :

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণে নরেশবাবু প্রসঙ্গত বলেছিলেন, 'বাঙলার সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে আমার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে কয়দিন এই রঙ্গালয়ে নাচিয়া গেলাম, তার স্মৃতিটুকুও ভবিষ্যতে থাকিবে কিনা জানি না।'

নরেশবাবুর এই অভিভাষণটি 'সাহিত্য সংগ্রাম' নামে ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *ভারতবর্ষ*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। সুনীতিবাবু নরেশবাবুর অভিভাষণের ওই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে এই কথা বলেছেন।

সুনীতিবাবুর ন্যায় সজনীকান্ত দাসও নরেশবাবুর এই কথাটিকে নিয়ে ওই সময় তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে নরেশবাবুকে নাচিয়ে একটা ছবিও ছেপেছিলেন। সেই ছবিটা ছিল এইরূপ :

নাচমঞ্চের মাথার উপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা 'বঙ্গ সাহিত্য'। মঞ্চের পর্দা উঠেছে, মঞ্চের উপর একপাশে একজন বাঁয়া তবলা, একজন বাঁশি, এবং আরও কয়েকজন অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। নাচের বেশে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু, তাঁর পায়ে ঘুমুর, পরণে নাচের পোশাক ও হাতে ওড়না।

সুনীতিবাবুর লেখায় দেখা যায়, তিনি নরেশবাবু ও *ফরওয়ার্ড* কাগজকে আক্রমণ করেছেন। সুনীতিবাবু নরেশবাবুকে যে আক্রমণ করেছেন, তার উত্তরে নরেশবাবুর পক্ষ থেকে শুধু এই যুক্তি হতে পারে যে, তিনি সংবাদপত্রে যা পড়েছিলেন, তারই ওপর মন্তব্য করে চিঠিটি লিখেছিলেন। এতে হয়তো তাঁর মনগড়া কোনো কথা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের এই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের কাহিনি তখন প্রতিদিন বা দু-একদিন ছাড়াও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত না। বেশ কয়েকদিন ছাড়াছাড়াই এ বিষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হত। ২৮ আগস্ট তারিখের আগে *ফরওয়ার্ড*-এ ৩, ১০ ও ১৪ আগস্ট এই কদিনই মাত্র রবীন্দ্রনাথের ওই ভ্রমণের সংবাদ ছাপা হয়েছিল। প্রথম দিনে সংবাদের হেডিং ছিল Rabindranath at Singapore . Hearty Reception to the Poet', ১৪ই তারিখে রবীন্দ্রনাথের ওই ভ্রমণ নিয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, যার হেডিং ছিল—India's greatest Poet and Sage.

ফরওয়ার্ড-এ প্রকাশিত ৩রা আগস্ট তারিখের সংবাদে ছিল, রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গাপুরে গভর্নরের অতিথি হয়েছেন। ১০ তারিখের প্রকাশিত সংবাদে ছিল, কবি ২৩ জুলাই পর্যন্ত সরকারি অতিথি ছিলেন এবং ২৫ জুলাই মালাক্কা রওনা হন। ১৪ ও ২৮ আগস্টের লেখা ও সংবাদের মধ্যে কোথাও ছিল না, রবীন্দ্রনাথ কার অতিথি হয়েছেন। অতএব নরেশবাবু ১ সেপ্টেম্বর যখন চিঠি লেখেন, তখন তাঁর পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে, রবীন্দ্রনাথ তখন কার অতিথি হয়ে আছেন।

কিন্তু তাহলেও বল্‌ব সব কিছু না জেনে *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় ওই চিঠি লেখা নরেশবাবুর মোটেই উচিত হয় নি।

আর সুনীতিবাবু *ফরওয়ার্ড* কাগজকে যে আক্রমণ করেছেন, তার উত্তরে এই বলা যেতে পারে যে, দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এবং সুভাষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই সংবাদপত্রটি তখন শুধু বাঙলা

দেশ কেন, সারা ভারতের সংবাদপত্র জগতেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সংবাদই শুধু প্রচার করেননি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক সংবাদও যে প্রকাশ করেছিলেন, সে তো ৩, ১০ ও ১৪ আগস্টের লেখা থেকেই দেখা যায়। সুনীতিবাবু তাঁর লেখায় তৎকালীন *ফরওয়ার্ড*-সম্পাদক এবং *ফরওয়ার্ড*-এর কোনো কোনো কল্পনাবিলাসী লেখককেই প্রধানত লক্ষ্য করে মনে হয় এই কথাগুলি বলেছিলেন।

২৮ আগস্ট তারিখের *ফরওয়ার্ড* কাগজে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদের সারাংশে এক জায়গায় 'Mussolini Muddle' কথার উল্লেখ আছে। এই 'Mussolini Muddle' কি এ সম্পর্কে অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করবেন। এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। সংক্ষেপে সেই ব্যাপারটি এই— রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি যান, এবং গিয়ে মুসোলিনীর প্রশংসা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কয়েকজনের কাছে মুসোলিনীর স্বরূপ জানতে পেরে পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের এক কাগজে মুসোলিনী সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তন করে আবার এক বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

এদিকে ১ সেপ্টেম্বরের *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত নরেশবাবুর চিঠির কথা রবীন্দ্রনাথের কানে গেলে তিনি নরেশবাবুর উপর রেগে গেলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত নরেশবাবুর উপর এই বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেন।

ওই সেপ্টেম্বরের কয়েক মাস পরে ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের *শনিবারের চিঠি*-তে সজনীকান্ত দাস আবার নরেশবাবু সম্বন্ধে লিখলেন :

> নরেশবাবুর 'শাস্তি' উপন্যাসখানি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নাই এবং ঐ পুস্তকের শেষে যে সার্টিফিকেট রবীন্দ্রনাথের বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ববীন্দ্রনাথ কোনও উপন্যাস বা গল্প সম্পর্কে লেখেন নাই। কোন ব্যক্তিগত (personal) চিঠিতে নরেশবাবুর কোনও একটি সমাজ সম্বন্ধীয় মন্তব্য সম্বন্ধে এই উক্তি রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন।

নরেশবাবু সজনীবাবুর এই লেখার কথা বন্ধুদের কাছে শুনে তখন ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তা এই :

> পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,
>
> আপনার কোনও অখ্যাত অনুচর সম্প্রতি আমাকে গালাগালি দিয়া খ্যাতিলাভের সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। সে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ নিবিড় পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ পরম্পরায় শ্রুত হইলাম। তার লেখা আমার পড়িবার অবসর হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম সে নাকি লিখিয়াছে যে, আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে নয়।
>
> লেখককে যে আপনি-এ কথা বলিয়াছেন এবং এ কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেন আপনি এ কথা বলিতে গিয়াছিলেন, আর এ কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই বা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেই হেতুটা বুঝিতে পারিলাম না। কথাটা সত্য কিনা বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তখন আমার কতকগুলি প্রবন্ধ, গুটি কয়েক গল্প এবং খান কয়েক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি

কয়েকখানা উপন্যাস আপনাকে উপহার দিয়াছিলাম। তারপর আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমার 'লেখা' আপনি কতক পড়িয়াছেন এবং পড়িয়া সাধুবাদ করিয়াছেন ইত্যাদি এবং আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পত্রে আপনি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই যে, আমার লেখা অর্থে আমার প্রবন্ধ বুঝিয়াছিলেন এবং গল্প সম্বন্ধে ও কথা প্রযোজ্য নয়।

তারপর 'কাঁটার ফুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাতে আপনার পত্রাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ঢাকার কোনও যুবক বন্ধু কলিকাতায় আসিয়া এ কার্যটি করাইয়াছিলেন, আমি ইহার কথা পূর্বে জানিতাম না। বইখানা হস্তগত হইবার পরই আমি সেজন্য আপনাকে বইখানা পাঠাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কেন না আমার মনে হইয়াছিল যে, আপনার নিকট প্রকাশের অনুমতি না লইয়া ঐ পত্র ছাপা অন্যায় হইয়াছে ; এবং যে ভাবে উহা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে উহা 'কাঁটার ফুল' বিষয়েই লেখা হইয়াছে, লোকে এরূপ মনে করিতে পারে, উহা হয়তো আপনার অনুমোদিত না হইতে পারে।

আমার সে পত্রের উত্তর পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সে উত্তরে আপনি কোনওরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই এবং প্রকাশ যে আপনার অননুমোদিত এমন কথাও জানান নাই। ও কথা যে আপনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন এবং উহা আমার উপন্যাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহার আভাসও আপনি সে পত্রে দেন নাই।

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে আপনার সে প্রশংসা প্রত্যাহার বা তার অর্থ সঙ্কোচন করিবার ইচ্ছা হওয়া কিছুই আশ্চর্য বা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু দুঃখ এই যে, আপনার সে অভিপ্রায় আমাকে না জানাইয়া আপনি আমার পরোক্ষে অন্য ব্যক্তিকে জানাইয়া তাহা প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা এভাবে প্রচারিত হইলে যে আমি জগতের কাছে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব, এ সহজ কথাটা আপনার মনে হয় নাই, ইহা মনে হয় না।

আপনার নিকট প্রশংসা বা সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় আমাকে জানাইতেন, তবে আমি স্বয়ং প্রকাশ্যে ভুল বুঝিবার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া সে পত্র প্রত্যাহার করিতাম। কেন না, যিনি আমাকে সমাদর করিয়া লজ্জিত, তাঁর সমাদর লইয়া বড়াই করিয়া বেড়াইব, এতটা দৈন্য আমার নাই।

তাছাড়া সময়ে জানিলে আর একটা উপকার হইত। গত অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় আমার যে লেখা বাহির হইয়াছে, বোধহয় 'পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছেন' যে, তাতে আমি প্রকাশ করিয়াছি যে, 'শাস্তি' প্রকাশিত হইবার পর আপনি আমাকে সাক্ষাতে সে বইয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়াই যে রকম কুণ্ঠিত দেখিতেছি, তাতে একথা প্রকাশ হওয়ায় নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন। আপনার মত পরিবর্তনের বিষয় আগে জানা থাকিলে কথাটা প্রকাশ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতাম না।

যাহা হউক, আমার প্রকাশককে জানাইয়া আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন হইতে আপনার পত্রখানি উঠাইয়া লইতে উপদেশ দিতেছি। যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আমার হাত নাই, সেজন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, যদিও কর্তব্যানুরোধে সম্প্রতি আমাকে আপনার অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে আমার গ্রন্থাবলীর বহুস্থানে আপনার সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি, এখনও তার কোনও অংশ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন বা প্রত্যাহার করিয়া দত্তাপহারকের প্রত্যবায় অর্জন করিবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার হয় নাই। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার ভক্তি ও

শ্রদ্ধা অচলা আছে এবং আশা করি চিরদিন থাকিবে।

আর একটা কথা বলি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির উপর যদি আপনার ক্রোধের কোনও কারণ হইয়া থাকে, তবে স্বয়ং আঘাত করিতে কি আপনি কুণ্ঠিত? আপনি যদি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন, তাতে নিন্দার কোনও কথা নাই ; আর আমিও যদি সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাতেও কেহ দোষ দিতে পারিবেন না। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণে অক্ষম সেই শিখণ্ডীর দল দাঁড় করাইয়া গোপনে অস্ত্রাঘাত কি শিষ্ট যুদ্ধরীতি?

এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কাগজে ঘাঁটাঘাঁটি হয়, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং তার চালে হয়ত আমি লোকের কাছে মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সেজন্য এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সে বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকে তবে জানাইলে বাধিত হইব।

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নরেশবাবুর এই চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তরে নরেশবাবুকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তা এই :

ওঁ

কলিকাতা

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া আমি আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি। সে সময়ে সমাজ-বিরুদ্ধ মত অসংকোচে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। গল্প রচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয়, তাহা ভাষা-নৈপুণ্য ও কল্পনা শক্তির—সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্প-সাহিত্যে মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারে না। যখন আপনার গল্পের বহির বিজ্ঞাপনে উক্ত পত্রাংশ দেখিতে পাই, তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং যে কেহ আমাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এইভাবেই উত্তর দিয়াছি। বিনা প্রশ্নে এ কথা লইয়া আলোচনা করিবার কথা সম্প্রতি বা পূর্বে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

আপনার সহিত মতের বা রুচির পার্থক্য লইয়া ক্ষোভ অনুভব করি নাই। 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে আমি আপনাকে লক্ষ্য করি নাই ; আপনার গল্প আপনি কি ভাষায় ও কিভাবে লেখেন, তাহা আমি জানিও না। সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থ আকারে যে গল্প বা কবিতা পড়িয়া আমি লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছি, আপনার লেখা তাহার অন্তর্গত নহে। সুদীর্ঘকাল আপনার লেখা পড়িবার অবকাশ হয় নাই।

যখন আমি বিদেশে ছিলাম, আপনি আমাকে মিথ্যাচারী প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের অপেক্ষা মাত্র করেন নাই। হয় আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন এরূপ মিথ্যাচার আমার পক্ষে অসম্ভব নহে, নয় বিশ্বাস না করিয়া লিখিয়াছেন। ইহা মত বা রুচির আচরণ নহে, চরিত্রগত, এই কারণেই ইহা ক্ষোভের বিষয়। ইতি—

১৩ অগ্রহায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উত্তরে নরেশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিখানি এই :

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রাংশ আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন স্বরূপ বাহির হইবার পর আপনি সে বিষয়ে আলোচনা বা মত প্রকাশ করিবার একাধিক অবসব পাইয়াছেন। আমার এক পত্রেই এ বিষয় আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং তদুত্তরে আপনি জানাইয়া ছিলেন যে, ইহাতে আপনার অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণই নাই। সে কথা বোধহয় আপনি বিস্মৃত হইযাছেন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আপনার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হইবে। আমি কেবল নিজেব মান বক্ষার জন্য যাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহাতে আমি আনন্দবোধ করি নাই।

এই প্রসঙ্গে আপনি যে আপনার মালয়ের কার্য সম্বন্ধে আমার পত্রের কথা উপস্থিত করিয়াছেন, তার প্রসক্তি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার সে পত্র বোধহয় আপনার দেখিবার অবসর হয় নাই। তার বিবরণ পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকিবেন। সে পত্রে আপনার উপর কোনও মিথ্যাচার আরোপ করা হয নাই, পক্ষান্তরে বলা হইয়াছিল যে, I do not doubt the truth of sincerity of his statement but the question is whether that was the time or place for making it. স্থান কাল হিসাবে আমি আপনার উক্তি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ইহার পর যদি কেহ আপনাকে বলে যে, গভর্ণরেব নিমন্ত্রণের খাতিরে একথা বলিয়াছিলেন তবে তাহা আশ্চর্যেব হইবে না—ইহা যে আমি মনে করিয়াছি, এমন আভাস মাত্র দেই নাই।

আপনার কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিয়াই কথাটা লিখিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু ঐ পর্যন্ত ঐ ব্যাপারের এমন কোনও পূর্ণতর বিবরণ দেখি নাই যাহাতে আমার ঐ মত পরিবর্তন হইতে পারে। যদি তেমন বিবরণ দেখিতাম, তবে আমি সর্বাগ্রে অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার উক্তি প্রত্যাহার করিতাম।

আপনি এ ব্যাপারে আমার মত বা রুচিগত প্রভেদ না দেখিয়া আমার চরিত্রেব ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা বোধহয়, সেই অসাধারণত্বের একটা নিদর্শন। কোনও কথা বিশ্বাস না করিয়া বলা বা কাহারও উপর অযথা দুরভিসন্ধি আরোপ করা যে আমার চরিত্র নয়, এ কথা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকিলে আপনি জানিতে পারিতেন। যার চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, তার একটা বিশিষ্ট অভিমতের অপব্যাখ্যা করিযা তার চরিত্রে দোযারোপও চরিত্রের একটা গুরুতর ত্রুটি প্রকাশ করে। মতভেদ সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত আত্মাভিমান এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে, তাহা আমাদের দেশে বিরল নয়। দুঃখ এই যে আপনার মত লোকের প্রতিভাও সে দোষ হইতে মুক্ত নয়। ইতি—

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নরেশবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মনোমালিন্য কিন্তু বেশি দিন ছিল না। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে আবার সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। নরেশবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের চিঠিগুলি

থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম মিটমাটের সময় রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুর একটি চিঠি পেয়ে তখন উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন :

ওঁ

বাঙ্গালোর

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আপনার কাছ থেকে যে চিঠিখানি আজ আমার হাতে এসে পৌঁছিল, সেটিতে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এই কথাটি আমি অনুভব করেচি। কোথাও বেদনার কারণ ঘটিয়ে রেখে দিয়েছি এ কথা মনে করতে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করি —এই জন্য আপনার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ সান্ত্বনা বোধ করেচি। আমি জানি এ রকম চিঠি লেখা সহজ নয়, খুব অল্প লোকেই পারে। পরস্পরকে আঘাত করতে গিয়ে আমরা যে মোহজালে জড়িয়ে পড়ি আশা করি আমাদেব দু জনের সম্বন্ধে সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। ইতি—২২জুন ১৯২৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নরেশবাবুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এর পরের আর যে কটা চিঠি নরেশবাবুর পুত্র নির্মল সেনগুপ্তর কাছে দেখিছি, তার কোনোটাতে রবীন্দ্রনাথ নরেশবাবুকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কোনোটাতে বা নরেশবাবু তাঁর উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ কীভাবে করান যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন।

সাহিত্যের মাত্রা

১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের *পরিচয়* পত্রিকায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথের ওই পত্র-প্রবন্ধ 'সাহিত্যের মাত্রা' এ পর্যন্ত (১৩৭৬ সাল) রবীন্দ্রনাথের কোনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি, আর দিলীপবাবুও রবীন্দ্রনাথের ওই পত্রটি তাঁর কোনও গ্রন্থভুক্ত করেননি। ওটি এখন পর্যন্ত শুধু ওই পুরানো পরিচয় পত্রিকাতেই আবদ্ধ হয়ে আছে। দেশের পুরানো পত্র-পত্রিকাও আজকাল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্ত হয়ে আসছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ওই পত্র-প্রবন্ধটি সমগ্রই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

> বর্তমান যুগে পূর্বযুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েচে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তাপ্রণালী প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে। এই জন্যে তার মননবস্তু জমে উঠচে বিচিত্ররূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেককালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত, তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য-জীবন যাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে চলচে প্রভূত পণ্য উ ৎপাদন। তার জন্যে প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির দরকার। চারিদিকের মানব সংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এই জন্যে এক একটা কারখানার সহর পরিস্ফীত হয়ে উঠচে, ধোঁয়াতে, কালিতে, যন্ত্রের গর্জনে ও আবর্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেই সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েচে মজুর বস্‌তি। একদিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করচে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্যদিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক, মন্দ লাগুক আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারচে না। এই অপ্রাণ পদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়চে। বলতে পারো বর্তমানে এটা অপরিহার্য, তাই বলে বলতে পারো না এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েচে, তাই বলে বলতে পারো না, সেটাই লোকালয়।
>
> এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলচে। চসরের ক্যাণ্টরবরি টেল্‌সে তখনকার কালের মানব সংসারের পরিচয় প্রকাশ পেয়েচে। এখনকার মানুষের মধ্যে যে, সেই পরিচয় একেবারেই নেই তা নয়। অনুভবের দিকে অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু চিন্তায় মানুষ তার সেদিনকার গণ্ডি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়, তখন ভাবে বলায় চলায়, সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হয়ে উঠবেই। অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক্, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রস-সম্ভোগের যে নিয়ম আছে, তা মানুষের নিত্য স্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতেশ্র চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানব চরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে, সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয়

নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্‌সে। তাই হয়ত সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্‌সের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে। অবশ্য গল্পে পলিটিক্‌সপ্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয়, তবে তার মুখে পলিটিক্‌সের বুলি দিতেই হবে। কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি-জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে পড়ে চরিত্র রচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্র সৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়া হয়েও উঠচে, তার কারণ আধুনিক কালে জীবন সমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত। এই জন্যে তাকে খুসি করতে দরকার হয় না, যথার্থ সাহিত্যিক হবার। প্রহ্লাদ বর্ণমালা শেখবার সুরুতেই ক অক্ষরের ধ্বনি কানে আসবা মাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করেই অভিভূত হয়ে পড়লো। তাকে বোঝানো আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ বর্ণমালার তরফ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে ক অক্ষর কৃষ্ণ শব্দেও যেমন আছে, তেমনি কোকিলেও আছে, কাকেও আছে, কলকাতাতেও আছে। সাহিত্যে তত্ত্ব কথাও তেমনি, তা নৈর্ব্যক্তিক, তাকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে চরিত্রের বিচার আর এগোতে চায় না। সেই চরিত্ররূপই রস-সাহিত্যের অরূপ তত্ত্ব রস-সাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানাকালে নানা লোকের হাত পড়েচে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না। অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায় ভীষ্মের চরিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ, যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে যথাপরিমাণ আলোচনায় বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্চে, কোন এককালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতি প্রবল ছিল। এই জন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন; তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুস্কিল এই যে, এই সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যে-রকম সচকিত করেছিল, এখন আর তা করে না ; এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোন তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনকালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎ কথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েচে, বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে-দেখা পাওয়া গেছে, সেটাতে রামের চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠত্বের কোন কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিকরূপে সুসঙ্গত করে সাজানো হয়নি। অর্থাৎ কোনো একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁত প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক আদালতে সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়ান নি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে, পিতার প্রাণনাশ যদিবা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্মনৈতিক। তারপরে বিশেষ উপলক্ষে রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন,

সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকে নি। বাঙালী সমালোচক যে রকম আদর্শের যোল আনা উৎকর্ষ যাচাই করে সাহিত্যে চরিত্রের সত্যতা বিচার করে থাকে, সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোন একটা মত-সঙ্গতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানান নি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়। কিন্তু উত্তর কাণ্ড এলো বিশেষ কালের বুলি নিয়ে। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে, তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্লেম। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এলো, তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোক মতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তার অগ্নি-পরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েচে। সেই বাহবার জোরে ঐ জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে। আজকের দিনের একটা সমস্যার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা হিন্দু-স্ত্রী মুসলমানের ঘরে অপহৃত হয়েছে, তারপরে তাকে পাওয়া গেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্লেমটাকে নিয়ে আপন পক্ষের সমর্থনরূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপাকার করে তুলতে পারেন। এ রকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত, এমনতর একটা রব উঠেছে। খাঁটি হিন্দুয়ানি রক্ষার ভার হিন্দু মেয়েদের উপর কিন্তু হিন্দু পুরুষদের উপর নয় সমাজে এটা দেখতে পাই। কিন্তু হিঁদুয়ানী যদি সত্য পদার্থই হয়, তবে তার ব্যত্যয় মেয়েতেও যেমন দোষাবহ, পুরুষও তেমনি। সাহিত্যনীতিও সেইরকম জিনিষ। সর্বত্রই তাকে আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগতরূপ সাহিত্যে আমরা দাবী করবই। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে, তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক, তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইনটেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইনটেলেক্‌চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই, বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস্ পড়ার রোগ আছে, আমি বল্‌ব সাহিত্যের পদ্মবনে তারা মত্তহস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘর থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইএ তার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোনো প্রব্লেমের দিক থেকে নয়।

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে : এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য সার্থকতা তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবরদস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি। এই পালোয়ানি বিস্ময়কর, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, সুন্দর ত নয়ই। এই পালোয়ানি সীমা-লঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য সাধনও করে থাকে কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙ্গে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেচে। সভ্যতা স্বভাবকে এতদূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলি সে করচে পালোয়ানি, প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়চে তার আবর্জনা। অর্থাৎ মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলচে। আজ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুতেই তাল পৌঁচচ্ছে না শমে। এত দিন দূণ চৌদুণের বাহাদুরি নিয়ে চলছিল মানুষ, আজ অন্তত অর্থনীতির দিকে বুঝতে পারচে বাহাদুরিটা। সার্থকতা নয়—যন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়চে মুখ থুবড়িয়ে। জীবন এই আর্থিক বাহাদুরির উত্তেজনায় ও

অহংকারে এতদিন ভুলেছিল যে গতিমাত্রার জটিল অতিকৃতির দ্বারাই জীবন যাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করচে, অসুস্থ হয়ে পড়েচে আধুনিক অতিকায় সংসার, প্রাণের ভার সাম্যতত্ত্বকে করেচে অভিভূত।

পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসঙ্গত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেচে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইনটেলেকচুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ একটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়। বিস্ময়কর ইনটেলেকচুয়েল, প্রয়োজন সাধকও হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অতিকায় জন্তুগুলো আপন অস্থিমাংসের বাহুল্য নিয়ে মরেচে, এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরচে। প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না, লোভ উপকরণবতাং জীবিতং যা, তাকেই জীবিত বলে অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্যে, তার হঠাৎ নবাবী আপন ইনটেলেকচুয়েল অত্যাড়ম্বরে, সেটা যথার্থ আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু মরণধর্মী। মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে। আমিও এমন কাজ করেচি কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ। রঘুবংশ কাব্যে কালিদাস স্পষ্টই আপন উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় স্বীকার করেচেন। রাজধর্মের কিসে গৌরব কিসে তার পতন কবিতায় এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্য সমগ্র ভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশ কাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মত তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই। কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রব্লেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থি মোচন ইনটেলেকটের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টি-শক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে লজিকের এলেকায় নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা *গোরা, ঘরে বাইরে* প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেচ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার এই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে সেগুলি জায়গা পেয়েছে, না জায়গা জুড়েছে। আহার্য্য জিনিষ অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন হয় না। 'গোরা' গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক না সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিষ সাহিত্যে বেশি দিন টিঁকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তারপরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তাহলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জনা রূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইবসেনের নাটকগুলি একদিন কম আদর পায়নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি। কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে? মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিষ, বুদ্ধি বিচারের কথা

বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তাহলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছু পরিমাণ অপ্রাণকে বহন করেই থাকে, যেমন আমাদের বসন আমাদের ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছড়িয়ে না যায়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেচে অতি পরিমাণে, সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা। আপন প্রবল গতিবেগে য়ুরোপ এই প্রভূত বোঝা আজও বইতে পারচে, কিন্তু বোঝার চাপে এই গতির বেগ ক্রমশঃ কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। অসঙ্গত অপরিমিত প্রকাণ্ডতা প্রাণের কাছ থেকে এত বেশি মাশুল আদায় করতে থাকে যে একদিন তাকে দেউলে করে দেয়।

মতিলাল রায়কে লেখা গান্ধীজির পত্র

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোল্যাণ্ড ভারতীয়দের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় তিনি আবার হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দু ও তফশিলি বা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচন-নীতির কথাও ঘোষণা করেন। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ভেদমূলক নির্বাচন-নীতির প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধি তখন অনশন আরম্ভ করেন।

গান্ধিজি অনশন করলে তখন অনেকের মতো চন্দননগরের 'প্রবর্তক সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ও গান্ধিজির কাছে সহানুভূতিসূচক চিঠি ও তারবার্তা পাঠিয়ে ছিলেন।

গান্ধিজি অনশন ভঙ্গের পর মতিবাবুর ওই চিঠি ও তারবার্তার উত্তর দিয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরে মতিবাবু 'বর্ণাশ্রম ও জাত' সম্বন্ধে এক পত্রে গান্ধিজিকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন। গান্ধিজি এক দীর্ঘ পত্রে মতিবাবুর ওই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

এই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দেই ডিসেম্বর মাসে হিন্দু সমাজের ঐক্য রক্ষার প্রয়াসে মতিবাবু তাঁর প্রবর্তক সংঘ আশ্রমে হিন্দু সম্মেলন করেছিলেন। মতিবাবুর এই কাজে গান্ধিজি শুভেচ্ছা পাঠিয়ে ছিলেন। এই হিন্দু সম্মেলন নিয়ে তখন গান্ধিজির সঙ্গে মতিবাবুর কয়েকটা চিঠি ও তারবার্তার বিনিময় হয়েছিল। এমন কি গান্ধিজির আহ্বানে তখন মতিবাবু পুণায় গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখাও করে এসেছিলেন।

এইসব নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে মতিবাবুর তখন বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাই কিছু দিন পরে মতিবাবু তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের 'সত্য ও সুন্দর' সম্পর্কে প্রশ্নমূলক এক চিঠি পেয়ে, সেই চিঠির প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে গান্ধিজির কী মত তা জানবার জন্য গান্ধিজিকে এক চিঠি দিয়েছিলেন।

মতিবাবুর সেই চিঠির উত্তরে গান্ধিজি তখন মতিবাবুকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন :

Wardha
12th November, 1931

Dear Moti Babu,

I have your letter and the enclosures . With reference to the letter from Sarat Babu (Sarat Ch Chatterjee) I have always held the opinion that there is no contradiction between real beauty and truth Therefore truth is always beautiful Truth, therefore in my opinion is the whole of Art. Art divorced from truth is no art and beauty divorced from truth is utter ugliness That in this world many ugly things pass for beauty is too true. That happens, because we do not always appreciate Truth. ...

Yours sincerely
M K. Gandhi

নূতন প্রোগ্রাম

শরৎচন্দ্রের রংপুর-অভিভাষণ নিয়ে বাদানুবাদ চলতে থাকলে শরৎচন্দ্র 'শ্রীপরশুরাম' এই ছদ্মনাম নিয়ে সেই সময়ে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসের *বেণু* পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন :

শরৎবাবুর রংপুর-অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এত বড় একটা অমর্যাদার উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু শরৎবাবু নিজে যখন নীরব, তখন আমার মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির ওকালতি করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। নিজের মাথায় টিকি নাই, কেহ যে ধরিয়া রাগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সেও পারিবে না, সুতরাং এদিকে নিরাপদ। কিন্তু অভিভাষণে কেবল টিকিই ত ছিল না, চরকাও ছিল যে, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা হইতে দ্রুতবেগে গেলেন মানভূমে, এবং প্রতিবাদ করিলেন যুব সমিতির সম্মিলনে। ঠিকই হইয়াছে, ওটা যুব-সমিতিরই ব্যাপার। তরুণ বৈজ্ঞানিক বুড়া সাহিত্যিকের তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, সকলে একজনকে ধন্য ধন্য এবং অপরকে ছি ছি করিতে লাগিল। তথাপি ভরসা হয় না যে তিনি তিন কাল পার করিয়া দিয়া অবশেষে এই শেষ কালটাতেই তামাক ছাড়িবেন! অতঃপর শুরু হইয়া গেল প্রতিবাদের প্রতিবাদ, আবার তারও প্রতিবাদ। দুই একটা কাগজ খুলিলে এখনও একটা না-একটা চোখে পড়ে।

কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলা দেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এ দেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি ত এই বছর-আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দে মাতরমের দিব্যি, কোন কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না, যে বা লইল, চরকার দাম দিল না; বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ ঘটাইল আরও বেশি। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন দশ পনেরো পরেই জোটপাকানো এ মুঠা সূতা আনিয়া হাজির করিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাতে নাম ধাম সমেত লেবেল আঁটা অর্থাৎ গোলমালে ক্ষোয়া না যায়। কহিল, দিন ত মশাই একখানা প্রমাণ শাড়ী বুনে। কর্মীরা কহিত—এতে কি কখনো শাড়ী হয়?

হয় না? আচ্ছা শাড়ীতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন বহর ছোট ক'রে ফেলবেন না যেন।

কর্মীরা—এতে ধুতিও হবে না।

হবে না কি রকম? আচ্ছা ঝাড়া দশ হাত না হোক ন'হাত সাড়ে ন'হাত ত হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম।—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।

কর্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মস্‌লিন নয়, —খদ্দর। এক মুঠো সুতার কাজ নয় মশাই, অন্ততঃ এক ধামা সুতার দরকার। কিন্তু এ ত গেল বাহিরের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্মীদের উৎসাহ-উদ্যম, অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগে মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত। সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে।

তিনি পরিয়া আসিতেন দিশী—সামিয়ানা তৈরির কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আসিল লয়ন-ক্লথের যুগ। সে দিন আসল ও নকল কর্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা, অনিলবরণ– দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুক্ মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না হওয়া পর্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! 'My only answer is Charka' অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাবাক্য মনে মনে জপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লাল বাতি জ্বলিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

সে দিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল-ক্লথ। তা সে যেখানেরই তৈরি হউক না কেন? সে দিন অপবিত্র মিল-ক্লথ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it

সে দিন কেন যে কবি এত বড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলায় খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরি হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ পান করা পর্যন্ত, তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, যোল কলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার না কি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক, এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।

কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধনপদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারম্বার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্মনির্ভরতা জন্মে, কিন্তু এ জিনিসটা যে কি, কেন জন্মায়, এবং চরকা ঘুরাইয়া বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারম্বার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করি, আত্ম-নির্ভরতার ধারণা সকলেরই

এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্ম-নির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন,— "মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্ম নির্ভরতা (self help) শিক্ষা হইয়াছে—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।"

অবশ্য এরূপ হইলে বিবাহের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক্। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশি দরকারী। বিশেষজ্ঞবাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে দু-চার ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। অবশ্য গরীব শব্দটা অনাপেক্ষিক বস্তু নয়, একটা তুলনাত্মক শব্দ। Economics-এ marginal necessity-র উল্লেখ আছে, সে যে-দেশের শাস্ত্র, সেই দেশের উপলব্ধির ব্যাপার। আমাদের এ দেশের গরীব কথাটার মানে আমরা সবাই বুঝি, এ লইয়া তর্ক করি না, কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সার আয় বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্ট হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।

অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরি ; এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসর মত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও ত মাসিক দশ আনা বারো আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি-র একটা মিটিং ডাকিয়া Franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতে হইবে। কারণ, শহরে ঘাস মিলে না। অতএব এরূপ মেলামেশায় পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ শহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে 'due consideration' দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন ; তিনি হয়ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই, সুতরাং তাঁহার কথা শোনা চলিবে না। বিশেষতঃ, বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন যিনি বিলাতে দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু? চরকা-বিশ্বাসী অহিংসকেরা হিংস্র অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, তোমরা চরকা কাটার মত সোজা কাজটাই ধৈর্য ধরিয়া করিতে পার না, আর তোমরা করিবে দেশোদ্ধার? ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি।

শুনিয়া ইহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। হয়ত কেহ কেহ ভাবে হবেও বা। চরকা কাটিতেই যখন পারিলাম না, তখন আমাদের দ্বারা আর কি হইবে? কিন্তু আমি বলি, হতাশ হইবার কারণ নাই। অনিলবরণের কর্ম-পদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ, আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না ; বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না ;—কোনও মুস্কিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে ত কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরা মাত্রেই খুশ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে' স্বরাজ মুঠার মধ্যে।

কিন্তু অনিলবরণ বলিয়াছেন, আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথায় যত ছেলেমানুসি দেখাক, যুক্তি যত উল্টা কথাই বলুক, তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে।

এক বৎসরে Dominion Status অবশ্যম্ভাবী! হইবেই হইবে। যদি না হয়। সে লোকের অপরাধ, প্রোগ্রামের নয়। এবং তখন অনায়াসে বলা চলিবে, এত সহজ কর্ম-পদ্ধতি যে দেশের লোক নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া সফল করিতে পারিল না তাহাদের দিয়া কোনও কালেই কিছুই হইবে না। আসল জিনিস বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। একটায় যখন সুবিধা হইল না, তখন আর একটা লওয়া কর্তব্য। এমনি করিয়া চেষ্টা করিতে করিতেই একদিন খাঁটি প্রোগ্রামটি ধরা পড়িবে।

পড়িবেই পড়িবে। জয় হোক অনিলবরণের! কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাৎলে দিলেন!

নিখিল ভারত-কাটুনি সঙ্ঘ খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর হইল বলিয়া। কলিকাতার বড় কংগ্রেস আসন্নপ্রায়, সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার! কলের তৈরি দেশী একগাছি সুতাও যেন একজিবিশনে না ঢোকে! এ ঢুকলে আর উনি ঢুকিবেন না।

নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয় খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন—সে কি কথা! বিদেশী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমার এই বাইশ লাখ দিয়া সত্তর-আশি ক্রোড়ের ধাক্কা সামলাইবে কেন?

সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমরা ঐ খদ্দর এক-শ টুকরা করিয়া লেংটি পরিব। নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক-শ টুকরা কেন, উহার একগাছি করিয়া সূতা ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।

সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাততঃ মহাত্মাজীর বয়কট সহিবে না।

কিরণশঙ্কর কহিলেন, ঠিক, ঠিক। মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া certificate পাঠাইয়া দিলেন, 'ফিলিস সরকাস' মন্দ জমে নাই।

নেতারা টু শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবিকাটিটি আটকাইয়া রাখেন! বাংলা দেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল, তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন? কর একজিবিশন!

আমরা বাইরের লোকেরা ভাবি complete independence বটে! তাই Dominion Status-এ এঁদের মন উঠে না। আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে, দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। 'ফিলিস সরকাসের' বিবরণ Young India-র পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।

শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহরু-রিপোর্ট পাস হইয়াছে। বহুবিধ ছল-চাতুরিপূর্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে। আশা ত ছিলই না, তবে সে দেশের পার্লামেণ্ট না কি এবার মেয়েদের হুকুম মত তৈরি, সুতরাং এখন তাহারাই একপ্রকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এ দেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি—

কানাকড়ি[১]

বন্ধুবরেষু—

ভারতীয় পূজায় কিছু দক্ষিণা এবং প্রবাসী বন্ধুর নামে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ এই দুই সৎকার্যের কতকটা সার্থকতা থাকিলেও থাকিতে পারে—ইহকালে না হয় পরকালে বা। কিন্তু বাৎসরিক ছয় তনখা দিয়া দশশালা বন্দোবস্তে আসমুদ্র ভারতবর্ষটা দখল করিয়া লওয়ার অর্থ ত আছেই, তাছাড়া 'স্পেকেউলেশান' হিসাবে যে কার্যটার বেশ একটু রস আছে যেটা প্রথমোক্ত দুটা সৎকার্যের একটাতেও নাই। —এখন 'একটা হর্ষ', 'একটা মহামহিমা', একটা আরব্য উপন্যাসের নূতন প্রদীপের বদলে পুরাতন প্রদীপ ক্রয় করিয়া লওয়ার মত,—যদি না 'ভারতবর্ষ'টা যার সেই ভারত-গবরমেণ্ট বাধা দেন। এই যদি-না-তেই আমি ঠেকিয়া গেলাম। এবং আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষের ধন যখন ছয় টাকায় ছয় গুণ হিসাবে আর সকলেই বুঝিয়া পাইল, আমি তখন আমার আধুলিটির পরিবর্তে ষোল আনার বদলে আট আনা মাত্র রস উপভোগের অধিকারী হইয়া বড়ই যে ঠকিয়াছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস যে এই আট আনাকে নিংড়াইয়া আমি ষোল আনা রস বাহির করিয়া লইতে পারিব। ভারতবর্ষের মাটি তো বটে। সুতরাং প্রথমেই আমি মলাট বা ঝুলিটা লইয়া পড়িলাম। সর্বাগ্রে হাতে ঠেকিল—দাঁতে নয়, কেননা, আমি অদন্ত ; কাযেই হাতে পরীক্ষা না করিয়া মুখে কিছু দিই না—কুতুব মিনার এবং বুদ্ধগয়ার দুই টুক্‌রো প্রস্তর। সে দুটাই আমি রেল-কোম্পানীর টাইম টেবিল অফিসে উপহার পাঠাইয়াছি ; কেন না তাঁহারা ও দুইটা পদার্থের সদ্ব্যবহার চিরকাল করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাহাকেও দিলে চলিত, কিন্তু সেটা পূর্বে মনে আসে নাই। পাথর ছাড়িয়া মনোভৃঙ্গ এবার একেবারে ওই আকাশ গঙ্গায় প্রস্ফুটিত কমল দলে গিয়া বসিল[২] ; কিন্তু হায় কাগজের ফুলে রস কোথায়। সেটা কলিকাতায় আসিয়া পাড়াগেঁয়ে বরকর্তারাই কেবল আবিষ্কার করিতে পারেন। ভৃঙ্গবর হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পদ্মবনের জলবুদ্বুদটার দিকে আমার পড়ায় দৃষ্টি আমি একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া গেলাম ; এবং আট আনার চার আনা রসে বেশ একটি বড় গোছের রসগোল্লা পাকাইয়া লইতে বিলম্ব করিলাম না। এ রসের নাম বিরাগ। এটি ভারতবর্ষের চিরন্তন সামগ্রী। ধন্য সেই চিত্রশিল্পী, যে কাগজের মলাটে এতটা রস দিতে পারে! জলবুদ্বুদের উপরে বিধাতার আখরের মত যেন একটা কি দেখিলাম, কিন্তু প্রিণ্টারের দোষে আমার ভাগ্যে সেটা অস্পষ্টই রহিয়া গেল। ছয় টাকার কোন অংশীদার সেটা সুস্পষ্ট আকারে পাইয়াছেন বোধ হয়। আট আনায় আর ছয় টাকায় এইটুকুই প্রভেদ।

এইবার বাহির ছাড়িয়া আমি একেবারে থলির ভিতরে হাত পুরিলাম। একটা যেন গ্রামোফোন হাতে ঠেকিল।[৩] কিন্তু সেটাকে বাহির করিয়া মহলা দিতে মোটেই আমার উৎসাহ হইল না, সেটা ডাক্তার কুমারস্বামীকে দিব স্থির করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। আমাদের পাড়ায় আর সব আছে, কেবল গ্রামোফোনটাই নাই, এক একবার মনে করিতেছি যে বাদ্যযন্ত্রটা আমাদের সঙ্গীত-সমাজে উপহার দিই ; কিন্তু এখন না, যেদিন অন্য পাড়ায় উঠিয়া যাইব, সেদিন এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে ; তৎপূর্বে কিছুতেই না।

থলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবার একখানি ছবি হাতে উঠল ;—হাঁ এতক্ষণে জিনিষের মত একটা জিনিষ পাইয়াছি। ছবিখানির উপরে লেখা 'ভারতবর্ষ', ছবির নীচে লেখা 'বিশ্বাস' 'আশা'

ও 'বদান্যতা', চিত্রকর জ্যাট্‌কা! এ নিশ্চয় আমাদের ও পাড়ার প্যাট্‌কা ছেলেটার কার্য, নাম ভাঁড়িয়েছে। যা হোক ছেলেটা এঁকেছে ভাল, ঠিক ইতালিয়ান পেন্‌টিং, কিন্তু ছেলেটা ভাব ফোটাতে পারে নি। ক্রুশ নিয়ে 'বিশ্বাস' এটা বোঝা গেল—ঠিক আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বড় মেম। কিন্তু 'আশা' আর 'বদান্যতা' এ দুটোর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া গেল না ত! একটা জেলেনী একটা নঙ্গরের রশি ধরে খাড়া আছে, এতে আশার কথা কোন্‌খানে? আর একটি মহিলা সন্তান-ক্রোড়ে উপবিষ্টা এতে বদান্যতাই বা কোথায়! ছবিটার গুণপনা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আমার থাকিয়াই যাইত, যদি না আমার এম, এ, বন্ধু আসিয়া আমায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেন যে এটি একটি সত্যই বিলাতী ছবি। নারদের বাহন যেমন ঢেঁকি তেমনি ক্রিশ্চানদেব মতে বিশ্বাসের বাহন ক্রুশ-কাষ্ঠ, আশার বাহন নঙ্গর এবং বদান্যতার বাহন মদের পেয়ালা।

এবার যে ছবিখানি হাতে পাইলাম সেটির ভাবার্থ বুঝিতে আমার আর তিলার্ধ মাত্র বিলম্ব ঘটিল না। ঐ যে ভারতের মানচিত্রের উপরে সালঙ্কারা রমণী, উনি হচ্ছেন ভারতী। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যেমন অসি হইয়াছিল। তেমনি ভারতীর বীণা এখানে বন্দুকের আকার ধরিয়াছে। দেবী হাঁস শিকার করিতেছেন। একটি হাঁস গুলি খাইয়া পদতলে লুণ্ঠিত, আর এক গুলি ভারতবর্ষের জীবনভার লাঘব করিতে ছুটিয়াছে। সুনিপুণ চিত্রকর 'র'য়ের পুঁটুলিটি গুলির মত আঁকিয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এবং ভাবের ঘরে গুলি চালানো যে তাঁহার নেশা সেটা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন—'স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা।'[৪]

এইবার আমার এম, এ, বন্ধু আমাকে পরীক্ষা করিবার আশায় নিজেই ঝুলির ভিতর হইতে একখানি ছবি উঠাইয়া আমায় দেখাইলেন। বলাবাহুল্য সে বন্ধুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ছবির যতটা পঠনীয় সেটা চাপিয়া রহিল। আমি ব্যাখ্যা দিতে সুরু করিলাম ঃ—ছবিখানির নাম 'সিন্ধু সৈকতে।' সম্মুখে ঐ মেটে অংশটি বালুচর, তাহার উপর অনেক শামুক গুগ্‌লী গড়াগড়ি দিতেছে—আসল সমুদ্রে শামুক কিন্তু ওভাবে বালিতে গড়াগড়ি দেয় না। তাহাবা প্রায়ই ভিজে বালিতে লুকাইয়া যায়। কিন্তু বালির উপরে নাম লিখিতে আমি অনেককেই দেখিয়াছি। ওই যে সাপের খোলসের মত নীল অংশ ওটা হচ্ছে সমুদ্র। চিত্রের সমুদ্র এইরূপই হওয়া উচিত। আমি থিয়েটারের অনেক বড় বড় সিন্‌ পেণ্টারকে এমনি ভাবেই সমুদ্র আঁকিতে দেখিয়াছি। আসল সমুদ্র সে অতি ভীষণ ব্যাপার। যেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ক্ষ্যাপা ঘোড়ার ছুটোছুটি। যে বেগে ঢেউ আসে তাতে মাটিতে পা রেখে ওই বড় ঘরের ঝিটি কেন, জোয়ান পালোয়না পর্যন্ত খাড়া থাকতে পারে না। সুতরাং ও রমণীটি যে সে নহেন! শ্বেত ও নীলে মণ্ডিত মুক্তাহার বিলম্বিত মণিময় মুটুকান্বিত স্বয়ং 'ফেনা দেবী।' সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। জলদেবীও বলিতে পার, তিনি সিন্ধু তীর ঝাঁটাইতে[৫] আসিয়াছেন। বালির উপর দিয়া সমুদ্রের জল যখন গড়াইয়া যায় তখন মনে হয় বাস্তবিক কে যেন ঝাঁট দিয়া গেল। আকাশের চন্দ্র সূর্য দিয়া শিল্পী এই বুঝাইয়াছেন যে দিবারাত্র এই ঝাঁট কার্য চলিতেছে ;—অনন্তের কুলে কেহ যে সুখে বাস করিবেন, তাহার অবসর নাই। বন্ধু বলিলেন—"দেখ দেখি এটা 'শীতলা' কিনা—হাতে ঝাঁটা রয়েছে যে।" আমি হঠাৎ বন্ধুবরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ টান দিলাম, লেখা বাহির হইল 'ভারতবর্ষ'। আমি অবাক। ওই চন্দ্রবংশ সূর্যবংশ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কিছু তো খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং আমার ধারণা যে বিজ্ঞাপনের জন্য 'ভারতবর্ষ'টা ওখানে ছাপা গেছে, আসল ছবিটা হচ্ছে 'সিন্ধু সৈকতে।' *ভারতীতে* এবং *প্রবাসীতে* ও সাহিত্য ইত্যাদিতে এমন কি বিলাতেও মাঝে মাঝে এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা আজকাল প্রচলিত হইয়াছে। একা *ভারতবর্ষের* দোষ কি! বেচারা মহাজনদিগেরই পথ অনুসরণ করিতেছে—এবং তাঁহাদের মত 'গত' হইবার চেষ্টায় আছে।

এবার যে ছবিখানি হাতে উঠিল তাহার নীচে মেঘদূতের দুই চরণ বিজ্ঞাপন। সুতরাং সেটা

ছাড়িয়া আমি ছবির অর্থ বাহির করিতে বসিলাম। ছবির নাম *'কলের বাঁশী'*।[৬] সকালে কলের চিমনি ধূমোদ্গিরণ করিয়াছে এবং দুই কুলী-রমণী বলিতেছে—'সখি ওই বুঝি বাঁশী বাজে'। ছবির এক কোণে লাল অক্ষরে ভারতবর্ষ, সুতরাং তাহারা যে ভারতের মাটিতে দণ্ডায়মানা সেটা নিশ্চয়, নচেৎ মনে হইত চিৎপুরের ছাদে দুই রমণী কি যেন একটা লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে। ছবিখানিতে যথেষ্ট পারসপেকটিভ দেখান হইয়াছে। চিত্রটি বেনামী, কিন্তু চিত্রকর পল্লী-চিত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন। আমি ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছি এমন সময় বন্ধুবর মেঘদূতের দুই চরণের বাংলা দিলেন। এবার আর বিজ্ঞাপনের দোহাই চলিল না। আমি হার মানিলাম।

এবার একটা দিক্‌গজ শিল্পীর ছবি হাতে উঠিল। ছবির নীচে কিছু লেখা না থাকলেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম—আনন্দে করতালি দিতে দিতে কাহারও অগ্নি-প্রবেশ![৭] অগ্নিশিখাগুলি ভয়ে কালীমূর্তি ধারণ করিয়া সর্পাকারে সতীর অঞ্চলে দ্রুত লুক্কায়িত হইতেছে, আর ধূমরাজি সতীর করতালির সঙ্গে মনোহর নৃত্য করিতেছে। ভবানীচরণের ছবির গুণই এই যে বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না—যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার অঙ্গ-ভঙ্গীর অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ভবানীবাবুর ছবিও বুঝিতে কোন কষ্ট নাই ; দুইই সমান! এ বিষয়ে আমার এম, এ, বন্ধুও এক মত। নন্দলালের সতীর ছবি দেখিলে গায়ে যেন জ্বর আসে। আগুনের তাপে অঙ্গ যেন দগ্ধ হয়। ভবানীবাবুর ছবি সেই জ্বরের ডিঃ গুপ্ত। আমরা আপামর সাহিত্যসেবককে ভবানীবাবুর এই জ্বরান্তক বটিকা বা কুইনাইন প্রভাতে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। *অলমিতি।—শ্রীনগদ-ক্রেতা—*

(প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩২০)

পত্র-পরিচিতি

১ অবনীবাবু তাঁর 'কানাকড়ি' প্রবন্ধটি 'শ্রীনগদ ক্রেতা' এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন। কেন না লেখার শেষে লেখক হিসেবে ওই নামই ছিল। শ্রাবণ মাসে লেখার সূচিপত্রে এই লেখার লেখক হিসেবে কী নাম ছিল জানি না। (মনে হয়, 'নগদ ক্রেতা'ই ছিল)। তবে আশ্বিন মাসে ষাণ্মাসিক সূচির সময় এই লেখার লেখক হিসেবে অবনীবাবুরই নাম ছাপা হয়। যাই হোক, নগদ ক্রেতা যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা প্রমথবাবুরা শ্রাবণ মাসেই সঠিক জানতে পেরেছিলেন।

বইয়ের প্রথমে নিবেদনের পরে সংশোধন অধ্যায়ে প্রথম সংশোধনটি দ্রষ্টব্য।

২ *ভারতবর্ষ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কভারটা ছিল এইরূপ, পাতার মাথায় 'ভারতবর্ষ' লেখা এবং ওই লেখার দুপাশে ফোটা পদ্ম। পাতার মাঝখানে পাশাপাশি বুদ্ধগয়ার ও কুতুব মিনারের ছবি। আর নীচের অংশে 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত' লেখার দুপাশেও ফোটা পদ্ম। এই পাতাটা বহুবর্ণে ছাপা।

৩. কভারে দ্বিতীয় পাতায় গ্রামোফোনের ছবিসহ গ্রামোফোন বিক্রেতা 'কার এণ্ড মহলানবিশ কোম্পানি'র একটা বিজ্ঞাপন ছিল।

৪. *ভারতবর্ষ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতাটা ছিল এইরূপ,
পাতার মাথায় বড়ো অক্ষরে লেখা 'ভারতবর্ষ'। বাকি অংশটার বাঁদিকে বীণা হাতে ভারতীর ছবি এবং ডান দিকে লেখা :

স্বস্তিবাচন
(ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত)
ওঁ

স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ—ইত্যাদি কয়েক পঙ্‌ক্তি স্বস্তিবাচন এবং ঐ সংস্কৃত পঙ্‌ক্তিগুলির নীচে বাঙলা কবিতায় সেগুলির অনুবাদ। এখানে যে পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছি, এর অনুবাদ ছিল এইরূপ :

অশ্বিনীকুমার নামে দেবতাযুগল,
ভগ দেব আমাদের করুন মঙ্গল।

৫. *ভারতবর্ষ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' কবিতার 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী! ভারতবর্ষ!'—এই প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে মিলিয়ে বহুবর্ণের একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে ভারতমাতার প্রতীক কল্পিত নারী-মূর্তির হাতে ছিল ধানের শীষের গুচ্ছ।

৬. *ভারতবর্ষ*-এ এই ছবিতে ছবিব কোনো নাম নেই। তবে যাণ্মাষিক সূচিতে নাম দেওয়া আছে 'মেঘ দর্শনে'। ছবির নাম 'কলের বাঁশী' এটা অবনীবাবু বলেছেন।

৭. ভবানীচরণ লাহার ছবি 'সীতার অগ্নি-পরীক্ষা'। ছবিতে আছে সীতা প্রজ্বলিত আগুনের মাঝে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সংযোজন

হাতে লেখা চিঠি

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা

বাজে শিবপুর, হাওড়া
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩০

প্রিয় সুরেন,

মনে করে ছিলাম আমার জন্মদিন ভাদ্রের সংক্রান্তি পর্যন্ত কিছুতেই চিঠি লিখ্‌ব না। ১লা বৈশাখ থেকে একটি চিঠিও লিখিনি,—ভয়ানক সংসারী, এবং সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়ছিলাম, যা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা—ভেবেছিলাম এই বস্তু হয়ত এই প্রকার নীরবতায় কম্‌বে, কিন্তু দেখ্‌লাম তার অন্য প্রকার মানে হতে সুরু হচ্চে। অন্ততঃ যার কোনমতেই ভুল করা উচিত ছিল না, সেই তুমিই ভুল বোঝবার পথে পা দিচ্চ। ঠিক যেন একটা কিছু মনের মধ্যে আমার ময়লা জমেচে তোমার দোলনা[1]র হাতের চিঠিতে এই অর্থই প্রকাশ পেয়েচে। তুমিও একথা ভাবতে পারো।—আশ্চর্য্য!

সুরেন, কি করে যে কোথায় যেতে পারা যায়—যেখানে উপদ্রব নেই, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয় না, আমি তাই কেবল ভাবি। আর আমার ত দুনিয়া ভাল লাগে না। গত মাস দুই থেকে কেবলি এই কথাই মনে উঠে।

তোমার ওখানেও ঠিক শান্তি নেই। আমি গেলে বাড়ে যখন জানতাম না তখন বার বার যেতাম, এখন আর যেন পা এগোয় না। খুঁজে পাইনে কোথা যাই।

নন্‌-কো তো ছেড়েচি; খদ্দরের মোহ কেটেচে। শুনলাম তুমিও তাঁত বন্ধ করেচ। এই সুবুদ্ধি যদি আগে হোতো। দেশলায়ের কলের লোহাগুলো এবার বেচে দাও। যে মরেচে তাকে হয় কবর, না হয় পোড়ানোই সুযুক্তি। মমি করে পুজো করবার আবশ্যক নেই।

দেনা কত দাঁড়ালো? সর্ব্বস্ব ত তোমার গেছে শুনলাম। আমি আগেই জানতাম। এইটে এবার আমাদের শোধ করার চেষ্টা করতে হবে।[2] তবে আনন্দ এই যে বোকামি করা হয়ত হয়েচে, কিন্তু সেও আনন্দের বোকামি, বৃহৎ বোকামি। ছোট্ট প্রেটি চালাকি নয়। এস, আর, দাশ-এর চেয়ে সি, আর, দাশ চিরকালই বড়।[3]

এইবার একটু শেষ সাহস চাই—এই তাঁত চরকা ও দেশলায়ের কল থেকে তোমাকে মুক্ত হতেই হবে।

আমি আবার ভাবচি লেখায় মন দেব। তবে তার আগে মনটা একটু স্বস্তি চায়। বড়ই ভারাক্রান্ত।

ভালই আছি।

তোমার শরৎ

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[১]কে লেখা

আমি সেদিন রাত্রেই ত তোমাকে পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলী—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে ছাপাইবার অনুমতি দিয়াছি। অবশ্য লিখিত অনুমতি চাই, সেটা পরে পাঠাইয়া দিব, কারণ আর একটা কিছু[২] যদি এর সঙ্গে দরকার হয় তো সেটা কি হইবে আমি স্থির করিতে পারি নাই। এখন তো তোমার এই দুটো বইয়ের ছাপা চলুক। আমার মৌখিক পারমিশান্‌ও লিখিত পারমিশান্-এর মত। ৪।৫ দিন পরে দেখা করিব, সেদিন কিন্তু আমার বাকি প্রয়োজনের টাকাটা যদি সংগ্রহ করিয়া রাখ বড় উপকার হয়।

এখনো আমি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, যদি মনে কর প্রবন্ধ ভাল, নিশ্চয় ছাপা উচিত সে আমার বিরুদ্ধে কিছু থাকিলেও। তবে নিরর্থক বা অসম্বন্ধ কতকগুলা গালিগালাজ সাহিত্যের দিক দিয়াও প্রয়োজন নয়, ভদ্রতার দিক দিয়াও ভাল নয়।

উপন্যাস লিখিব এ কথা বলিয়াছি, কিন্তু বোধ করি আমার শক্তি এতই কমিয়া গিয়াছে যে ভাবিয়া একটা নূতন উপন্যাসের চরিত্র পাইতেছি না। প্লট ত আমি করি না, আমার চরিত্র সংগ্রহ হইলেই কাজ চলে।

তবে, ইচ্ছা এবং চেষ্টা দুইই করিতেছি—কিন্তু হয়ত, আমার লেখার জন্য এতগুলা টাকা ব্যয় করা লাভের ব্যাপার হইবে না।

শরৎ

রাধারাণী দেবীকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের রাধু, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে অবধি মনটা অত্যন্ত বিমনা হয়ে আছে। কোনও কাজেই যেন মন দিতে পারছি নে। জলধরদা লেখার তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েচেন, নিজেরও কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী কাজের দরকার রয়েছে, কিন্তু কিছুই হচ্চে না। কল্‌কের পর কল্‌কে পাল্‌টে গড়গড়া টেনে চলেছি আর ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে কদিন ধরে তোমাদের কথাই ভাবচি।

মনে হোলো, তোমাকে একখানা চিঠি লেখা দরকার। জানোই তো, কেমন কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি লেখা আমার বাঘ ! তবু উদ্যোগী হয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসেচি এই মনে করে,— তোমাকে কতগুলো কথা যদি ভালো করে বোঝাতে পারি তা হলে আমার কি হবে ঠিক জানি না রাধু, তবে তোমার যে এতে সত্যিকারের কল্যাণ হবে এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি। আমার যে খুব তৃপ্তি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কথাটা হচ্চে এই, তোমরা মেয়েরা,—অন্যের মত অর্থাৎ পুরুষ মানুষের মন যতোখানি আশ্চর্য রকম বুঝতে পারো, ঠিক ততখানিই আশ্চর্য রকম বুঝতে পার না নিজেদের মনটি। এ তথ্যটি আমার এতই নিঃসন্দেহ রূপে জানা যে, এটি তুমি (বড়দার কাছে) প্রমাণিত সত্য বলেই গণ্য করে নিতে পার।[১]

রাধু, আমার সব চেয়ে বড়ো ভয়, বেশির ভাগ গভীর প্রকৃতির ভালো মেয়েদের মতন তুমিও না নিজের কাছে আত্ম-অস্বীকার করে আত্ম-প্রতারণা করে বোসো। এই আত্ম-অস্বীকৃতির মত আত্মহত্যা আর নেই।

আমার একটা কথা মনে রেখো বোন, সত্যিকারের ভালোবাসা সব মানুষের জীবনে আসে না। এ দুর্লভের আবির্ভাব যাদের জীবনে ঘটে, তারা যদি একে ঠিক চিন্‌তে পারে, তবেই এর সার্থকতা। অতি-দুর্লভ হীরেও অজ্ঞলোকে কাচ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এ তো জানো। তবে একথাও বলতে পারো, সংসারে নব্বই ভাগ মানুষই কাচ কুড়িয়ে নিয়ে তার ঝক্‌মকা নিতে খুসি হয়ে গলায় গেঁথে পরে গর্বিত হয়ে বেড়ায়। যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে আসলে তা তুচ্ছ কাচখণ্ড মাত্র। দেখতে অবশ্য হীরেরই মতন।

তুমি হয়তো বলবে—পাকা জহুরী না হোলে হীরে চেনা তো সহজ নয় বড়দা।

ঠিক কথা দিদি! আমি তোমাকে বলি শোনো, হীরে আর কাচ পরখ্ করার সহজ উপায় তো রয়েছে। জোরে আছড়ে ফেললেই কাচ ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়, হীরে কখনও টস্‌কায় না। হীরে দিয়ে কাচ কাটা যায়, কাচ দিয়ে হীরে কাটা যায় না।

সত্যিকারের ভালবাসার পরখ্ হোলো ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে-ভালোবাসায় যতো বেশি কল্যাণবুদ্ধি, যতো আত্ম-উৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা হতেই গভীরতর আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালবাসাই জেনো খাঁটি জাতের।

দুনিয়ায় সব জিনিষেরই আসল-নকলের যাচাই আছে যখন, ভালবাসারও যাচাই আছে। অকৃত্রিম ভালবাসা, পাত্রের দোষ-গুণ-নিরপেক্ষ হয়। সে তার প্রিয় ব্যক্তির সমস্ত কিছুই সুন্দব দেখে, আশ্চর্য দেখে, মহৎ এবং মাধুর্যময় দেখে। এই দেখার দৃষ্টি এক আশ্চর্য দৃষ্টি।

রবিবাবু যে লিখেছিলেন—

আমি, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—

এর থেকে পরম সত্য আর কিছু নেই।

ভালবাসা যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন সে চায় আধার বা আশ্রয়? এই আধার সর্বক্ষেত্রেই যে উপযুক্ত অথবা সুন্দর হয়, তা নয়। ভালবাসা আপনিই আপন হৃদয়-রসে রচনা করে নেয় তার পাত্রকে। ভালবাসার প্রতিমা রচনায় পাত্রটি খড়-বাঁশ-দড়ি মাত্র। যার উপরে মাটি, চড়বে রং, চল্‌বে তুলি, মাখানো হবে ঘাম-তেল, পরানো হবে কেশবেশ অলঙ্কার। এর অনেকটাই তো নিজেরই হাতে।

বড়ো ভালবাসা স্বভাবতঃই নিঃস্বার্থ। এ কেবল উপলব্ধির সামগ্রী রাধু। হৃদয়ের মহৎবৃত্তিগুলির সাহায্যে, উপলব্ধির দ্বারাই স্পর্শ করা যায় একে। বুদ্ধি বিচার জ্ঞান তর্ক যুক্তি দিয়ে নয়, এই আমার নিজস্ব ধারণা।

একটা অত্যন্ত সত্যিকথা তোমায় চুপি চুপি বলি শোনো। —সংসারে এমন ভালবাসাও আছে রাধু, যে, সমস্ত জীবন যাকে ভালবেসেছে তার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তার ভালবাসাই তাকে এই দূরে সরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে। কাছাকাছি থাকা চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা,—ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ব্যাকুল ও তীব্র প্রবৃত্তিকেও সংবরণ করার শক্তি জোগায়—খাঁটি ভালবাসাই। সত্যকার ভালবাসা, তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ এবং সুখী দেখতে চায়, তাকে সার্থক এবং গ্লানিহীন দেখতে চায়। আত্মপরিতৃপ্তি তার ঐখানেই।

কোনো মিলন যদি ভালবাসার পাত্রকে অগৌরবের মধ্যে নতশির করে আনে, তার জীবনের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে আনে, লজ্জা দুঃখ বা অনুতাপ অনুশোচনা উন্মেষের সামান্যতমও ছিদ্র রেখে দেয় তার জীবনে,—সে-মিলন কখনই কল্যাণকর হোতে পারে না, সুতরাং—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আবার এও সত্য, বলিষ্ঠতার অভাবে, প্রেমের প্রতি স্থির বিশ্বাসের অভাবে, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে মিলনকে জীবনে বরণ করে নিতে যারা ভয় পায়, সেই ভীরুদেরও প্রেমের দুর্গতি সমানই ঘটে।

সত্যকার গভীর ভালবাসা—কল্যাণ বুদ্ধির আলোয় কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চির বিচ্ছেদের মধ্যে, কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চির মিলনের মধ্যে। যে ক্ষেত্রে বিচ্ছেদেই আসে প্রেমের কল্যাণ—সেখানে সংযমের অভাবে মিলন এনে ফেললে সর্বনাশ। আবার যেখানে মিলনেই আছে প্রেমের কল্যাণ, সেখানে বলিষ্ঠতার অভাবে বিচ্ছেদ রচনা করলেও ঠিক তেমনিই সর্বনাশ ঘটে।

গভীর ভালবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলনে এবং বিচ্ছেদে উভয়েই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। বেছে নিতে হয় প্রেমে, কাকে তুলে নিতে হবে মিলন, কাকে নিতে হবে বিচ্ছেদ। এরই মধ্যে প্রেমের আসল পরীক্ষা। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয় ভাই, আত্মসংবরণেও।

আজ সন্ধ্যা বেলায় তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এই পর্যন্ত লিখে উঠে যেতে হয়েছিল। এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। চিঠিখানা শেষ করে খামে পুরে ঠিকানা লিখে রেখে তারপরে ঘুমুতে যাবো। সংক্ষেপে কথাটা এইবার শেষ করি।

আজ তোমার জীবনে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত করেছেন তোমার 'জীবন দেবতা'। যে 'জীবন-দেবতা'র পানে তাকিয়ে তুমি ওঠো, বসো, ঘুমোও, জাগো। যাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তুমি, সবাইকেই ধমক্ দাও। সেই তোমার 'জীবন দেবতা' তোমাকে সত্যপথ দেখিয়ে দিন্—এই তোমার হিতার্থী বড়দার উদ্বিগ্ন হৃদয়ের আশীর্বাদ।

আমি তো তোমাকে সেদিনই বলেছি রাধু, আমার প্রথম জীবনে যদি এই স্বর্গীয় আশীর্বাদ না নামত, আজকের এই 'আমি'র অস্তিত্বই সম্ভব হোতো না।[২]

আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছো, তা যদি আমি নিজের জীবনে না পেতুম ভাই, এ সাহিত্য সম্ভব হোতো কি? সুতরাং আমি তোমাকে পথ নির্দেশের অনধিকারী নই, বিশ্বাস করতে পারো। রাগ কোরো না। সেদিন তুমি রাগ করেছিলে বলেই এত কথা লিখলুম। তোমার বুড়ো বড়দার জীবনটা একেবারেই ফাঁকিতে গড়া নয় রে ভাই। কখনও যদি সম্ভব হয়, তোমাকে বলবো একটা কাহিনী। শুনতে গল্প উপন্যাসের মতই অবাস্তব লাগবে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্যি আমার জীবনে আর কিছুই ঘটেনি।

আমার আশীর্বাদ জেনো। মনস্থির করে ফেল। আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাচ্চি। দেখা হবে। আশীর্বাদক—বড়দা।

এ চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলো, আমার অনুরোধ।

মণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণি, ধন্যবাদ। ললিত আমার বড় উপকার করেছে। তারই জন্য ধন্যবাদ।

আমার একটা তোমাকে কাজ করে দিতে হবে। তুমি সাহেব মানুষ অনায়াসেই পারবে। যথা— (১) একবার ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অফিসে যেতে হবে। ঐ জমিটার দরুণ হাজার পাঁচেক টাকা দিয়েছি, কিন্তু এখনও তাদের কাছ থেকে চিঠি পাইনি। কয় ইনস্টলমেণ্টে বাকি টাকা দিতে হবে এবং কবে কবে দিতে হবে, সেটা জানা দরকার।

(২) আমি আগে জানতাম না যে, বাকি টাকার দরুণ সুদ দিতে হয়। আমরা গরীব লোক, সুদ দেওয়া আমার পোষাবে না। অতএব বাকি টাকাটা একেবারেই দিয়ে দিতে চাই, যখনই তারা দিতে বলবে।

(৩) বাকি টাকা এখুনি দিলে আমাকে কত টাকা দিতে হবে? শুন্‌চি আমার দেয় টাকার মধ্যেই নাকি তারা সুদ ধরে রেখেচে। যদি আমি আগে জানতাম যে সুদ দিতে হয় তো ৫০% এখন দেবার এবং পরে ক্রমশঃ ৫০% দেবার আবেদন করতাম না— এই বলতাম যে সমস্ত দামটাই একেবারে দিয়ে দেব।

এখন টাকার 'ডিমাণ্ড সর্বত্রই। সুতরাং আমি যদি বলি, বাকি টাকা এখুনি দেব তাতে কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ আপত্তি করবে না অর্থাৎ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এ কথা বলবে না যে বাকি টাকা ইনস্টলমেণ্টেই দিতে হবে।

শুধু কথা এই যে, আমাকে এখুনি দিতে হবে কত? যদি তারা বলে যে বাকি পাঁচ হাজারই দিতে হবে, তাহালে না হয় তাই দেব। কারণ সমস্তটা দেব অথচ সুদশুদ্ধ দেব তা নিশ্চয়ই করব না।

প্ল্যান এখনও তৈরি হয়নি। হলেই বাড়িটা সুরু করে দেব।

ইতি ১৪ই ফাল্গুন '৩৮।—দাদা

জবাবটা শীঘ্র দিও।[১]

শ

নির্মলারাণী দেবীকে লেখা

সামতাবেড়

পরম কল্যাণীয়াসু,

বউমা, তোমার পাঠানো জিনিসপত্র পেয়ে অতিশয় আনন্দ লাভ করেচি। বিশেষতঃ ললিতকে পাঠানোর জন্যে। সে যে বড় বউয়ের কাজে কি কাজেই লেগেছে, কি পরিশ্রমই সমস্ত দিন করেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমি বোধ হয় মঙ্গল বারে তোমাদের ওখানে যাবো।[১]
ইতি ১৪ই ফাল্গুন ১৩৩৮। দাদা

কল্যাণীয়া শ্রীমতী নির্মলারাণী দেবী

বউমা, তোমার নামে 'নব বিধান'-এর বাঙলা ফিল্‌ম করবার অধিকার দিতে আমি সম্মত আছি। তুমি আমাকে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেই আবশ্যকীয় লেখা-পড়া করে দেবো।
১, ৪, ৩৬

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ ছবি ভালো হলে তোমাকে 'বিপ্রদাস' দেবার ইচ্ছাও আমার রইল।[২]

শচ

নির্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাওড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

নির্মল, ঠিকানাটা ঠিক না থাকার জন্য তোমার চিঠিখানি হাতে পেতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। যাই হোক, মারা যায় নি। দেহ নিয়ে কি দুঃখটাই পেলাম। তবে এখন মনে হয় ভালর দিকেই যাচ্ছে।

একটা কথা। আমার হাতের রেখা ত তোমার মনে আছে, বলতে পার পথের দাবীর দ্বিতীয় সংস্করণ করাবো না সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

বোধ হয় ২।৪ দিনে একবার কাশী যাবো। তুমি আমার বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। ইঁ।ত ৮ই কার্তিক ৩৩

আশীর্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চরণদাস ঘোষকে লেখা

১.

১১ই পৌষ, ৩১

বাজে শিবপুর, হাওড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার বই আমি পড়েছি। হঠাৎ একটা অর্শ (?) হওয়ায় ১৫/১৬ দিন এক প্রকার শয্যাগত ছিলাম, ২/৩ দিন থেকে একটু ভালো আছি। চিঠিতে মতামত দেওয়া শক্তও বটে এবং দিতে ইচ্ছাও করি নে। তুমি এদিকে যখন আসবে তখনই সমস্ত খুলে বলব।

আশা করি তোমার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়েছে। কি নাগাদ এদিকে আসবে?

তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.

বাজে শিবপুর, হাওড়া

২৯-১১-২৪

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার অসুস্থতার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্র নিরাময় হও। তোমার 'ছন্নছাড়া' বইখানি সম্বন্ধে একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। ১০/১২ পাতা মাত্র পড়ার পরে আমাকে বাহিরে যাইতে হয়, এই অবসরে বইখানি মেয়েদের হাতে পড়ে। তাহার পর হইতে পাড়ায় এ-হাত ও-হাত ঘুরিতেছে কোনমতেই পাইতেছি না। তবে কথা পাইয়াছি যে হয় কাল কিম্বা পরশু নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দিবে। হয়ত আরও ৪/৫ দিন দেরি হতে পারে, কিন্তু হারাইবে না, তাহা ঠিক। হাতে পাইলেই পড়িয়া ফেলিব এবং যাহা কিছু বলা প্রয়োজন বলিব। আমার অনিচ্ছা এবং নিষেধ সত্ত্বেও এইরূপ হইয়াছে বলিয়া আমি লজ্জিত। কিন্তু কোনক্রমেই ইহারা কথা শুনে না, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া এইরূপ অত্যাচার করে।

যাই হোক, আমি ৫/৭ দিনের মধ্যেই তোমাকে জানাইতে পারিব আশা করি। সময়মত আরোগ্য সম্বাদ জানাইলে সুখী হইব।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিমলকুমার ঘোষকে লেখা

বাজে শিবপুর, হাওড়া
৪ঠা চৈত্র, ১৩৩১

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পাইয়া চৈতন্য হইল। নানা অকাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে সাহিত্য সম্মিলনের কথা মনেই ছিল না, সাহিত্যের সঙ্গে যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। এখন মনে হয়, এই ভারটা যোগ্যতর ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইলেই আপনারা ভাল করিতেন। যাই হোক, এখন আর বদল করিবার যো নাই। অভিভাষণ তো ইতিপূর্বে কখনো লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই, ও সব আমি জানিও না। শুনিয়াছি এই সকল লিখিতে ভয়ানক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। পড়াশুনা আমার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং গভীর গবেষণার লেখা আমি মোটেই পারিব না। না জানি ইংরাজি, না জানি সংস্কৃত—ছোট বড় গল্প লিখি....যা মনে আসে। কারও ভাল লাগে, অধিকাংশেরই লাগে না,—সবাই গালিগালাজ করে,....আমি যে কি লিখিয়া লইয়া যাইব ভাবিয়া পাই না। আপনি সম্পাদক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব আপনার। আমি কংগ্রেস লইয়াই পড়িয়া আছি—সেই আমার ভাল। দেশোদ্ধারের বক্তৃতা দেওয়া ঢের সহজ।

আমার থাকিবার আবার বন্দোবস্ত কি? সঙ্গে একটি চাকর যায়, যেখানেই যাই। একটা ঘর-টর কিছু দেবেন---কেটে যাবে।

....কিছুকাল পূর্বে নবীন সাহিত্যিকের দল আমাকে শাসাইয়া রাখিয়াছিল যে....তাহারা দল বাঁধিয়া যাইবে। কারণ, আমি যাবো।

ভাল কথা, কবে হবে? পূর্বাহ্নে একটা খবর দেবেন। এমন না হয় ভুলে গিয়ে বসে থাকি।

আশা করি কুশলে আছেন। কুমুদ যাবে নাকি? সে তো প্রায়ই যায়। আর একটা কথা। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মশায়কে আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেবেন, যদি একটু নিরালা জায়গা পাই। না পাই না-ই নাই।

পুঃ—আপনি যদি সম্পাদক তো একটা উপকার করে রাখবেন। সাহিত্য কি, কোন্ ধাতুর উপর কোন্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়। আর্ট কি, তার কি উদ্দেশ্য, মুন্সীগঞ্জের কি বিশেষত্ব—তা, গুণকীর্তন করার পক্ষে কি কি দরকারি অর্থাৎ যে সব ভাল ভাল কথা বলিতে পারিলে লোকে বলিবে আহা বেশ লেখা হইয়াছে---এই রকম কিছু একটা আমার জন্য হয় নিজে লিখিয়া না হয় সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আমি অভিভাষণে জুড়িয়া দিব।

আপনাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানসী রায়কে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
৮ই মাঘ, ১৩৩৯

মানসী,

সংসারের যাত্রাপথে আজ একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি আর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষের প্রতীক্ষায় তোমার এই বৃদ্ধ জ্যাঠামশাই। আশীর্বাদ করি এই সুদীর্ঘ পথ যেন তোমার সুগম হয়, সুন্দর হয়, সহজ হয়।

আশীর্বাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্রজমোহন দাসকে লেখা

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

দাদার সম্বর্ধনার আয়োজন তোমরা করছো। এ যে আমার কাছে কত বড় আনন্দের সংবাদ তা বলে শেষ করা যায় না। দাদা বৃদ্ধ হয়েছেন, বাঙলা সাহিত্য সেবায় শেষ পুরস্কার দেশের লোকের কাছে দাবী করার তাঁর সময় হয়েছে বললে, অন্যায় হবে না। মনে হয়, দেশের পক্ষ থেকে এই আয়োজন আরও পূর্বে হওয়াই উচিত ছিল।

যাঁরা আমার এ কথাটা স্বীকার করেন, জলধরদাকে যাঁরা ভালোবাসেন, আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, যেন তোমাদের এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করেন। আমি নিজেও তোমাদের মধ্যে আছিই, যে কোন ভার আমাকে দেবে সানন্দে গ্রহণ করবো। ইতি—২৯শে বৈশাখ, ১৩৪১।

তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পান্নালাল বোসকে লেখা

১৩-০১-২১

প্রিয়বরেষু,

কিছুদিন হল, আপনার চিঠি এবং সেই তর্জমার কপিটা পেয়েছি কিন্তু হঠাৎ বাড়ি যেতে হয়েছিল বলে জবাব দেওয়া ঘটেনি। আপনি হয়ত কিইবা মনে করছেন।

সেদিন থমপস্ন সাহেব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ক্যারিংটন সাহেব প্রশান্ত মহলানবিশকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ উপস্থিত, তাঁরা ও ক্ষিতীশবাবু তর্জমার প্রায় সমস্তই সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি শুধু এইটুকু বলে দিলাম যে এই-ই চরম অর্থাৎ শেষ কথা নয়। অন্ততঃ আরও কিছু improvement এর উপর হতে পারে। আচ্ছা, যদি কিছু না মনে করেন আপনাকে একটু কষ্ট দেব? শ্রীকান্তর দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়টা যদি একবার তর্জমা কোরে দেন একবার দেখি। বলেন তো শ্রীকান্তগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দিই। আমার নিজের একান্ত ইচ্ছা যদি তর্জমাই হয় তা প্রথমে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় ভাগই বার হোক। সেদিন প্রশান্ত মহালনবিশও তাঁদের সেই কথাই বলছিলেন এবং Thompson সাহেব আশা দিয়েছেন তিনি ছাপার পূর্বে সমস্ত নিজে revise করে দেবেন। আমার মনে হয় তিনি ঐ উপকারটুকুই আমার করতে পারেন। মৌলিক তর্জমা বিদেশীকে দিয়ে হবেও না, হওয়া সম্ভবপরও নয়।

কালিদাস রায়কে লেখা

কালিদাস,

কুমুদবাবু'র কাছে সমস্ত শুনলাম। আনন্দের সঙ্গে অর্থাৎ পরমানন্দে সম্মতি দিলাম। শুধু দেখো ভাষাটা যেন গোড়ার লেখাটার সঙ্গে মেলে। নইলে একটুখানি বেমানান দেখাতে পারে।

শরৎ'দা

তোমার রসচক্রে একদিন যোগ দেবার বাসনা রইলো।

পত্র-পরিচিতি

সুরেন্দ্রনাথকে লেখা

১ সেকালের ভাগলপুরের বিপ্লবী দলের এক যুবক। স্বদেশী কাজে ইনি শরৎচন্দ্র ও সুরেনবাবুর ভক্ত ছিলেন। ইনি তখন ভাগলপুর কলেজে পড়তেন এবং কলেজে পড়ার সময়েই টি, বি, রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

২ সুরেনবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে ভাগলপুরে তাঁত ও দেশলায়ের কল বসানো এবং তার ব্যর্থতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মুখে বলা গল্প, *শরৎচন্দ্র*-এ (২য় খণ্ড) বৈঠকী গল্প বিভাগে 'তাঁত' গল্পে বিস্তৃত ভাবে দিয়েছি দেখুন।

৩ এস, আর, দাশ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল। কিন্তু সি, আর, দাশ বিখ্যাত ব্যারিস্টার হয়েও দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে 'দেশবন্ধু' হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এখানে দেশবন্ধুর এই বড়ত্ব বা মহত্বের কথাই ইঙ্গিত করেছেন। এস, আর, দাশ ছিলেন দেশবন্ধুর জ্যাঠতুতো ভাই।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা

১ বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্বাধিকারী। ইনি ১৯১৯-৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭ খণ্ডে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থাবলির ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২১-২-২৩ তারিখে।

২ *গৃহদাহ* ও *বামুনের মেয়ে* ছাড়া 'মহেশ' গল্পটি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

রাধারাণী দেবীকে লেখা

১ ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭ তারিখে রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠিটির ৭ম ও ৮ম অনুচ্ছেদ এবং ওই সঙ্গের পত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

২ শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি থেকে তাঁর জীবনের তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা একটা পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছি—(১) কেন তিনি প্রথম যৌবনে শত যোজন দূরে রেঙ্গুন চলে গিয়েছিলেন। (২) আত্মসংযম ও আত্মসংবরণে পরিশুদ্ধ তাঁর অন্তরের এক পবিত্র প্রেম। (৩) তাঁর সাহিত্যে তাঁর প্রথম জীবনে নেমে আসা ওই স্বর্গীয় আশীর্বাদের প্রভাব।

মণীন্দ্রনাথ রায়কে লেখা

১ চিঠিটি কলকাতায় শরৎচন্দ্রের জায়গা কেনা সংক্রান্ত।

নির্মলারাণী দেবীকে লেখা

১ নির্মলাদেবী মণীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী। ৮.২.৩২ তারিখে শরৎচন্দ্র মণিবাবুকে লিখেছিলেন, 'শনিবারে বড় বৌয়ের একটা ব্রত প্রতিষ্ঠার বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন'। সেই বামুন খাওয়ানোর জন্যই নির্মলাদেবী ও মণিবাবু জিনিসপত্র দিয়ে তাঁদের গোমস্তা ললিত চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে ছিলেন। শরৎচন্দ্র এই চিঠিটিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি না লিখে ভুল করে বাঙলা সালের সঙ্গে ১৪ ফাল্গুন লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি এবং আগের পৃষ্ঠায় ছাপা মণিবাবুকে লেখা চিঠিটি কলকাতায় 'বিড়লা অ্যাকাডেমি' থেকে সংগ্রহ করেছি।

২ নির্মলা দেবী শেষ পর্যন্ত কি *নব বিধান* আর কি *বিপ্রদাস* কোনটারই ফিল্‌ম করবার সত্ব শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে কেনেননি। নির্মলা দেবীকে লেখা এই শেষের চিঠিটি নির্মলা দেবীর পুত্র প্রদীপকুমার রায়ের কাছে পেয়েছি।

নির্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা

১ নির্মলবাবু সম্বন্ধে কিছুটা হদিস্ পেয়ে, তাও তাঁর পুরো ঠিকানা জানতে না পেরে আন্দাজেই, আমার পরিচিত বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌সপেকটর অফ্ স্কুলস গোপালচন্দ্র ঘোষের ঠিকানায় নির্মলবাবুর নামে একটা চিঠি দিই।

গোপালবাবু নির্মলবাবুর বাড়িতে চিঠিটি পাঠিয়ে দেন। আমি লিখেছিলাম, 'আপনি কি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন? আপনি কি উমাপ্রসাদবাবুদের বাড়িতে একদিন শরৎচন্দ্রের হাত দেখেছিলেন? আপনার কাছে আপনাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোনো চিঠি আছে কি?' ইত্যাদি।

আমার চিঠি পেয়ে নির্মলবাবু আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে আমার প্রশ্নের উত্তর ছাড়া বাঙলার নারী সমাজের ও দেশের দুঃখে শরৎচন্দ্রের অশ্রুপাত করারও কথা থাকায় সমস্ত চিঠিটিই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

প্রসন্ন ভবন
কালীতলা
পোঃ বাঁকুড়া

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সহিত যদিও পূর্বে পরিচয় ছিল না, তথাপি আপনার পত্রদ্বারা পরস্পর পরিচিত হইলাম। আপনি এখানে ডি, আই, অফ্ স্কুলস-এর ঠিকানায় আমার নামে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার অনুমান সঠিক। আমিই নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার একান্ত

বন্ধুস্থানীয় সহপাঠী। আমরা উভয়ে সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দেখাশুনা ও নানা আলোচনা স্যার আশুতোষের বাড়িতে ও শরৎবাবুর পল্লীগৃহে করিয়াছি। স্যার আশুতোষের গৃহেতে শরৎবাবুর হাত দেখার সৌভাগ্য আমার হয় এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত কয়েকটি পত্রালাপ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়া মাত্র একটি পোষ্টকার্ড পাইলাম। তাহারই 'ট্রু কপি' আপনার নিকট আপনার পুস্তকে প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। শরৎবাবু মহাপ্রাণ দরদী লেখক ছিলেন এবং বাঙ্গলার নারী-সমাজের ও দেশের দুঃখেতে আমার নিকট অশ্রুপাতও করিয়াছিলেন। যদি প্রয়োজন হয় আমায় লিখিলে তাঁহার বিষয় আরও জানাইব। আপনার মহৎ চেষ্টা সফল হউক ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। আমার নমস্কার লইবেন। ইতি—২৮, ৬, ৬৯

বিনীত—
শ্রীনির্মলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের দুঃখে শরৎচন্দ্রের অশ্রুপাত করার কথা আমি আরও জানি। এখানে তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

দেশবন্ধুর সহকর্মী হিসাবেই সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। বাঙ্গলা দেশে ফজলুল হকের কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার আমলে এই সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র আইন সভার অধ্যক্ষ ছিলেন।

শহীদ সুশীলকুমার দাশগুপ্তর দাদা সেকালের কংগ্রেস কর্মী বিনয়কুমার দাশগুপ্ত (বিনয়বাবু আজও এই প্রসঙ্গ লেখার সময় জীবিত আছেন এবং ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুরের কাছে কালিয়া নিবাস কলোনীতে বাস করছেন।) একদিন আমাকে বলেছিলেন—

সত্যেন মিত্র যখন আইন সভার অধ্যক্ষ, সেই সময় একদিন রবিবারে দুপুরের দিকে আমি শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। শরৎচন্দ্র আমাকে স্নেহ করতেন, তাই তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনেই সেদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

আমি গেলে, দু'একটা কথার পর শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন, সত্যেন মিত্রকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

আমি সত্যেনবাবুর বাড়ি থেকে তাঁকে ডেকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলে, শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে বসিয়ে আবেগ ভরে বললেন—সত্যেন, দেশটা কিভাবে কবে স্বাধীন হবে বলতে পার?

শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে যখন এই কথাগুলো বলেন, তখন ঘরে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। দেখলাম শরৎচন্দ্র সত্যেনবাবুকে ওই কথাগুলো বলবার সময় তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

চরণদাস ঘোষকে লেখা ১ ও ২

চরণদাস ঘোষের জন্ম ২৯ মে ১৮৯৫ সালে বর্ধমান জেলার বাইতিপাড়া গ্রামে। পিতার নাম মথুরাকিশোর ঘোষ। ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ভাগলপুরে ডাকবিভাগের কর্মী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। *নিরক্ষর, দান, নাগরিক, কামরূপ, তেপান্তর, ছন্নছাড়া* তাঁর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস। *সুহাস* নামে একটি গল্পগ্রন্থও রচনা করেন। *পাঠশালা* পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ১৩৫৬ সাল থেকে

১৩৬০ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি হাওড়া জেলাতে এসে বসবাস শুরু করেন। প্রায়ই শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আসতেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

অধ্যাপক অলোক রায়ের *শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র* বইয়ে চরণ দাস ঘোষকে লেখা এই চিঠি দুটি ছাড়া ১৩৩৬ সালের ৩ কার্তিক সামতাবেড় থেকে চরণদাসকে লেখা একটা চিঠি আমার *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী* বইয়ে আছে। সেই চিঠির পত্র-পরিচিতিতে চরণদাসের পরিচিতি হিসাবে লিখেছি 'নিরক্ষর' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক। চরণদাসবাবু হাওড়া শহরে থাকতেন। শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন চরণদাসবাবু মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন।

পরিমলকুমার ঘোষকে লেখা

ইনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *দীপিকা* ও *প্রাচী* পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ইনি হুগলি মহসীন কলেজের অধ্যাপক হন।

মানসী রায়কে লেখা

তাঁর স্নেহধন্য বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা মানসীর বিবাহে উপস্থিত থাকতে না পেরে শরৎচন্দ্র এই আশীর্বাণী লিখে পাঠিয়েছিলেন।

ব্রজমোহন দাসকে লেখা

কবি ব্রজমোহন দাসের বাড়ি ছিল হাওড়া শহরে, ইনি হাওড়ার সংগীত ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ছিলেন।
ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেনের সংবর্ধনায় অন্যতম প্রধান ছিলেন।

পান্নালাল বোসকে লেখা

এই চিঠিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। *আ গোল্ডেন বুক অফ শরৎচন্দ্র সেন্টিনারি ভল্যুম* থেকে যতটা অংশ পাওয়া গেছে তাই-ই এ গ্রন্থে সংকলন করা হল।
শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকীর সময় কলকাতা থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এস. ইউ. সি. *আ গোল্ডেন বুক অফ শরৎচন্দ্র* বইটি বহু অর্থব্যয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

কালিদাস রায়কে লেখা

অধ্যাপক অলোক রায়ের শরৎচন্দ্রের *চিঠিপত্র* বইয়ের এই চিঠিটি আমার *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী* বইয়েও আছে। অলোকবাবুর বইয়ে এই চিঠির কোনো ইতিহাস বা প্রসঙ্গ-কথা নেই। আমি আমার ওই বইয়ে এই চিঠি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। এখানে আরও কিছু বলছি—
চিঠির কুমুদবাবু হলেন কুমুদ রায়চৌধুরী। তিনি কলকাতায় আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক এবং '*রসচক্র*'-র সদস্য ছিলেন।
চিঠির 'সমস্ত শুনলাম' হল—বারোজনে মিলে একটা বারোয়ারি উপন্যাস লেখা।

'রসচক্র' প্রতিষ্ঠানের *রসচক্র* নামক উপন্যাসের প্রথম বা গোড়ায় লেখাটা ছিল শরৎচন্দ্রের। কিছুটা প্রাসঙ্গিক কথা সহ সেই লেখাটা এখানে দিলাম :

বারোয়ারি উপন্যাস

রসচক্র

বারোয়ারি উপন্যাস হল, বারোজনে মিলে লেখা একটা উপন্যাস। এই উপন্যাস লেখার পদ্ধতি বা প্রথা হচ্ছে, প্রথমে একজন লেখক আরম্ভ হিসেবে উপন্যাসের গোড়ার দু-একটা পরিচ্ছেদ লিখবেন। তাঁর ওই লেখা পড়ে গল্পের গতি কি হতে পারে বা হওয়া উচিত তা ভেবে নিজের চিন্তা ও বুদ্ধি অনুযায়ী পরের লেখক লিখবেন। এইভাবে একে একে অপর সকলেও লিখবেন। এঁরা কোনোদিনই একত্রে বসে গল্পের মূল কাহিনি নিয়ে আলোচনা করবেন না। প্রত্যেক লেখক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাহিনির সামঞ্জস্য রেখে কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন।

রসচক্র বারোয়ারি উপন্যাসের প্রথম লেখা শরৎচন্দ্রের হলেও, এই লেখা প্রথমে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশী থেকে প্রকাশিত *প্রবাস জ্যোতিঃ* পত্রিকায় 'বাড়ির কর্তা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ওই কাশী থেকেই প্রকাশিত *উত্তরা* পত্রিকায় রসচক্র বারোয়ারি উপন্যাসের সূচনা হিসাবে *উত্তরা*-য় শরৎচন্দ্রের এই লেখাই প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালের ১১ বৈশাখ।
রসচক্র-য় শরৎচন্দ্রের যেটুকু লেখা প্রকাশিত হয় তা সংক্ষেপে হল :

> রাজসাহী শহরের কিছুটা দূরে বিরাজপুর গ্রাম। এই গ্রামের মৈত্ররা বেশ অবস্থাপন্ন। এই বংশের বড়ো শিবরতন গ্রামেই জমিদারের কাছারিতে কাজ করেন। সেজ শম্ভুরতন রাজসাহী শহরে আদালতে পেসকারী করেন। ন' বিভূতিরতন কলকাতায় একটা সওদাগরি অফিসে ভালো চাকরি করেন। মেজ এবং ছোটো দু-ভাই শিশুকালেই মারা যায়।
> এঁদের পিতা জীবিত নেই, তবে মা আছেন। একান্নবর্তী পরিবার। তিন ভাই-ই বিবাহিত। ন' সস্ত্রীক কলকাতায় থাকেন। তাঁর স্ত্রী বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় কলকাতা থেকে এসে এক মাস প্রায় বাড়িতে থাকে।
> ন-বউ বড়লোকের মেয়ে, লেখাপড়া জানে, তার কাপড়-গহনা প্রচুর। সংসারে কাজেরও। শিবরতন ন-বউমাকে খুবই স্নেহ করেন। তিনি সর্বদাই ন-বউমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এতে বাড়ির অপর দু বউ তাদের ন-জাকে ঈর্ষা করে। এই দু বউ-এর লাগানোয় এদের শাশুড়িও ন-বউকে একেবারেই দেখতে পারে না।
> সেবার বিজয়ার দিনের ঘটনা। ন-বউ বড় লোকের মেয়ে বলে প্রতিবেশী ধরণী সান্যালদের বাড়ির মেয়েদের সরায় দুটো সন্দেশ কম দিয়েছে, এই অজুহাতে তাকে তার দু-জা ও শাশুড়ি কটূক্তি করেছে।
> সেদিন ন-বউকে তার শাশুড়ি গালাগালি করছে, ন-বউ মুখ বুজে একটা জায়গায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাঁট দেবার সময় সামনে তার স্বামীর জুতো জোড়া থাকায়, পা দিয়ে ঠেলে দেয়। তখন কীভাবে একপাটি জুতো সেখানে উপস্থিত তার শাশুড়ির পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে।
> ব্যাস্, আর যায় কোথা শাশুড়ি তার বড়ো ছেলের কাছে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে বলে—শিবু আমার গুরুর দিব্যি রইল, তোদের বাড়িতে আর আমি জল-গ্রহণ করব না, এর বিচার করিস। ন-বউ বড়লোকের বেটি, আজ আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে।
> সেখানে তখন শিবুর অপর দু-ভাই উপস্থিত ছিলেন। মা-র ওই কথা শুনে তিন ভাই-ই স্তম্ভিত

> হয়ে গেলেন। বাড়িতে তখনও পূজা উপলক্ষ্যে আসা লোকজনরা আছেন। তাঁরাও বৃদ্ধার দিব্যি শুনলেন।
>
> ন-বউ যখন ঝাঁট দিচ্ছিল, তখন শিবরতনের ছোটো মেয়ে গিরিবালা সেখানে উপস্থিত ছিল। শিবরতন ছোটো মেয়েকে জিজ্ঞাসা করায় সে আসল ঘটনাটা বল্‌ল।
>
> শিবরতন প্রকৃত ঘটনা শুনলেও, যেহেতু মা-র দিব্যি তাই তিনি বিচার করে ন-ভাই বিভূতিকে বললেন—ওই জুতো তোমার স্ত্রীব মাথায় তুমি তুলে দেবে। উঠোনের মাঝখানে তিনি মাথায় নিয়ে সমস্ত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবেন। তোমার ওপর আমার এই আদেশ।
>
> শিবরতন মা-র সম্মান রক্ষার জন্য ন-বউমার উপর এতবড অপমানকব শাস্তি দিলেন বটে, কিন্তু তবুও তাঁর প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী ন-বউমার ওই অপমানেব জন্য তাঁর নিজের চোখ দিয়েই টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়াতে লাগল।

আমি আমার বইয়ে শরৎচন্দ্রেব যে চিঠিটা উদ্ধৃত করেছি, তাতে কোথাও 'ভাষাটা' শব্দ নেই। অলোকবাবুর বইয়েব চিঠিতে এটা সংকলকের সংযোজন। 'ভাষাটা' নয় 'গোড়ার লেখাটার সঙ্গে মেলে' এইটাই ছিল শরৎচন্দ্রেব আসল কথা।

অধ্যাপক অলোক রায়েব *শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র* নামে একটা বই আছে। তা থেকে আমার বইয়ে নেই এমন ৩টি চিঠি এই বইয়ে দিয়েছি। সেগুলি এবং পরবর্তী কালে আমার সংগৃহীত আরও কয়েকটা চিঠি বইয়ের শেষে এই 'সংযোজন' অংশে দিয়েছি।

আমার আগের *শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী* গ্রন্থে প্রতিটি চিঠির শেষে পত্র-পরিচিতি বা প্রসঙ্গ কথা দিয়েছিলাম। এবার প্রকাশকের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বভারতীয় আদর্শে সমস্ত চিঠির শেষে পত্র-পরিচিতি স্থান পেয়েছে।।.

অলোকবাবু তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন :

> শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের মত তাঁর চিঠিপত্রও বার বার মুদ্রিত হবে। .. শ্রীগোপালচন্দ্র বায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী'র পাঠ আমরা সকলেই অবশ্য মান্য বিবেচনা কবি।...
>
> শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা আবার জানাই। তাঁর গ্রন্থাবলি এখন জাতীয় সম্পদ। আমরা তাঁর সংগ্রহ এবং মতামত বিশ্লেষণ সাগ্রহে গ্রহণ করেছি।

উত্তরকথন

উত্তরকথন

শরৎচন্দ্রের চিঠি সংগ্রহের জন্য কী পরিশ্রম করেছি, তা আগে 'প্রাক্‌কথন'-এ বলেছি। দুটো .... ও বড়ো কাহিনি বলা হয়নি। সে দুটো এই উত্তরকথনে বলি :

১. শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর সময় ১৭-১১-১৯৭৬ তারিখের *দৈনিক বসুমতী* পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

> কোচবিহারে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পালন।/নিজস্ব সংবাদাতা/কোচবিহার/শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা শাসক এন. এস. খারোলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত জেলার শতবার্ষিকী কমিটির এই প্রদর্শনী। শরৎচন্দ্রের বহু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, কিছু পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র এবং তাঁর লেখার প্রচুর কোটেশান ও বৈচিত্র্যময় জীবনের ঘটনাপঞ্জী প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

দৈনিক বসুমতী-তে প্রকাশিত এই সংবাদ পড়ে আমি শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি, বিশেষ করে তাঁর চিঠিপত্রের সন্ধানে কোচবিহারে যাই। গিয়ে, প্রদর্শনী তখন শেষ হয়ে যাওয়ায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেব গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপির কথা জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরে তিনি বললেন, 'শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি বা পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়নি। নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদপত্রে ভুল খবর পাঠিয়েছিলেন।'

২. শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মস্থান হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে একবার সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। বহুবারই সেখানে বক্তৃতা দিতে গেছি।

সেদিন সভার শেষে, সভার প্রধান উদ্যোক্তা দেবানন্দপুর শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক দীনবন্ধু ঘোষের এক বন্ধু আমার কাছে এসে তাঁর নিজের নাম বলে (নামটা মনে আছে—জ্যোতিপ্রকাশ) বললেন—আমার বাড়ি চন্দননগরে। আমার সংগ্রহে শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি আছে। আমার কাকা একবার পুরী বেড়াতে গিয়ে সেখানে যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলেই শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের এক বন্ধুও গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাকার আলাপ হয় এবং পরে বন্ধুত্বও হয়। তিনি তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি এক সময় কাকাকে দিয়েছিলেন। সেই চিঠি বর্তমানে আমার কাছে আছে।

এই শুনেই আমি জ্যোতিবাবুর ঠিকানা নিয়ে, পরের রবিবারেই তাঁর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের

ওই চিঠির নকল নিতে যাব বললাম। জ্যোতিবাবু রাজি হলেন।

পরের রবিবার সকালেই স্নান আহার করে আমার কলকাতার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে বেলা ১২টা নাগাদ চন্দননগরে জ্যোতিবাবুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। আমি যখন যাই জ্যোতিবাবু তখন তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তিনি বাহিরে এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। দেখলাম—বনেদি বড়োলোকের বিরাট দু মহলা বাড়ি। বার মহলে বেশ বড়ো ঠাকুর দালান। ঠাকুর দালানটি সামনের উঠোন থেকে অনেকটা উঁচু। ওই ঠাকুর দালানে পাতা কয়েকটা চেয়ারের মধ্যে একটায় আমাকে বসিয়ে জ্যোতিবাবু বাড়ির ভিতরে স্নান করতে গেলেন।

ঠাকুর দালানে নির্জন মহলে একা বসে আছি। কেউ কোথাও নেই। লোকজনের অল্প যা সাড়া পাচ্ছি, সে ওই ভিতর মহলের। এমন সময় হঠাৎ দেখি—বিরাট এক অ্যালসেসিয়ান কুকুর বাড়ির ভিতর থেকে এসে আমার সামনেই ঠাকুর দালানের উঠোনে ঘুরে ঘুরে কী যেন শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল।

আমার তখন কী ভয়াবহ অবস্থা! ভাবলাম. এখুনি বুঝি ওই ভীষণ কুকুরের কামড়ে জীবনটা যায়। ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলাম। তবুও স্থির হয়েই ভাবছি, কী করে আত্মরক্ষা করবো।

আমার সৌভাগ্যবশতই হয়তো কুকুরটা উপরের দিকে ঠাকুর দালানে না তাকিয়ে উঠানের আশপাশেই শুধু কিছুক্ষণ ধরে শুঁকে শুঁকে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

বুঝলাম, কুকুরটা অচেনা মানুষের গন্ধ পেয়েই শুঁকে বেড়াচ্ছিল। ভয়ে ভয়েই ভাবছি, কুকুরটা হয়তো আবার এখনই ফিরে আসবে। এবার এসে উপরে ঠাকুর দালানের দিকে তাকিয়ে হয়তো আমাকে দেখতে পাবে। ঠাকুর দালানের থামের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ার দিয়ে আটকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবো. তখনও সমানে ভাবছি।

এইভাবে ভয়ে ভয়ে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। যখন কেবলই ভাবছি, কুকুরটা হয়তো এখনই আসবে। তখন দেখি কুকুরের বদলে কুকুরের মনিব জ্যোতিবাবু স্নান সেরে এসে দেখা দিলেন।

আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই জ্যোতিবাবুকে বললাম— মশায় আমাকে একেবারে মৃত্যুর মুখে বসিয়ে রেখে গেসলেন। আপনি চলে যাবার পরেই আপনার কুকুর এসে উপস্থিত। ভাগ্য ভালো যে দেখতে পায়নি।

আমার কথা শুনে সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তেই জ্যোতিবাবু শুধু বললেন. 'ওঃ কুকুরটা ছাড়া ছিল বুঝি।'

এই কথায় কী আর বল্‌বো। চুপ করেই রইলাম।

এরপর জ্যোতিবাবু আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার সামনেই চিঠি খোঁজার জন্য একটা আলমারি খুললেন। আলমারির নীচের থাকে একটু খুঁজে বললেন, 'এইখানেই তো ছিল দেখছি নেই। চিঠিটা তাহলে গেছে। সে আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে শুধু শুধু আনলাম।'

বললাম, 'এ রকম কষ্টের অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। তবে আপনার কুকুরের কামড়ের মুখ থেকে যে রক্ষা পেয়েছি, সেটাই আমার আজকের বড় ঘটনা।'

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থাবলি

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলা তথা ভারত, এমনকী বহির্ভারতেরও বহু দেশে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সুপরিচিত।

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। জন্ম তারিখ ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর)। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের দু-ভাই ও দু-বোন ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের শিক্ষা গ্রামের বিদ্যালয়ে, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ও মাতুলালয় ভাগলপুরে। পিতা দীর্ঘকাল উপার্জনহীন ছিলেন। তাই এফ. এ. (আই. এ.) পরীক্ষার ফি ২০ টাকা জমা দিতে না পারায় পরীক্ষা দিতে পারেননি। তবে জীবনভোর পড়াশুনা করেছেন প্রচুর। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করেছেন রীতিমতো।

ভাগলপুরে মামার বাড়ির এক আত্মীয়র সঙ্গে রেঙ্গুনে চাকরি করতে যান ১৯০৩ সালে। বর্মার একাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে চাকরি করেছেন অনেক বছর।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র বিবাহ করেন দুবার। প্রথমা স্ত্রী এবং এক বছরের শিশুপুত্রের প্লেগে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন হিরন্ময়ী দেবীকে। হিরন্ময়ী দেবীর পিতা মেদিনীপুরের শ্যামচাঁদপুর গ্রামের কৃষ্ণদাস অধিকারী চাকরির সূত্রে রেঙ্গুনে থাকতেন।

হিরন্ময়ী দেবীর কোনো সন্তান হয়নি।

১৯১৬ সালে হঠাৎ দুরারোগ্য পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হয়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন। এসে হাওড়া শহরে বাজে শিবপুরে ও শিবপুরে থাকতেন।

এরপর হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদের তীরে দিদি অনিলা দেবীদের গ্রামের পাশে সামতাবেড়ে-য় বাড়ি করে বাস করতেন। পরে কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি করেন। এখানেও মাঝে মাঝে এসে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য-চর্চা করতেন, গল্প উপন্যাসও লিখতেন। রেঙ্গুনে গিয়ে অনেকগুলি বই লেখেন, আর দেশে ফিরে তো বটেই। তখন তাঁর লেখা এই বই-ই ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র অবলম্বন।

এই সময় তিনি (রেঙ্গুনে থাকতেও) *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন এবং সেজন্য দক্ষিণাও পেতেন। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মালিকেরই ছিল 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স' বইয়ের দোকান। এঁরাই শরৎচন্দ্রের বই বিক্রি করতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর যুগান্তকারী রচনার জন্য দেশবাসী তাঁকে অপরাজেয় ও অমর কথাশিল্পী আখ্যায় সম্মানিত করেন। অসংখ্য সংবর্ধনা সভায় সম্মানিতও হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা বই শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্বও করেছেন। সভাপতির আসন থেকে বলেছেন, 'শরৎ বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সেই স্রষ্টা, সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।'

১৩৪৪ সালের ২ মাঘ (১৯৩৮ এর ১৬ জানুয়ারি) শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬১ বৎসর ৪ মাস।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন :

> যিনি বাঙালির জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি।

পরে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ বাসরের দিন ১২ মাঘ তারিখে কবি আবার শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে এই কবিতাটি লিখেছিলেন :

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি।
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

গ্রন্থাবলি

শরৎচন্দ্র রচিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের একটা কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থগুলি ছাড়া শরৎচন্দ্রের কিছু অসমাপ্ত এবং টুকরো লেখাও আছে :

১৯১৩

সেপ্টেম্বর	:	*বড়দিদি* (উপন্যাস)

১৯১৪

মে	:	*বিরাজবৌ* (উপন্যাস)
জুলাই	:	*বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প* (গল্পসংকলন)
আগস্ট	:	*পরিণীতা* (গল্পগ্রন্থ)
সেপ্টেম্বর	:	*পণ্ডিতমশাই* (উপন্যাস)

১৯১৫

ডিসেম্বর *মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প* (গল্পসংকলন)

১৯১৬

জানুয়ারি : *পল্লীসমাজ* (উপন্যাস)
মার্চ : *চন্দ্রনাথ* (উপন্যাস)
আগস্ট : *বৈকুণ্ঠের উইল* (গল্পগ্রন্থ)
নভেম্বর : *অরক্ষণীয়া* (গল্পগ্রন্থ)

১৯১৭

ফেব্রুয়ারি : *শ্রীকান্ত* (১ম পর্ব, উপন্যাস)
জুন : *দেবদাস* (উপন্যাস)
জুলাই : *নিষ্কৃতি* (গল্পগ্রন্থ)
সেপ্টেম্বর : *কাশীনাথ* (গল্পসংকলন)
নভেম্বর : *চরিত্রহীন* (উপন্যাস)

১৯১৮

ফেব্রুয়ারি : *স্বামী* (গল্পসংকলন)
সেপ্টেম্বর : *দত্তা* (উপন্যাস)
সেপ্টেম্বর : *শ্রীকান্ত* (২য় পর্ব, উপন্যাস)

১৯২০

জানুয়ারি : *ছবি* (গল্পসংকলন)
মার্চ : *গৃহদাহ* (উপন্যাস)
অক্টোবর : *বামুনের মেয়ে* (উপন্যাস)

১৯২৩

এপ্রিল : *নারীর মূল্য* (প্রবন্ধ)
আগস্ট : *দেনা-পাওনা* (উপন্যাস)

১৯২৪

অক্টোবর : *নব-বিধান* (উপন্যাস)

১৯২৬

মার্চ : *হরিলক্ষ্মী* (গল্পসংকলন)
আগস্ট : *পথের দাবী* (উপন্যাস)

১৯২৭

এপ্রিল : *শ্রীকান্ত* (৩য় পর্ব, উপন্যাস)
আগস্ট : *ষোড়শী* (*দেনা-পাওনা*-র নাট্যরূপ)

১৯২৮

আগস্ট : *রমা* (*পল্লীসমাজ*-এর নাট্যরূপ)

১৯২৯

এপ্রিল : *তরুণের বিদ্রোহ* (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

১৯৩১

মে : *শেষ প্রশ্ন* (উপন্যাস)

১৯৩২

আগস্ট	:	*স্বদেশ ও সাহিত্য* (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

১৯৩৩

মার্চ	:	*শ্রীকান্ত* (৪র্থ পর্ব, উপন্যাস)

১৯৩৪

মার্চ	:	*অনুরাধা, সতী ও পরেশ* (গল্পসংকলন)
ডিসেম্বর	:	*বিজয়া* (*দত্তা*-র নাট্যরূপ)

১৯৩৫

ফেব্রুয়ারি	:	*বিপ্রদাস* (উপন্যাস)

১৯৩৮

এপ্রিল	:	*ছেলেবেলার গল্প* (গল্পসংকলন)
জুন	:	*শুভদা* (উপন্যাস)

১৯২৫ সালে Ferdinando Bellori Felippi ইতালীয় ভাষায় *শ্রীকান্ত* অনুবাদ করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ সেই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

Fragments of a Prisoner's Diary (p. 7, Vol. III; M N Roy) গ্রন্থে মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসকে *গীতাঞ্জলি*-রও উপরে স্থান দিয়েছেন : *Personally I would place Shesh Prashna above* Gitanjali.

সংশোধন

সংশোধন

১.

৩৩ পৃষ্ঠায় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিটির ২৩ পংক্তিতে আছে—'কানাকড়ি' এখনও পড়িনি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো লেখার প্রতিবাদে প্রমথবাবু একটা প্রবন্ধ লিখে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কেননা প্রমথবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের এর পরের চিঠিতেই (৯/৮/১৩ তারিখের) এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ থেকেই ভেবেছিলাম—'কানাকড়ি' প্রমথবাবুর লেখা। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির খোঁজ করতে গিয়ে সৌরীনবাবুর পুত্র সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে সৌরীনবাবুর সংগ্রহের মধ্যে আশ্চর্যভাবে রেঙ্গুন-প্রবাসী শরৎচন্দ্রকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের একটা চিঠি পাই। তাতে প্রবাসীতে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কানাকড়ি' প্রবন্ধের উল্লেখ থাকায় বোঝা গেল, 'কানাকড়ি এখনও পড়িনি' বলতে অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'কানাকড়ি', প্রমথবাবুর নয়।

আমি নিবেদনে বলেছি, সৌরীনবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির আশায় বছর কয়েক ঘুরেছি। শেষে এই বই ছাপা প্রায় শেষ হয়ে আসার সময় একদিন সৌম্যেনবাবুর কাছে ওই চিঠিটি পাই। চিঠিটি ঠিক সময়ে পেলে, যথাস্থানেই ওই কথার উল্লেখ করতে পারতাম।

যাই হোক্, প্রমথবাবুর চিঠিটিতে শুধু অবনীন্দ্রনাথের 'কানাকড়ি'র কথাই নেই, শরৎচন্দ্রের রচনা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। তাই প্রমথবাবুর সেই চিঠিটি সমস্তই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

পোর্ট হেল্‌থ অফিস
১৫/১ স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা
১৯. ৭. ১৩.

শরৎ,

আজ 'যমুনা' পেয়ে এক নিঃশ্বাসে 'বিন্দুর ছেলে' পড়লাম। এই গল্পটা ভারতবর্ষে অশোভন হবে বলে ভয় পেয়ে ছিলে ! বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় আজও এমন কাগজ বার হয়নি যাতে ওটা অশোভন হতে পারে ! এর চেয়ে ভাল গল্প বাঙ্গলা ভাষায় বার হয়েছে কি না সন্দেহ।

রবিবাবুর কতকগুলা গল্পে চোখে জল আসে, প্রভাতবাবুরও বোধ হয় দু একটায় হয়, আর দেখলাম তোমার। তারপর আর যা গল্প লেখক সব এ পিঠ আর ও পিঠ— আমারই মত চৌরঙ্গীর মোড়ে কুকুর ঠেঙ্গিয়ে মেরে 'প্যাথোস'-এর সৃষ্টি করেন। তোমার এই গল্পটার 'ফাইন টাচ'য়ে আমায় ৪।৫ জায়গায় একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল, চোখে সত্য সত্যই জল এনেছিল— আর আমার চোখ নিতান্ত 'পান্‌শে' নয়।

তুমি লিখেছ—'ওটা ভাল হয় নি'— কি মন্দ হয়েছে তুমি জান— আমি বলতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। তুমি ঐ অছিলা করেছ বোধ হয় 'ভারতবর্ষ'কে এটা প্রকাশ করবার গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার জন্য। এটা যদি তোমার খারাপই হয়, আমার বিশ্বাস 'ভারতবর্ষ' কেন, এর চেয়ে ঢের খারাপ গল্প প্রকাশ করতে পেলে অনেক কাগজ ধন্য হয়। 'ভারতবর্ষ'কে এর চেয়েও ভাল গল্প দিবার জন্য যখন প্রতিশ্রুত হয়েছ— তখন এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখলাম না। আশা করি শীঘ্র তোমার একটা গল্প প্রকাশ করার গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না। লোকের কাছে তোমার গল্প প্রকাশ করতে না পারায় যে কি পরিমাণ লজ্জিত হয়ে আছি—তা আর কি করে জানাব। যাদের কাছে, নিশ্চয় তোমার গল্প প্রকাশ করব বলে ইতিপূর্বে আস্ফালন করে ছিলাম, তাদের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হয়েছে।

এবারকার 'ভারতবর্ষ' পৌঁছেছে বোধ হয়। আগেকার সংখ্যার চেয়ে এবার ছাপাটাপা ভাল হলেও ঠিক যে খুব ভাল হয়েছে, মনে হয় না। আসছে সংখ্যাটা ভাল হবে বলে আশা করা যায়। 'বুড়ি' 'শাবরের দেবী' বলে একটা গাথা পাঠিয়েছেন— চমৎকার। পূজা সংখ্যায় বার করবার ইচ্ছা আছে।

আমি আশ্চর্য হয়েছি ভাই, তুমি ত কখনই ঠিক গৃহী নও— বরাবরই উদাসীন—অন্ততঃ আমি যতদিন থেকে তোমায় জেনেছি, কিন্তু কি করে তোমার এত "কীন অবজারভেশান উইথ্ মাইনিউটনেস অব্ ডিটেল্‌স' জন্মাল? অবাক হয়ে গেছি।

নরেনের সঙ্গ-দোষে অমূল্য যে আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে, এমন চমৎকার ফুটেছে যে সত্যি সত্যি ও 'চরিত্র চিত্রণ' হয়েছে। নূতনত্বের লোভে বালকেরা বয়ঃজ্যেষ্ঠ সঙ্গীদের দোষগুলা নকল করতে যায়— তাতেই নষ্ট হয়। আমরাও ঠিক ঐ রকম করে দশ আনা ছ'আনা চুল কাটা থেকে আরম্ভ করে সিগারেট খেতে ধরে ছিলাম। পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকাতায় আসায় ঐ অনুকরণ-প্রিয়তার জন্যই শহুরে হতে গিয়ে কলা খেয়ে যায়। চমৎকার তোমার 'অবজারভেশান' আর বাহাদুরী তোমার বর্ণনায়। যা লিখেচ সবই জানি— কিন্তু এমন সজীব হয়ে ফুটে ওঠেছে, যেন নিজের সংসারের ঘটনা।

এবারকার প্রবাসীতে 'কানাকড়ি' বলে একটা 'আর্টিকেল' বার হয়েছে, পড়েছ? অবনীবাবু 'ভারতবর্ষ'-এর ছবির উপর খুব একচোট গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন— রসিকতারও অভাব নেই। অবনীবাবুর 'ইন্ডিয়ান আর্ট' জ্ঞান ভাই দুর্ভাগ্যবশতঃ 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করতে পারি না। তিনি শিব গড়তে কি যেন একটা গড়েন— আর প্রবাসীর দল তাঁর ঢাক বাজায়। তাঁর 'আর্টের' যমুনায় একটা 'ক্রিটিসিজম্' করতে পার? তাঁর পুষ্পরাধা প্রভৃতির। সত্য, প্রথম সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' ও 'মেঘদূতে'র ছবিটা খারাপ হয়েছিল। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর অপর স্কুলের আর্টকে নিন্দা করবার সংকল্প করেই কলম ধরেছিল— নইলে কভারটা আর 'ফেথ্', 'হোপ অ্যান্ড চ্যারিটি'র ছবিটাও নিন্দা করে। 'সীতার অগ্নি পরীক্ষা'টা তাঁর প্রতিযোগীর আঁকা। সকলের চেয়ে আশ্চর্য বুড়া রামানন্দ কি করে ওটা তার কাগজে বার করলে। ওটা সাহিত্যে বার হলে অশোভন হত

না। আমরা কিন্তু তার 'নবল্ রিভেঞ্জ' নিয়েছি— তাঁর ফটো ছেপেছি ও তাঁর ছাই (সি. আই. ই.) ল্যাজ পাওয়ায় দীর্ঘ জীবন কামনা করেছি। 'কানাকড়ি' পড়ে যদি তোমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় একবার অনিলাকে দিয়ে তাঁর ছাই ঝেড়ে দেবে? তুমিই একা পার। সত্য বিদ্রূপটায় আনন্দ হয় কিন্তু মিথ্যা গালাগালি উপেক্ষা করতে আমি এখনও শিখি নাই। ইতি—

তোমার প্রমথ

'শ্রীনগদ-ক্রেতা' এই ছদ্মনামে লেখা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে 'কানাকড়ি' প্রবন্ধটি পড়ে প্রমথবাবু এই কথা লিখেছিলেন এবং শরৎচন্দ্রও পড়ে পরে ৯/৮/১৩ তারিখে উত্তরে প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন, 'আক্রমণ করিতেই হইবে ... দুঃখ এই যে আমি ওঁর অরিজিনাল পেন্টিং দেখি নাই, তাহা হইলে এমন বলা বলিতাম যে তিনি বুঝিতেন, এ কোন চিত্র-ব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়।' সেই প্রবন্ধটি সবই ১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী থেকে উদ্ধৃত করে 'পরিশিষ্টে' ৮১-৮৬ পৃষ্ঠায় দিয়েছি।

২.

১৭৩ পাতায় ১-সংখ্যক পত্র-পরিচিতিতে লিখেছি (পৃ. ১৯৮)—প্রবাস জ্যোতিঃ উঠে গেলে এর সহকারী সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পরে *উত্তরা* নামে একটি পত্রিকা বার করেন।

উত্তরা পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী হিসাবে সুরেশবাবুকে অনেকদিন থেকেই জানি। এইজন্যই এ কথা লিখেছিলাম। কিন্তু তা নয়। *উত্তরা* পত্রিকা বার করার ব্যাপারে সুরেশবাবু একজন উদ্যোগী হলেও সেদিন এ ব্যাপারে আরও অনেকেই উদ্যোগী ছিলেন। পরে অবশ্য সুরেশবাবুই এই পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক দুইই হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাইই ছিলেন। কিন্তু উত্তরা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এর মালিক ছিলেন 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন-এর কর্তৃপক্ষ (সুরেশবাবুও এ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিষ্ঠাবান কর্মী)। আর *উত্তরা*-র তখন সম্পাদক ছিলেন লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী কবি অতুলপ্রসাদ সেন ও অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উত্তরা তখন লক্ষ্ণৌ থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসের *কল্লোল* পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপনে এইরূপ দেখছি :

বাঙলার ভাবধারার সহিত প্রবাসী বাঙালীর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য

উত্তরা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল—বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।।০

সম্পাদক—সুকবি শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন বার-য়্যাট-ল, মনীষী পণ্ডিত

ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি

পরিচালক—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

উত্তরা কার্যালয়—১০।১ নং লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতার এজেন্ট—কল্লোল পাবলিশিং হাউস,

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা